শ্রীমা সারদা দেবী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৬৬

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীমায়ের জীবনী-রচনার কথা আমরা মনে মনে যতই আলোচনা করিয়াছি, ততই এই কার্য কত গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাধ্য ইহা ভাবিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি। এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব দেবচরিত্রের মর্মোদ্ঘাটনের জন্য যে প্রকার অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্নৈপুণ্য আবশ্যক, তাহার কিছুই আমাদের নাই। তথাপি আমরা এই বিশ্বাসে এই অসীম সাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছি যে, ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত লাভ আছে। চরিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে আমরা বস্তুতঃ এক সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক সাধনায়ই রত হইয়াছি। আবার আমরা ইহাও জানি যে, কোনও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় না লইয়া সরলভাবে এই অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী শুধু পরপর সাজাইয়া গেলেই শুদ্ধচিত্ত পাঠক ইহার তাৎপর্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কারণ মা কোন নিগূঢ় দর্শন বা জটিল মতবাদ লইয়া আসেন নাই; তিনি আসিয়াছিলেন জীবমাত্রের কল্যাণবিধায়িনী জননীরূপে। জননীর স্নেহ সন্তানের নিকট ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না।

অধিকন্তু তিন বৎসর পূর্বে শ্রীমায়ের শতবর্ষীয় জয়ন্তী-উৎসবের জন্য যে অস্থায়ী সমিতি সংগঠিত হয়, তাঁহারা বঙ্গভাষায় একখানি প্রামাণিক ও বিস্তারিত জীবনীর প্রয়োজনবোধ করিয়া বর্তমান লেখকের উপর ঐ গুরুভার অর্পণ করেন। তখনই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী ইহা সম্পাদন করিবেন। ইহাতে আমরা সাহস ও উৎসাহ পাইয়া এই সাধ্যাতীত কর্তব্যপালনে উদ্যত হই। বলা বাহুল্য যে, স্বামী মাধবানন্দজী আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থের উপাদান প্রায়শঃ প্রকাশিত পুস্তকাবলী হইতে সংগৃহীত হইলেও অনেক প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বহু নূতন তথ্য লিখিত বা মৌখিকভাবে দিয়াছেন। গ্রন্থগুলিরও বিবরণদাতাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত পুরাতন পত্র ও দলিল প্রভৃতি হইতেও আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। আমরা গ্রন্থকার ও উপাদানদাতৃগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, শ্রীমা যদিও মাত্র সার্ধত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ পূর্বে লীলাসংবরণ করিয়াছেন, তথাপি এই জীবনের চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট বহু লেখক ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য ভক্তসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য থাকিলেও সর্বাঙ্গীণ মিল নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিচারশক্তির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি এবং অধিকাংশ স্থলে পাদটীকায়

আমাদের অবলম্বিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু অযথা বাদপ্রতিবাদের ভয়ে স্থল বিশেষে যুক্তিযুক্ত বিবরণ-প্রদানান্তে কারণ-বিষয়ে মৌন অবলম্বন করিয়াছি। তবে পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই সকল স্থলে মায়ের নিজের কথাকেই আমরা সর্বাধিক সম্মান দিয়াছি।

শ্রীমায়ের জন্মতিথি, গম্ভীরানন্দ

১২ই পৌষ, ১৩৬০

সূচীপত্র

অবতরণিকা

সশক্তিক ভগবানই যুগধর্মপ্রবর্তনে সক্ষম হন; নতুবা নির্গুণ ব্রহ্মের পক্ষে জগদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া কল্পনাতীত। নরাবতারে শক্তির আরাধনাপূর্বক তিনি তাঁহাকে উদ্বোধিত করেন; অনন্তর লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে ঈশ্বরারাধিতা শক্তি যুগে যুগে কৃপাসুমুখী হইয়া বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানবসমাজের পুনরভ্যুত্থানের সূত্রপাত করেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন শক্তিও প্রায়ই নারীবেশে তাঁহার সহগামিনী হন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা, বুদ্ধদেবের সহিত যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনে ইহাই প্রমাণিত হয়। ফলতঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক শক্তিরূপেই হউক, কিংবা নারীরূপেই হউক, অবতারের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া শক্তি তাঁহার লীলাপ্রকাশে অশেষরূপে সহায় হন। শক্তিকে বাদ দিলে অবতারের দিব্য কার্যকলাপ অসম্ভব ও আমাদের নিকট অবোধ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাই লিখিয়াছেন, "চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্যমিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের ঋষিগণ শব-শিবার আরাধনা করিয়াছিলেন।. পথ-প্রদর্শক গুরুর ভিতর, জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্তির ভিতর বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও তামসিক গুণের ভিতর সেই অদ্বিতীয়া, বরাভয়করা মুণ্ডমালিনী দেবীর আবির্ভাবদর্শনে এবং শ্রদ্ধার সহিত আরাধনে তাঁহারা আপনারা কৃতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন" ('ভারতে শক্তিপূজা', ২০ পৃষ্ঠা)।

'রামকৃষ্ণের উপাসনায় সন্তুষ্টা সেই দেবীকে বর্তমান যুগে পুনরায় মানব-কল্যাণে নিরতা দেখিয়া পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন, "যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্-দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহা-যুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।" সর্বানুস্যূতা ব্রহ্মরূপিণী সেই অদৃশ্যা আদ্যাশক্তি এই কালে আবার যুগাবতারের সহধর্মিণীরূপে অবতীর্ণা হইয়া একদিকে যেমন পরম পুরুষের লীলার পূর্তিবিধান করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমা বিস্তার এবং মানবসমাজ হইতে অকল্যাণ

বিদূরণপূর্বক ভাবী ভারতকে, তথা সমগ্র বিশ্বকে, এক নব অভ্যুদয়ের রাজমার্গে তুলিয়া দিয়াছেন। তাই সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাপাঙ্গে কৃতার্থ স্বামী বিবেকানন্দ সবিনয়ে প্রণাম করিয়াছেন—

দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।

ঈশ্বরের অবতরণের যেমন একটা ধারা আছে, শক্তির আবির্ভাবেরও তেমনি একটা রীতি আছে। অথবা অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় অভিন্ন ঈশ্বর ও ঈশ্বরশক্তির শরীরগ্রহণ একই উদ্দেশ্যে, একই কালে, একই নিয়মে হইলেও উহার কার্যসিদ্ধি পুরুষদেহাবলম্বনে এক প্রকারে এবং নারীদেহাবলম্বনে অন্য প্রকারে হইয়া থাকে। তাই সত্তার পার্থক্য না থাকিলেও করুণাময়ী শক্তির অবতারতত্ত্ব পৃথকভাবে আলোচনার একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

"এইরূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আমি তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রুবিনাশ করিব" (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)। পুরাকালে দেব-মনুষ্যাদির নিপীড়নকারী দানবকুলের ধ্বংসসাধনের একটা অবশ্য-স্বীকার্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অসুরদিগের তাণ্ডবলীলা শুধু বহির্জগতে সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্তর্জগতে সুবৃত্তি ও কুবৃত্তির মধ্যে যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে, উপনিষদে তাহাকেও দেবাসুরসংগ্রাম নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। আস্তিক্যবুদ্ধি, পরলোকচিন্তা, ধ্যাননিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশিকে নির্মূল করিবার জন্য বর্তমান যুগে অশ্রদ্ধা, জড়বাদপ্রিয়তা, ভোগপরায়ণতা প্রভৃতি আসুরিক গুণাবলী যে সমর ঘোষণা করিয়াছে, এবং যাহার ফলে ধর্মের গ্লানি অধর্মের বৃদ্ধি এবং ঈর্ষা, দ্বেষ কাম প্রভৃতির আধিক্যবশতঃ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইতেছে, উহাই একালের দেবাসুরসংগ্রাম।

আধুনিক এই মনোরাজ্যের সংগ্রাম পৌরাণিক দেবদানবের যুদ্ধ অপেক্ষাও ঘোরতর। অতীতের সংঘর্ষ সাধারণতঃ স্থূলজগতের গণ্ডি অতিক্রম করিত না, কিন্তু আধুনিক দ্বন্দ্ব অন্তর্জগতে উদ্ভূত ও দৈনন্দিন জীবনে প্রসারিত হইয়া মানবের মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে শক্তির ক্রিয়া এবং অসুরসংহার প্রধানতঃ মানসিক ক্ষেত্রে হওয়া আবশ্যক। আধুনিক জগতে সর্বাধিক প্রয়োজন নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির। অন্তরে একবার ভক্তি, বিশ্বাস ও পবিত্রতা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহিরের অবস্থা স্বতই তদনুযায়ী পরিবর্তিত হইবে। এই যুগে শক্তির অবতার তাই অন্তঃশত্রুর বিজয়ে ব্যাপৃত। বিজয় দুই প্রকার হইতে পারে— প্রথম, ক্ষমতার

প্রয়োগে পাপসহ পাপীর ধ্বংসসাধন; দ্বিতীয়, সদ্‌গুণরাশির চমৎকারিত্বের দ্বারা শত্রুর চিত্ত আকর্ষণপূর্বক অসৎকে সৎ-এ পরিবর্তিত করা। যুদ্ধে অরিবিনাশ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাহার মনোজয় করা অধিকতর শক্তির পরিচায়ক। তাই বর্তমান অবতারে অস্ত্রবাহুল্য, সিংহগর্জন বা সমরকোলাহল নাই—আছে শুধু লজ্জা, বিনয়, সদাচার, পবিত্রতা, কল্যাণস্পৃহা ও ঈশানুভূতি। আবার শুধু বিঘ্নাপসারণই দেবীর কর্তব্য নহে; তাঁহাকে নবীন আদর্শ স্থাপন করিতে এবং নূতন উদ্দীপনা যোগাইতে হইবে। অরিসংহার দ্বারা ভক্তের সাধনমার্গ নিষ্কণ্টক করার জন্য স্বয়ং ভগবানকে নামিয়া আসিতে হয় না; তাঁহার আংশিক বা গুণবিশেষের আবির্ভাবেই সে কার্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু মানবসমাজকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চতর সোপানে তুলিতে হইলে স্বয়ং ব্রহ্মশক্তিকেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়।

ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ ঐশী শক্তির আবির্ভাবে এক অভূতপূর্ব জাগরণের সম্ভাবনা দ্যোতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নারী জগতে ইহার কার্য সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। নারীসমাজের উন্নতির প্রয়োজন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মাতৃজাতির অভ্যুদয় ব্যতিরেকে ভারতের কল্যাণ সম্ভবপর নহে; একপক্ষে পক্ষীর উত্থান হয় না; সেইজন্য রামকৃষ্ণ-অবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই স্বীয় সহধর্মিণীর শিক্ষা-দীক্ষার ভারগ্রহণ, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।

মাতৃজাতির প্রগতির পথে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ-বিজিত ভারত তখন পাশ্চাত্যের ভাবধারায় প্লাবিত। প্রতীচ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও সম্পদের দুর্নিবার্য মোহে পরাধীন ভারত তখন ইওরোপীয় ভাবগুলিকে গ্রহণ করিতে লালায়িত। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুলাই সার চার্লস উড্ ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই লালসার পরিণতি কোথায়, তাহার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এই বৈদেশিক পদ্ধতি ও প্রভাবকে স্বীকার করিয়া ভারত নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভুল করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির বরং ইহাই রীতি যে, সে আত্মসংস্থ থাকিয়া অপরের ভাবরাশিকে গ্রহণপূর্বক নিজের চিন্তারাজ্যের সমৃদ্ধিসাধন করে। বর্তমান যুগে আমাদের নারীসমাজকে পাশ্চাত্যের নারীসমাজের আদর্শ দ্বারা কিছু সতেজ করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। তেমনি আবার পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচিতে হইলে আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে উভয় দেশেরই দাতব্য অনেক কিছু থাকিলেও মৌলিক দৃষ্টিভেদ না মানিয়া একে অপরের অনুসরণ করিতে গেলে হিতে

বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। উভয় দেশে নারী সম্মানিতা হইলেও প্রতীচ্যে সে সম্মান পূজার স্তরে উন্নীত হয় নাই, উহা প্রধানতঃ রমণীর সৌন্দর্য বা রমণীকুলোচিত গুণরাশির প্রশংসায় পর্যবসিত। নারীজীবনের একটা প্রধান অংশ সেখানে ইচ্ছাপূর্বক পুরুষের মনোহরণে নিয়োজিত। আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ, সংযম ব্যতিরেকে তাহা সম্ভব নহে। তাই এখানে সতীত্বের ও মাতৃত্বের এত আদর। আমাদের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। এই উভয় আদর্শের সংঘর্ষস্থলে ভাবী বিশ্বসভ্যতা কোন্ পথ বাছিয়া লইবে—প্রশ্নটি এই যুগে যেখানে প্রবল ও সুস্পষ্টাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে, এক শত বৎসর পূর্বে ঠিক সেভাবে উত্থিত হয় নাই। তবু ভারতের ভাগ্য-বিধাত্রী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুগের বৈদেশিক ভাবের মহাপ্লাবন হইতে যদি ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা না করা হয় তবে এমন কোন অটুট ভিত্তিই থাকিবে না যাহার উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সৌধ পুনঃস্থাপিত হইতে পারে। তাই দেবী-গুরু-মাতৃশক্তি-সমন্বিত এক অত্যুচ্চ আশ্রয়স্থল দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, যাহার সহায়ে আধুনিক ভারতসমাজ আপনাকে ঐ মহাবিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে এবং পাশ্চাত্য সমাজকেও সে রক্ষাস্থলে আকর্ষণ করিতে পারে।

যেদিক দিয়াই ধরা যাউক না কেন, বর্তমান যুগে এই দেশের আদর্শকে সঞ্জীবিত করার ও উহার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল আর সে প্রয়োজন-সম্পাদন একমাত্র জগদম্বার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কোন উপায়ে পরাধীন ভারতকে আত্মসংস্থ করা এবং সমস্ত বিশ্বকে এই প্রাণপ্রদ আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত করা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভারতের মর্মকথা জগৎসমাজে প্রচারের ইহাই চিরন্তন পন্থা। সত্য কথা বলিতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ধর্মের অধোগতি যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, শক্তির অবতরণও তেমনি সর্বোত্তম হইয়াছে। দেবী-গুরু-মাতৃ-জ্ঞানে এই শক্তির পূজার ভিতর দিয়াই নবীন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইবে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যদিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, ভগবান স্বয়ং মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিলেও ক্ষুদ্রচিত্ত মানুষ তাঁহার পরমেশ্বরত্ব না বুঝিয়া সাধারণ নরবুদ্ধিতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ("অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"), তথাপি তাদৃশ দেহ-অবলম্বনেই তিনি যুগে যুগে সুখদুঃখ ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানবজীবনকে দৈবী সম্পদে ভূষিত করিবার প্রণালী দেখাইয়া থাকেন, কারণ স্বার্থবিজড়িত সংসারে নিবদ্ধদৃষ্টি জনসাধারণের পক্ষে উচ্চতর আদর্শের জন্য উদ্দীপনালাভের অন্য কোন উপায় নাই। এই শিক্ষাদান বহু প্রকারে হইয়া থাকে। কোন ক্ষেত্রে উপদেশচ্ছলে কিংবা স্বীয় আচরণাদি-সহায়ে মহাজন-সমাদৃত ভাবরাশির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় এবং উহাদের

অধিকতর গাম্ভীর্য সম্পাদিত হয়; কোন স্থলে লীলাবিগ্রহ-অবলম্বনে উন্নত চরিত্রগঠনের জন্য যুগোপযোগী নবীন পন্থা নির্ধারিত হয়; আবার ক্ষেত্র-বিশেষে লীলাচ্ছলে বিবিধ চিত্তবিমোহন ভগবদ্ভাবের প্রতি মানবহৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট করা হয়। অবশ্য অবতারের কার্যাবলী এই ভাব-গাম্ভীর্য-সম্পাদন, নবীন আদর্শ-সংস্থাপন বা মানবচিত্তের আকর্ষণমাত্রেই নিঃশেষিত হয় না। বস্তুতঃ ভাবঘনমূর্তি ঈশ্বরাবতারের উদ্দেশ্যাদি মানববুদ্ধি-সহায়ে সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ করা বা বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বহু শতাব্দী ধরিয়া সমাজকল্যাণ সাধনার্থে যে ভগবচ্ছক্তি প্রসারিত হয়, তাহার পূর্ণ সার্থকতা প্রথমাবস্থায়ই নির্ণীত হইতে পারে না, ভাবী ইতিহাসই উহা নির্ধারণে সক্ষম। তথাপি বর্তমান চরিত্রের আলোচনার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা এই তিনটি মানই গ্রহণ করিলাম। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে আমরা মাতৃত্বাদি দৈবভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইব, এবং ধর্মমার্গের পরি-পুষ্টির জন্য উহারা কেমন করিয়া নবভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহারও পরিচয় পাইব। আমরা দেখিব, তাঁহার জীবনে দুহিতৃ-ভগিনী-বধূ-পত্নী-গৃহিণী প্রভৃতি নারীজনোচিত সম্বন্ধ ও অবস্থাবিশেষের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাঁহার অমলধবললীলাবিলাস স্বতই মানবমনকে আকর্ষণপূর্বক চিরধ্যেয়-বস্তুরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

ইহা কি ভাবের উচ্ছ্বাস, অথবা বাস্তবতার অস্ফুট ইঙ্গিত? আমরা পাঠককে এই জীবন অনুধাবনান্তে এই প্রশ্নের পুনরুত্থাপনে আহ্বান করি; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বয়ং তৎপূর্বেই তথ্যের সন্ধান পাইয়া সন্দেহ-নির্মুক্ত হইবেন। তবে এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, আমরা যে চরিত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি উহা অনেকাংশেই অনন্যসাধারণ; সুতরাং উহার সার্থকতার মানও অন্যবিধ। সমসাময়িক জগতে যে অতিমানব মূর্তিগুলি অকস্মাৎ স্ফীতি লাভ করিয়া কিছুকাল বিস্ময়োৎপাদনান্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া যায়, অথবা যে-সকল জীবন কর্মচাঞ্চল্য, বাগাড়ম্বর বা যন্ত্রাদির বিকট সংঘর্ষ উৎপাদনপূর্বক তৎকালিক সভ্যতাকে সঙ্কটাপন্ন করে এবং ইতিহাসের অধ্যায়বিশেষকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখে, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনী সেই ক্ষণিকচমকপ্রদ স্তরের নহে। কিন্তু যে মহান চরিত্রসমূহ নীরব সাধনের ফলে মানব-সংস্কৃতিকে উচ্চতর সুরে বাঁধিয়া দিয়া যায়, যাহাদের প্রভা সমসাময়িক দৃষ্টিতে ক্ষীণ মনে হইলেও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় এবং ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পূত চরিত্র তাহাদেরই পর্যায়ভুক্ত। শুধু তাহাই নহে, সতী, সীতা প্রভৃতি যে-সকল প্রাতঃ-স্মরণীয়াদের আগমনে ধর্মজীবনের পঙ্কিলতা বিদূরিত ও নবাভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, শ্রীমায়ের জীবনী তাঁহাদেরই সমশ্রেণীতে স্থাপনীয়।

সবই সত্য; তবু প্রশ্ন জাগে, সমগ্র বিশ্বের জন্য যে শক্তির অবতরণ, তিনি নবীন সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্র পল্লীকে আপনার পীঠস্থানরূপে নির্বাচিত করিলেন কেন? ইহার উত্তর কে দিবে? যাঁহার অচিন্ত্য মহিমায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইয়া থাকে, তাঁহার কয়টি কার্যের কারণনির্ণয়ে আমরা সমর্থ হই? তবু মানববুদ্ধি নিজের এই অপারগতা জানিয়াও অনুসন্ধানে বিরত হয় না। আমরা তাই ভাবি, জয়রামবাটীর কি কোন নিজস্ব মহিমা ছিল, যাহার ফলে সে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইল? বহু সন্ধানেও তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসের কারাগারে এবং শৈশব, বাল্য ও কৈশোর গোপবালকমধ্যে ব্যয়িত হইয়াছিল; যীশুখ্রীস্ট অশ্বশালায় জন্মগ্রহণ করিয়া সূত্রধরগৃহে লালিত হইয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ অখ্যাতনামা কামারপুকুর গ্রামে ঢেঁকিশালে ভূমিষ্ঠ হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দেবলবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। আর সমাজতাত্ত্বিকের সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতে পাই যে, দেশের নগরবাসী, শিক্ষিত ও ধনিক সম্প্রদায়ে চিন্তাবিপ্লব উপস্থিত হইলেও জাতীয় সংস্কৃতি বহুকাল যাবৎ পল্লীর নিঃস্ব শান্তজীবন আশ্রয়পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ভারতীয় সংস্কৃতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কপর্দকহীন ধর্মগুরুদিগকে আধ্যাত্মিক উচ্চাসন ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছে! জয়রামবাটী কি সেই অধ্যাত্মসম্পদে গরীয়ান?

শক্তিপীঠ

শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বাঁকুড়া জেলা সাধারণতঃ অভাবগ্রস্ত ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহার দক্ষিণ-পূর্বভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রামখানি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিবশতঃ অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ, এবং অক্লান্তকর্মা কৃষককুলের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে উহার শস্যক্ষেত্র ইক্ষু, ধান্য, গম ও বিবিধ শাক-সবজিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া সদা হাস্যময়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থল কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উহা বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তঃপাতী কোতুলপুর বা কোতলপুর থানার অধীনস্থ শিরোমণিপুর নামক ফাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে পূর্বমুখে প্রবাহিত স্বচ্ছতোয় আমোদর নদ গ্রামের উত্তর-সীমা নির্ধারিত করিয়া ক্রীড়াচঞ্চল বালকের ন্যায় আপন-মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়াছে; পরে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে ঘুরিয়া কামার-পুকুরের মুকুন্দপুর নামক পল্লীর প্রান্তদেশ প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। স্বল্পপরিসর ও হেমন্তে অগভীর আমোদরের স্থানে স্থানে ছোট বড় দহ (ঘূর্ণিজল) আছে। উহার জল গভীর ও মৎস্যাদিতে পূর্ণ। কখনো কখনো ঐসকল ঘূর্ণিতে মৎস্যাশী ছোট ছোট কুমিরের আবির্ভাব হয়। বক্রগতি আমোদর জয়রামবাটীর উত্তর প্রান্তে এক মনোহর উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ হরিৎ-শষ্পাচ্ছাদিত, ত্রিভুজাকৃতি কূর্মপৃষ্ঠ ভূমিখণ্ড বিল্ব, বকুল, গুলঞ্চ, আম্র, বট, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া ছায়া-শীতল, জনকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া নীরব-গম্ভীর এবং ইতস্ততঃ দুই-একটি শ্মশানচিহ্ন শোভিত হইয়া বৈরাগ্যোদ্দীপক। বিহঙ্গ-কাকলীপূরিত, ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ এই সাধনানুকূল মনোরম ভূভাগের মধ্য-স্থলে অধুনাবিলুপ্ত আমলকী বৃক্ষের নিম্নে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীযুক্তা যোগীন-মা, শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা প্রভৃতি অনেকে আমোদরে অবগাহনান্তে জপ-ধ্যান ও গীতা-চণ্ডী-পাঠাদিতে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বাল্যকালে এই আমোদর নদেই পর্বাদিতে 'গঙ্গাস্নান' সমাপন করিতেন।

জয়রামবাটীর স্বাভাবিক অবস্থান অতি সুন্দর —প্রায় চারিপার্শ্বেই উন্মুক্ত প্রান্তর। আমোদর নদ এবং গ্রামের মধ্যবর্তী আন্দাজ অর্ধ মাইল পরিমিত ক্ষেত্র খুবই উর্বর। উহাতে এবং গ্রামসংলগ্ন অন্যান্য ভূমিতে স্বল্পে সন্তুষ্ট কৃষকপরিবারের উপযোগী ধান্য, দাল, লঙ্কা, হলুদ, তরকারি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমায়ের বাল্যকালে কার্পাসেরও চাষ হইত। আর পুষ্করিণীতে

যথেষ্ট মৎস্য ছিল। কথিত আছে যে, শ্রীমায়ের আগমনের পূর্বে গ্রামে তেমন প্রাচুর্য দেখা যাইত না; তাঁহার আবির্ভাবের পর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তখন এই ক্ষুদ্র গ্রামে কোন দোকান ছিল না। অথচ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট গ্রামবাসীদিগকে সাধারণতঃ অন্যগ্রামের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। বিশেষ প্রয়োজনে তাহারা তিন মাইল দূরবর্তী কামারপুকুরের হাটে যাইত, এবং সেখান হইতে মিঠাইমণ্ডা কিনিয়া আনিত; ছয় মাইল উত্তরে কোতলপুরে তাহারা আবশ্যকীয় বস্ত্র, লবণ ও মশলা প্রভৃতি দ্রব্য পাইত; কিংবা পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়াপাট-বদনগঞ্জে যাইয়া হাট-বাজার করিত। জয়রাম-বাটীর এক মাইল পশ্চিমে শিহড়ের (শিওড়ের) হাটতলায় কয়েকটি ছোট দোকান এবং মাইল দেড়েক দূরে পুকুরে গ্রামে একখানি মুদির দোকান ছিল। সময়বিশেষে ইহারাও জয়রামবাটীর অভাব মিটাইত। গ্রামের উত্তরে আমোদর পার হইয়া প্রশস্ত মাঠের পর বৃহৎ দেশড়া গ্রাম। পূর্বেও প্রায় এক মাইল-ব্যাপী ধান্যক্ষেত্রাদির পর আমোদর নদ। উহা পার হইয়া অমরপুর গ্রামের ভিতর দিয়া চলা-পথে কামারপুকুরে যাইতে হইত। অধুনা ঐ পথটি প্রশস্ত ও সহজগম্য হইয়াছে। পথের আশেপাশে বট, অশ্বত্থাদির সুশীতল ছায়ায় ক্লান্ত পথিকগণ ও গোচারণরত বালকগণ বিশ্রাম করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পিতৃবংশ মুখোপাধ্যায়রা ঐ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। এই মুখোপাধ্যায়গণ এবং তাঁহাদের দৌহিত্রবংশীয় বন্দ্যোপাধ্যায়কুল ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মণ-পরিবার সেখানে নাই। এতদ্ব্যতীত বিশ্বাস, মণ্ডল, ঘোষ ও সামুই উপাধিধারী কয়েক সদ্‌গোপ পরিবার, কয়েক ঘর গোয়ালা একঘর নাপিত, একঘর ময়রা, একঘর কামার এবং দুই-তিন ঘর বাগদী—এইসব মিলিয়া প্রায় একশতটি পরিবার তাহাদের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকাগৃহে অনাড়ম্বর পল্লী-জীবন যাপন করে। গ্রামের নামের উৎপত্তিবিষয়ে কোন অবিসংবাদিত মত আমরা অবগত নহি। হয়তো মুখোপাধ্যায়দের আরাধ্য দেবতা অথবা পূর্ব-পুরুষদের কাহারো নামেই গ্রামের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

গ্রামের দক্ষিণপার্শ্ববর্তী তালবৃক্ষ-সুশোভিত বাঁড়ুজ্যেপুকুরে গ্রামবাসীরা স্নান করিত এবং উহা হইতেই পানীয় জল আহরণ করিত। বাঁড়ুজ্যেপুকুরের দক্ষিণে শতদলশোভিত একটি সুন্দর প্রাচীন পুষ্করিণী। গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে কৃষককুলের চাষের ভরসাস্থল আহের নামক বৃহৎ জলাশয় এবং প্রায় মধ্যস্থলে পুণ্যপুকুর নামে প্রাচীন পুষ্করিণী অবস্থিত। পুণ্যপুকুরের পশ্চিম তীরে দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর (১৩২৩ সালে নির্মিত) নূতন বাটী। ঐ পাড়ের উত্তর দিকে দক্ষিণদ্বারী একখানি ক্ষুদ্র খড়ের চালা আছে। উহা মুখুজ্যে-বংশের প্রাচীন দেবালয়। উহার একখানি ঘরে সাঙ্গোপাঙ্গ সুন্দর-নারায়ণ নামক কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর অবস্থান করেন। মুখুজ্যেরা এখনো পালা-

ক্রমে দেবতার পূজা চালাইয়া থাকেন। অপর কক্ষ কালী-মাড়ো নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ মাড়ো শব্দ মণ্ডপেরই অপভ্রংশ। এই মাড়োতে প্রতিবৎসর কালীপূজা হইত। কিন্তু পরে মুখুজ্যেদের অন্তর্বিবাদে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই মণ্ডপেই আবার গ্রাম্য পাঠশালা বসিত। আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া এবং বগলে পাততাড়ি লইয়া গ্রাম্য বালক-বালিকারা দুইবেলা তথায় সমবেত হইত। কালী-মণ্ডপের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর ছিল; উহা মা ষষ্ঠীর প্রতীক। নববিবাহিত বরবধূকে এই ষষ্ঠীতলায় আসিয়া প্রণাম জানাইতে হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকেও নিশ্চয় এখানে আসিতে হইয়াছিল। মা ষষ্ঠী এখন সুন্দরনারায়ণের গৃহে স্থান পাইয়াছেন। পুণ্যপুকুরের দক্ষিণ পাড় হইয়া যে গ্রাম্য রাস্তা গিয়াছে উহার দক্ষিণ পার্শ্বে, পুণ্যপুকুরের পূর্ব পাড়ে ও দক্ষিণ পাড়ের পূর্ব কোণে, মোড়লপাড়া। মোড়লপাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধা ৺সিংহবাহিনীর মাড়ো বা দেবালয়। ৺সিংহবাহিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় একাসনে এবং ৺মনসাদেবী অন্য আসনে স্থাপিতা। মুখুজ্যেরাই দেবীর পুরোহিত। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, দেবী তখন একখানি খড়ের চালায় থাকিতেন; বর্তমানে পাকা ভিতের উপরে টিনের চালা হইয়াছে।

পুণ্যপুকুরের দক্ষিণে বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি। গৃহদেবতার প্রাচীন ইষ্টক-নির্মিত দেবালয়, বৈঠকখানা ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় যে, ইঁহারা একসময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এখন সবই ধ্বংসপ্রায়।

পুণ্যপুকুরের তীরবর্তী শ্রীমায়ের নূতন বাড়ি ও ৺কালীমণ্ডপের পশ্চিম দিক দিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রধান গ্রাম্যপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। উহা ধরিয়া একটু উত্তরে অগ্রসর হইলেই বামদিকে শ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর ইষ্টকনির্মিত মন্দির[১] দেখিতে পাওয়া যায়। মুখুজ্যেরা প্রথমে এই ভূমিখণ্ডেই বাস করিতেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধি হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমে সরিয়া যান। পূর্বোক্ত গ্রাম্যপথের পশ্চিমে তাঁহাদের পূর্বদ্বারী গৃহগুলি আজও বিদ্যমান। প্রাচীন বসতবাটীর পূর্বদিকে একখানি দোচালা ঘর ছিল; মধ্যে দেওয়াল—উহার দুই পার্শ্বে সদর ও অন্দর। দক্ষিণে রান্নঘর, ঢেকিশাল প্রভৃতি ছিল। মুখুজ্যেদের বর্তমান গৃহগুলির দক্ষিণদিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান যে রাস্তা আছে, উহা একদিকে পুণ্যপুকুরের পশ্চিমস্থ প্রধান গ্রাম্য পথের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপরদিকে 'কলুগেড়ে'র (পুকুর) উত্তর পাড় দিয়া পশ্চিমমুখে গিয়া ঘোষপাড়ার দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া আহেরের উত্তর পাড়ে শিহড়ের রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। ঘোষপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে উক্ত পথের অদূরে ঘোষবংশের

১ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল, বা ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয়।

কুলদেবতা 'যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক ধর্মঠাকুরের পাকা মন্দির। চারিখুরাবিশিষ্ট একখানি চতুষ্কোণ আসনই তাঁহার প্রতীক।

জয়রামবাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ যে-সকল গ্রামের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত, তাহাদের মধ্যে শিহড়, কোয়ালপাড়া, আনুড় ও শ্যামবাজারের নাম উল্লেখযোগ্য। শিহড়ে ঠাকুরের পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনীর শ্বশুরগৃহ এবং শ্রীমায়ের মাতুলালয়। এই সূত্রে বাল্যাবধি উভয়ে তথায় বহুবার গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুরের পথে কলিকাতায় যাতায়াতের সময় শ্রীমা প্রায়ই কোয়ালপাড়ায় দুই-একদিন বিশ্রাম করিতেন; দুইবার অধিক দিনও বাস করিয়াছিলেন। আনুড়ে বিশালাক্ষী-দর্শনে গমনকালে ঠাকুর পথিমধ্যে দেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্যামবাজারে তিনি একবার সাত অহোরাত্র সংকীর্তনে মত্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপর অনেক গ্রাম ঠাকুর ও শ্রীমায়ের লীলাস্মৃতি বহন করিতেছে। জয়রামবাটীর পূর্বে আমোদরের অপর তীরে বৃহৎ গ্রাম তাজপুর; দক্ষিণে গ্রামের জমিদার রায়দের বাসভূমি জিবটা; দক্ষিণ-পশ্চিমে মসিনাপুর (মসনেপুর), পশ্চিমে শিহড়। এইসব গ্রামই জয়রামবাটী হইতে অর্ধক্রোশের মধ্যে। শিহড়ের পশ্চিমে মুসলমান-অধ্যুষিত শিরোমণিপুর। সেখানে পুলিশের ফাঁড়ি আছে।

জয়রামবাটী কলিকাতা মহানগরী হইতে অধিক দূর নহে; অথচ তথায় যাতায়াত বিশেষ আয়াসসাধ্য। পূর্বে উহা আরও দুর্গম ছিল। তখনকার দিনে অধিকাংশ লোক কামারপুকুর, বেঙ্গাই-চৌরাস্তা, কুমারগঞ্জ, একলকী ও উচালনের পথে পদব্রজে চলিয়া ও চটিতে বিশ্রাম করিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইতেন এবং তথায় ট্রেনে চড়িতেন। সঙ্গতিসম্পন্ন বিরল দুই-চারিজনই পালকি প্রভৃতির সাহায্য লইতেন। সমস্ত পথেই তখন দস্যুভয় ছিল। ঐ পথে গো-যানে দ্রব্যসম্ভার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইত। উচালন বর্ধমান হইতে আন্দাজ ষোল মাইল, কামারপুকুর হইতেও প্রায় ঐরূপ। অপর একটি পথ কামারপুকুর হইতে জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া তেলো-ভেলোর মাঠ অতিক্রমপূর্বক তারকেশ্বর পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথে কলিকাতার দূরত্ব অল্পতর[১] হইলেও উহা অধিক ভয়াবহ ছিল। বর্ষায় এই পথ দুর্গম হইলে কেহ কেহ আরামবাগে গহনার নৌকায় উঠিয়া রানীচক ও কোলাঘাট হইয়া কলিকাতায় যাইতেন। বেঙ্গল নাগপুর রেললাইন খুলিবার পর বহু লোক বিষ্ণুপুরের পথে যাইতেন। কলিকাতার লোকেরা বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তথা হইতে বাসে কোতুলপুর, কোয়ালপাড়া ও দেশড়া হইয়া জয়রামবাটী গিয়া থাকেন। বর্ষাকালে বাস কোতলপুরের ওদিক আর যায় না;

---

১ জয়রামবাটী হইতে তারকেশ্বর প্রায় ত্রিশ মাইল।

সুতরাং বাকি পথ গোযানে বা পদব্রজে যাইতে হয়।[১] কেহ কেহ বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যাইয়া বাসে আরামবাগে উপনীত হন। এবং তথা হইতে গোযানে বা পদব্রজে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী গমন করেন। এতদ্ব্যতীত ছোট লাইনের ট্রেনে চাঁপাডাঙ্গা যাইয়া সেখান হইতে বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে মোটরে বা বর্ষার সময় গোযানে আরামবাগ যাওয়া চলে। আরামবাগ হইতে জয়রামবাটী আন্দাজ এগার মাইল।[২]

আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও জয়রামবাটীতে আনন্দোৎসবের অভাব কোন কালেই ছিল না। বৎসরে অনেক পার্বণই সেখানে জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয়। আবার শরৎকালে ৺সিংহবাহিনীর মন্দিরে তিন দিবসব্যাপী সাড়ম্বর পূজা, বলি ও ভোগরাগাদি লইয়া গ্রামবাসীরা মাতিয়া উঠে। দেবীর অন্নভোগ নিষিদ্ধ; তাঁহাকে চিঁড়া, ফল-মূল ও মিষ্ট নিবেদন করা হয়। ৺রাধাষ্টমী ও ৺শ্যামাপূজাতে গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া আনন্দোৎসব ও কীর্তনাদি করে; ৺শিবরাত্রিতে শিহড়ে গমনপূর্বক ৺শান্তিনাথের পূজা দেয় এবং গাজনের সন্ন্যাসী সাজিয়া ব্রত উপবাস করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ধূম-ধামের সহিত ৺শীতলা দেবীর পূজানুষ্ঠান আজও প্রচলিত আছে। সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহে অদ্যাপি সময়বিশেষে অষ্টপ্রহর-কীর্তন ও পৌরাণিক যাত্রাভিনয়াদি হইয়া থাকে। যাত্রা শুনিতে বগলে মাদুর লইয়া ও আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া গ্রামান্তরে গমনের প্রথা আজও বিদ্যমান আছে।

সর্বোপরি জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থলের উপর অবস্থিত শুভ্র ইষ্টকমন্দিরের শ্বেতচূড়া এবং তদুপরি 'মা'-নামাঙ্কিত ধাতুপতাকা দূর দূরান্তরের পথিকবর্গকে সেকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং দেশ-বিদেশের প্রণতি আকর্ষণ করিতেছে। লোক-চলাচলের অপেক্ষাকৃত সুবিধা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্র স্থাপন এবং ঐ কেন্দ্রকে অবলম্বনপূর্বক বিবিধ সেবানুষ্ঠানের ফলে জনসমাজের দৃষ্টি ক্রমেই এই অতি পবিত্র পীঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও উন্নতি হইতেছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবস অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণরজোদ্বারা পবিত্রীকৃত এই পুণ্যভূমিতে দেহ অবলুণ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিবৎসর বহু ভক্তের সমাগম হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জননীর দ্বারা আরব্ধ ৺জগদ্ধাত্রীপূজাও এখানে তুল্য সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীজগদম্বার ইহা এক অপূর্ব মহিমা যে,

১ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত পথ পাকা হইয়াছে।

২ বর্তমানে কলিকাতা হইতে লোকেরা বাসে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী সহজে যাতায়াত করিতে পারেন।

তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে নগণ্য জয়রামবাটী আজ পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়া নিজ গৌরব সর্বত্র ঘোষণা করিতেছে। শ্রীমা এই ভূমির ধূলি স্বয়ং একদিন মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

আবির্ভাব

শ্রীমায়ের আগমনে যে মুখুজ্যেকুল জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন তাঁহারা ঠিক কবে জয়রামবাটীতে বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অবিদিত। প্রাচীন দুইখানি দলিল দৃষ্টে জানা যায় যে, ১০৭৬ সনের ১২ বৈশাখ তারিখে বিষ্ণুপুরের জনৈক রাজা শ্রীচৈতন্যসিংহ দেব জয়রামবাটী গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে ১১।৪ কাঠা ব্রহ্মোত্তর ও ৬॥১ কাঠা দেবোত্তর নিষ্কর ভূমি দান করেন। দেবোত্তর দলিলে খেলারামকে 'ধর্মঠাকুরের পরিচারক বলিয়া উল্লেখ করায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ইহারা তখন বা তৎপূর্বে হইতেই ধর্মঠাকুরের সেবায়ত ছিলেন। বর্তমান মুখুজ্যেরা খেলারামেরই বংশধররূপে সেই সকল সম্পত্তি ভোগদখল ও ধর্মঠাকুরের সেবা পরিচালনা করিতেছেন।[১]

মাতৃমন্দির যেস্থানে নির্মিত হইয়াছে, উহাই মুখুজ্যেদের আদিম বাস্তুভিটা বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীমায়ের জন্ম এবং বিবাহ ঐ বাটীতেই হয়; তাঁহার নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার জনকজননী তথায় বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমা বলিয়াছেন, "পুরান (জন্মস্থানের) বাড়িতে বিয়ে হয়। আমার ন-বছর বয়সের সময় নূতন বাড়িতে (বরদা-মামার বাড়িতে) আসি—ও বাড়িতে আর ধরে না।" মাতৃমন্দির-নির্মাণের জন্য মৃত্তিকাখননকালে ঐ স্থানে যে কৃষ্ণপ্রস্তরের গৌরীপট্ট সমেত ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছিল, উহা হয়তো এককালে মুখুজ্যে-পরিবারে ভক্তিসহকারে পূজিত হইত!

মুখুজ্যেদের জয়রামবাটীতে আগমনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের এক ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ-প্রাধান্য-বিমুক্ত হিন্দুসমাজ তখন হয় অনমনীয়-স্বভাব বৌদ্ধদিগকে সমাজে অপাংক্তেয় করিতেছে, না হয় উদারভাবাপন্ন বৌদ্ধদিগকে তাঁহাদের দেবতাসহ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিতেছে। এইরূপে বৌদ্ধদের দেবদেবীরা ক্রমে হিন্দু দেবদেবীর সমাসনে বসিয়া হিন্দু পুরোহিতের পূজা পাইতে থাকিলেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই মুখুজ্যেরা ধর্মঠাকুরের পূজা আরম্ভ করেন। গ্রামে আগমনের পর তাঁহারা গ্রামবাসী অপর হিন্দুদেরও যজন-যাজনে ব্যাপৃত হন এবং তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন।

১ ইঁহাদের বংশতালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পুরুষানুক্রমে 'রাম'মন্ত্রের উপাসক মুখুজ্যে-বংশে জাত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইষ্টনিষ্ঠা, সদাচার, লোককল্যাণসাধন ইত্যাদি সদ্‌গুণের জন্য গ্রামবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। যথাকালে তিনি শিহড়নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্যামাসুন্দরী দেবীও পতিরই অনুরূপা ধর্মপ্রাণা ছিলেন। তাঁহার সরলতা, পবিত্রতা ও দৃঢ়চিত্ততার কাহিনী এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। এই ভক্ত-দম্পতিরই গৃহ আলোকিত করিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। পিতা ও মাতার বিষয়ে শ্রীমায়ের মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সামান্য দুই-একটি কথা বাহির হইত, তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের অমল চরিত্রের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি জনক-জননীর প্রতি মায়ের অগাধ ভালবাসার আভাসও পাওয়া যায়। মা বলিতেন, "আমার বাপ-মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক—অন্য-বর্ণের দান নিতেন না। মায়ের কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন—কত সরল!" আর বলিতেন, "বাবা তামাক খেতে খুব ভালবাসতেন। তা এমন সরল, অমায়িক ছিলেন যে, যে কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে যেত ডেকে বসাতেন, আর বলতেন, 'বস, ভাই, তামাক খাও।' এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াতেন। বাপ-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয়?" নিজ জননীর সম্বন্ধে শ্রীমা বলিতেন, "আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী, সমস্ত বছর সব জিনিসটি পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে, ঠিক-ঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।'... এ সংসারটি ছিল যেন তাঁর গায়ের রক্ত। কত করে এটি ঠিক-ঠাক রাখতেন।"

রামচন্দ্রের তিন কনিষ্ঠ সহোদর—ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব—তাঁহারই সহিত এক পরিবারে বাস করিতেন। এই পরিবারে অর্থসচ্ছলতা কোন দিনই দেখা যাইত না, চাষ ও পৌরোহিত্য হইতে লব্ধ স্বল্প আয়ে কোন প্রকারে ব্যয়সঙ্কুলান হইত। অথচ দানাদিতে রামচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পরে পাইব।

একবার শিহড় গ্রামের উত্তর পাড়ায় পিতৃগৃহে অবস্থানকালে শ্যামাসুন্দরী দেবীর উদরাময় হয়। তিনি অন্ধকারে এল্লাপুকুরের পাড়ে শৌচে যান। কিন্তু অকস্মাৎ স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া কুমারদের পোয়ানের অদূরে এক বেল গাছের নিচে বসিয়া পড়েন। অমনি পোয়ানের দিক হইতে এক ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ উঠিল, আর বিল্ববৃক্ষের শাখা হইতে এক ক্ষুদ্র বালিকা নামিয়া আসিয়া কোমল হস্তে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়াইয়া ধরিল। শ্যামাসুন্দরী হতচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি ঐভাবে ছিলেন, জানেন না। আত্মীয়-স্বজন পরে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে ও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া

আনিলে তিনি অনুভব করিলেন, ঐ কাঁচ মেয়েটি তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।[১]

এই সময়ে শ্রীমায়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতা-গমনের সঙ্কল্প গ্রহণের পূর্বে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পরে তিনি সংসারের অভাব-চিন্তায় ক্লিষ্টহৃদয়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখেন, একটি হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া কোমল বাহুপাশে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে। বালিকার অসামান্য রূপ ও মূল্যবান অলঙ্কার সহজেই তাহার অসাধারণত্বের পরিচয় দেয়। অতিবিস্মিত রামচন্দ্র স্বতই প্রশ্ন করিলেন, "কে গো তুমি ?" বীণাবিনিন্দিত সস্নেহকণ্ঠে বালিকা উত্তর দিল, "এই আমি তোমার কাছে এলুম।" রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নবিবরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, অতএব অর্থোপার্জনের ইহাই প্রশস্ত সময়। তাই তিনি কলিকাতায় গমন করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা কতখানি ফলবতী হইয়াছিল, তাহার সহিত আমাদের এই গ্রন্থের সম্বন্ধ নাই। তবে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, গৃহে প্রত্যাগমনের পর সহধর্মিণীর মুখে তিনি যখন শিহড়ে দেবাবির্ভাবের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার আস্তিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ মন সহজেই উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল. ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ-দম্পতি তদবধি ভোগসুখে উদাসীন থাকিয়া পবিত্রদেহে ও পূতহৃদয়ে দেবশিশুর জন্মকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত রামচন্দ্র আর স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই; অধিকন্তু শ্যামাসুন্দরীকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের মা একবার শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন,

১ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'—২য় খণ্ডের আরম্ভে প্রদত্ত 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে আছে—"মা তাঁহার জন্মকথা এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'আমার জন্মও তো ঐ রকমের (ঠাকুরের মতো)। আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হলোনা কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদবমধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে, লাল চেলী পরা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে, তা থেকেই আমার জন্ম। বাড়িতে ফিরে এসে মা এই ঘটনাটি বলেছিলেন।' "

এই বিবরণটি কিছু অন্য আকারেও পাওয়া যায; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোটামুটি সবগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে।

"গর্ভাবস্থায় আমার এই রূপ! মাথায় চুল আর ধরে না। সেবার সাধে কত লোক যে কাপড় দিয়েছিল, তার আর অবধি নাই।"

ক্রমে কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। এখন হেমন্তের অবসান ও শীতের আরম্ভ; বাঙলার পল্লীর ইহা সর্বাপেক্ষা সুখের সময়। বাহিরের কার্যশেষে গ্রামের কৃষককুল কৃষিলব্ধ শস্য গৃহে আনিয়া ক্ষেত্রলক্ষ্মীকে ভাণ্ডারে স্থাপন-পূর্বক আনন্দে ভাসিতেছে। জয়রামবাটীর প্রান্তরে রবিশস্যের শ্যামলশ্রী ছড়াইয়া পড়িতেছে। গৃহে গৃহে নবান্নের উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখন তান্ত্রিককুলে প্রখ্যাত 'পৌষ-কালী' দর্শনে সাধকবর্গ উৎসুক এবং এখন হইতেই পৌষ-পার্বণের কল্পনা ক্ষুদ্র বালক-বালিকার মনে লালসা জাগাইতেছে। আবার খ্রীস্টান সমাজ যীশুর আশু জন্মোৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত। আর এদিকে দক্ষিণায়ণ-শেষে উত্তরায়ণে দেবগণের জাগরণ হইতেছে। এমন সময়ে দিবাবসানে রাত্রিদেবীর উজ্জ্বল তারকা-খচিত কৃষ্ণাঞ্চলে জয়রামবাটীর শ্রমক্লান্ত দেহ আবৃত হইলে রামচন্দ্রের ক্ষুদ্র গৃহ আনন্দমুখরিত করিয়া ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ (১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি, রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল সময়ে অতি শুভক্ষণে শ্রীযুক্তা সারদামণি দেবী[১] ভূমিষ্ঠ হইলেন। অচিরে মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে আকৃষ্ট গ্রামবাসী সে শুভ সংবাদ বিদিত হইয়া নবজাত শিশুর অশেষ মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। যথাকালে জন্মপত্রিকা সম্পাদিত হইলে কন্যার রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হইল শ্রীমতী ঠাকুরমণি দেবী এবং লোকবিশ্রুত নাম হইল সারদামণি। অধুনা উহা শুধু 'সারদা'-তে পরিণত হইয়াছে।[২]

সারদাদেবী পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। তাহার পর ক্রমে কাদম্বিনী নাম্নী কন্যা এবং প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামক পাঁচ পুত্র ঐ ব্রাহ্মণ-দম্পতির গৃহ অলঙ্কৃত করেন। কোকন্দ গ্রামের শ্রীযুত সুধারাম চক্রবর্তীর সহিত কাদম্বিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় এবং উমেশ যৌবনের উন্মেষে আঠার-উনিশ

১ নামকরণ-সম্বন্ধে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ একদিন শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, আপনার নামটি কি আপনার মা পছন্দ করে রেখেছিলেন?" শ্রীমা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "না বাবা, আমার মা আমার নাম রেখেছিলেন ক্ষেমঙ্করী। আমি হবার আগে, আমার যে মাসীমা এখানে সেদিন এসেছিলেন, তাঁর একটি মেয়ে হয়। মাসীমা তার নাম রেখেছিলেন সারদা। সেই মেয়ে মারা যাবার পরেই আমি হই: মাসীমা আমার মাকে বলেন, 'দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ; তাহলে আমি মনে করব আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে এবং আমি ওকে দেখে ভুল থাকব।' তাইতে আমার মা আমার নাম সারদা রাখলেন।"

২ স্বামী সারদানন্দজীর অনুরোধে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত শ্রীশ্রীমায়ের কোষ্ঠী পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বৎসর বয়সে বিবাহের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। অভয়ও ডাক্তারী শিক্ষার অব্যবহিত পরে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার কন্যা রাধারানীর কথা আমাদিগকে পরে বহুবার আলোচনা করিতে হইবে। অপর ভ্রাতারা উপার্জনক্ষম হইয়া পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণ করেন। কালীকুমার (মেজমামা) পৈতৃক ভিটার দক্ষিণে গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে যাতায়াতের যে ক্ষুদ্র পথ আছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে নূতন আবাস স্থাপন করেন। কালীমামার বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে বরদাপ্রসাদের (সেজমামার) বাড়ি। ঐ বাটীর ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তার অপর পার্শ্বে কলুগেড়ে নামক পুকুর। উহাতে মামাদের বাসন মাজা, কাপড় কাচা, হাতমুখ ধোওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজ চলিত। মাতৃমন্দিরের দক্ষিণে এবং কালীমামার বাড়ির উত্তরে প্রসন্নকুমারের (বড়মামার) বাড়ি। ঐ বাড়ির যে ঘরে শ্রীমা বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা বেলুড় মঠের নামে ক্রীত হইয়া মাতৃমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুণ্যপুকুর, পুণ্য-পুকুরের তীরে মায়ের 'নূতন বাড়ি' ইত্যাদিও এখন মাতৃমন্দিরেরই অংশ-বিশেষ। প্রসন্নমামার[১] যে ঘরখানি সম্প্রতি ক্রয় করা হইয়াছে, উহারই ঠিক উত্তরে সূর্যমামার গৃহের প্রবেশদ্বার। ইনি মাতাঠাকুরানীর মধ্যম খুল্লতাত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ত্রৈলোক্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বিবাহের অল্প পরেই তিনি যৌবনে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন; তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। কনিষ্ঠ খুল্লতাত নীলমাধব অকৃতদার ও শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রের পরিবারভুক্ত ছিলেন।

প্রথমা পত্নী রামপ্রিয়ার দেহত্যাগের পর প্রসন্নমামা শ্রীযুক্তা সুবাসিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নী তাঁহাকে নলিনী ও সুশীলা (মাকু) নামে দুই কন্যা উপহার দেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে কমলা ও বিমলা নাম্নী দুইটি দুহিতা শ্রীমায়ের দেহ থাকিতে, ও গণপতি নামে একটি পুত্র তাঁহার দেহরক্ষার পরে জন্মগ্রহণ করেন। কালীমামার দুই পুত্র ভূদেব ও রাধারমণ। বরদা-মামারও দুই পুত্র ক্ষুদিরাম ও বিজয়কৃষ্ণ। মায়ের জীবনের সহিত ইঁহাদের সকলেরই, জীবন নানাভাবে জড়িত; মাতুলানীদের জীবনও তদনুরূপ। বড়-মামীর নাম সুবাসিনী, ইহা উপরেই উল্লিখিত হইয়াছে; মেজমামী সুবোধ-বালা এবং সেজমামী ইন্দুমতী। ছোটমামী সুরবালাই পূর্বোল্লিখিতা রাধারানীর মাতা। অপ্রকৃতিস্থতার জন্য ইনি পাগলীমামী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

প্রসন্নকুমার প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন এবং যজমানিতে বেশ দু-পয়সা

১ শ্রীশ্রীমায়ের মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রীরা রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে যথাক্রমে দিদিমা, মামা, মামী ও দিদি বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থে আমরাও এইরূপ উল্লেখ করিব।

উপার্জন করিতেন। সম্ভবতঃ বাল্যে অভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় তিনি বড় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা ভাল ধানের জমি ও চাষের গরু প্রভৃতি কিনিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। কালীকুমার কোপনস্বভাব ছিলেন—সহজেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। শোনা যায়, তাঁহার জন্মের পূর্বে শ্যামাসুন্দরীর একাধিক সন্তান শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি শোকে পাগলিনীপ্রায় হইয়া যান। সেই সময় কোন দেবীভক্ত স্ত্রীলোকের ঔষধ ও আশীর্বাদে কালীমামার জন্ম হয়। তাই তাঁহার স্বভাব ঐরূপ হয়। তিনি স্বগ্রামেই থাকিতেন এবং নিত্য নিষ্ঠাসহকারে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাবন্দনা ও পূজার্চনা করিতেন। তাঁহার ক্ষুদ্র দেবগৃহে শালগ্রাম ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। যাজনিক ক্রিয়ায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বরদামামা গ্রামে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায়ও যাইতেন।

পিতামাতার দরিদ্র-সংসারে মায়ের শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত হইলেও পরস্পরের প্রতি স্নেহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধার অশেষ অবকাশ প্রদানপূর্বক সে দারিদ্র্য ঐ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনকে বড়ই মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। মুখুজ্যেদের কয়েক বিঘা নিষ্কর জমিতে যে ধান্য জন্মিত, পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে উহা যথেষ্ট না হওয়ায় রামচন্দ্র যাজনাদি ক্রিয়া করিতেন এবং তুলার চাষ করাইতেন। শ্যামাসুন্দরী কোলের মেয়ে সারদাকে ক্ষেত্রমধ্যে শোয়াইয়া তুলা তুলিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া কন্যাও মাতাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতেন। মাতাপুত্রী ঐ তুলা দ্বারা পৈতা কাটিয়া দিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থে পরিবারের বসনভূষণাদি সংগৃহীত হইত। ছোট ভাইদের রক্ষণাবেক্ষণ মায়ের আর এক প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম. আমোদর নদই ছিল যেন আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল।" অন্যান্য কাজ সম্বন্ধে তিনি কহিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।" বাল্যে পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই) ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনো কখনো যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।"

মায়ের বাল্যকালের এই সকল সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন স্মৃতি ব্যতীত প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে আরও কিছু কিছু জানা গিয়াছে। মায়ের ছেলেবেলার সঙ্গিনী রাজ মুখুজ্যের ভগিনী অঘোরমণি বলেন, "মা খুব সাদাসিদে ছিলেন। তাঁতে সরলতা যেন মূর্তিমতী ছিল। খেলায় তাঁর সঙ্গে কখনো কারো ঝগড়া হয়নি।

মা প্রায়ই কর্তা বা গিন্নী সাজতেন। পুতুল গড়ে খেলা করতেন বটে, কিন্তু কালী ও লক্ষ্মী গড়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে ভালবাসতেন। অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে মা এসে মিটিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী-পুজোর সময় হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। মাকে জগদ্ধাত্রীর সামনে ধ্যান করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন; কিন্তু কে জগদ্ধাত্রী কে মা কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তখন ভয়ে পালিয়ে গেলেন।" অপর প্রাচীন ও প্রাচীনারা বলিয়াছেন, "ছেলেবেলা হতেই সারদা যেমন বুদ্ধিমতী, শান্ত ও শিষ্ট ছিল, তেমন কাজেও উৎসাহী ছিল। তাকে কখনো কাজ করতে বলতে হতো না, বুদ্ধি খাটিয়ে আপনা হতে সে নিজের কাজগুলি সুন্দর গুছিয়ে করে রাখত।"

শ্রীমাকে ঘোষাল মহাশয়ের জগদ্ধাত্রীরূপে দর্শন এই অপূর্ব জীবনের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে। দেবত্ব ও মানবত্বের অত্যাশ্চর্য মিশ্রণে মায়ের বাল্যলীলা বড়ই চমকপ্রদ; মনে হয় যেন সেখানে দেবভাব স্ফুটতর। উত্তর-কালে অপরেরা মাকে যাহাই ভাবুক না কেন, তিনি আপনাকে সাধারণতঃ মানবীরূপেই প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আমরা যে কালের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে ঊর্ধ্বলোক হইতে ইহধামে সদ্য-সমাগতা মা দেবমানবত্বের সন্ধিস্থলে অবস্থানপূর্বক এই মর্তলীলায় কোন্ ভাবের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবেন, তাহা যেন সহসা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, অথবা দৈব বিধানে তাঁহার শৈশব ও বাল্য অলক্ষিতে অলৌকিক শক্তিতেই পরিবেষ্টিত ছিল। তাই দেখিতে পাই যে, সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি পরে বলিতেছেন, "দেখ, বাবা, ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।"[১] জলে নামিয়া গরুর জন্য দলঘাস কাটিতে গিয়া তিনি দেখিতেন, এক সমবয়স্কা মেয়ে ঘাস কাটিয়া দিতেছে; এক আঁটি পাড়ে রাখিয়া আসিয়া দেখিতেন, ঐ মেয়েটি আর এক আঁটি কাটিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীমায়ের বাল্যজীবন কত কর্মবহুল ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাইয়াছি। তাঁহার বাল্যস্মৃতি হইতে আমরা ইহাও অবগত হই যে, অতি অপরিণত বয়সেই তাঁহাকে সময়-বিশেষে রন্ধনাদি শ্রমসাধ্য কাজও করিতে

১ ইহার পরে ও পঞ্চতপার পূর্বে তিনি আর একবার এইরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

হইত। কচি মেয়ের তুলনায় তাঁহার বুদ্ধি ও কর্মপটুতা যথেষ্ট থাকিলেও হাত দুখানি তখনো যথেষ্ট সবল হয় নাই। তাই রন্ধনশেষে ভারি পাত্রগুলি নামাইবার জন্য পিতাকে ডাকিতে হইত। আবার গৃহকার্যের জন্য পুষ্করিণী হইতে কলসে করিয়া জল আনিতে হইত। এই অবকাশে তিনি কলস ধরিয়া সাঁতার কাটিতেও শিখিয়াছিলেন।

মায়ের বয়স যখন একাদশ বৎসর তখন (১২৭১ বঙ্গাব্দ; ১৮৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দ) ঐ অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। মায়ের পিতার কিঞ্চিৎ ধান্য সঞ্চিত ছিল। তিনি নিজে দরিদ্র হইলেও চারিদিকের হাহাকারে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পোষ্যবর্গের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। এই ঘটনার বিবরণ শ্রীমায়ের ভাষায় এইরূপ পাই—"একবার সেখানে কি দুর্ভিক্ষই লাগল—কত লোক যে খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! আমাদের আগের বছরের ধান মরাইবাঁধা ছিল। বাবা সেইসব ধানে চাল করিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন, 'বাড়ির সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে; সে আমার তাই খাবে।' এক একদিন এমন হতো, এত লোক এসে পড়ত যে, খিচুড়িতে কুলত না। তখনি আবার চড়ানো হতো। আর সেই গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শিগ্‌গির জুড়বে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম! আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি বাগদী না ডোমের মেয়ে এসেছে—মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল, তাই খেতে আরম্ভ করেছে! এত যে সকলে ডাকছে, 'বাড়ির ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য মানছে না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ! সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে।"

শ্রীমায়ের সহজ, অকৃত্রিম ও অনবদ্য ভাষায় যে মনোরম চিত্রখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই, ভবিষ্যতে যিনি মাতৃত্বের মহিমমণ্ডিত দাবি লইয়া প্রতিহৃদয়ে বিরাজিতা হইবেন, বাল্যে তিনি সুকুমার হস্তে বীজন গ্রহণপূর্বক বুভুক্ষুর অন্ন ভোজনোপযোগী করিতে কত ব্যস্ত! আর সে কোমলপ্রাণা দুহিতার লালনে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সস্নেহ হৃদয়ে কতখানি আকুলতা! শ্রীমা তখন বালিকা; এ বাল্যলীলা অনেকটা অপরাপর পল্লীবালারই অনুরূপ। কিন্তু ইহারও মধ্যে অকস্মাৎ যেন অলৌকিক দৈব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া চোখ ঝলসাইয়া দেয়। ক্ষুদ্র ভগিনী ও ক্ষুদ্রতরা তনয়ার জীবনে এই আলো-আঁধারের খেলা সম্ভবতঃ তাঁহার ভ্রাতাদের ও জনক-জননীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই, যদিও তাঁহারা মানবীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া এই ছোট

মেয়েটিকে স্নেহশীলা ভগিনী ও সাধারণ দুহিতারূপেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। মায়ের মা সম্ভবতঃ এইসব রহস্য অনুধাবন করিয়াই শেষ বয়সে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি, মা?" কন্যা অবশ্য তখন বাহ্যিক বিরক্তি-সহকারে বলিয়াছিলেন, "কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?"

ভগিনীরূপে সারদাদেবী কি করিয়াছিলেন, তাহা মাতাপুত্রীর একদিনের কথাতেই প্রকাশ পায়। গর্ভধারিণী বলিলেন, "সারদা, তোর মতন আমার যেন (জন্মান্তরে) একটি মেয়ে হয়, মা। স্বামীর ধন থাকবে। ছেলেপুলে নিয়ে বড় জ্বালাতন।" কন্যা তাহাতে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন, "আবার আমাকে টানছ? তোমার ছেলেপুলে আমি আবার এসে মানুষ করি!" তথাপি স্নেহময়ী ও কর্মচঞ্চলা সুশীলা কন্যার শান্তিপ্রদ অতীত স্মরণপূর্বক শ্যামাসুন্দরী স্বীয় কথায় দরদ ঢালিয়া বলিলেন, "তোকেই যেন আবার আমি পাই, মা।" কালীমামাও এক সময়ে এই কথারই সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।"

বধূ

শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ছিল। এই সূত্রে ঠাকুর তথায় যাতায়াত করিতেন। শ্রীমায়ের মাতুলালয়ও ঐ একই গ্রামে। এতদ্ব্যতীত শান্তিনাথ শিবের প্রাচীন স্থাপত্যানুযায়ী প্রস্তরনির্মিত মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবাদি হইত তদুপলক্ষে কিংবা সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থগৃহে কীর্তন ও যাত্রাভিনয়াদি দর্শনার্থে জয়রামবাটীনিবাসী অন্যান্য নরনারীর সহিত শ্রীমায়ের পিত্রালয়ের অনেকেই মধ্যে মধ্যে শিহড়ে যাইতেন; আশে-পাশের গ্রামের অনেকেও আসিতেন। হৃদয়ের গৃহে এইরূপ সঙ্গীতানুষ্ঠানকালীন এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে (৫৪-৫৫ পৃঃ) দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র বালিকা সারদা ঐ সঙ্গীতের আসরে এক মহিলার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন। গীত সমাপনান্তে ঐ মহিলা তাঁহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?" অমনি উভয় কর তুলিয়া সারদা অদূরে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন। শ্রীমা এইরূপে যেদিন স্বয়ংবরা হইয়াছিলেন, সেদিন লোকদৃষ্টিতে তাঁহার বিবাহ-শব্দের তাৎপর্যবোধ ছিল না। কিন্তু যে দৈবপ্রেরণায় তিনি আপন পতিকে হস্তপ্রসারণপূর্বক নির্দেশ করিয়া দিলেন, সেই দৈববিধানেই তাঁহার সত্যসন্ধ মনের সে অভিলাষ কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিপূর্ণ হইল।

শ্রীমা তখন পঞ্চমবর্ষ-অতিক্রমান্তে ষষ্ঠ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। আর এদিকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ও মন অবলম্বনে যুগধর্মপ্রবর্তনের উদ্যোগস্বরূপে সাধনার প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি তখন ভাবিতেছে যে, তাঁহার মন সে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় কেন্দ্রভ্রষ্ট ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বায়ুরোগগ্রস্তের আচরণবৎ তাঁহার কার্যাবলী অতিরঞ্জিতাকারে কামারপুকুরে তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণির কর্ণে পৌঁছিলে জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের বিয়োগদুঃখকাতরা জননী স্নেহভাজন কনিষ্ঠপুত্রের এইরূপ অবস্থার বিবরণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অচিরে আপন সকাশে আনাইলেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পরামর্শানুসারে ঔষধপ্রয়োগ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক, চণ্ডনামানো ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে সন্তানকে প্রকৃতিস্থ করাইতে সচেষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য যে, লোকপ্রচলিত এই সকল উপায় কার্যকর হয় নাই; তবে এই সময়ে সাধনা-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার অধিকাধিক দর্শন লাভ করিতে থাকায় ঠাকুরের মন ও বাহ্য আচরণ

ক্রমে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল। জননী ইহাতে কতক আশ্বস্তা হইলেও দুর্ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইলেন না। অন্য দশ জনের সহিত তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সংসারে উদাসীনতাবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের মন পুনরায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িতে পারে; অতএব মধ্যমপুত্র রামেশ্বরের সহিত পরামর্শক্রমে এই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়কে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য তিনি গোপনে পাত্রীর সন্ধান লইতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিরক্তি-স্থলে বালকসুলভ আনন্দ ও উৎসাহই প্রকাশ করিলেন এবং পাত্রীর সন্ধান দিবার জন্য কহিলেন, "জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা[১] আছে।" এই সার্থক ইঙ্গিতের অনুসরণের ফলে পাত্রীনির্বাচনে আর বিলম্ব হইল না। বিবাহের শুভদিনও স্থির হইয়া গেল। তারপর ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের শেষভাগে নির্ধারিত দিবসে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া জয়রামবাটীতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শুভলগ্নে শ্রীমতী সারদামণি দেবীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণয় সমাপ্ত হইল। বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে তিন শত মুদ্রা পণ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।[২]

---

১ গাছেব বিশেষ ফল দেবতাকে দিবাব অথবা বীজের জন্য রাখিবার উদ্দেশ্যে উহার বোঁটাতে কুটা বাঁধিয়া চিহ্নিত করা হয়।

২ শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুরকুল—
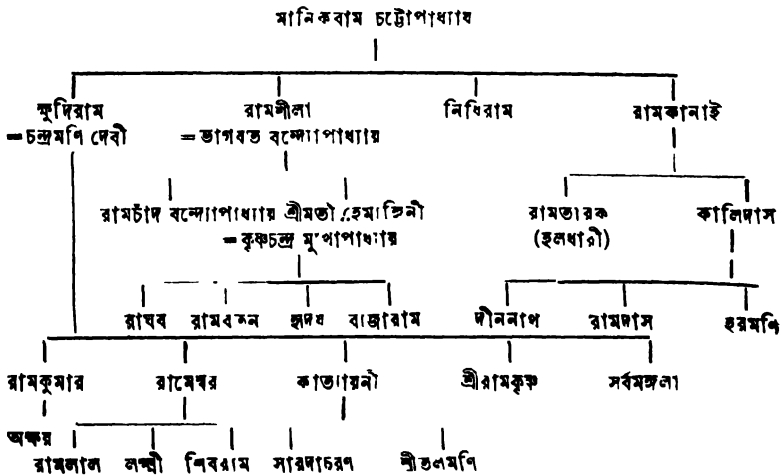
বিবাহের সময় সম্বন্ধে শ্রীমা বলিতেন, "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশ দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। (কামারপুকুরের জমিদার) ধর্মদাস লাহা এসে বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে।' (জ্ঞাতিভাই) সুয্যির বাপ (ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়) কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন।"

বিবাহের[১] পরদিবস বৈকালে বরপক্ষ বরবধূকে লইয়া কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গ্রামে উপনীত হইলে শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণি দেবী পুত্র ও পুত্র-বধূকে যথারীতি বরণ করিয়া লইলেন। অনন্তর স্ত্রী-আচার, ফুলশয্যা ও বৌভাতের সহিত দরিদ্রগৃহের বিবাহোৎসব সমাপ্ত হইল। এই আনন্দ শেষ হইতে না হইতে এক নিদারুণ চিন্তা চন্দ্রাদেবীর মাতৃহৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল। বিবাহে যৌতুক দেওয়া হইয়াছিল; তদুপরি সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষার্থ লাহাবাবুদের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার আনিয়া বালিকা-বধূকে বিবাহদিনে সাজাইতে হইয়াছিল। উৎসবান্তে অবোধ ও দুহিতৃসদৃশা বালিকার অঙ্গ হইতে কোন্ প্রাণে অলঙ্কার উন্মোচন করিবেন, ইহা ভাবিয়া চন্দ্রাদেবী দুঃখভারাক্রান্তা হইলেন। বুদ্ধিমান শ্রীরামকৃষ্ণ অচিরেই মাতার সমস্যা জানিতে পারিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, ঐজন্য চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন, নববধূর নিদ্রার সুযোগে তিনি কৌশলে অলঙ্কার কয়খানি খুলিয়া দিবেন। কার্যতঃ তাহাই হইল; শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সাবধানে উহা উন্মোচিত করিলেন যে, শ্রীমা জানিতেও পারিলেন না। কিন্তু শয্যাত্যাগান্তে তিনি যখন নিজ অঙ্গ ভূষণহীন দেখিলেন, তখন তিনি হস্ত, গ্রীবা, বাহু ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এখানে এখানে যে গহনা ছিল, তা কোথা গেল?" সরলা বালিকার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল অলঙ্কার পরে কত দেবে।" ইহাতে বালিকা

১ বিবাহকালের একটি ঘটনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে (৫৫ পৃঃ) এইরূপ উল্লিখিত আছে—

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণীসকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥
হরিদ্রা-মাখান সুতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন॥

শান্ত হইলেও সেইদিনই তাঁহার খুল্লতাত কামারপুকুরে আসিয়া স্নেহপুত্তলি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিরাভরণা দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবারে দুই বৎসরাধিক কাল কামারপুকুরে ছিলেন। বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণে একবার শ্বশুরগৃহে যান। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমা কহিয়াছিলেন, "আমার সাত বছর বয়সের সময় ঠাকুর জয়রামবাটী এসেছিলেন। বিয়ের পর জোড়ে যায় না? তখন আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ক-বছরে বিয়ে হয়েছে, তখন পাঁচ বছর বলো, সাত বছর বলো না'।" জোড়ে যাওয়াকেই মা পাছে বিবাহ মনে করেন এইজন্যে ঠাকুর এই কথা বলিয়া থাকিবেন। মায়ের আরও মনে পড়িত যে, ঐ সময়ে ঠাকুরের সহিত আগত ভাগিনেয় হৃদয় কতকগুলি পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র মামীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন এবং তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও উহা দ্বারা তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন। সারদাদেবীর তখনো বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। তথাপি কেহ শিখাইয়া না দিলেও তিনি ঠাকুরের চরণযুগল ধুইয়া দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেরই হাসির উদ্রেক হইয়াছিল। জয়রামবাটী হইতে ঠাকুর শ্রীমাকে লইয়া কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। ইহার অল্প পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আবার সাধনসাগরে ডুবিলেন। এদিকে শ্রীমাও পূর্বের মতো স্নেহময়ী মাতার যত্নে পল্লীসৌন্দর্যের মধ্যে আপন ভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকিলেন।

ইহার পরে তের ও চৌদ্দ বৎসর বয়সে শ্রীমা দুইবার কামারপুকুরে যান; শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনায় নিমগ্ন। শ্বশুরালয়ে শ্রীমায়ের ভাসুর, জা ও আত্মীয়বর্গ ছিলেন; শাশুড়ী তখন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছেন। প্রথমবারে কামারপুকুরে অবস্থানের পর শ্রীমা জয়রামবাটীতে ফিরিয়া পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন। তারপর আবার শ্বশুরগৃহে যাইয়া দেড় মাস থাকেন। এইবারে পিত্রালয়ে আসিয়া তিনি চারি মাস আন্দাজ ছিলেন। ইহার পরে ১২৭৪ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে লইয়া স্বগ্রামে পদার্পণ করেন এবং শ্রীমাকে তথায় লইয়া আসেন। শ্রীমা সেখানে প্রায় সাতমাস ছিলেন।[১]

১ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠায় মাস তিনেক থাকার কথা আছে। আমরা এখানে 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব', ৩১৬ পৃষ্ঠার অনুসরণ করিলাম। দ্বিতীয় গ্রন্থের ৩০৭ পৃষ্ঠা এবং ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে মনে হয় যে, ঠাকুর "নিজ পত্নীর তাঁহার নিকট আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও, অপরেরা শ্রীমাকে কামারপুকুরে আনিয়াছিলেন।" কিন্তু প্রথম গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় শ্রীমা বলিতেছেন, "ঠাকুর তারপর যখন ব্রাহ্মণীকে নিয়ে দেশে এলেন (ইং ১৮৬৭), তখন আমাকে খবর দিলেন, 'ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস।' আমি খবর পেয়ে কামারপুকুরে গেলুম।"

দীর্ঘ সাত মাস পল্লীগ্রামে অবস্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আবার কামারপুকুরের কথা ভুলিয়া সাধনে ডুবিলেন। কিন্তু এই সাধনপর্বের শেষে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত কয়েক বৎসর বর্ষার সময় দেশে যাইয়া চাতুর্মাস্য যাপন করিতে হইত। শ্রীমাও তখন কামারপুকুরে উপস্থিত হইতেন। এই সুদীর্ঘ-কাল মধ্যে শ্রীমা ঠিক কতবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার আর উপায় নাই। আবার শ্রীমা প্রভৃতির স্মৃতি হইতে লব্ধ যে দুই-চারিটি ঘটনা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহাদের অনেক-গুলিরই সময়নির্দেশ অসম্ভব। সুতরাং আমরাও সম্ভবস্থল ব্যতীত অন্য-ক্ষেত্রে সে চেষ্টা না করিয়া কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইব।

তের বৎসর বয়সে শ্রীমা যখন কামারপুকুরে ছিলেন, তখনকার একটি অলৌকিক ব্যাপার ভক্তগণ তাঁহার শ্রীমুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন। পার্শ্বের গ্রাম্য পথ ও গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ হালদারপুকুরে স্নান করিতে যাইতে তাঁহার ভয় হইত। খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিতেছেন, "নূতন বউ, একলা কি করে নাইতে যাব?" ভাবিতে ভাবিতে দেখেন, আটটি মেয়ে আসিল; শ্রীমাও অমনি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। মেয়েদের চারিজন তাঁহার আগে, চারিজন তাঁহার পিছনে হইয়া তাঁহাকে লইয়া হালদারপুকুরের ঘাটে চলিল। মা স্নান করিলেন, তাহারাও করিল। পরে আবার সেইভাবে বাড়ি পর্যন্ত আসিল। মা যতদিন সেখানে ছিলেন, প্রতিদিন ঐরূপ হইত। অনেক দিন তাঁহার মনে হইয়াছে, "মেয়েগুলি কারা—স্নানের সময় রোজই আসে?" কিন্তু তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

জয়রামবাটী-জীবনে দারিদ্র্য ও শত কর্মের মধ্যেও শ্রীমায়ের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে যে, সঙ্গতিপন্ন ও উচ্চ-বর্ণের পরিবারেও তখন পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি অধিক আগ্রহ জন্মে নাই সুতরাং শ্রীমায়ের এই চেষ্টার মধ্যে অদম্য জ্ঞানলাভস্পৃহা-দর্শনে সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা আরও মুগ্ধ হই, যখন দেখিতে পাই যে, শ্বশুরগৃহের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সে স্পৃহা উন্মূলিত না হইয়া বরং বর্ধিত হইয়াছিল। শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে 'মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে।' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর এক-খানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত।

সে এসে আবার আমায় পড়াত।" প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমায়ের ভাষাতেই দেখান যাইতে পারে যে, এই বিদ্যোৎসাহ তাঁহার পরেও ছিল—"ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত।[১] আমি তাকে শাক পাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।" এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না; এমন কি, শেষ বয়সে নাম সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।

শ্রীমায়ের প্রতি কথায় শ্বশুর-পরিবারের সকলের উপর একটা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাইত। নিজের শ্বশুর সম্বন্ধে তিনি সগর্বে বলিয়াছিলেন, "আমার যে শ্বশুর ছিলেন, বড় তেজস্বী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি অপরিগ্রাহী ছিলেন। কেহ কোন জিনিস বাড়িতে দিতে এলেও নেবার নিষেধ ছিল। আমার শাশুড়ীর কাছে কিন্তু কেউ কিছু লুকিয়ে এনে দিলে তিনি রেঁধে বেড়ে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ দিতেন। শ্বশুর তা জানতে পারলে খুব রাগ করতেন। কিন্তু জ্বলন্ত ভক্তি ছিল তাঁর ; মা শীতলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। শেষ রাত্রে উঠে ফুল তুলতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একদিন লাহাদের বাগানে গিয়েছেন। একটি ন-বছরের মতো মেয়ে এসে তাঁকে বলছে, 'বাবা, এদিকে এস ; এদিকের ডালে খুব ফুল আছে। আচ্ছা, নুইয়ে ধরছি—তুমি তোল।' তিনি বললেন, 'এ সময়ে এখানে তুমি কে মা?' 'আমি গো, আমি এই হালদার বাড়ির।' অমন ছিলেন বলেই ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্মেছিলেন।"

শ্রীমা স্নেহময়ী দুহিতার ন্যায় তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সেবাদি করিতেন এবং ঐ সেবার সুযোগে শ্বশুরগৃহের ইতিবৃত্ত এবং সুখদুঃখাদির কথা শুনিতেন। এইরূপে একদিন তাঁহার পৃষ্ঠে তৈলমর্দন করিতে করিতে শ্বশুরের যে অপূর্ব ধর্মনিষ্ঠাদির কথা শুনিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহারই উল্লেখ করিয়া জনৈক ভক্তকে সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "এমন আচারী বংশে জন্ম, আর কর্তা হলেন

১ 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি' গ্রন্থের (১৬০ পৃঃ) বিবরণ একটু অন্যরূপ—"ঠাকুর বাগানের পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগার বৎসরের ছেলে শরৎ ভাণ্ডারীকে বলিলেন, 'তুই লক্ষ্মীকে ও তার খুড়ীকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দে।' এই দুই ভাগ শেষ হইলে এবং তাহারা সামান্য লিখিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আর লেখাপড়া শিখতে হবে না। এখন রামায়ণাদি ধর্মপুস্তক বেশ পড়তে পারবে।' ...তখন শ্রীমার বয়স বাইশ-তেইশ ও আমার (লক্ষ্মীদিদির) বয়স চৌদ্দ-পনর।" এখানে বয়সের উল্লেখ ভুল। শ্রীমায়ের জন্ম ১২৬০ সনে ও লক্ষ্মীদিদির জন্ম ১২৭০ সনে—দুই জনে দশ বছরের তফাত।

স্বয়ং কৈবর্তের[১] বাড়ির পূজারী।”

কামারপুকুরে থাকার অবকাশে শ্রীমা সন্তরণ, সঙ্গীত ও রন্ধনাদিতে পটুতালাভ করিয়াছিলেন। পল্লীবালাকে ঐ সকল কেহ শিখাইতে আসে না—দেখিয়া শুনিয়াই আয়ত্ত করিতে হয়। তখনকার দিনে বাউল ও ভিখারির মুখে বহু তথ্যপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত শোনা যাইত এবং পৌরাণিক যাত্রাভিনয় হইলে সকলে ধর্মোপদেশাদি লাভ করিত। শ্রীমায়ের বাল্যশিক্ষা অনেকাংশে ঐভাবেই হইয়াছিল। আবার জয়রামবাটীর ও কামারপুকুরের অভাবের সংসার তাঁহাকে কর্মনিরত রাখিয়া বহু বিষয় শিখাইয়াছিল; আর সে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া।

কামারপুকুরে আগতা শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর নানাভাবে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী কিশোরীর হৃদয় ভালবাসার দ্বারা জয় করিয়া তিনি উহাতে আপন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন স্বীয় ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ শ্রীমায়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন এবং উচ্চ ধর্মজীবনলাভের জন্য কিরূপে চরিত্রগঠন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিলেন, অপরদিকে তেমনি দৈনন্দিন গৃহস্থালি কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে থাকিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন—এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া লোকব্যবহার, পরিবারে প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সহিত আদান-প্রদান, নৌকায় বা গাড়িতে যাইবার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমন কি, প্রদীপের পলিতাটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, ইত্যাদি কিছুই সে অপূর্ব শিক্ষা হইতে বাদ পড়িল না। এই কামগন্ধহীন, স্বার্থশূন্য, আনন্দমিশ্রিত, সাগ্রহ উপদেশ-লাভে সরলা পূতচরিত্রা, ধর্মপ্রাণা, পতিব্রতা পল্লীবালা কিরূপে আনন্দ-বিভোর হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পরে স্বয়ং স্ত্রীভক্তদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন—“হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে” (‘লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব’, ৩৪৩ পৃঃ)।

সদারঙ্গময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে কিভাবে উচ্চতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন, তাহার একখানি ছবি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদিদি একদা জনৈক সাধুর নিকট

১ পুরাতন গ্রন্থগুলিতে কৈবর্ত শব্দের উল্লেখ থাকিলেও রানী রাসমণির বংশ মাহিষ্য বলিয়া পরিচিত।

এইভাবে আঁকিয়াছিলেন—"ঠাকুর সদা সর্বদা মাকে সংসারের অনিত্যতা, দুঃখ-কষ্টের কথা বলে বুঝাতেন, 'বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিই সার।' বলতেন, 'শেয়াল কুকুরের মতো কতকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা বিইয়ে কি হবে?' মায়ের মার অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছিল—কয়েকটি মারাও গিয়েছিল। মা তাঁর সেই ছোট ছোট ভাই-বোনদের কোলে কাঁখে করেছেন, তাদের মৃত্যুতে তাঁর মা বাপের শোক-কষ্টও দেখেছেন, নিজেও শোকতাপ করেছেন—সেই সকল উল্লেখ করে ঠাকুর বলতেন, 'তোমারও অনেক ঘাটাঘাটি হয়েছে। দেখেছ তো কত দুঃখকষ্ট! হাঙ্গামের দরকার কি? ওসব না হলে আছ ঠাকরুনটি, থাকবেও ঠাকরুনটি।' মা-ঠাকরুন সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কামারপুকুরের সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতেন। একদিন সকালবেলা মা বাড়ির ভিতরে ন্যাতা দিচ্ছেন (গোবর-মাটি দিয়ে লেপছেন), ঠাকুর বাইরে দাঁতন করছেন, আর নানারূপ রঙ্গ-রসের কথা বলে সকলকে হাসাচ্ছেন। মা-ঠাকরুনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ছেলের অন্নপ্রাশনে যে কোমরে গোট পরে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভুঁইয়ে আছড়ে কাঁদতে হবে।' লজ্জাশীলা মা নীরবে সব শুনছিলেন। ঠাকুর বারংবার ছেলের মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেষে আস্তে আস্তে বললেন, 'সবগুলোই কি আর মরে যাবে?' মার কথা বের হতে না হতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে, জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে! ওমা; আমি বলি, সাদাসিদে ভালমানুষ, কিছু জানে না—পেটের ভেতর সব আছে! বলে কিনা, সবগুলো কি আর মরে যাবে?' মা ছুটে পালিয়ে গেলেন।"

কলিকাতার সসঙ্কোচ ব্যবহার হইতে মুক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর কামারপুকুরে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন এবং অপরের সহিতও তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। একবার নিকটবর্তী কোন গ্রামে যাত্রাভিনয় হইতেছে শুনিয়া শ্রীমা পরিবারের অন্য এক মহিলার সহিত তথায় যাইতে চাহিলে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের মনঃকষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তিনিও দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, তিনি স্বয়ং সমস্ত অভিনয়টি তাহাদিগকে দেখাইবেন। ঐ অভিনয় তিনি একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও নাট্যকৌশল-সহায়ে সুরতাল-সহকারে তিনি সমস্ত পালাটি এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করিলেন যে, মহিলারা যাত্রা না দেখার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার অঙ্গভঙ্গি বাক্যালাপ ও সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন।

কামারপুকুরে ঠাকুরের চলন-বলন সম্বন্ধে শ্রীমা বলিয়াছেন, "তাঁকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি—সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনো বাপু, নিরানন্দ দেখিনি।

আহা! কামারপুকুরে সকালে উঠেই বলতেন, 'আজ এই শাক খাব, এইটি রেঁধো।' শুনতে পেয়ে আমরা (মা ও লক্ষ্মীদিদির মা) সব যোগাড় করে রাঁধতুম। কয়েক দিন পরে বলছেন, 'আঃ, আমার একি হলো? সকাল থেকে উঠেই কি খাব, কি খাব! রাম রাম!' আমাকে বলছেন, 'আর আমার কিছু খাবার সাধ নেই, তোমরা যা রাঁধবে যা দেবে তাই খাব।' শরীর সারতে দেশে যেতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে খুব পেটের অসুখে ভুগতেন কিনা! বলতেন, 'রাম রাম!' পেটটা কেবল মলেই ভরতি, কেবল মলই বেরুচ্ছে। এইসবে তারপর শরীরে ঘেন্না ধরে গেল, আর শরীরের যত্ন করতেন না।"

রসিক-চূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণের রসিকতার একটি দৃষ্টান্ত বড়ই উপভোগ্য। শ্রীমা বলিয়াছেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি' আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হলো রামদাস বদ্যি আর আমি হলুম ছিনাথ সেন -হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে। তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে—গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হয়। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সব সময় বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে, তা বটে। এ সব সময় আছে'।"

ফোড়নের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বালকসুলভ প্রীতি ছিল। একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, চার পয়সার পাঁচফোড়ন কিনে নিয়ে আয় তো।" তাহার পর শ্রীমাকে বলিলেন, "পাঁচমিশুলি ডাল করো; এমন সম্বরা দেবে যেন শুয়োর গোঙায়।" আর একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন, ভ্রাতৃজায়া রামলাল-জননী শ্রীমাকে বলিতেছেন যে, ঘরে পাঁচফোড়ন নাই, সুতরাং ফোড়ন ছাড়াই রাঁধিতে হইবে। তিনি শুনিয়াই বলিলেন, "সে কি গো! পাঁচফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণে-শ্বরের মাছের মুড়ো, পায়সের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?" রামলাল-জননী লজ্জা পাইয়া তখনই ফোড়নের ব্যবস্থা করিলেন।

১২৭৪ সালে দীর্ঘ সাধনার পরে হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আসিয়া শ্রীমাকে তথায় আনাইলেন। তিনি পূর্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসের গুরু তোতাপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন, "স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী

ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে ভেদসম্পন্ন অপর সকল সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহু দূরে রহিয়াছে" ('লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব', ৩১১ পৃঃ)। তত্ত্বদর্শী তোতাপুরী ইহাও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় নির্বিকল্প-সমাধিমান পুরুষ যদি নির্বিকার-চিত্তে সহধর্মিণীর প্রতি স্বীয় কর্তব্যপালন করেন, তবে তাহাতে ধর্মহানি হয় না। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, সরল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মসাধনায় অনুপম সাহসযুক্ত ঠাকুর শ্রীমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপর ইহার ফল অন্যরূপ হইল।

শ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার ব্যবহার প্রীতিপূর্ণই ছিল; মায়ের বয়স তখন অল্প। তিনি ভৈরবীকে শাশুড়ীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, আবার ভয়ও যথেষ্ট ছিল। ভৈরবী মাঝে মাঝে অধিক লঙ্কা দিয়া পূর্ববঙ্গের মতন তরকারি রাঁধিতেন এবং রামলাল-জননী ও শ্রীমায়ের পাতে পরিবেশন করিয়া স্বাদ-সম্বন্ধে মতামত জানিতে চাহিতেন। রামলাল-জননী বলিয়া ফেলিতেন, "হ্যাঁ, যে ঝাল হয়েছে!" কিন্তু ভৈরবীর ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মা সভয়ে বলিতেন, "বেশ হয়েছে"—বলিতে বলিতে হয়তো চক্ষে জল ঝরিতে থাকিত। ভৈরবী সেদিকে না চাহিয়া সগৌরবে রামলাল-জননীকে বলতেন, "বউমা তো বলছে, ভাল হয়েছে। তোমার, বাপু, কিছুতে ভাল হয় না। তোমাকে আর বেন্নুন দেব না।" উত্তরকালে ঘটনাটি বলিয়া শ্রীমা প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে মাল্যাদির দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গবেশে সাজাইলেন এবং ঐ মনোহর বেশ দর্শনের জন্য শ্রীমাকেও ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ভাবাবেশ হইয়াছে; ইহাতে তাঁহার কেমন যেন ভয় হইল। সুতরাং ব্রাহ্মণী যখন প্রশ্ন করিলেন, "কেমন হয়েছে?" তখন তিনি "বেশ হয়েছে" বলিয়া প্রণামান্তে দ্রুত চলিয়া গেলেন। সম্ভবতঃ এই অনির্বাচ্য ভয়ের সহিত লজ্জাও মিশ্রিত ছিল; কারণ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীমা তখনও লজ্জাপটাবৃতা নববধূ; শ্বশ্রূস্থানীয়া ব্রাহ্মণীর সম্মুখে পতি-সন্নিধানে তাঁহার অজ্ঞাতসারেও কোন চপলতা চলে না; আর স্বভাবতঃ ধীরা শ্রীমায়ের চরিত্রে উহার নিতান্তই অভাব ছিল।

শ্রীমায়ের ভৈরবীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও তাঁহার সহিত ঠাকুরের সহজ মিলনকে ভৈরবী কতকটা ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বহু পরিবারেই বধূ ও শ্বশ্রূর এই অবাঞ্ছিত সম্বন্ধ পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে। বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা অতীব নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া ভৈরবী তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবসর খুঁজিয়া পাইলেন না; কিন্তু সে

ঈর্ষা অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন—সহধর্মিণীর সহিত অবাধ মিশ্রণের ফলে তিনি সাধক-জীবনে পতন বরণ করিতেছেন মাত্র। সিদ্ধগুরু তোতাপুরী প্রজ্বলিত বহ্নিসদৃশ যাঁহাকে এই বিষয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, স্নেহান্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে স্বীয় অঞ্চলে ঢাকিয়া রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই বৃথা চেষ্টায় তিনি জ্বলিয়া মরিবেন। তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না যে, পটভূমিকা পরিবর্তিত হইতেছে—কিশোরী সারদাদেবী ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার উত্তরাধিকারিণীরূপে জগতে মাতৃত্বের মহিমা-প্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আর লীলাবিগ্রহবান ভাবঘনতনু শ্রীরামকৃষ্ণও তাহা বিদিত থাকিয়া সহধর্মিণীকে তদনুযায়ী প্রস্তুত করিতেছেন। সে উচ্চ তত্ত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত না হওয়ায় ভৈরবী স্বয়ং মর্মপীড়িতা হইয়া অপরকেও বিব্রত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিজ দোষ বুঝিতে পারিয়া ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। ইহার পর ভৈরবীর সহিত শ্রীমায়ের নরলীলার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

ভৈরবীর বিদায়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন এবং শ্রীমাও সাত মাস যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যে অনুপম আনন্দলাভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে জয়রামবাটীতে চলিয়া আসিলেন। ঠাকুরের সাহচর্যজনিত "পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার (মাতাঠাকুরানীর) চলন-বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটা পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল" ('লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব', ৩৪৩-৪৪ পৃঃ)।

দেবীর বোধন

জয়রামবাটীতে পুনরাগতা শ্রীমা দেখিলেন, পল্লীশ্রী পূর্বেরই ন্যায় আছে; জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহপ্রীতি সমভাবেই রহিয়াছে; দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ, আলাপ-আলোচনা আগেরই মতো চলিতেছে; কিন্তু তবু প্রাণের নিভৃত কোণে কোন্ অস্ফুট ব্যথা যেন মাঝে মাঝে গুমরাইয়া উঠিতেছে। কামারপুকুরে যে দৈব আনন্দের অধিকারিণী তিনি হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি অবিরাম অন্তরে জাগ্রত থাকিয়া অথচ বাহিরে উহার কোনও প্রতিচ্ছবি দেখিতে না পাইয়া, পদে পদে ব্যাহত হইতে লাগিল এবং সে প্রতিক্রিয়া তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিতে থাকিল। শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত আসিল। শ্রীমা শুধু উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, যদি দৈবাৎ আদান-প্রদানে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উদাসীনপ্রায় এই ক্ষুদ্র গ্রামে সেই নরদেবের কোন সংবাদ আসিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ চারি বৎসরেরও অধিক কাল (অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ হইতে চৈত্র, ১২৭৮) কাটিয়া গেল।

এই সময়মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের দুই-একটি কথা হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া গ্রামে জল্পনার খোরাক যোগাইতে লাগিল। গ্রামবাসী যাহা শুনিল তাহা হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ। শ্রীমায়ের মনে বা কার্যে তখন পূর্বের ন্যায় স্ফূর্তি ছিল না। যন্ত্রবৎ তিনি সব করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু অহরহ শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহজনিত মর্মব্যথার কালিমা তাঁহার বদনমণ্ডলে লিপ্ত থাকিয়া যদিও সহানুভূতি-সম্পন্না পল্লীবালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল, তথাপি, অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতামিশ্রিত সে সহানুভূতি যখনই আত্মপ্রকাশে অগ্রসর হইত, তখনই শ্রীমায়ের নিবিড় ব্যথাকে নিবিড়তর করিয়া তাঁহার পল্লী-জীবন অসহনীয় করিয়া তুলিত। সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া তাহারা শ্রীমাকে জানাইত, যে, তাঁহার পতি অবজ্ঞার পাত্র। আর পরদুঃখে যাহারা আনন্দ পায়, তাহারা অঙ্গুলিনির্দেশে মাকে দেখাইয়া বলিত, 'পাগলের স্ত্রী', অথবা সহানুভূতিচ্ছলে নিষ্ঠুর মনোবেদনা দিয়া বলিত, "ওমা, শ্যামার মেয়ের ক্ষেপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে।" এইসব অবাঞ্ছিত কথা শুনিবার ভয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কাহারও বাড়িতে যাইতেন না; দিবারাত্র আপনাকে কাজের মধ্যেই ডুবাইয়া রাখিতেন। সতীর নিকট পতিনিন্দা অসহ্য; তাই তাঁহাকে একই স্থানে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। একান্তই মন হাঁপাইয়া উঠিলে তিনি গ্রামের ভক্তিমতী সহৃদয়া রমণী ভানু-পিসীর[১] গৃহের বারান্দায় যাইয়া স্বীয় অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া কাটাইতেন।

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

শুদ্ধস্বভাবা ভানু-পিসীর একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল, যাহার প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের আভাস পাইয়া তিনি শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরীকে বলিয়াছিলেন, "বউ ঠাকরুন, তোমার জামাই শিব, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—এখন যা বিশ্বাস করতে পারছ না, পরে পারবে বলে রাখছি।" বিবাহের পর দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী আসিয়া ঠাকুর যখন শ্রীমায়ের সহিত জোড়ে যান, তখন রসিকা ভানু-পিসী হরগৌরীর কথা স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিলেন, "নাতনী তুই যেমন সুরূপা, তোর বর জুটেছে ন্যাংটা ক্ষেপা।" মনে রাখিতে হইবে যে, মায়ের শরীর তখন ভাল ছিল এবং বর্ণও ছিল উজ্জ্বল। ভানু-পিসী সেই আদিমকালেই ঠাকুর ও শ্রীমাকে হরগৌরীরূপে চিনিতে পারিলেও তিনি ভাবপ্রবণা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিত না। তবু শ্রীমায়ের নিকট ভানু-পিসীর ঘরই ছিল সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র জুড়াইবার স্থান।

কিন্তু এইভাবে আত্মগোপনকে আত্মরক্ষার অদ্বিতীয় অস্ত্র করিয়া চিরকাল কাটিতে পারে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেটুকু কথা কানে আসিয়া পড়িত, তাহা তিনি শুনিলেও বিশ্বাস করিতেন না। প্রেমঘনমূর্তি যাঁহার পূত সান্নিধ্যে তিনি এই কিছুদিন পূর্বে অনির্বচনীয় আনন্দে ভাসিতেছিলেন, যাঁহার দিব্য আবেশ তাঁহাতেও সংক্রামিত হইয়া অননুভূত উল্লাসের সঞ্চার করিয়াছিল, যাঁহার পরহিতচিন্তাদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন, যাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও হাস্যকৌতুক সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সহসা অন্য রাজ্যে লইয়া যাইত বা দীর্ঘকাল নিজসকাশে বসাইয়া রাখিত তিনি পাগল, ইহা একান্তই অবিশ্বাস্য। কিন্তু পল্লীর অজ্ঞ লোক তো শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চাবস্থা ধারণা করিতে পারে না ; সুতরাং তাহাদের উদ্দাম কল্পনা অপ্রতিহত গতিতেই চলিতেছিল, আর তাহাদের সমালোচনারও শেষ ছিল না। সতী-সাধ্বীর তাই মনে হইল, "সবাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কেমন আছেন।" তখন (চৈত্র, ১২৭৮ সাল) এক পর্ব উপলক্ষে ঐ অঞ্চলের অনেক স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল। শ্রীমায়েরও ইচ্ছা হইল যে, তিনি তাহাদের সঙ্গে যান। তিনি ভয়ে ও লজ্জায় পিতাকে কিছু বলিতে পারেন না ; অথচ মনের ভাব একেবারে চাপিয়া রাখাও অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে সব খুলিয়া বলিলেন। সে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রকে সব বলিয়া দিল। উদারমনা পিতা শুনিয়া বলিলেন, "যাবে? বেশ তো।" তিনি নিজেই কন্যার সঙ্গে চলিলেন।

কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র হাঁটিয়াই তারকেশ্বরের পথে কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। প্রায় ষাট মাইল পথ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। শ্রীমা সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সহিত প্রথমটা বেশ আনন্দেই চলিলেন। পথের দুই ধারে উন্মুক্ত প্রান্তর ; প্রান্তরের মাঝে মাঝে রবিশস্যের শ্যামল ছবি ; কোথাও বা ঘনবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন গ্রাম। মধ্যে মধ্যে সুশোভিত দীর্ঘিকা

নয়ন-মনে আনন্দ প্রদান করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ পথপার্শ্বস্থ বিশাল অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ক্লান্ত পথিককে বিশ্রামের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে। এইসব দেখিতে দেখিতে প্রথম দুই-তিন দিন বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু দেহে স্ফূর্তি থাকিলেও এবং শীঘ্র দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিবার অদম্য উৎসাহ মনে জাগিলেও ম্যালেরিয়ার দেশে বাস করিয়া শ্রীমায়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। বিশেষতঃ এত দীর্ঘ পথ চলা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। অপরের অসুবিধা হইবে, পিতা উদ্বিগ্ন হইবেন ইত্যাদি ভাবিয়া এবং স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ তিনি নিজ চরণদ্বয়ের অপটুতার কথা দুই-তিন দিন চাপিয়াই ছিলেন। কিন্তু অবশেষে প্রবল জ্বরে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ায় পিতাপুত্রীকে বাধ্য হইয়া একখানি চটিতে আশ্রয় লইতে হইল। ঐ অবস্থায় শ্রীমায়ের মনের নিদারুণ কষ্টের কথা সহজেই অনুমেয়। জ্বরের যন্ত্রণা তাঁহার জীবনে এই নূতন নহে, উহাতে হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না। এমন কি, এই অজ্ঞাত স্থানও তাঁহাকে তেমন চিন্তিত করিতে পারে নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কষ্ট-দায়ক হইল—তিনি অতিবাঞ্ছিত পতিসন্দর্শনে কবে সক্ষম হইবেন, এই সমাধান-হীন সমস্যা।

এই সমবেদনা ও দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে এক অলৌকিক দর্শন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিল। শ্রীমা জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছেন, তখন দেখিলেন, পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল। মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! সে বসিয়া তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠান্ডা হাত, গায়ের জ্বালা যেন তখনই জুড়াইয়া গেল! শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছ গা?" নবাগতা কহিল, "আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।" শুনিয়া অবাক হইয়া মা বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলুম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হলো না।" মেয়েটি বলিল, "সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" শ্রীমা বলিলেন, "বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?" মেয়েটি বলিল, "আমি তোমার বোন হই।" মা বলিলেন, "বটে? তাই তুমি এসেছ!" ঐরূপ কথাবার্তার পরেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।[১]

১ অন্য একদিন মা বলিয়াছিলেন, "একবার ছোটবেলায় দক্ষিণেশ্বরে যেতে আমার খুব জ্বর। কোন জ্ঞান নেই, এমন অবস্থায় দেখি যে, একটি কাল কুচকুচে মেয়ে এক-পা ধুলো নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। এক-পা ধুলো দেখে

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, শ্রীমায়ের জ্বর সারিয়া গিয়াছে। ঐ দিব্য-দর্শনের পর তাঁহার মনেও তখন যথেষ্ট উৎসাহ আসিয়াছে ; সুতরাং পিতা যখন বলিলেন যে, এই বিদেশে নিরুপায় হইয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই ভাল, তখন তিনি সানন্দে সম্মত হইয়া পিতার সহিত চলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদূরেই একখানি পালকিও পাওয়া গেল। রাস্তায় আবার জ্বর আসিল, কিন্তু তাহার প্রকোপ তেমন অসহ্য নহে। অধিকন্তু শ্রীমা তখন অসহায় নহেন; সুতরাং পিতার দুশ্চিন্তা বাড়ানো অনাবশ্যক ভাবিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ক্রমে সুদীর্ঘ ভ্রমণের পর শেষ পথটুকু নৌকায় চড়িয়া রাত্রি নয়টার সময় তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন।

জয়রামবাটী হইতে আগত সকলে যখন দক্ষিণেশ্বরে গংগার ঘাটে নামিতেছেন, তখন শ্রীমা শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "ও হৃদু, বারবেলা নাই তো রে? প্রথমবার আসছে!" শ্রীমা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি গংগার উপর নৌকাতেই বারবেলা কাটাইয়া আসিয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রথম কথাতেই এমন একটা প্রাণঢালা প্রেমের স্পর্শ ছিল, যাহার টানে তিনি সোজা ঠাকুরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ; অপরেরা নহবতে বা অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ করেছ!" পরে পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, "মাদুর পেতে দে রে।" ঘরেই মাদুর পাতা হইলে শ্রীমা উহাতে বসিয়া ঠাকুরের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যখন জানিলেন যে, শ্রীমা পীড়িতা, তখন তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সুখ-সুবিধার চিন্তায় অতিমাত্র উৎকন্ঠিত হইয়া তিনি সখেদে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে এলে! এখন কি আর আমার সেজোবাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।" তখন কয়েক মাস হয় (১৬ জুলাই, ১৮৭১) দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণির জামাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম রসদদার মথুরানাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম দর্শন ও আলাপাদি শেষ করিয়া শ্রীমা নহবতে যাইতে চাহিলে ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে ; এ ঘরেই থাক।" শ্রীমায়ের জন্য পৃথক শয্যা রচিত হইল ; মায়ের সঙ্গিনী একটি মেয়েরও তাঁহার সংগে শুইবার ব্যবস্থা হইল। তখন কালীবাড়ির সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে ; তাই শ্রীযুক্ত হৃদয় দুই-তিন ধামা মুড়ি লইয়া আসিলেন।

বললুম, 'মা, কেউ কি পা ধুতে জল দেয় নি?' সে বললে, 'না, মা, আমি এক্ষুণি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে।' তা পরদিন থেকে আমি ক্রমে সেরে উঠি।" ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ড, ২৭৭-৭৮ পৃঃ); (ঐ, ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পরদিন ঠাকুরের নির্দেশে ডাক্তার দেখানো হইল। সুচিকিৎসায় তিন-চারি দিনের মধ্যেই জ্বর সারিয়া যাওয়ায় শ্রীমা নহবতে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী চন্দ্রমণিও তখন সেখানে থাকেন। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনকালে বাবুদের 'কুঠি'র একখানি ঘর তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মথুরানাথের দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্বে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় ঐ ঘরেই পরলোকগমন করিলে চন্দ্রমণি দেবী আর সেখানে থাকিতে চাহিলেন না ; তিনি নাতির শোক ভুলিবার জন্য নহবতে চলিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আর আমি ওখানে থাকব না। আমি এই নহবতের ঘরেই থাকব, গঙ্গাপানে মুখ করে রইব, কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে শ্রীমায়ের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিল। পল্লীগ্রামের হৃদয়হীন অজ্ঞলোকের মধ্যে কত কথাই না রটিয়াছিল—তাঁহার আরাধ্যদেবতা সেখানে পড়িয়াছিলেন পাগলের পর্যায়ে ; এমন কি, এত যে বিশ্বাসী মন শ্রীমায়ের, বার বার শুনিতে শুনিতে সে মনেও যেন কেমন একটু সন্দেহের আঁচ লাগিয়াছিল। কিন্তু আজ? আজ তিনি দেখিলেন যে, দেবতা দেবতাই আছেন; পত্নীকে ভুলিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি এখন যেন অধিকতর কৃপাপূর্ণ। অতএব শ্রীমায়ের কর্তব্য স্থির হইতে বেশিদিন লাগিল না ; তিনি প্রাণের উল্লাসে নহবতে থাকিয়া ঠাকুর ও তাঁহার জননীর সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার পিতাও কন্যার আনন্দ এবং ঠাকুরের সপ্রেম ও সশ্রদ্ধ ব্যবহারে আশ্বস্ত হইয়া কয়েকদিন পরেই হৃষ্টচিত্তে স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে অবস্থানকালে তোতাপুরীর কথা আলোচনাপূর্বক নিজ সাধনলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতার পরীক্ষায় এবং পত্নীর প্রতি কর্তব্য-পালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে সুদীর্ঘ চারি বৎসর তাঁহার মন দৈব-প্রেরণায় তীর্থদর্শন ও বিবিধ সাধনাদিতে ব্যাপৃত ছিল। অধুনা ভগবদিচ্ছায় পত্নীকে স্বসন্নিধানে সমাগত দেখিয়া তিনি পুনর্বার অসমাপ্ত উভয় কর্তব্য-সম্পাদনে যত্নপর হইলেন। সে কর্তব্য জাগতিক ক্ষেত্রে পতিপত্নীর চিরাচরিত ব্যবহারমাত্রে নিঃশেষিত না হইয়া অতিজাগতিক ভূমিতে গুরু-শিষ্যের মন্ত্র ও সাধনা, বা পূজ্যপূজকের কৃপা ও উপাসনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মানবের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারে এক নবীন সম্পদ আনিয়া দিতে উদ্যত হইল। আমরা ঠাকুরের অনুষ্ঠিত ষোড়শী-পূজা-বর্ণনার ভূমিকা করিতেছি। সে অচিন্ত্য-পূর্ব ঘটনায় আসিবার পূর্বে এই দেবদম্পতির অপাপবিদ্ধ সম্বন্ধটি আমাদিগকে আর একটু আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

ঠাকুর এই সময়ে অবসরমত গৃহকর্ম, আত্মীয়বর্গের প্রতি ব্যবহার, অপরের গৃহে ভব্যতা প্রভৃতি সাংসারিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া ভজন, কীর্তন,

ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয়েই শ্রীমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া শ্রীমায়ের নিকট মানবজীবনের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার ; তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাক তো তুমিও দেখা পাবে।" তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না ; শ্রীমা ঐসকল কথা কতটা কিরূপে জীবনে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহারও খোঁজ রাখিতেন।

শ্রীমা সারাদিন নহবতে থাকিয়া সংসারের কাজকর্ম করিতেন, কিন্তু প্রতিরাত্রে তিনি ঠাকুরের ঘরে তাঁহারই শয্যায় শয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। ইহারই একসময়ে শ্রীমাকে একান্তে পাইয়া ঠাকুর পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" শ্রীমা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" শ্রীমাও একদিন ঠাকুরের পদসংবাহন করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" পাঠক এক্ষণে ভাবুন, আমরা এ কাহাদের দৈবলীলা বর্ণনে অগ্রসর হইয়াছি। কামগন্ধশূন্য ও মানবীয়-দেহসম্বন্ধ-বিহীন এই অপার্থিব প্রেমলীলার অনুসরণ করিতে হইলে আমাদিগকে অন্ততঃ মুহূর্তকালের জন্য আত্মসমাহিত হইতে হইবে।

মাতাঠাকুরানী শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে তাঁহারই পার্শ্বে শয়ন করিতে যান। কিন্তু ইহা তো সাধারণ দাম্পত্য-জীবন নহে। পূর্ণযৌবন শ্রীশ্রীঠাকুর ও নবযৌবনা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অধুনা যে আত্মপরীক্ষায়, কিংবা জনসমাজের শিক্ষাপ্রদ লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার নিকট অগ্নিপরীক্ষাও তুচ্ছ প্রতীত হয়। দেহবোধ-বিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি তখন সমাধিতে অতিবাহিত হইত। তাদৃশ সমাধির এক বিরামক্ষণে তিনি পার্শ্বে শায়িতা শ্রীমায়ের রূপযৌবনসম্পন্ন শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—"মন, এরই নাম স্ত্রীশরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি করো না ; পেটে একখানা মুখে একখানা রেখো না। সত্য বল, তুমি একে গ্রহণ করতে চাও, অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি একেই চাও, তো এই

তোমার সম্মুখে রয়েছে, নাও।" এইরূপ বিচারপূর্বক ঐ অঙ্গস্পর্শনের জন্য হস্তপ্রসারণ করিবামাত্র মন সহসা কুণ্ঠিত ও উচ্চ সমাধিপথে ধাবিত হইয়া বিলীন হইয়া গেল, সে রাত্রে আর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসিল না। পরদিন বহুক্ষণ ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে ব্যবহারিক জগতে নামাইয়া আনা সম্ভব হইল।

শ্রীমা একাদিক্রমে আট মাস ঠাকুরেব সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের মন যেমন ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিত, মায়ের মনও তেমনি এই আরাধ্য দেবতার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিত। সুতরাং কাহারও মনে ভোগস্পৃহার অবকাশ ছিল না। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শ্রীমাকে অতি নিকটে থাকিতে দিয়া ঠাকুর তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোগেচ্ছা দেখিতে পান নাই; তাই পরবর্তী কালে ভক্তদের নিকট এই পবিত্রতা-স্বরূপিণীর মহিমা খ্যাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হ'ত আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে (আমার) সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি না, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, 'মা, আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে এই কালে বুঝেছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শুনেছিলেন।"

লীলাচ্ছলে ঠাকুর যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন অন্তরে কিন্তু জানি যে, আপ্তকাম, আত্মরতি ও আত্মক্রীড় শ্রীরামকৃষ্ণের কোন অবস্থাতেই সংযমের বাঁধ ভাঙিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং সাক্ষাৎ জগদম্বা শ্রীমায়ের পবিত্রতার জন্যও অপরের নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি আদর্শস্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ লীলাবিলাস হইয়াছিল বলিয়া লোককল্যাণার্থ সেই অতি গোপনীয় তথ্য প্রকাশ্যে বলা আবশ্যক ছিল। স্বামী ও স্ত্রীই পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতমরূপে জানেন; সুতরাং লোকদৃষ্টিতে শ্রীমায়ের বিষয়ে ঠাকুরের এবং ঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রীমায়ের সাক্ষ্যপ্রদানের একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে।

অন্য বহুভাবে ও বহু কথাচ্ছলে শ্রীমায়ের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকিলেও ঐ অভিব্যক্তির ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল ষোড়শী-পূজায়। সে পূজার তাৎপর্য ঠাকুরের দিক হইতে আলোচনার স্থান ইহা নহে। মায়ের দিক হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ক্ষুদ্র বালিকাকে ঠাকুর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে তাঁহাকে দিব্যপ্রেমের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে লৌকিক ও দেবজীবনোচিত অপূর্ব সম্পদরাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অধুনা নারীর দেবীত্বের উদ্বোধনের সময় সমাগত। যাঁহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে অন্তরের পূজা

প্রদানপূর্বক নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তিবিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ষোড়শী-পূজার আয়োজন।

শ্রীমায়ের প্রথমাগমনের পর তাঁহার সহিত কিছুদিন এক শয্যায় শয়ন করিয়া ঠাকুর তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। অতঃপর ১২৭৯ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ (৫ জুন, ১৮৭২) অমাবস্যা তিথিতে ফল-হারিণী-কালিকাপূজার দিন আসিল।[১] আজ রাত্রে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে তাঁহার ষোড়শী (শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী) মূর্তিতে আরাধনা করিবার আগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু পূজার আয়োজন মন্দিরে না হইয়া ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহারই কক্ষে হইয়াছে। এই সব কার্যে ঠাকুর হৃদয়ের সাহায্য লইতেন। কিন্তু হৃদয় আজ কালীমন্দিরে বিশেষ পূজায় ব্রতী; সুতরাং তিনি ঠাকুরকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া মন্দিরে চলিয়া গেলেন। পরে রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালীন সেবাপূজা শেষ করিয়া দীনু পূজারী[২] ঠাকুরের ঘরে আসিয়া অবশিষ্ট আয়োজনে মন দিলেন। পূজাদ্রব্য সমস্ত যথাস্থানে সজ্জিত হইল। আরাধ্য দেবীর কোন প্রতিমা না থাকিলেও তাঁহার জন্য আলিম্পনশোভিত পীঠ ঠাকুরের চৌকির উত্তরে পূজকের সম্মুখে স্থাপিত হইল। এইরূপে ষোড়শীর (বা ত্রিপুরসুন্দরীর) পূজার সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। দীনু পূজারী তখন চলিয়া গেলেন।

শ্রীমাকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিবার জন্য ঠাকুর পূর্বেই বলিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। এখন তিনি ঘরে আসিয়া নিবিষ্টমনে ঠাকুরের পূজা দেখিতে

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাবে' (৩৫৩-৫৪) লিখিত আছে যে, শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের বৎসরাধিক কাল পরে (অর্থাৎ ১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে) 'ষোড়শী-পূজানুষ্ঠান হয়। কিন্তু 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (২য় খণ্ড, ১২৮ পৃঃ) আছে—"দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শী-পূজা করলেন" (১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ)। লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব-পূর্বার্ধে' (১৫২ পৃঃ) "আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও এক শয্যায় শয়নে"র উল্লেখ আছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম খণ্ডে (৩০৯ পৃঃ) এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', ২য় ভাগে (৯ম সং, ১৭৮ পৃঃ) এই কথা সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীমায়ের আগমন হইতে 'ষোড়শীপূজা পর্যন্ত দুই মাস ও পরে ছয় মাস একত্রে শয়ন হইয়াছিল ধরিলে অধিকাংশ ঘটনা ও গ্রন্থের সামঞ্জস্য হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষও তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থে (৩৩১ পৃঃ) "শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই 'ষোড়শী-পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দ্রষ্টব্য এই, বহু গ্রন্থে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে (১৩ই চৈত্র, ১২৭৮, ২৫শে মার্চ, ১৮৭২) শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের উল্লেখ থাকিলেও, তাঁহার কথানুসারে, "মাস দেড়েক পরেই 'ষোড়শী-পূজা হয়, ইহা মানিয়া লইলে প্রথমাগমন চৈত্র-সংক্রান্তি বা ঐরূপ সময়েও হইতে পারে।

২ ইনি জ্ঞাতিসম্পর্কে শ্রীমায়ের ভাসুরপুত্র; বাড়ি মুকুন্দপুরে।

লাগিলেন। ঠাকুর পূর্বমুখ হইয়া পশ্চিম দিকের দরজার কাছে বসিয়াছিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে পূজা-দ্রব্যসকল শোধনের পর তিনি যথাবিধি পূর্বকৃত্য শেষ করিলেন এবং শ্রীমাকে নির্দিষ্ট পীঠে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দেখিতে দেখিতে মাতাঠাকুরানীর অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং কেন, কি করিতেছেন ইত্যাদি না ভাবিয়া তিনি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুরের সম্মুখস্থ পীঠে উপবেশন করিলেন।[১] তখন মন্ত্র-পূত কলসের জল লইয়া ঠাকুর বারংবার শ্রীমায়ের অভিষেক করিলেন। তারপর তাঁহাকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "হে বালে, হে সর্ব-শক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধি বিন্যাস করিয়া সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। পূজান্তে ভোগ নিবেদিত হইল। অবশেষে পূজক নিবেদিত মিষ্টান্নাদির কিয়দংশ স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া দেবীর শ্রীমুখে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা শ্রীমা সমাধিস্থ হইলেন; ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সমাধি-রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সে ভূমিতে আত্মসংস্থ পূজক ও পূজিতা আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে একীভূত হইলেন। এই প্রকারে দীর্ঘকাল কাটিয়া যখন মধ্যরাত বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, তখন আত্মারাম ঠাকুরের ব্যুত্থানের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিল। অর্ধবাহ্যদশায় উপনীত হইয়া তিনি দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব দেবীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, "হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্ম-নিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি।" পূজা সমাপ্ত হইল—"মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীরও দেবীমানবীত্বের পূর্ণ বিকাশের দ্বার অর্গল-মুক্ত হইল। পূজাশেষে বাহ্যভূমিতে প্রত্যাবর্তনান্তে স্বগৃহে যাইবার পথে তাঁহার মনে পড়িল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম ফিরাইয়া দেন নাই ;তাই তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া নহবতে ফিরিলেন।

শ্রীমা তখন অষ্টাদশ বর্ষ সমাপনান্তে ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন

১ 'লীলাপ্রসঙ্গে' (সাধকভাব, ২৫৪-৫৫ পৃঃ) পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাস্য হইয়া বসার উল্লেখ আছে। আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠার অনুসরণ করিলাম।

তবে তিনি ক্রমক্রমে প্রায়ই বলিতেন, "আমি তখন ষোল বছরে পড়েছি।" উৎসুক ভক্ত নরনারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক আর যে-সকল কথা অবগত হইয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার সারসঙ্কলন করিতেছি। পূজার প্রথমে ঠাকুর শ্রীমায়ের পদযুগলে আলতা, কপালে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন; অঙ্গে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইলেন; মুখে পান-মিষ্টি প্রদান করিলেন। এই বর্ণনা শুনিয়া লক্ষ্মী-দিদি যখন সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি তো অত লজ্জা কর—কাপড় কি করে পরালেন গো?" মা সরলভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তখন কি রকম যেন হয়ে গিছলুম।" মা গঙ্গাজলের জালার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে পূজাসামগ্রী সজ্জিত ছিল। পূজাকালে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ থাকায় কেহ উহা জানিতে পারে নাই, অথবা বাহিরের উৎসবের কোলাহলে পূজার ব্যাঘাত হয় নাই। গৃহে ঠাকুর ও মা ব্যতীত কেহ ছিলেন না; শেষাশেষি হৃদয় আসিয়াছিলেন। পূজাবসানে মায়েব এক সমস্যা উপস্থিত হইল। পূজায় প্রাপ্ত শাঁখা শাড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? কারণ তাঁহার তো আর গুরু-মা ছিলেন না যে, তাঁহাকে দিবেন। সর্ববিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ইহা শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা তোমার গর্ভ-ধারিণী মাকে দিতে পার; কিন্তু দেখো, তাঁকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না, সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে দেবে।" শ্রীমা তাহাই করিয়াছিলেন।

শ্রীমা ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের পূজা ও তৎসহ তাঁহার সাধনলব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিনা সাধনায় সমস্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হইলেন; অধিকন্তু ব্যুত্থিতাবস্থায়ও তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখিতে শিখিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরও সহধর্মিণীর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

ষোড়শী-পূজার পরেও শ্রীমা পাঁচ-ছয় মাস রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ঠাকুরের ভাব ও সমাধির সহিত তখনও পূর্ণ পরিচয় না ঘটায় তিনি একদিকে যেমন পতিসান্নিধ্যে আনন্দ পাইতেন, অন্য-দিকে তেমনি ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "(ঠাকুর) সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়। কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত। সে কি এক আবির্ভাব আবেশ! দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে। ভাব-সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না। একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদে-কেটে (ঝি) কালীর মাকে দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শোনাতে শোনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। পরদিন ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে

দিলেন, 'এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শোনাবে; এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে।' তখন আর তত ভয় হতো না, ঐ সব শোনালেই তাঁর আবার হুঁশ হতো। তারপর অনেক দিন এইরকমে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—একথা একদিন জানতে পেরে নহবতে আলাদা শুতে বললেন।"[১]

শ্রীমা নহবতেই থাকুন আর ঠাকুরের ঘরেই থাকুন, তিনি ঠাকুর ও ঠাকুরের জননীর সেবাকেই সম্বল করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জননী শেষ বয়সে চলচ্ছক্তি-হীন হইয়া বধূর উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। শ্রীমা ইহা জানিতেন; তাই বৃদ্ধা কোন প্রয়োজনে যখনই তাঁহাকে ডাকিতেন, তখনই তিনি সত্বরে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। কেহ যদি সাবধান করিয়া দিত যে, এভাবে ছুটিলে নহবতের নিচু দরজায় মাথা ঠুকিয়া যাইতে পারে, তবে তিনি উত্তর দিতেন, "হলোই বা! তিনি আমার গুরুজন, আর মা। আহা, তিনি বুড়ো হয়েছেন! আমি যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাঁর অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য দৌড়ে যাই।" ঠাকুরের জননী তখন নহবতের উপরে থাকিতেন; মা থাকিতেন নিচে।

ঠাকুরের সেবাও তিনি এইরূপ সর্বান্তঃকরণেই করিতেন। এই সেবা-অবলম্বনে তিনি তাঁহার যেটুকু সাহচর্য পাইতেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই সেব্য-সেবক-লীলা আবার দৈহিক প্রয়োজনসাধনে আবদ্ধ না থাকিয়া অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বিকশিত হইত। বাহ্যভূমিতে বিচরণকালে ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতির ভাবের প্রাধান্যবশতঃ আপনাকে জগদম্বার সখী বা পরিচারিকা মনে করিতেন এবং শ্রীমাকে ঐরূপ জগদম্বার অপর সখী বলিয়া জানিতেন। শ্রীমাও সানন্দে ও সযত্নে কাঁচুলি ও অলংকারাদি দ্বারা ঠাকুরকে নারীবেশে সাজাইয়া দিয়া নিজেকে তাঁহার সখী ভাবিয়া উল্লসিতা হইতেন। এই সেবাবিষয়ে তাঁহার কোন দাবি-দাওয়া ছিল না; ঠাকুর যখন যতটুকু, যেভাবে চাহিতেন, তিনি তাহাই সম্পাদন করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন।

ষোড়শী-পূজার প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীমা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক ডাক্তার প্রসাদবাবুকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঠাকুরের উদ্বেগ-উৎপাদন অনুচিত মনে করিয়া শ্রীমা সকলের পরামর্শে কামার-পুকুর হইয়া জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন।

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব-পূর্বার্ধ', ১৫২-৫৩ পৃঃ এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম খণ্ড, ৩০৯-১০ পৃঃ।

দৈবাধীনা

ষোড়শী-পূজার প্রায় এক বৎসর পরে ১২৮০ সালে[১] শ্রীমা দেশে আসেন এবং পর বৎসর বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান। এই কয় মাসের মধ্যে তাঁহার শ্বশুর-গৃহে এবং পিত্রালয়ে দুইটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ১২৮০ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ইহধাম পরিত্যাগ করেন। এই বৎসরই কালীমামার উপনয়নের চতুর্থ দিনে রামনবমী তিথিতে (১৪ চৈত্র; ২৬ মার্চ, ১৮৭৪) শ্রীমায়ের রামগতপ্রাণ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। পিতৃস্নেহে লালিতা প্রথমা কন্যার বুকে সে ব্যথা কতখানি বাজিয়াছিল, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। সম্ভবতঃ এই বেদনা হইতে মনকে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীমা একমাস পরে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যান।

এই গমনের সহিত হয়তো বা পিতৃকুলের নিদারুণ দারিদ্র্যেরও একটা সম্পর্ক ছিল। পতির দেহত্যাগের পর শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী আপনাকে নৈরাশ্য-পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইলেন। গৃহে অর্থ নাই; পুত্রগণ সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক; রামচন্দ্রের দেহত্যাগে যাজনক্রিয়া-লব্ধ আয়ের পথ রুদ্ধ; চাষ-আবাদ দেখিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে উহাও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত, দেবর ঈশ্বর-চন্দ্র কলিকাতায় পৌরোহিত্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিলেও স্বীয় ব্যয়-সঙ্কুলানের পর জয়রামবাটীতে প্রেরণের জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। এই-রূপ সঙ্কটে পড়িয়া শ্যামাসুন্দরী কায়ক্লেশে পরিবারপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে বাঁড়ুজ্যে পরিবার তখনো সঙ্গতিশালী ছিলেন। রামচন্দ্রগৃহিণী বাঁড়ুজ্যে বাটী হইতে ধান্য আনিয়া ঢেঁকিতে কুটিতেন। যে পরিমাণ ধান ভানিতেন, তাহার চতুর্থাংশ তিনি পারিশ্রমিকস্বরূপে পাইতেন। শ্যামাসুন্দরীকে সংসারের জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত তাহার উদাহরণস্বরূপ তিনি পুত্রবধূ ইন্দুমতী দেবীকে একসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমরা ঘরে ভাত বসিয়ে দিয়ে শিওড়ে গিয়ে তরকারি নিয়ে এসেছি", আর বলিয়াছিলেন, "ষোল-পাকা (এক সারিতে ষোলটা) উনুন জ্বলছে, তাতে রান্না করেছি—এক হাঁড়ি ভাত আর এক ধুচুনি চালের জন্য।" এত করিয়াও তাঁহার পক্ষে পুত্র-কন্যাদের অন্নসংস্থান ও বিদ্যাভ্যাসের বন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই পুত্রগণ

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব' (৩৫৭ পৃঃ, ৩৭৭ পৃঃ) অনুসারে শ্রীমা সম্ভবতঃ কার্তিক মাসে (অর্থাৎ এক বছর চারি মাস পরে) কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ডের (১৩০ পৃঃ) অনুসরণ করিলাম।

পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলে আত্মীয়গৃহে চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্ন যাইলেন জিবটায়, বরদাপ্রসাদ আশ্রয় পাইলেন শিহড়ে শ্রীহরেরাম ভট্টাচার্যের গৃহে এবং কনিষ্ঠ অভয় ঐ গ্রামে মাতুলগৃহে[১] থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীমাও হয়তো জননীর ক্লেশভারলাঘব ও পতিসেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শাশুড়ীর সহিত অল্পপরিসর নহবতে আশ্রয় লইলেন।

দক্ষিণেশ্বরের স্বাস্থ্য তখন খুব খারাপ—বর্ষাতে প্রায়ই আমাশয় হইত। শ্রীমা অচিরেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে নীরোগ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। শ্রীমা তথাপি শাশুড়ী ও পতির সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। সুতরাং অসুখ লইয়াও তিনি আরও এক বৎসর ঐ ভাবেই কাটাইয়া দিলেন।[২] অবশেষে কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। (সম্ভবতঃ ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে)। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরে পুনরায় ঐ রোগের আক্রমণে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; এমন কি, রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, জীবনরক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল। ঠাকুর এই নিদারুণ পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিলেন, "তাইতো রে, হৃদে, ও (শ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না?"

পীড়ার পুনরাক্রমণকালে শ্রীমাকে ঘন ঘন শৌচে যাইতে হইত; অথচ শরীর এত শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বারংবার গমনাগমনে কষ্ট হইত। তাই গৃহপার্শ্বস্থ 'কলুপুকুরের' পাড়ে শুইয়া থাকিতেন। সেই সময় পুকুরের জলে নিজের অস্থিচর্মসার শরীরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার এমনও মনে হইয়াছিল, "আরে ছি! এই দেহ! তবে আর কেন? এখানেই দেহটি থাক, দেহ ছাড়ি।" পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার অসুখের সময়—তখন সব শরীর ফুলে গেছে—নাক কান দিয়ে রস ঝরছে। উমেশ (মায়ের ভাই) বললে, 'দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে?' সে-ই আমাকে রাজি করে ধরে নিয়ে গেল। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যা—চক্ষে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চক্ষু গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশা, তিন-চার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই শৌচে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল, ঐখানেই তার ঘর। সে মাঝে মাঝে গলা-খ্যাঁকারি দিত, আমি ভয় না পাই। পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে বলছেন, কামারদের একটি মেয়ের বেশে, রাধুর মতো অত বড় (বার-তের বছরের) মেয়েটি, 'যাও যাও,

[১] ইঁহাদের পাঁচ মাতুল—রামব্রহ্ম, রামতারক, কেদার, শ্রীপতি ও বৈকুণ্ঠ এবং এক মাসী—দীনময়ী। মাতুলবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

[২] "দক্ষিণেশ্বরে একবছর ভুগে দেশে গেছি"—'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ড, ১৩১ পৃঃ।

উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? এক্ষুণি আনগে। এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হয়ে যাবে।' এদিকে আমাকে বললেন, 'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে ফুট (ফোঁটা ফোঁটা ক'রে) দিও, ভাল হয়ে যাবে।' তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম। আর লাউফুলের ফুট চোখে দিলুম। দিতেই যেমন জাল টেনে আনে, অমনি চোখের সব ময়লা টেনে বের করে দিল। সেইদিনই চোখ ভাল হয়ে গেল। আর শরীরের সব ফুলো-টুলো কমে গেল। বেশ ঝর-ঝরে হলুম। সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা করত বলতুম, "মা (সিংহবাহিনী) ওষুধ দিয়েছেন।' সেই হতেই মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার হলো। আমিও ওষুধ পেলুম, জগৎ ধন্য হলো। আগে আগে মাকে অত কেউ জানত না। আমার খুড়ো মায়ের ওখানে হত্যা দিয়েছিলেন। তাঁকে কিন্তু এমন ডেয়ো ছেড়ে দিলেন যে, টিকতে দিলে না। মাকে এসে স্বপ্নে বলছেন, 'আমি যে শয়নে আছি, এখন কেন হত্যা দিয়েছে? ও বামুন মানুষ, এসব জানে না? যাও, যাও, উঠিয়ে আনগে।' মা বললেন, 'এত কথা বললে, আর ওষুধটুকু বলে দিলেই তো হতো'।"

জীবনের আশা যখন নাই, তখন দেবীর শরণ লইয়া শ্রীমা আরোগ্যলাভ করিলেন। জগদ্বাসী ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইল যে দৈবী শক্তি অমোঘ। তবে সে শক্তির আশ্রয়গ্রহণ সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; শ্রীমায়ের ন্যায় যাঁহাদের চিত্ত ভক্তিতে পরিপূর্ণ কেবল তাহারাই ইহাতে সফলকাম হন। কিন্তু এই-সকল দৈব-শক্তিসম্পন্ন মহামানবের ঐকান্তিক ভক্তিতে দেবতার একবার জাগরণ হইলে অপরেও সে মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে। সিংহবাহিনীর প্রতি শ্রীমা চিরজীবন অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করিতেন। তিনি বিশ্বাসভরে সেখানকার মাটি কৌটায় পুরিয়া রাখিতেন, নিজে নিত্য উহার কিছু গ্রহণ করিতেন রাধুকে একটু একটু খাইতে দিতেন, এবং অপরকেও মায়ের মহিমা শুনাইতেন। শ্রীমায়ের এই আরোগ্যলাভ-দর্শনে আশান্বিত দূরদূরান্তরের বহু লোক মানত করিয়া সিদ্ধকাম হওয়ায় এবং দেবীস্থানের মৃত্তিকাপ্রয়োগে রোগমুক্ত হওয়ায় তথায় বহু ভক্ত আসিতে লাগিল। তাই আজকাল দেবীর প্রাঙ্গণ পূজার্থী ও দর্শনাকাঙ্ক্ষী নরনারী সমাগমে প্রায়ই কোলাহল-মুখর দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

১২৮২ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬) শ্রীশ্রীঠাকুরের

[১] সিংহবাহিনীর মহিমা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে কয়েকটি ঘটনা প্রচলিত আছে—(১) শ্রীমায়ের বাড়ির রাখালকে শাঁখমুটি সাপে তর্জনীতে কামড়াইলে শ্রীমা পরামর্শ দিলেন যে, ছেলেটিকে সিংহবাহিনীর মাড়োতে লইয়া গিয়া স্নানজল খাওয়ান হউক এবং অঙ্গুলিতে মাটির প্রলেপ দেওয়া হউক। উহাতেই সে বিষমুক্ত হয়। (২) মাঠের আলপথে যাইবার সময় শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেব বিষধর সাপের দংশনে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া

শুভ জন্মতিথি দিবসে তাঁহার রত্নগর্ভা জননী শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণি দেবী ভগবৎপদে মিলিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। অন্তিমকালে বৃদ্ধাকে অন্তর্জলি করানো হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানী তখন জয়রামবাটীতে অসুখে ভুগিতেছিলেন।

শ্রীমায়ের সময় তখন খুবই মন্দ বলিতে হইবে; কারণ শারীরিক ব্যাধি ও পারিবারিক শোক হইতে মুক্তি পাইবার পূর্বেই তিনি পুনর্বার ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িলেন। প্লীহা বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কয়াপাটবদনগঞ্জে গিয়া উহা দাগাইতে হইল। এই দাগানো ব্যাপারটা সেকালের এক বিকট গ্রাম্য চিকিৎসা। উহাতে রোগের উপশম হইত কিনা নির্ধারণ করা কঠিন; কিন্তু রোগীর পক্ষে উহা অশেষ যন্ত্রণাদায়ক ছিল। স্নানের পর রোগীকে শোয়াইয়া তিন-চারিজন লোক তাহার হাত-পা চাপিয়া ধরিত, যাহাতে সে উঠিয়া না পালায়। তারপর এক ব্যক্তি একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়া পেটের উপরকার কতকটা জায়গা ঘষিত। উহাতে চামড়া পুড়িয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিত। শোনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরও প্লীহা দাগাইবার জন্য কয়াপাটের হাটতলায় গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া কয়াপাটের হাটতলায় যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার শিবমন্দিরে অন্যলোকের ঐরূপ প্লীহা-চিকিৎসা চলিতেছিল। শ্রীমা সব দেখিলেন এবং রোগীদের আর্তনাদও শুনিলেন। যথাসময়ে তিনি স্নান সারিয়া আসিলে জনকয়েক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেল। কিন্তু মা বলিলেন, "না, কাউকে ধরতে হবে না; আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে থাকব।" বাস্তবিকই তিনি সে অমানুষিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিলেন। পরে যে কোন কারণেই হউক, প্লীহাবৃদ্ধি সারিয়া গেল।

কথিত আছে যে, শ্রীভগবান বা তাঁহার শক্তিবিশেষ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহারা প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যুদ্ধঘোষণা না করিয়া ঐগুলিকেই নবভাবে রূপায়িত করেন, কিংবা তাহাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, অথবা ঐসকল আপাতবিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যেও স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া পথভ্রান্ত জনগণকে এক উচ্চতর আদর্শের দিকে টানিয়া লন। কে জানে শ্রীমায়ের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল? তবে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আদর্শ হিসাবে যা করতে হয়, তার ঢের বাড়া করেছি।"

শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তের ভক্তির আকর্ষণে দেবতা জাগ্রত

যায়। শ্রীমা সর্পদষ্টস্থানে সিংহবাহিনীর মাটির প্রলেপ দিয়া তাহাকে সারা রাত্রি গৃহে শোয়াইয়া রাখেন। ইহাতে সে সংজ্ঞালাভ করে। (৩) স্বামী গৌরীশানন্দ ভূদেবের ন্যায় সর্পদষ্ট হন এবং অনুরূপ চিকিৎসায় বিষমুক্ত হন।

হন। "সিংবাহিনীর জাগরণে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। শাস্ত্রবিৎ-সম্প্রদায়ে ইহাও সুবিদিত যে, শুদ্ধসত্ত্ব মন যে বিষয় বা ক্রিয়াকে বিশ্বাসপূর্বক অবলম্বন করে উহাতে এমন এক অলৌকিক শক্তি আহিত হয় যাহার মহিমায় ঐরূপ তুচ্ছ বিষয় বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়া অচিন্তিতপূর্ব ফলের উৎপত্তি হয়। প্লীহা-চিকিৎসাতে আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শাস্ত্র আরও বলেন যে, ভক্তের ঐকান্তিকতা থাকিলে দেবতা তুষ্ট হইয়া স্বতই দর্শন দেন কিংবা ভক্ত-গৃহে চির-অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্রীমায়ের পিতৃগৃহে 'জগদ্ধাত্রীপূজায় ইহা প্রমাণিত হইবে। আমরা এখন ঐ বিষয়ের অনুসরণ করিব। কিন্তু তৎপূর্বে শ্রীমায়ের অদ্ভুত চরিত্রের কথা আর একবার চিন্তা করিয়া লইতে চাই। আমরা ভাবিয়া স্তব্ধ হই যে, কলিকাতার ধনী ও বিদ্বানদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সাধকসমাজে সিদ্ধির চরম অবস্থায় উন্নীত বলিয়া প্রখ্যাত এবং গুণগ্রাহী সিদ্ধগণের দ্বারা অবতাররূপে উপাসিত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক দেবীজ্ঞানে আরাধিতা এবং সর্বদা সুসম্মানিতা হইয়াও এই অলৌকিক চরিত্রমাধুর্য-মহীয়সী পল্লীবালা কখনো গৌরবমদে আত্মবিস্মৃত বা শ্রদ্ধাহীন হন নাই; বরং অশেষ বিনয়সহকারে আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসী সকলকে যথোচিত সম্মান দিয়াছেন এবং গ্রাম্যদেবতাদির প্রতি পূর্বাপেক্ষাও অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামীর অবস্থা তখন অসচ্ছল না হইলেও তিনি নিজের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁহার নিকট অর্থাদি যাচ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করেন নাই, কিংবা মনঃপীড়া দেন নাই। বরং পিত্রালয়ের দারিদ্র্যের মধ্যে মুখ বুজিয়া রোগ-যন্ত্রণা ভুগিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে শুধু দেবতারই নিকট আকুতি জানাইয়াছেন। যেখানে এই প্রকার শরণাগতি, এবং শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর ন্যায় দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী মাতা যে গৃহের গৃহিণী, সেখানে দেবতার আবির্ভাব অবশ্য-ম্ভাবী। অতএব নিষ্কিঞ্চনের কুটিরেও রাজরাজেশ্বরী 'জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা তেমন আশ্চর্যজনক নহে।

একবার গ্রামের 'কালীপূজার সময় নব মুখুজ্যে গ্রাম্যসঙ্কীর্ণতাবশতঃ আক্রোশ করিয়া পূজার জন্য সংগৃহীত শ্যামাসুন্দরীর চাউল প্রভৃতি লইলেন না। শ্যামাসুন্দরী বহু যত্নে এবং অতি ভক্তিভরে পূজার উপকরণ তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অপরের নিষ্ঠুরতায় তিনি অকস্মাৎ দেবীকে নৈবেদ্যদানে পর্যন্ত বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে মর্মপীড়িত হইয়া তিনি সারা-রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "কালীর জন্যে চাল করেছি, আমার চাল নিলে না! এ চাল আমার কে খাবে? এ কালীর চাল তো কেউ খেতে পারবে না!" তারপর রাত্রে স্বপ্নে এক দেবী তাঁহার নিকট আসিয়া গা চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। শ্যামাসুন্দরী চক্ষু মেলিয়া দেখেন, রক্তবর্ণা সেই দেবী দুয়ারের ধারে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন।

তিনি বলিতেছেন, "তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভবনা কি?" শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' 'জগদ্ধাত্রী উত্তর দিলেন, "আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।"

পরদিন শ্রীমায়ের মা তাঁহাকে বলিতেছেন, "হাঁরে, সারদা, লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে ও কী ঠাকুর?" শ্রীমা বলিলেন, "ও তো জগদ্ধাত্রী।" দিদিমা তখন বলিলেন, "আমি জগদ্ধাত্রী পূজা করব।" ঐ পূজা করার কথা তিনি যখন তখন বলিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বাসদের বাড়ি হইতে পাঁচ মন আন্দাজ ধান আনাইলেন। তখন এমন বৃষ্টি যে, একদিনও বিরাম নেই। দিদিমা বলিলেন, "মা. কি করে তোমার পূজা হবে? ধানই শুকাতে পারলুম না।" কিন্তু মা জগদ্ধাত্রীর কৃপায় এমন হইল যে, চারিদিকে বৃষ্টি হইতেছে, অথচ দিদিমার চাটাইয়ে রৌদ্র! আগুন জ্বালিয়া প্রতিমাকে শুষ্ক করিয়া উহাতে রং দেওয়া হইল। প্রসন্নমামা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে সংবাদ দিতে গেলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "মা আসবেন? মা আসবেন? বেশ বেশ। তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে।" মামা বলিলেন. "আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।" ঠাকুর বলিলেন, "এই আমার যাওয়া হলো; যা, বেশ. পূজা করগে। বেশ, বেশ তোদের ভাল হবে।" 'জগদ্ধাত্রীপূজা হইল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের বিস্তর লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল, কিন্তু ঐ চাউলেই সব কুলাইয়া গেল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় দিদিমা 'জগদ্ধাত্রী-মূর্তির কানে কানে বলিয়া দিলেন, "মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখব।"

পর বৎসর দিদিমা শ্রীমাকে বলিলেন, "দেখ, তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজা হবে।" শ্রীমা বলিলেন, "অত ল্যাঠা আমি পারব না। হলো একবার পূজা হলো আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই, ও পারব না।" ইহার পর তিনি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনজন আসিয়া উপস্থিত—'জগদ্ধাত্রী এবং তাঁহার সখীদ্বয়, জয়া ও বিজয়া। তাঁহাবা বলিতেছেন, "আমরা তবে যাব?" শ্রীমা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তোমরা?' দেবী বলিলেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।' শুনিয়াই শ্রীমা অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "না, তোমরা কোথা যাবে? না, না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাক. তোমাদের যেতে বলিনি।" তখন হইতে বরাবর 'জগদ্ধাত্রীপূজা চলিতে থাকে। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর পিতৃগৃহে তখন বেশি লোকজন ছিল না; তাই পূজার সময় বাসন মাজিতে ও অন্যান্য কাজ করিতে প্রতিবারে তাঁহাকে জয়রামবাটী আসিতে হইত।

প্রথম বৎসর বিসর্জনের দিন বৃহস্পতিবার ছিল বলিয়া শ্রীমা আপত্তি তুলিয়াছিলেন, লক্ষ্মীবারে মাকে বিদায় দেওয়া চলে না। উহার পরের দিন

সংক্রান্তি এবং তৃতীয়দিন নূতন মাসের পহেলা ছিল। অতএর চতুর্থদিন রবিবারে বিসর্জন হইয়াছিল।[১]

প্রথম চারি বৎসর পূজার সঙ্কল্প শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী দেবীর নামে, দ্বিতীয় চারি বৎসর শ্রীমায়ের নামে, তৃতীয় চারি বৎসর তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলমাধবের নামে হইয়াছিল। বার বৎসর পূজার পরে শ্রীমা আর পূজা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই ; কারণ সকলেরই নামে পূজা হইয়া গিয়াছে। তিনি যেদিন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, সেই রাত্রে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া জানাইলেন যে, মধু মুখুজ্যের পিসিমা দেবীর আরাধনা করিতে চাহিতেছেন এবং তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমি যাই?" শ্রীমা বুঝিতে পারিলেন, জগদ্ধাত্রী ত্রিসত্য করাইয়া চলিয়া যাইতে চাহেন; অতএব তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "আমি আর ছাড়ব না তোমাকে, আমি বছর বছর তোমাকে আনব।" এই সঙ্কল্পানুসারে পূজা চালাইবার জন্য তিনি কিঞ্চিদধিক সাড়ে দশ বিঘা চাষের জমি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন।[২] এই জমির আয় ও সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আজও জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে প্রতিবৎসর পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরের ন্যায় এখনও তিন দিন পূজা হয়—প্রথম দিন ষোড়শোপচারে এবং পরের দুই দিন সাধারণ ভাবে। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার প্রতিমা স্থাপিত ও পূজিত হয়। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, জগদ্ধাত্রী শ্রীমায়ের মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং দেবী আরাধিত হইলে শ্রীমাও স্বতই আরাধিত হন।

প্রসঙ্গত জগদ্ধাত্রীপূজার বিবরণের পর আমরা আবার শ্রীমায়ের অসুখের পরবর্তী কালে ফিরিয়া যাই। শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের দিনলিপি হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতাঠাকুরানীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া অসুখ সারিবার অল্প পরেই (৫ চৈত্র, ১২৮২; ১৭ মার্চ, ১৮৭৬) শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় আগমন। পর বৎসর (১২৮৩) কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে তিনি দেশে ফিরিয়া যান এবং সম্ভবতঃ ঐ বৎসর শীতকালে (মাঘ মাসে) পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ইহা তাঁহার চতুর্থ আগমন।

১ এই জগদ্ধাত্রীপূজার কাল সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি। কেহ কেহ বলেন, ইহা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ঘটনা।

২ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীর জন্য ঐ জমি ক্রয় করা হয়। শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় স্বামী সারদানন্দজীর অনুরোধে ১।৪।৯৪ (২০ চৈত্র, ১৩০০) তারিখে ঐ বাবদ ৩২০ টাকা দান করেন। ৭।৭।১৯১৬ তারিখে কোয়ালপাড়া আশ্রমে জগদ্ধাত্রীর নামে শ্রীমায়ের অর্পণনামা রেজিস্ট্রী হয়।

আলোছায়ায়

মথুরানাথের দেহত্যাগের কিছুকাল পরে 'জগদম্বার বিধানে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের সর্বপ্রকার সেবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতেন, ইহার পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। "শম্ভুবাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া যোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন" ('লীলাপ্রসঙ্গ -সাধকভাব', ৩৮১-৮২ পৃঃ)। শম্ভু-বাবুর ন্যায় ভক্তিপরায়ণ ও সদাশয় ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পল্লীর স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিতা মাতাঠাকুরানীর পক্ষে ঐ পিঞ্জরপ্রায় নহবত-গৃহে বাস কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্যহানিকর। অতএব শ্রীশ্রীমায়ের তৃতীয়বার (মার্চ, ১৮৭৬) দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পূর্বেই তিনি কালীমন্দিরের সন্নিকটে (এখন যেখানে রামলাল দাদাদের বাড়ি, তাহার পার্শ্বে) একখানি চালাঘর করিয়া দিবার জন্য কিছু জমি ২৫০ টাকা মূল্যে মৌরুসী করিয়া লইলেন। নেপাল সরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন) তখন শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি গৃহনির্মাণের শুভ-সঙ্কল্প শুনিয়া প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসময়ে গঙ্গার অপর তীরস্থ বেলুড় গ্রামের কাঠের গোলা হইতে তিনখানি শালের গুঁড়ি পাঠানো হইল; কিন্তু রাত্রে প্রবল জোয়ারের বেগে একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় ইহাতে বিরক্ত হইয়া মাতুলানীকে বলিলেন, "তোমার ভাগ্য মন্দ" ; সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কটূক্তি করিতেও ভুলিলেন না। কাপ্তেন কিন্তু ভাসিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আর একখানা গুঁড়ি কাঠ পাঠাইয়া দিলেন। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইলে শ্রীমা সেখানে চলিয়া গেলেন।[১] তাঁহাকে গৃহকর্মে সাহায্য করিবে ও সর্বদা তাঁহার

১ ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধে এখানে আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাবের' (৩৮২-৮৫) অনুসরণ করিতে পারিলাম না। উহা (৩৮২ পৃঃ) হইতে অনুমিত হয় যে, গৃহনির্মাণ ১২৮১ সালের (১৮৭৪ খৃঃ) কোন এক সময়ে হইয়াছিল। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের দিনলিপিতে শম্ভুবাবুর দানের তারিখ ১১ এপ্রিল, ১৮৭৬। আবার 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় খণ্ডে (১৩০-৩২ পৃঃ) ঘটনাবলীর ক্রম এইরূপ—'ষোড়শীপূজার পর শ্রীমা "দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছর" ছিলেন। ঠাকুরের মায়ের দেহরক্ষার সময় (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) শ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন। শ্রীমা বলিতেছেন, "তখন আমার অসুখ—দক্ষিণেশ্বরে এক বছর ভুগে দেশে গেছি।...দু-তিনবার (দক্ষিণেশ্বরে) আসবার পর...শম্ভুবাবু (বাড়ি) করালেন।... ঘরে কিছুদিন রইলুম। পরে কাশীর একটি প্রাচীন মেয়ে, আমাকে বলে ও-বাড়ি থেকে

সঙ্গে থাকিবে বলিয়া একজন স্ত্রীলোককে নিয়োগ করা হইল। শীঘ্রই হৃদয়ের পত্নীও ঐ গৃহে আসিয়া শ্রীমায়ের সঙ্গিনী হইলেন।

শ্রীমা ঐ গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের রুচি ও প্রয়োজনানুরূপ বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া মন্দিরোদ্যানে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনসমাপনান্তে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেন। শ্রীমায়ের সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখনো কখনো ঐ গৃহে পদার্পণ করিতেন এবং কিছুকাল সদালাপ করিয়া নিজস্থানে ফিরিতেন। একদিন মাত্র ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। এক বর্ষার দিনে ঠাকুর ঐ চালায় উপস্থিত হইবার পর এমন মুষলধারে বৃষ্টি চলিতে লাগিল যে, তিনি মন্দিরে প্রত্যাবর্তনে অক্ষম হইয়া আহারান্তে সেখানেই শুইয়া পড়িলেন, আর ঠাট্টা করিয়া শ্রীমাকে বলিলেন, "কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় না? এ যেন আমি তাই এসেছি।"

এই চালাতে শ্রীমা দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের আমাশয় হওয়ায় তাঁহার সেবার জন্য শ্রীমাকে পুনর্বার নহবতে আসিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে তখন ঘন ঘন ঝাউতলায় শৌচে যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ায় নহবতের দিকে লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাঠের বাক্সে গর্ত করিয়া নিচে সরা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেখানে শৌচে যাইতেন। প্রথম প্রথম শ্রীমা সকালে চালা হইতে আসিয়া উহা পরিষ্কার করিতেন; বিকালে অপরে পরিষ্কার করিত। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দীর্ঘকাল যাবৎ এতই ভুগিয়াছিলেন যে, শ্রীমায়ের ভাষায় "বাহ্যে গিয়ে গিয়ে মলদ্বার হেজে গেছে।" এমন সময় দৈবক্রমে কাশীর এক 'প্রাচীন মেয়ে' তথায় আসিয়া পড়েন এবং ঠাকুরের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার অতীতের ও ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তিনি যেন দৈবনির্দেশে অন্ধকারে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো যুগাবতারের প্রয়োজনে কাশীধাম হইতে অকস্মাৎ তথায় আবির্ভূত হন ও সেবাবসানে চিরকালের মতো বিলুপ্ত হইয়া যান। শ্রীমা পরে যখন কাশীতে গিয়াছিলেন তখন বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই। সেবাভার লইয়াই আগন্তুক মহিলা দেখিলেন, তাঁহার দ্বারা সর্বপ্রকার শুশ্রূষা হওয়া সম্ভব নহে এবং শ্রীমায়ের ঐ সময়ে দূরে থাকা অনুচিত। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, তাঁর এমন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে?" মা উত্তর দিলেন, "কি করব, ভাগ্নে বউটি

নবতের ঘরে আনালে; তখন ঠাকুরের অসুখ, সেবার কষ্ট হচ্ছে।...তার পরের বার (চতুর্থবার) তো আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি।' শম্ভুবাবুর দেহত্যাগ হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ('কথামৃত', ২য় ভাগ, ৭৯ পৃঃ); সুতরাং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে (১২৮২ সালে) বাটী নির্মাণ করা অযৌক্তিক নহে। বরং শাশুড়ীর দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীমায়ের অন্যত্র অবস্থান সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, উহা পরে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

একা থাকবে! ভাগ্নে হৃদয় সেখানে ঠাকুরের কাছে রয়েছে।" মেয়েটি বলিলেন, "তা হোক, ওরা লোক-টোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে?" শ্রীমা সে কথার যাথার্থ উপলব্ধি করিয়া নহবতে চলিয়া আসিলেন এবং সর্বতোভাবে ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন।

এ পর্যন্ত শ্রীমা সঙ্কোচবশতঃ ঠাকুরের সম্মুখে ঘোমটা খুলিতেন না। কাশীর এই মহিলাই একরাত্রে শ্রীমাকে ঠাকুরের ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন; ভগবদ্ভাবে বিভোর ঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে বহু ঈশ্বরীয় কথা শুনাইতে লাগিলেন। সে উপদেশের আকর্ষণে শ্রীমা ও মহিলা সে রাত্রে এতই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, এদিকে সূর্যোদয় হইলেও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

ইহার পরে শ্রীমা জয়রামবাটী যান। পরবর্তী চতুর্থবারের গমনাগমন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। তবে চতুর্থবারে দক্ষিণেশ্বরে আগমন সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "তার পরের বার তো আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বরে গত অসুখের মানসিক নখচুল দিয়ে এলুম। (ভাই) প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে কলকাতায় তার বাসায় (গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায়) উঠি। ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাই। যেতেই হৃদয় কি ভেবে বলতে থাকে, 'কেন এসেছে? কি জন্যে এসেছে? এখানে কি?'—এসব বলে তাঁদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেননি। হৃদয় শিওড়ের লোক, আমার মাও শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে আদৌ মান্য করলে না। মা বললেন, 'চল, ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া কিছুই বলেননি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে গেলুম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিলে।"

মর্মান্তিক বেদনা লইয়া শ্রীমা বিদায় লইলেন—দক্ষিণেশ্বরে সেবারে একদিনও থাকা হইল না। কিন্তু সে বেদনার জন্য স্বামীর উপর সতীলক্ষ্মীর কোন অভিমান হয় নাই, ভাগিনেয় হৃদয়ের উপরও করুণাময়ীর কোন অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই। যাহা কিছু মান, অভিমান বা দুঃখনিবেদন ছিল সর্বকার্যের বিধাতা দেবতার নিকট। তাই বিদায়কালে তিনি মনে মনে মা কালীকে বলিলেন, "মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।" শরণাগতাকে দেবতা যদি সরাইয়া দেন, তবে তিনি দেবতা ভিন্ন আর কাহার চরণে আবেদন জানাইবেন? চতুর্থবারের নিষ্ফল যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হইল।

হৃদয় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মর্যাদা লঙ্ঘন করিলেন। আপাততঃ তিনি নিজ ইচ্ছানুরূপ কার্যসিদ্ধি করিয়া হয়তো আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন; কিন্তু বিধাতার অদৃশ্য হস্ত তখন তাঁহার ভাবী জীবন অন্যরূপে গড়িতেছিল। শ্রীমায়ের প্রতি হৃদয়ের দুর্ব্যবহার এই প্রথম নহে! আর একদিন তাঁহার অনুরূপ

ব্যবহার দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—"ওরে, হৃদে (নিজ দেহ দেখাইয়া) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিস নি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস ; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।" হৃদয়ের অভিমান-কঠিন মনে সে সাবধানতা-বাণী দাগ বসাইতে পারে নাই, সুতরাং দৈবনির্বন্ধে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া মায়ের পুনরাগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইল। শ্রীযুক্ত মথুরানাথের পুত্র ত্রৈলোক্যবাবুর কন্যাকে কুমারী-রূপে পূজা করার অপরাধে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) হৃদয় মন্দিরোদ্যান হইতে বিতাড়িত হইলেন।

অতঃপর রামলালদাদা কালীমন্দিরের পূজারী হইলেন। ঐ পদের গর্বে আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি ভাবিলেন, "আর কি, এবার মা-কালীর পূজারী হয়েছি!" সুতরাং তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আর তেমন দেখাশোনা করিতেন না। ঠাকুরের তখন মুহুর্মুহু সমাধি হইত, কাজেই কেহ যত্ন করিয়া না খাওয়াইলে মা-কালীর প্রসাদ ঘরে পড়িয়া থাকিয়া শুকাইয়া যাইত। অথচ এমন আর কেহ ছিল না, যে আপনার বোধে তাঁহার সেবা করিতে পারে। তাই তাঁহার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হওয়ায় ঐ অঞ্চলের যে-কেহ দক্ষিণেশ্বর হইতে দেশে যাইত, তাহাকে দিয়াই তিনি শ্রীমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইতেন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য। এইরূপে কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পাইনকে দিয়া তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, "এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনদের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে—ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক ; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক—আমি দেব।" এইরূপ আহ্বান পাইয়া শ্রীমা অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন (মাঘ বা ফাল্গুন, ১২৮৮)। এক বৎসর পরে এই তাঁহার পঞ্চমবার আগমন।

ইহার পরে পিত্রালয়ে যাইয়া শ্রীমা সাত-আট মাস ছিলেন। অনন্তর ১২৯০ সনের মাঘ মাসে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এই সময়েই ভাবের ঘোরে পড়িয়া যাওয়ায় ঠাকুরের বাম হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় এবং খুব কষ্ট হইতে থাকে। শ্রীমা আসিয়া ঠাকুরের ঘরে কাপড়ের পুটুলিটি রাখিয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে রওনা হয়েছ?" শ্রীমায়ের উত্তরে ঠাকুর যেই জানিলেন যে, তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছিলেন, অমনি বলিলেন, "এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও, যাত্রা বদলে এসগে।" শ্রীমা সেইদিনই ফিরিতে চাহিলে

ঠাকুর বলিলেন, "আজ থাক, কাল যেও।" পরদিনই শ্রীমা যাত্রা বদলাইতে দেশে গেলেন।

ইহার পরে শ্রীমা কবে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং কবে দেশে যান, তাহা অনিশ্চিত। তবে ইহা জানা আছে যে, ১২৯১ সনে ভাসুর পুত্র রামলালের বিবাহে তিনি কামারপুকুরে যান এবং ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসান পর্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সম্ভবতঃ আর দেশে যান নাই—বাকি কয় বৎসর দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে কাটাইয়াছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত কয়েকবার ছাড়া অন্য সময়েও শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কেন না সাধনকালের অবসান হইতে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর চাতুর্মাস্যের সময় যখন দেশে যাইতেন, তখন শ্রীমাও সম্ভবতঃ সঙ্গে থাকিতেন। সাধনকালে অনিয়মাদিবশতঃ ঠাকুরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; সুতরাং পল্লীগ্রামের মুক্ত বাতাস ও স্বচ্ছন্দ আহার-বিহারে দেহের উন্নতি হইবে বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে ঐ সময় দেশে যাইতে পরামর্শ দিতেন। ঘাটাল পর্যন্ত স্টীমার চলাচল আরম্ভ হইলে তিনি শ্রীমা ও হৃদয়কে লইয়া একবার ঐ পথে দেশে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঘাটালের স্টীমারে যাইয়া তাঁহারা সম্ভবতঃ বন্দর নামক স্থানে অবতরণান্তে নৌকাযোগে কামারপুকুরে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বালিদেওয়ানগঞ্জে উপনীত হন। সেখানে অনেক গোস্বামীর বাস ছিল। গ্রামের জনৈক মোদকের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার নবনির্মিত গৃহে কোন সাধুকে ত্রিরাত্র রাখিবেন। ঠাকুর ও শ্রীমায়ের তথায় আগমনের পর এমন অবিরাম বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল যে, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া মোদকভবনে তিন রাত্রি কাটাইতে হইল। চতুর্থ দিনে তাঁহারা কামারপুকুর না যাইয়া শিহড়ে গেলেন। এই বারেই ঠাকুর শিহড়ে ও শ্যামবাজারে অপূর্ব সংকীর্তনে যোগ দিয়া সকলকে হরিনামে মাতাইয়াছিলেন।[১]

ঠাকুর জয়রামবাটিতেও বহুবার গিয়াছিলেন। কামারপুকুরে গেলেই

১ কোন কোন গ্রন্থে বালি-দেওয়ানগঞ্জ বালি বা দেওয়ানগঞ্জ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিহড়, শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানে কীর্তনের সময়নির্দেশ সম্বন্ধে 'কথামৃত', ৫ম ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা হইতে জানা যায় যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে আট মাস ছিলেন—৩ মার্চ, বুধবার হইতে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে শিহড়, শ্যামবাজার ও কয়াপাটে কীর্তনাদি হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার সময় তিনি কোতুলপুরে ভদ্রদের বাড়িতে সপ্তমী পূজার আরতি দেখিয়াছিলেন। রাস্তায় কেশবের প্রেরিত ব্রাহ্ম ভক্তের সহিত দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরকে কয়মাস দেখেন নাই বলিয়া কেশব চিন্তিত ছিলেন, তাই ব্রাহ্ম ভক্তকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহাকে শিহড়ে লইয়া যাওয়া হইত। ঐ সময় পথে জয়রামবাটীতে কোন কোন বারে তিনি আট-দশ দিনও থাকিয়া যাইতেন। একবার শ্বশুরালয়ে অবস্থান-কালে রাত্রে যখন সকলে আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন, তখন ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া বলিলেন, "বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" বাড়ির স্ত্রীলোকেরা ভাবিয়া আকুল, কি খাইতে দিবেন, কারণ সেদিন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা ঐরূপ কোন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে গৃহে বহু লোকের সমাগম হওয়ায় খাদ্যাদি নিঃশেষিত হইয়াছিল। কেবল হাঁড়িতে কিছু পান্তা ভাত ছিল। শ্রীমা ঠাকুরকে সভয়ে উহা জানাইলে তিনি বলিলেন, "তাই নিয়ে এস।" শ্রীমা বলিলেন, "কিন্তু তরকারি তো নাই।" ঠাকুর কহিলেন, "দেখ না খুঁজে পেতে; তোমরা 'মাছ-চাটুই' করেছিল তো? দেখ না তার একটু আছে কি না?" শ্রীমা অনুসন্ধানে দেখিলেন, ঐ পাত্রে একটি ক্ষুদ্র মৌরলা মাছ ও একটু ঘন রস আছে। অগত্যা তাহাই আনিলেন। দেখিয়া ঠাকুরের কী আনন্দ! সেই রাত্রে পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন এবং ঐ ক্ষুদ্র মৎস্যের সাহায্যে এক রেক[১] চালের ভাত খাইয়া শান্ত হইলেন।

কামারপুকুর বা জয়রামবাটী হইতে শ্রীমা সাধারণতঃ পদব্রজেই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একবার কোন পর্ব উপলক্ষে কয়েকজন পল্লীরমণী গঙ্গাস্নানার্থ কলিকাতা যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীমাও কামারপুকুর হইতে লক্ষ্মীদিদি, শিবুদা প্রভৃতিকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলেন—তাঁহার মনের ভাব এই যে, গ্রাম-বাসিনীরা ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যাইবেন। কামারপুকুর হইতে চার ক্রোশ দূরে আরামবাগে পৌঁছিয়া অবশিষ্ট দিন সেখানেই কাটাইবার কথা ছিল; কারণ সম্মুখেই নরহন্তাদের বসতি বলিয়া কুখ্যাত পঞ্চক্রোশব্যাপী তেলোভেলোর মাঠ। উহার মধ্যভাগে এখনও এক ভীষণ 'কালীমূর্তি' আছে—দস্যুগণ লুণ্ঠনাদিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই ডাকাতে-কালী পূজা করিত। ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ না হইয়া কেহ ঐ ভীষণ মাঠ অতিক্রম করিত না। আলোচ্য দিনে শ্রীমায়ের সঙ্গীরা আরামবাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সন্ধ্যার যথেষ্ট বিলম্ব আছে—একটু দ্রুত চলিলে সেইদিনই এই বিপদসঙ্কুল প্রান্তর অতিক্রমপূর্বক তারকেশ্বরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। অতএব বিশ্রাম না করিয়া আরও অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল। শ্রীমা বাল্যকাল হইতেই পরের অসুবিধা সৃষ্টি না করার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। প্রয়োজনস্থলে অপরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি স্বয়ং কষ্ট বরণ করিতেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাঁহার ক্লান্ত দেহ ও কোমল পদদ্বয় আবার ঐ দীর্ঘ পথ চলিতে সক্ষম নহে জানিয়াও তিনি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অল্প কিছু দূর হাঁটার পরেই অক্ষমতাবশতঃ তাঁহার

১ চাউল মাপিবার বেতের তৈয়ারী পাত্র।

গতি মন্দীভূত হইতে থাকিল। সঙ্গীরা দুই-চারিবার তাঁহার জন্য পথে অপেক্ষা করিল ; কিন্তু পরে যখন বুঝিল যে, এইরূপ মন্থর গতিতে চলিলে সন্ধ্যার পূর্বে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রাণহানির সম্ভাবনা, বিশেষতঃ শ্রীমা যখন সাহসভরে সকলকে তাঁহার জন্য কোনপ্রকার দুশ্চিন্তা না করিয়া দ্রুত তারকেশ্বরে চলিয়া যাইতে বলিলেন, তখন তাহারা আর অপেক্ষা করিল না।

অস্তাচলগামী সূর্যের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন উচ্চ তালবৃক্ষের মস্তক হইতে সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া নামিয়া আসিয়া প্রান্তরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, তখনও সেই জনবসতিহীন অচিন্ত্য বিপদের আবাসস্থল প্রান্তরের অজানা পথে একাকী চলিতে চলিতে শ্রীমা বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, এমন সময় দেখিলেন, প্রান্তরের একস্থলে এক দীর্ঘাবয়ব মূর্তি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঐ মূর্তি নিকটে আসিতেই দেখা গেল, তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, স্কন্ধে দীর্ঘ যষ্টি, হস্তদ্বয়ে রৌপ্য বলয় এবং কেশরাশি নিবিড় ও কুঞ্চিত। শ্রীমায়ের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে দস্যু ; সুতরাং তিনি ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটি সম্ভবতঃ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আরও ভয়োৎপাদনের জন্য রুক্ষস্বরে বলিল, "কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কোথা যাবে?" শ্রীমা বলিলেন, 'পুবে'। আগত ব্যক্তি তেমনি কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "সে এ পথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।" শ্রীমা তখনও স্থাণুবৎ অচল, আর লোকটিও খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মায়ের শ্রীমুখ দেখিয়া অকস্মাৎ সেই নরঘাতকের মনে যেন কি এক পরিবর্তন আসিল, সে মায়ের দিকে তাকাইয়া নরম সুরে বলিল, "ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পিছিয়ে পড়েছে।" এতক্ষণে শ্রীমায়ের দৃষ্টি সম্মুখস্থ বিপদকে ছাড়িয়া আরও দূরে ধাবিত হইলে তিনি দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক সত্যই সেদিকে আসিতেছে। তখন তিনি ভরসা পাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধ হয় পথ ভুলেছি ; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদর যত্ন করবেন।" ঐ কথা শেষ হইতে না হইতেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পড়িল এবং শ্রীমা বিশ্বাস ও স্নেহভরে তাহার হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম ; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারি নে।"

সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগদী-জাতীয় এই দস্যুদম্পতির প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা

সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলিয়া সত্যসত্যই তাঁহাকে নিজ কন্যার ন্যায় দেখিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল এবং তিনি ক্লান্ত বলিয়া আর তাঁহাকে চলিতে না দিয়া নিকটবর্তী গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজের বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিল ও পুরুষটি দোকান হইতে মুড়িমুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল, পরে পিতামাতার মতন আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল, এবং বাগদী পাইক সারা রাত্রি যষ্ঠি-হস্তে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিল। অবশেষে ভোরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বরের পথে চলিতে চলিতে বাগদী-মা ক্ষেত হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া সস্নেহে শ্রীমায়ের হাতে দিতে লাগিল এবং তিনিও ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সে স্নেহের দান স্বীকারপূর্বক খাইতে খাইতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা তারকেশ্বরে যখন পেঁাছিলেন, তখন বেলা চারিদণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতএব একটি চটিতে আশ্রয় লইয়াই বাগদিনী তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায় নি ; বাবা তারকনাথের পূজা শীগগির সেরে বাজার থেকে মাছ তরকারি নিয়ে এস, আজ তাকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।"

পুরুষটি ঐসব কাজে চলিয়া গেলে শ্রীমায়ের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পেঁাছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। তারপর তিনি তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাত্রী বাগদী-মাতার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "এরা এসে আমাকে রক্ষা না করলে কাল রাত্রে যে কি করতুম বলতে পারি না।"[১] কামারপুকুর হইতে আগত, অমার্জিতবুদ্ধি, জাতিবিচারের কুজ্ঝটিকায়

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' (দিব্যভাব, ২৬০-৬৪ পৃঃ) এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' (১ম খণ্ড, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)। এই গ্রন্থদ্বয়ের যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া আমরা ইহা লিখিলাম। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় আছে—"আমি একেবারে একলা ছিলুম তা ঠিক নয়। আমার সঙ্গে আরও দুইজন বুড়ো গোছের স্ত্রীলোক ছিলেন—আমরা তিনজনেই পিছিয়ে পড়েছিলুম।" স্বামী ঈশানানন্দের সম্মুখে অপর কেহ কেহ একদিন শ্রীমায়ের নিকট ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া এই কথার সমর্থন পান নাই। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে পাশ কাটাইয়া গেলেন। পরে ঈশানানন্দকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, "দেখ দিকি, বার বার ডাকাতের গল্প। আমি বলতে চাই না। লক্ষ্মী, শিবু ওরা সব সঙ্গে থেকে ফেলে গেল। এখন ঐ কথা উঠলে তারা মনস্তাপ করে, সঙ্কোচ হয়। আর হাজার হোক একটা অন্যায় করে ফেলেছে। আমারই তো ভাসুরপো, ভাসুরঝি, আমি সকলের কাছে ঐ কথা বার বার বললে তাদের অপমান হয়। সেজন্য আমি চেপে যাই। ওরা বুঝতে পারে না। বার বার জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়।" বস্তুতঃ সেদিন শ্রীমা অপর সাথী থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গেও' সঙ্গিনী থাকার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু ডাকাত-দম্পতির সহিত মিলনের পরে অপর কাহারও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা কোন গ্রন্থে বা মৌখিক বিবরণে পাই নাই। দুইজন বুড়ো থাকিলে তাঁহারা গেলেন কোথায়?—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর এ যাবৎ কেহ দেন নাই।

সমাচ্ছন্ন, সরল পল্লীবাসীরা শ্রীমায়ের সে কাহিনী কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল জানি না। বিগত দিবা ও রাত্রের মিলনসময়ে যে দৈব স্নেহলীলা সংঘটিত হইল এবং নিশাগমে অতি নিম্নজাতীয় দস্যুদম্পতির সহিত প্রান্তরে মিলিতা, অপরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যা সারদামণির যে আত্মীয়বৎ ব্যবহার ও অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসম্পর্ক সংস্থাপিত হইল, গ্রামবাসীরা তাহার তাৎপর্য কতটুকু ধারণা করিতে পারিল, তাহাও আমরা অবগত নহি। অথবা বিকাশোন্মুখ সুপবিত্র মাতৃত্বশক্তি এবং দস্যুর নিষ্ঠুরতার সংঘর্ষস্থলে মাতৃত্ব কিরূপে বিজয়লাভ করিল, আলো-আঁধারের সংগ্রামে আলোর প্রভুত্বই কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভবিষ্যৎ মানবকে নূতন আশাপথের সন্ধান দিল, তাহার ইঙ্গিত অশিক্ষিত গ্রাম্যমনে উদ্ভাসিত হইল কিনা, তাহারও দ্যোতনা আমরা পাই না। আমরা নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে এইটুকু শুধু দেখিতে পাই যে, শ্রীমায়ের ডাকাত বাবা ও মা এবং কামারপুকুরের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সেদিন তারকেশ্বরের শিবমন্দির-সন্নিকটে একই পরিবারভুক্ত নরনারীর মতো আহ্লাদসহকারে রন্ধন ও ভোজনাদি সমাপ্ত করিলেন এবং তারপর বৈদ্যবাটী অভিমুখে রওনা হইলেন।

একরাত্রের মধ্যেই শ্রীমা ও তাঁহার ডাকাত পিতামাতা পরস্পরকে এত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, বিদায়কালে তিনজনেরই চক্ষে অজস্র অশ্রু ঝরিতে থাকিল। অনেক দূর পর্যন্ত শ্রীমাকে আগাইয়া দিতে দিতে বাগদী-রমণী ক্ষেত্র হইতে অনেকগুলি কড়াইশুঁটি তুলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে উহা তাঁহার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস।" অবশেষে শ্রীমা দস্যু-পিতামাতাকে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার কথা স্বীকার করাইয়া কোনপ্রকারে তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন। এই অঙ্গীকার বাগদী-দম্পতি রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা নানাবিধ দ্রব্য লইয়া শ্রীমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহার ও আদর আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

সমস্ত ঘটনাটি ভক্তদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া শ্রীমা একটি অর্থপূর্ণ কথায় উহা শেষ করিয়াছিলেন—"এমন সরল ও সচ্চরিত্র হলেও আমার ডাকাত-বাবা আগে কখনো কখনো ডাকাতি যে করেছিল, একথা কিন্তু আমার মনে হয়।" অর্থাৎ তেলোভেলোর মাঠের সন্ধ্যাকালীন সেই লোমহর্ষণ ঘটনাটিকে তিনি কোনদিনই একটা সাধারণ ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

দস্যুবৃত্তিপরায়ণ ডাকাত-দম্পতির কঠোর মন কেমন করিয়া যে এতটা দ্রবীভূত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য। হয়তো শ্রীমায়ের

অনন্যসাধারণ সরলতা ও অশ্রুতপূর্ব পবিত্রতাই তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল, হয়তো বা ইহার পশ্চাতে কোন দৈবী শক্তিও ছিল। এই দ্বিতীয় কল্পনা ভিত্তিহীন নহে; কারণ শ্রীমা কথাচ্ছলে কোন কোন ভক্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভক্তেরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন—তিনি একবার বাগদী-দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?" তাহারা উত্তর দিয়াছিল, "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখেছি।" মা বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি গো, তোমরা এটা কি দেখলে?" তাহারা ইহাতে নিরস্ত না হইয়া বিশ্বাসপূর্ণ অনুযোগসহকারে বলিল, "না, মা, আমরা সত্যই দেখেছি, আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করছ।" শ্রীমা উদাসীনভাবে বলিয়া গেলেন, "কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।"[১]

১ শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত 'শ্রীমা' গ্রন্থে (৩১-৩২ পৃঃ) ডাকাতের ঘটনার শেষাংশ এইভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—শ্রীমা বলিতেছেন, "লোকটা জাতে বাগদী, ডাকাতের মতো রুক্ষ কথায় জিজ্ঞেস করলে, 'তুই কে?' আর আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।" যাঁহার সহিত শ্রীমায়ের কথা হইতেছিল সেই ভক্ত মায়ের কথা শুনিয়া জানিতে চাহিলেন, "ডাকাত আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছিল?" শ্রীমা—"পরে বলেছিল, কালীরূপে নাকি দেখেছিল।" ভক্ত—"তাহলে আপনি তাকে কালীরূপে দেখা দিয়েছিলেন? লুকোবেন না, মা, বলুন।" শ্রীমা—"আমি কেন দেখাতে যাব? সে বললে, সে দেখেছে।" ভক্ত—"তা হলেই হলো—আপনি দেখিয়েছিলেন।" শ্রীমা (সহাস্যে)—"তা তুমি যাই বল না কেন?"

বিন্দুবাসিনী

শ্রীমাকে আমরা পূর্বে যখনই কামারপুকুর এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার শাশুড়ী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, মধ্যম-জা, অথবা ভাগিনের হৃদয় প্রভৃতি তাঁহার গতিবিধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যতই নিবিড় হউক না কেন, উহার বহিঃপ্রকাশে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল। বর্তমানে আমরা সে দৈব সম্পর্ককে পাইব তাদৃশ সঙ্কোচ হইতে মুক্ত, স্বাধীন সৌন্দর্যবিলাসমধ্যে; অথচ সে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোন ফেনিলতা নাই, কোন উদ্বেলতা নাই। তাঁহার প্রতি গতিভঙ্গি ধীর, স্থির, স্বচ্ছ, নয়নাভিরাম চাকচিক্যময়। এই স্বাধীনতার মধ্যেও লজ্জাপটাবৃতা পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীমায়ের সাত্ত্বিক ক্রিয়াবলী কি অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

দক্ষিণেশ্বরে শম্ভু মল্লিকের নির্মিত গৃহে শ্রীমায়ের অবস্থানকালের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার তথাকার অবশিষ্ট জীবন অল্পায়তন নহবতেই কাটিয়াছিল। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সে বড়ই কষ্টের জীবন; শ্রীমায়ের বিভিন্ন সময়ের উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নবতখানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হতো। তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। কখনো কখনো একাও ছিলুম। ... মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরী-দাসী, এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না হতো। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিন রাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। প্রথম প্রথম (নহবতের) ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটা-সোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো'।

রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নিচের একটু খালি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙি মাছের ঝোল হতো কি না। শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগ ধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল।[১] দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম 'হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম'! আর ঐ মেছুনীরা ছিল আমার সংগী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত, আমার সংগে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম।"

শ্রীমা নহবতের নিচের ঘরে থাকিতেন এবং সিঁড়ির নিচে রান্না করিতেন।[২] তিনি দিবাভাগে বাহিরে আসিতেন না। নহবতে তাঁহার দৈনিক কার্যধারা শ্রীযুক্তা যোগীন-মা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, "শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন—ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এর পরে বাকি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান এতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নিচে রান্না করতে বসতেন। রান্না হলে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন, মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরে এলেন কিনা। তিনি তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তার পরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়। একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তাঁর ভাবসমাধি আসা অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, আর কারও সে সাধ্য ছিল না। ঠাকুরের খাওয়া হলে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন করে গান গাইতেন; তা খুব সাবধানে, যেন কেউ না শুনতে পায়। এর পরে কলের সেই একটার বাঁশি বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের মা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি বলতেন, তাই শুনে তিনি খেতে বসতেন।

১ অনেক পরে যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীমায়ের কষ্ট বুঝিতে পারেন এবং এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। তখন নহবতের নিকট শৌচের স্থান করা হয়। শ্রীমা একটু পেট-রোগা ছিলেন।

২ স্ত্রীভক্তের সংখ্যা অধিক হইলে তাঁহারা উপরের ঘরে শুইতেন।

সুতরাং দেড়টা দুটোর আগে কোন দিনই মায়ের খাওয়া হতো না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ। তারপর আলো-টালো ঠিক করে তোলা জলে নমো নমো করে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুর-দেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এর পরে রাত্রের রান্না; সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে শুয়ে পড়তেন।"

একদিন অন্ধকারে স্নানের জন্য সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় নামিতে গিয়া তিনি এক কুমিরের গায়ে প্রায় পা দিয়াছিলেন। কুমিরটা সিঁড়ির উপর শুইয়াছিল। শ্রীমায়ের পদশব্দ শুনিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। তদবধি তিনি আলো না লইয়া স্নানে যাইতেন না।

শ্রীমায়ের কিন্তু এই সব ক্লেশ বা অসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছিল না। উত্তরকালে সব কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াও তিনি ভক্তদিগকে বলিতেন, "তবু আর কোনও কষ্ট জানি নি।...তাঁর সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।" কেহ হয়তো ভাবিবেন, এই আনন্দে থাকার মধ্যে শ্রীমায়ের কোন কৃতিত্ব নাই, কারণ যে আনন্দময় পুরুষের আকর্ষণে দূর-দূরান্তর হইতে আগত স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তবৃন্দ তাঁহার কথামৃতপানে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা এককালে ভুলিয়া দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরেই থাকিয়া যাইত, তাঁহার নিকটে অবস্থান তো সৌভাগ্যের কথা। এই প্রকার যুক্তি-সম্বলিত চিন্তাধারা আপাততঃ যতই চমৎকার মনে হউক না কেন, বাস্তব জীবনে কয়জন এইরূপ আকর্ষণ বোধ করেন, ঠাকুরের লীলাকালেই বা কয়জন এই রসের মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং রসজ্ঞদের কয়জন এইভাবে দিন-রাত দক্ষিণেশ্বরে পড়িয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, পতিগতপ্রাণা শ্রীমায়ের ভাগ্যে অনেক সময় পতিসন্দর্শন পর্যন্ত ঘটিত না। তিনি বলিয়াছেন, "কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।" সুদীর্ঘকাল একই স্থানে দাঁড়াইয়া এক ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসন্দর্শনে আনন্দোপভোগ করিতে গেলে দর্শকের অন্তরকে কোন্ পবিত্র সাত্ত্বিক স্তরে তুলিয়া রাখিতে হয়, তাহা পাঠক একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? শ্রীমায়ের দেহখানি তখন দূরে পড়িয়া থাকিলেও মন সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন ঠাকুরের নিকট কত ভক্ত আসিতেন; নাচ, গান, কীর্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই চলিত। মা ঐ সব দেখিতেন, শুনিতেন, আর ভাবিতেন, "আমি যদি ঐ ভক্তদের

মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।" একদিকে স্বতন্ত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ জগন্মাতা; একদিকে লীলাবিলাস, অপরদিকে সতৃষ্ণ নিরীক্ষণ—ইহা এক অপূর্ব চিত্র! এই সুখদুঃখমিশ্রিত, নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে অতিবাহিত জীবনের সমস্ত সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলিয়া শ্রীমায়ের হৃদয়ে শুধু এই স্মৃতিটুকুই সর্বদা জাগিয়া থাকিত, "কি আনন্দেই ছিলুম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট-বাজার বসে যেত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য মায়ের প্রতি উদাসীন ছিলেন না; বরং তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। চারিদিকে দরমাঘেরা অতি ক্ষুদ্র কক্ষখানিকে তিনি খাঁচা আখ্যা দিয়াছিলেন। এই খাঁচায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীও মাঝে মাঝে থাকিতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাদিগকে শুক ও সারী বলিতেন। মা-কালীর প্রসাদ ঠাকুরের ঘরে নামিলে তিনি রামলালদাদাকে বলিতেন, "ওরে, খাঁচায় শুক-সারী আছে; ফলমূল, ছোলা-টোলা কিছু দিয়ে আয়।" অপরিচিত লোকেরা ভাবিত সত্যই পাখি আছে; মাস্টারমহাশয় পর্যন্ত প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মীদিদির অনুপস্থিতকালে শ্রীমায়ের পায়ের বাত ও সঙ্গিনীহীন জীবন ঠাকুরকে খুবই ভাবাইয়া তুলিত। তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন, "বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।" শুধু এইখানেই নিবৃত্ত না হইয়া দ্বিপ্রহরে আহারের পর মন্দিরোদ্যান জনশূন্য হইলে তিনি তাঁহাকে কালীবাটীর খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া কিছুকাল নিকটবর্তী পাঁড়েগিন্নিদের বাড়িতে বেড়াইয়া আসিতে বলিতেন। সেখানে আলাপাদি করিয়া আরতির পরে পঞ্চবটী নির্জন হইলে শ্রীমা আবার নহবতে ফিরিতেন।

শ্রীমায়ের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা লৌকিক আচারে প্রকাশের জন্যই যেন ঠাকুর কখনো কখনো রহস্যাভিনয় করিতেন। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও জনৈক ভক্তের মধ্যে কাহার বর্ণ উজ্জ্বলতর, এই বিষয়ে বিতর্ক উঠিলে শ্রীমাকেই মধ্যস্থ সাব্যস্ত করা হইল। ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়া রাখিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন ঠাকুরের ঘর হইতে পঞ্চবটীর দিকে হাঁটিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের বর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণ তখন তপ্তকাঞ্চনসদৃশ—বাহুর স্বর্ণকবচের সহিত মিশিয়া যায়। শ্রীমা তথাপি নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় রায় দিলেন, অপর ব্যক্তিই কিছু অধিক ফরসা।[১]

১ একদিন এক বালক ভক্ত শ্রীমাকে বলে যে, স্বামী সারদানন্দজীর মতে ঠাকুর খুব ফরসা ও সুন্দর ছিলেন না। ইহাতে শ্রীমা বলেন, "শরৎ কি জানে? ওরা ঠাকুরকে কবে

বস্তুতঃ এই দেবদম্পতির প্রেম প্রবাহ উভয়কূল প্রসারী ছিল; শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মায়ের যতটা টান ছিল, মায়ের প্রতি ঠাকুরের টানও তদপেক্ষা কম ছিল না। শ্রীযুক্তা গৌরী-মা একবার বলিয়াছিলেন, "এই যে দুজনের মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে থেকেও কখনো কখনো ছ-মাসেও হয়তো একদিন দেখা নাই, তবু দুজনে ভাবই ছিল কত!" একবার মায়ের মাথা ধরিলে ঠাকুর বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন, "ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে?"

সারাদিন কর্মতৎপরা শ্রীমায়ের কর্তব্যভার যাহাতে অযথা বর্ধিত না হয়, সেদিকে ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। একবার সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে শ্রীযুক্ত রাখালকে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি অকস্মাৎ প্রেতাত্মাদের দেখা পান। ভূতদের নিকট ঠাকুরের পবিত্র হাওয়া অসহ্য হওয়ায় তাহারা তাঁহাকে উদ্যান ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করে। সে রাত্রি উদ্যানে কাটাইবার কথা ছিল; কিন্তু প্রেতদের আকুলতায় ঠাকুর তখনই গাড়ি ডাকাইয়া কালী-বাড়িতে ফিরিলেন এবং অধিক রাত্রি হইলেও ফটক খোলাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। এদিকে সেবার্থে সদা উদ্‌গ্রীব শ্রীমা সাড়া পাইয়া শশব্যস্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং আহারাদির কোন ব্যবস্থা না থাকায় উৎকণ্ঠিতস্বরে ঝিকে বলিলেন, "ও যদুর মা, কি হবে?" নহবতে কথা হইতেছিল, সতর্ক ঠাকুর শুনিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।"

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শ্রীমায়ের ভরণপোষণের চিন্তাও ঠাকুরের মনে উঠিত। তিনি অত ত্যাগী হইলেও একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক-টাকা হলে হাত-খরচ চলে?" মা বলিলেন, "এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।" তারপর প্রশ্ন করিলেন, "বিকেলে কখানা রুটি খাও?" মা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন, খাবার কথা কি করিয়া বলেন? এদিকে ঠাকুরেরও প্রশ্নের বিরতি নাই। তখন তিনি বলিলেন, "এই পাঁচ-ছখানা খাই।" ঠাকুর খরচের পরিমাণ হিসাব করিয়া বলিলেন, "তাহলে পাঁচ-ছয় টাকায় তোমার খুব চলে যাবে।" পরে ঐ পরিমাণ টাকা তিনি বলরামবাবুর নিকট গচ্ছিত রাখেন। বলরামবাবু ঐ টাকা জমিদারিতে খাটাইয়া ছয় মাস অন্তর ৩০ টাকা সুদ শ্রীমাকে পাঠাইয়া দিতেন।

ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, আত্মভাবে বিভোর ঠাকুরের দৃষ্টি কতদিকেই না প্রসারিত থাকিত; আবার সর্বদা আজ্ঞাপালনে তৎপর ভক্তবৃন্দে পরিবৃত

দেখেছে? যখন তিনি নিজের রূপ ভেতরে সংবরণ করেছিলেন, তখন তারা দেখেছে। লোকে নরেনের রূপ দেখেই ফেটে মরে; যদি ঠাকুরের আগের রূপ দেখত তো পাগল হয়ে যেত।"

থাকিয়া এবং স্বয়ং ঈশ্বররূপে পূজিত হইয়াও তিনি অপরের ব্যক্তিগত সম্মান ও স্বাধীনতার মর্যাদা কিরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন! শ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার সৌজন্যের দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীমায়ের কথাতেই পাই, "আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে, তিনি কখনো আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেননি। ঠাকুর আমাকে কখনো ফুলটি দিয়েও ঘা দেননি; কখনো 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি।" শ্রীমা একদিন দক্ষিণেশ্বরে সরুচাকলি ও সুজির পায়েস প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ঘরে দিতে গেলেন। খাদ্যগুলি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মীদিদি খাবার দিয়া গেলেন মনে করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।" শ্রীমা বলিলেন, "হাঁ, দরজা ভেজিয়ে রাখলুম।" ঠাকুর শ্রীমায়ের গলার স্বর বুঝিতে পারিয়াই সংকুচিত হইয়া বলিলেন, "আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী, কিছু মনে করো না।" অজ্ঞাতসারে 'দিয়ে যাস' বলিয়াই তাঁহার এত সংকোচ! পরদিন পর্যন্ত নহবতের সামনে গিয়া তিনি শ্রীমাকে বলিলেন, "দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি, ভেবে ভেবে--কেন এমন রূঢ় বাক্য বলে ফেললুম।" স্ত্রীলোকমাত্রে 'জগদম্বার মূর্তিদর্শনকারী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে কত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একদিন ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমা তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিবার পর তিনি আবার শ্রীমাকে নমস্কার করেন। অন্য আর এক ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন, "আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে (শ্রীমাকে) জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে; আর যাওয়া হলো না" ('কথামৃত')।

এইরূপে শ্রীমাকে সর্বদা সম্মানের চক্ষে দেখিলেও, এবং তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিলেও ঠাকুর জানিতেন যে, উভয়ের মধ্যে বয়স ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য অনেক। বিশেষতঃ শ্রীমাকে লোকব্যবহার ও সাধন-ভজনাদি শিক্ষা দিবার অন্য কেহ না থাকায় ঠাকুর স্বয়ং সে কর্তব্য নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। একবার মা যখন দেশে যাইতেছিলেন তখন ঠাকুর বলিয়া দেন, "পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভাব রাখবে। অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে।" শ্রীমাকে তিনি শিখাইতেন, "কর্ম করতে হয়; মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই; বসে থাকলে নানারকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা—সব আসে।" একদিনের কথা শ্রীমা বলিয়াছেন, "(ঠাকুর) কতকগুলি পাট এনে আমায় দিয়ে বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমায় শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁশোগুলি দিয়ে থান ফেড়ে বালিশ করলুম। চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁশোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো, এখন এই সবে (খাট বিছানায়) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না, মা।"

স্বভাবগুণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রভাবে শ্রীমা সত্য সত্যই 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন', এই উক্তিটি জীবনের প্রতিকার্যে এতই প্রতিফলিত করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরও একদিন সবিস্ময়ে ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ওরে, হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কে জানে—এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দে করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে। তা, ও কিন্তু এমন যে, কখন কি করে কেউ টের পায় না, বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।" ঠাকুর তো ঐ কথা প্রশংসাচ্ছলেই বলিলেন কিন্তু শোনা অবধি শ্রীমা এই ভাবনায় পড়িলেন, "ওমা, তিনি তো যা চান, তাই 'মা' ওঁকে দেখিয়ে দেন এইবার বাইরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি।" তাই তিনি ব্যাকুল হইয়া জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিলেন, "মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর।" জগদম্বা সে প্রার্থনা শুনিয়া তাঁকে এমনই সন্তর্পণে রাখিতেন যে, দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াও তিনি কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। তাই মন্দিরের খাজাঞ্চী একদিন তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি।"

শ্রীমা লজ্জাশীলা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ মতানুবর্তিনী হইলেও এক বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীনতা অটুট রাখিতেন—সেটি তাঁহার মাতৃত্বের এলাকা। এই সম্বন্ধে আমাদিগকে পরে অনেক ঘটনার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। আপাততঃ তিনটির উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমায়ের সঙ্গিনী তখন অতি অল্প; কখনো ধীবর-রমণীরা আসিত, একজন ঝিও কিছুদিন ছিল। আর কলিকাতা হইতে কেহ কেহ আসিতেন। ভক্তসংখ্যা তখনও তেমন বাড়ে নাই। সেই সময়ে এক বৃদ্ধা শ্রীমায়ের নিকট আসিত। যৌবনে সে অনেক দুষ্কর্ম করিলেও ঐ কালে সে হরিনাম করিত এবং একাই মায়ের নিকট আসিত। শ্রীমা তাহার সহিত কথা বলিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, "ওটাকে এখানে কেন?" মা বলিলেন, "ও এখন ভাল কথাই তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কি?" মা জানিতেন যে, মানুষের মনোভাব সর্বদা একরূপ থাকে না—মন্দ ব্যক্তিও ক্রমে উত্তম হইতে পারে। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে বলিয়া দিত যে, মন্দ লোক আসিয়া অসৎ আলোচনা করিতে পারে; শ্রীমাকে তাহা হইতে রক্ষা করা উচিত। শুধু কি তাই? এইরূপ ব্যক্তির সহিত গল্পগুজব করা আগন্তুক সাংসারিক লোকের দৃষ্টিতে বিসদৃশ। তাই তিনি বলিলেন, "ছি ছি! বেশ্যা! ওর সঙ্গে কি কথা? শত হোক, রাম, রাম!" শ্রীমা ঠাকুরের সতর্কবাণীর তাৎপর্য পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, বৃদ্ধার অতীত জীবন যাহাই হোক না কেন, এখন সে ধর্মপথেই চলিতেছে এবং মাতৃজ্ঞানেই তাঁহার নিকট যাতায়াত করে;

অতএব নিরাশ্রয় ও পাপীতাপীর আশ্রয়ভূতা হইয়া তিনি শুধু লৌকিক সাবধানতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া শরণার্থিনীকে দূরে সরাইবেন কিরূপে? ফলতঃ ঠাকুরের আপত্তির পরেও পূর্ববৎ আলাপাদি চলিতে লাগিল; শ্রীশ্রীঠাকুরও মায়ের মনোভাব বুঝিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

ইহারও পরে ভক্তসমাগম আরম্ভ হইয়াছে; শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ফল-মিষ্ট প্রভৃতি যথেষ্ট আসে, আর তিনিও ইহা নহবতে পাঠাইয়া দেন। শ্রীমা উহার অগ্রভাগ ঠাকুরের জন্য রাখিয়া বাকি সব ভক্ত ও পাড়ার বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। ঠাকুরের নিকট আগত বালক ভক্তগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীভক্তবৃন্দ তখন শ্রীমায়ের নিকটেও যাইতেন। মাতৃভাবে ভাবিতা তিনি তাঁহাদিগকে আদর-যত্ন করিতেন এবং ফল-মিষ্ট প্রভৃতি কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। এই বিষয়ে তিনি একটু মুক্তহস্ত ছিলেন। একদিন ঐরূপে তাঁহাকে সমস্ত দ্রব্য বিলাইয়া দিতে দেখিয়া তথায় উপস্থিত গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন, "বউ মা, আমার গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণের) জন্য কিছু রাখলে না?" মা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। ঠিক তখনই নবগোপালবাবুর স্ত্রী এক চাঙ্গারি সন্দেশ লইয়া ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিলেন এবং শ্রীমায়ের হস্তে উহা দিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। মা তবু শিখিলেন না; অথবা এই বিষয়ে তাঁহার স্বভাব পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীমায়ের এই প্রকৃতি জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই একদিন শ্রীমা কোন কাজে তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি অনুযোগের সুরে বলিলেন, "এত খরচ করলে কি ভাবে চলবে?" শুনিয়াই মা বিনা বাক্যব্যয়ে নহবতের দিকে ফিরিয়া গেলেন। তখন ঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে বলিলেন, "ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখাইয়া) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।" ইহা শ্রীমায়ের স্ফুটনোন্মুখ মাতৃত্বশক্তির নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বেচ্ছাবৃত পরাজয়।

সেই সব পুরাতন দিনের কথা একদিন শ্রীমা যোগীন-মা প্রভৃতিকে শুনাইতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে যোগীন-মার ইহা জানিবার ঔৎসুক্য জাগিল, শ্রীমা ঠাকুরের একান্ত অনুগত হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার কথা মানেন না কেন? মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা যোগেন, মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে?" পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা বাপু, যাই বল, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকেও শ্রীমা একদিন তাঁহার মনোভাব পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছিলেন। এই শেষ দৃষ্টান্তটি একদিকে যেমন স্বার্থগন্ধশূন্য সেবার চরম আদর্শ, অপর দিকে তেমনই সদ্যামুকুলিত মাতৃস্নেহ-সৌরভে ভরপুর। তখন ভক্তসমাগমে ঠাকুরের প্রকোষ্ঠ প্রায়ই পূর্ণ থাকিত। এত লোকের সম্মুখে

লজ্জাশীলা মাতাঠাকুরানীর যাওয়া সম্ভব হইত না বলিয়া রাত্রে আহারের সময় সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইত। শ্রীমা হাতে থালা লইয়া সেই ঘরে আসিতেন এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। একদিন যথা-সময়ে শ্রীমা ভোজ্যহস্তে আসিয়া সবে ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ি হইতে বারাণ্ডায় পা দিয়াছেন, এমন সময় সহসা এক মহিলা ভক্ত আসিয়া "দিন, মা, আমায় দিন", এই বলিয়া মাতাঠাকুরানীর হস্ত হইতে থালাখানি লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন এবং তখনই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন, শ্রীমাও পার্শ্বে বসিলেন। কিন্তু ঠাকুর সে অন্ন স্পর্শ করিতে পারিলেন না; শ্রীমায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি জান না? ও অমুকের ভাজ, দেওরকে নিয়ে থাকে। এখন আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে?" শ্রীমা বলিলেন, "তা জানি; আজ খাও।" ঠাকুর কিন্তু তখনো ছুঁইতে পারিলেন না; শ্রীমায়ের মিনতির উত্তরে অবশেষে বলিলেন, "আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল।" শ্রীমা করজোড়ে বলিলেন, "তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।" তখন ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া আহারে বসিলেন।

প্রাণের টান

নহবতে কার্যব্যাপৃতা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষণিক সান্নিধ্যে অথবা দূর হইতে দর্শনে পরিতৃপ্তা শ্রীমাকে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু উহা তাঁহার জীবনের একটা অবান্তর দিক মাত্র। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ছিলেন পতিসেবার জন্য; সে সেবাকে উপলক্ষ করিয়া যে আত্মতৃপ্তি হইত, উহা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তাহা হইত তবে নহবতের অশেষ কায়ক্লেশে তাঁহার মন একদিন না একদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং উহার প্রতিবিধানের উপায় অন্বেষণ করিত। প্রতিকারও এমন দুর্লভ ছিল না; কারণ দক্ষিণেশ্বরেই অদূরে শম্ভুবাবুর নির্মিত পৃথক গৃহ ছিল; আবার আপনাকে নহবতে একান্ত পিঞ্জরাবদ্ধ না রাখিলেও তেমন আপত্তি করার কেহ মন্দিরোদ্যানে ছিল না। যাহা হউক, ইহা আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে; আমরা বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীমায়ের পতিসেবার এবং তাহারই অনুগামী ভক্তসেবার অনুসরণ করিব। সেবানিরতা শ্রীমায়ের দর্শন আমরা পূর্বেও পাইয়াছি, পরেও পাইব। এখানে প্রধানতঃ ভক্তসমাগমের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠরোগের সময়ের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

শ্রীমা যতদিন না দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততদিন হৃদয়াদির উপর নির্ভর করিয়া ঠাকুরের দিন একরূপ চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সাধনার শেষে তাঁহার পরিপাকশক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈবনির্দেশে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পড়ায় এবং হৃদয়কে মন্দিরোদ্যান হইতে বিতাড়নের পর শ্রীমায়ের প্রাণ-ঢালা সেবায় ঠাকুরের শারীরিক উন্নতি হওয়ায় ঠাকুর অতঃপর অনেকাংশে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। কোন কারণে শ্রীমা অন্যত্র গেলে বালকস্বভাব ঠাকুর আপনাকে বিপন্ন মনে করিতেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনাইতে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। দেহবুদ্ধিহীন যুগাবতারের এই প্রকার লীলার তাৎপর্য মানববুদ্ধির অগম্য হইলেও শ্রীমায়ের চরিত্রানুধ্যানে অগ্রসর হইয়া আমাদের সহজেই মনে হয় যে, তাঁহার পতিসেবা সফল হইয়াছিল—সদা সমাধিমগ্ন মহামানবও সে অনুপম সেবার মর্যাদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীমা নারায়ণের পদপ্রান্তে উপবিষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদসংবাহন করিতেন, স্নানের পূর্বে তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেন, এবং দেহের অবস্থা বুঝিয়া রুচিকর ও পুষ্টিকর আহার্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। ফলতঃ আপনার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া তিনি তখন সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণময়

হইয়া গিয়াছিলেন। এই নিতান্ত তদেকশরণ্য দেবীকে ভুলিয়া থাকা সংসার-সম্পর্কশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেও বোধহয় সম্ভব ছিল না। মায়ের সেবা ও ঠাকুরের এই নির্ভরতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঠাকুর বড়ই পেটরোগা ছিলেন। শ্রীমা নহবতে আসিয়া ঠাকুরের ইচ্ছামত সুক্তা, ঝোল প্রভৃতি রাঁধিয়া দিতেন। মাসের মধ্যে যে তিন দিন উহা পারিতেন না, সে কয়দিন ঠাকুরের জন্য কালীমন্দির হইতে প্রসাদ আসিত। তাহা খাইলে ঠাকুরের অসুখ বাড়িত। তাই একদিন তিনি শ্রীমাকে বলিলেন, "দেখ, তুমি এই তিনদিন রান্না না করাতে আমার অসুখটা বেড়েছে। তুমি ও কদিন কেন রাঁধলে না?" শ্রীমা বলিলেন, "মেয়েদের অশুচির তিনদিন তারা কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।" ঠাকুর বলিলেন, "কে বললে পারে না? তুমি আমাকে দেবে, তাতে দোষ হবে না। বলতো, অশুচি তোমার শরীরের কোন্ জিনিসটা? চামড়া, না মাংস, না হাড়, না মজ্জা? দেখ মনই শুচি অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।" ইহার পর হইতে শ্রীমা প্রত্যহ রান্না করিয়া দিতেন। ঠাকুর সে রান্না খাইয়া তৃপ্তহৃদয়ে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ তো, তোমার রান্না খেয়ে আমার শরীর কেমন ভাল আছে।"

শ্রীমায়ের সেবার আর একটি বিবরণ ভক্তগণ তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দেখানো হইল। কবিরাজ জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। শিশুপ্রকৃতি ঠাকুর অমনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, জল না খেয়ে পারব?" শ্রীমাকেও জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পারবে বই কি?" ঠাকুর সাবধান করিয়া দিলেন, "বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে; দেখ যদি তোমরা পার।" শ্রীমা আশ্বাস দিলেন, "তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।" শেষে মন স্থির করিয়া জলপান ছাড়িয়া দিয়া তিনি ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে রোজ তিন-চারি সের, শেষে পাঁচ-ছয় সের পর্যন্ত দুধ দিতেন। গাই দোহাইবার যে লোকটি দুধ দিত, সে শ্রীমাকে বেশি বেশি দুধ দিয়া যাইত; বলিত, "ওখানে দিলে কালীর ভোগ বেটারা বাড়ি নিয়ে যাবে—কাকে না কাকে খাওয়াবে; আর এখানে দিলে উনি খাবেন।" তাই সে পাঁচ-ছয় সের পর্যন্ত দিয়া যাইত। শ্রীমা সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি যাহা থাকিত, ঐ ব্যক্তিকে দিতেন। তখন ঐ সকল জিনিস যথেষ্ট আসিত, তাই অভাব ছিল না। তিনি দুধ জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া এক সের, দেড় সের করিয়া ঠাকুরকে দিতেন। ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করিতেন 'কত দুধ?' তখন তিনি ঘন দুধের কথাই মনে করিয়া বলিতেন, "কত আর? এক সের, পাঁচপো হবে।" ঠাকুরের সন্দেহ দূরীভূত না হওয়ায় তিনি বলিতেন, "না, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে?" শ্রীমা তথাপি নানাভাবে বুঝাইয়া ঐ ঘন দুধ সবটাই তাঁহাকে

খাওয়াইতেন। একদিন আহারের সময় গোলাপ-মা উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, কত দুধ হবে?" গোলাপ-মা ব্যাপারটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই পাতলা দুধের পরিমাণ বলিয়া দিলেন। অমনি ঠাকুর চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, এত দুধ! তাইতো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাক, ডাক।" আহ্বান শুনিয়া শ্রীমা আসিতেই ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, 'কত দুধ?' মা পূর্বেরই ন্যায় উত্তর দিলেন, "পাঁচ-পো হবে আর কি?" ঠাকুর তবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে গোলাপ বলে এত?" মা নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন, "গোলাপ জানে না। এখানের মাপ গোলাপ জানে? ঘটিতে কত দুধ ধরে গোলাপ জানবে কি করে?" সেদিন এ পর্ব ঐখানেই শেষ হইল। কিন্তু ঠাকুর আর একদিন গোলাপ-মাকে দুধের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং গোলাপ-মাও বলিয়া ফেলিলেন, "এখানের এক বাটি আর কালীঘরের এক বাটি।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, এত দুধ? ডাক, ডাক, জিজ্ঞাসা কর"। শ্রীমা আসিতেই ঠাকুর বলিলেন, "বাটিতে কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "ক ছটাক, ক পো, অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক ছটাকের ঘটি, ক পো, অত কেন? অত হিসাব কে জানে?" ঠাকুর অনুযোগ করিলেন, "এত কি হজম হয়? তাইতো, পেটের অসুখ হবে!" বাস্তবিকই সেদিন পেটের অসুখ করিল। শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম দাস্ত হচ্ছে?" ঠাকুর বলিলেন, "পালো পালো, সাদা সাদা, একটু একটু পনর বার বাহ্যে গেলুম। তোমাদের এমন সেবা চাই না।" সেদিন আর বিকালে কিছু খাইলেন না। ভাত ইত্যাদি পড়িয়া রহিল। শ্রীমা একটু সাগু করিয়া দিলেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের শরীরের উপর মনের ক্রিয়া দেখিয়া অনুতপ্তা গোলাপ-মা শ্রীমাকে বলিলেন, "মা, বলে দিতে হয়। আমি কি জানি? তাইতো খাওয়া নষ্ট হলো।" শ্রীমা তাঁহাকে বুঝাইলেন, "খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই; আমি এই রকম করে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই।" শ্রীমা মনভুলানো কথাগুলির সত্যতার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া সেবার উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ঠাকুর সারিয়া উঠিতেছেন, শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে।

উপরের বিবরণের দুই একটি বিষয়ে একটু চিন্তা প্রয়োজন। শ্রীমা ঠাকুরকে দুধের পরিমাণ সম্বন্ধে হিসাব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই যুক্তি ঠাকুরের চিন্তাধারার অনুসরণক্রমেই শ্রীমায়ের মনে উদিত হইয়াছিল। একবার কালীবাড়ির খাজাঞ্চী ঠাকুরের মাসিক বরাদ্দের হিসাবে কি গোল করিয়া কম দিয়াছিল। শ্রীমা উহা শুনিয়া খাজাঞ্চীকে বলিয়া ভুল শোধরাইবার পরামর্শ দিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ছি ছি, হিসাব করব!" বর্তমান ক্ষেত্রেও শ্রীমা সম্ভবতঃ সরলবিশ্বাসী, পরের উপর নির্ভরশীল ও

'বে-হিসাবী' ঠাকুরকে নিজের যুক্তিতেই পরাস্ত করিয়া দুগ্ধপানে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ঠাকুরকে এইভাবে বুঝাইয়া-শুনাইয়া খাওয়াইবার চেষ্টার সহিত আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে প্রিয়জনকে, বিশেষতঃ অবোধ বালক-বালিকাদিগকে প্রীতিভরে আহার করাইবার চিত্র। মাতা, ভগিনী, পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ কত ভাবে ভুলাইয়া হিতকর খাদ্যসকল প্রিয়পাত্রকে ভোজন করান এবং ঐরূপে তাহাদের দেহের পুষ্টিসম্পাদন করেন। সে স্থলে মাতা প্রভৃতিকে কেহ মিথ্যাবাদিনী বলার সাহস রাখে না, ঐ চিন্তা মনেও উঠে না। ভাল-মন্দমিশ্রিত এই সংসারে আমরা ভাল তাহাকেই বলি যাহাতে সত্ত্বাধিক্যবশতঃ তমোরজঃ অভিভূত হইয়া যায়। গোলাপের সবটুকু ভাল নহে; তথাপি প্রভাতের শিশিরসিক্ত কুসুমগুলি সুপ্তোত্থিত নয়নকে অন্য সমস্ত বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া শুধু আপনার সৌন্দর্যরাশির মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং তজ্জন্য সে স্মৃতিও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেরই আকর হয়। জননী প্রভৃতির অনুপম স্নেহসিক্ত, কোমল কথাগুলিও তেমনি অপর সমস্ত বিষয় ভুলাইয়া দিয়া প্রিয়জনের মনকে শুধু অনুরাগ-রঞ্জিতই করিয়া থাকে এবং উত্তরকালে চিন্তার অবতারণা হইলে কেবল সেই প্রীতিটুকুকেই স্মৃতিপথে তুলিয়া ধরে। শ্রীমা এইরূপ মন ভুলানো কথা প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। ঠাকুর অধিক ভাত দেখিলে ভয় পাইতেন। তাই তিনি ভাত বাড়িবার সময় হাত দিয়া চাপিয়া চাপিয়া দিতেন। ঠাকুরের জননী যতদিন ছিলেন ততদিন ঠাকুর প্রায়ই নহবতে আসিয়া দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ করিতেন। শাশুড়ীর দেহত্যাগের পর শ্রীমা আহার্যহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাকে আসনে বসাইয়া পাখা দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে প্রীতিপূর্ণ কথা বলিয়া তাঁহার ঊর্ধ্বগামী মনকে আহারের দিকে ধরিয়া রাখিতেন।

শ্রীমায়ের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা এবং শ্রীমায়ের অনবদ্য পতিসেবার আগ্রহের মধ্যে কখনো কখনো জাগতিক নিয়মে বিরোধ উপস্থিত হইয়া লোকশিক্ষার্থে এক অপূর্ব রসের সঞ্চার করিত। অধিক দুগ্ধপান চলিতেছে ইহা জানামাত্র সত্যসন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিরূপ অজীর্ণতার উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে বিষয়টি সুগম হইবে। একদিন আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, বেটুয়াতে মসলা নাই; সুতরাং মুখশুদ্ধির জন্য মসলা আনিতে নহবতে গেলেন। শ্রীমা তাঁহাকে একটু যোয়ান-মৌরি খাইতে দিলেন এবং কাগজের মোড়কে আর কিছু দিয়া বলিলেন, 'নিয়ে যাও।' উহা লইয়া ঠাকুর নিজের ঘরে চলিলেন; কিন্তু অজ্ঞাতশক্তিবলে অসঞ্চয়ী পরমহংসদেবের পদদ্বয় স্বকক্ষে না গিয়া সোজা দক্ষিণ দিকের নহবতের কাছে গঙ্গার ধারের পোস্তায় উপস্থিত

হইল। ঠাকুর তখন পথ দেখিতে পাইতেছেন না, হুঁশও নাই ; আর বলিতেছেন, "মা, ডুবি? মা, ডুবি?" তখন শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের আরম্ভমাত্র। তিনি সব দেখিতেছিলেন ; কিন্তু নববধূর ন্যায় লজ্জাশীলা তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরকে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছিল না—শুধু উৎকণ্ঠায় ছটফট করিতেছিলেন। এমন সময় কালীবাড়ির জনৈক ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ সেদিকে আসিলে মা তাঁহার দ্বারা হৃদয়কে ডাকাইয়া আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, এই দেবমানবের সেবা করা কত দুঃসাধ্য ছিল। কারণ মানবের সেবার একটা ধারা আছে, দেবতারও পূজার বিধি আছে ; কিন্তু দেবতা যখন মানবদেহে আগমন করেন, তখন সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের ন্যায় দেবী-মানবীই তাঁহার সর্বপ্রকার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।

ঠাকুরের সেবাকে স্বীয় জীবনের একমাত্র কাম্য জানিয়াও শ্রীমা কিন্তু অপরকে উহা হইতে বঞ্চিত করিতেন না ; বরং শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে তাঁহার ক্ষণিক বিচ্ছেদও ক্লেশপ্রদ, ইহা জানিয়াও তিনি অম্লানবদনে অপরকে পথ ছাড়িয়া দিতেন। ভক্ত-সমাগমের পূর্বে তিনিই ঠাকুরের ভাতের থালা লইয়া তাঁহার গৃহে যাইতেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রতি অশেষ ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা আগমনের পর ঠাকুর একদিন তাঁহাকে ভাতের থালা আনিতে বলেন। তদবধি শ্রীমা প্রত্যহ তাঁহারই হস্তে থালা তুলিয়া দিতেন। পূর্বে ভাত দিতে গিয়া শ্রীমা ঠাকুরকে দিনে অন্ততঃ একবার দেখিতে পাইতেন ; কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থার ফলে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। গোলাপ-মা উচ্চ সাধিকা ও ভক্তিমতী হইলেও শুধু নিজের ভাবেই চলিতে জানিতেন, পরের ভাব বুঝিতে পারিতেন না। এমন কি, এই কারণে অপরের হিত করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে অহিত করিয়া বসিতেন। একদিন তিনি উপদেশচ্ছলে শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "মা, মনোমোহনের মা বলছিল, 'উনি অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি'?" সাংসারিক বুদ্ধির নিকট পরাজয় মানিয়া শ্রীমা সেই দিনই হাতের দুইগাছি সোনার বালা ছাড়া সমস্ত খুলিয়া ফেলিলেন। পরদিন যোগেন-মা আসিয়া অনেক বুঝাইলে তিনি আর দুই-একখানি গহনা পরিলেন, কিন্তু সমস্ত অলঙ্কার আর কোন দিনই পরা হইল না ; কারণ অচিরেই ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হওয়ায় তাঁহার সেদিকে আর মন গেল না। যাহা হউক, আমরা অন্নপরিবেশনের কথাই বলিতেছিলাম। গোলাপ-মা সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ ঠাকুরের নিকট থাকিতেন ; কোন দিন হয়তো রাত্রি দশটায় নহবতে ফিরিতেন। ইহাতে শ্রীমায়ের বিশেষ অসুবিধা হইত ; কারণ তাঁহাকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নহবতের বারান্ডায় ভাত আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। একদিন ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, "খাবার বেরাল কুকুরে খায়

থাক, আমি আর আগলাতে পারব না।" ঠাকুর শ্রীমায়ের অসুবিধা বুঝিয়া গোলাপ-মাকে সাবধান করিয়া দিলেন; কিন্তু গোলাপ-মা নিজ চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া ঠাকুরের কথা বুঝিয়াও বুঝিলেন না ; বলিলেন, "না, মা আমাকে খুব ভালবাসেন, মেয়ের মতো নাম ধরে ডাকেন।" কাজেই এতাদৃশ-স্বভাবা গোলাপ-মার পক্ষে শ্রীমায়ের মনঃকষ্ট বুঝিতে এবং তদনুসারে সেবার ভার তাঁহার শ্রীহস্তে তুলিয়া দিতে প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল শ্রীমা নীরবে আপন দুঃখ আপন হৃদয়ে গোপন রাখিয়া দূর হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন।

শ্রীমায়ের এই সংসারসম্বন্ধশূন্য সেবার তাৎপর্য কিন্তু সকলে বুঝিতে পারিত না। শুধু কি তাই? অশুদ্ধ মনে এই বিষয়ে হিংসারও উদয় হইত ; এমন কি, একটু-আধটু আলোচনাও যে হইত না, তাহাও নহে। সুতরাং অজ্ঞ-লোকের বিপরীত ইঙ্গিত বা সমালোচনা যে শ্রীমায়ের কর্ণগোচর হইত না, ইহা বলা চলে না। একবার এক মহিলা স্পষ্টই শ্রীমাকে বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন?" সরলা শ্রীমা অপরের কথা সরলভাবেই গ্রহণ করিতেন ; অধিকন্তু তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন, যাহাতে তাঁহার ব্যবহারে অপরে পীড়িত না হয়। পরের হিতসাধনে ব্রতী হইয়া তাঁহাকে অযথা অনেক স্থলে অসহ্য যন্ত্রণা সহিতে হইলেও তিনি সে কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিতেন। বর্তমানক্ষেত্রে ঐরূপ অভিমত শুনিয়া তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার সুযোগ না পাইয়া ঐ মহিলার মনঃকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তিনি কিছুদিন ঐ কার্যে বিরত রহিলেন। সে বড়ই দুঃখের সময়—দিনান্তে ঠাকুর যখন ঝাউতলায় যাইতেন, তখন হয়তো শ্রীমা তাঁহার দর্শন পাইতেন, কোনদিন বা সে সৌভাগ্য ঘটিত না।

সুখে-দুঃখে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল ; কিন্তু বিধি বাম হইলেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠরোগের সূত্রপাত হয়। অতঃপর রোগ দুশ্চিকিৎস্য এবং কলিকাতায় না থাকিলে সদা-সর্বদা উপযুক্ত ডাক্তার, কবিরাজ পাওয়া অসম্ভব জানিয়া ভক্তবৃন্দ স্থির করিলেন যে, ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া রাখা হইবে। ঠাকুরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইলেন। তদনুসারে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ি ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় আনা হইল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পায়তন গৃহে প্রবেশ করিয়াই বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামবাবুর ভবনে চলিয়া গেলেন। ইহার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা-ভবন তাঁহার বাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং আশ্বিনের শেষে (অক্টোবরের

প্রারম্ভে) তাঁহাকে ঐ বাড়িতে আনিয়া সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় কিছুদিন রাখা হইল।[১]

এদিকে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরেই সেই চরম দুঃখের দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিকটে নাই, তাঁহার সেবার সুযোগ রুদ্ধ, আর প্রতিক্ষণে মনে উদিত হইতেছে তাঁহার অশুভ ভবিষ্যৎ-বাণী। কণ্ঠরোগ হইবার চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যার-তার হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব, আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার বেশি দেরি নেই।" কণ্ঠরোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানাস্থানে, নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য পদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন; কলিকাতায় আগমনপূর্বক শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে ইতঃপূর্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন; এবং অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে, দক্ষিণেশ্বরে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া, বহুদিবস ঠাকুরের নিকট না আসিলে তিনি একদিন নরেন্দ্রকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোলভাতের অগ্রভাগ সকাল সকাল তাঁহাকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ঐ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ-প্রদানে তাঁহার মন সংকুচিত হইতেছে না; উহাতে কোন দোষ হইবে না; সুতরাং শ্রীমায়ের পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমা সব দেখিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বিধাতা পুরুষ স্বয়ং যেখানে ভাগ্যচক্র ঘুরাইতে থাকেন, সেখানে অপরে নিবারণের উপায় জানিয়াও নিজ অসহায় অবস্থায় অশ্রুবিমোচন ব্যতীত আর কি করিতে পারে? ঐরূপ পরিস্থিতিতে শ্রীমায়ের গভীর মনোবেদনা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি; বুঝিতে পারি যে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অন্তরে এই কঠোর প্রশ্নের উদয় হইতেছিল, "তবে কি তিনি দেহরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প?" কিন্তু অপ্রিয় সত্য কে বিশ্বাস করিতে চায়? আর উহা সত্য না হইলেও শ্রীমায়ের বর্তমান অবস্থায় তিনি কিই বা করিতে পারেন? ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণ তাঁহারই অনুমতিতে

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' —দিব্যভাব (২৫৭ পৃঃ) "১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে" শ্যামপুকুরের বাড়িতে আসার উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কথামৃত' ৫ম ভাগে (১৭৬ পৃঃ) অন্ততঃ ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ বলরাম-ভবনে কাটাইয়া শ্যামপুকুরে যান। ১৮ অক্টোবর বিজয়া দশমী ও তৎপূর্বে পূজার কয়দিন তিনি শ্যামপুকুরেই ছিলেন। কাজেই ইহার কিছু আগে সেখানে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

যখন তাঁহার সেবার জন্য পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিলেন, তখন শ্রীমাকে নীরবে সে বিরহব্যথা সহ্য করিতেই হইবে। তবে মায়ের সে ব্যথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে আগমনের কয়েকদিন পরেই ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, সুচিকিৎসার সহিত দিবারাত্র সেবা ও সুপথ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও থাকা আবশ্যক। যুবক ভক্তগণ সেবাভার গ্রহণ করিলেও পথ্যের জন্য শ্রীমাকে ঐ বাটীতে আনয়ন ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা গেল না। কিন্তু তখন আর এক সমস্যা উপস্থিত হইল। বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট অন্দরমহল নাই; কাজেই শ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী থাকিবেন, ইহা ভক্তগণ স্থির করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার অপূর্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়া অনেকে তাঁহার আগমন সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। এত দীর্ঘকাল নহবতে থাকিয়াও যিনি কখনো কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই, তিনি সর্বপ্রকার লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে আসিয়া বাস করিবেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অথচ গত্যন্তর না থাকায় তাঁহাকে আনিবার এই প্রস্তাবে ঠাকুরের অনুমতি লইতে হইল। তিনি ভক্তদিগকে শ্রীমায়ের পূর্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে? যা হোক, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সকল কথা জেনে শুনে সে আসতে চায় তো আসুক।" ভক্তগণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল উপাদান অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐরূপ অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সঙ্গে ভাবিবার ছিল শ্রীমায়ের স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী স্বীয় জীবনধারাকে পরিচালিত করার অপরিসীম ক্ষমতার বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও লজ্জা-সঙ্কোচ-পরিত্যাগে প্রস্তুত থাকার কথা। কার্যতও দেখা গেল যে, আহ্বান আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া শ্যামপুকুরে আগমনপূর্বক নির্দিষ্ট কর্তব্যে রত হইলেন।

শ্যামপুকুরে ঐ ৫৫ নম্বর বাড়ি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ শ্যামপুকুর স্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়া উভয় দিকে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর রোয়াক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ঘর। উপরে উঠিয়া দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল; বামভাগে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমে যে দ্বার পাওয়া যায়, উহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সুপ্রশস্ত কক্ষের প্রবেশ পথ। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্ডা এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি ঘর। একখানিতে ভক্তগণ এবং অপর-

খানিতে শ্রীমা রাত্রে বাস করিতেন। ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথে পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার গায়ে চারিহাত আন্দাজ চতুষ্কোণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল। এই চাতালেই শ্রীমায়ের সারাদিন কাটিত এবং এখানেই ঠাকুরের পথ্যাদি রন্ধন হইত।

ঐ বাড়িতে একটিমাত্র স্থান সকলের স্নানাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকায় শ্রীমা অপর সকলের পূর্বে রাত্রি তিনটার সময় নিচে নামিয়া স্নানাদি সারিয়া তেতলায় ছাদে সিঁড়ির পার্শ্বে চাতালে উঠিয়া যাইতেন। সেখানে যথাকালে পথ্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে বৃদ্ধ গোপাল-দাদা বা লাটুর দ্বারা নিচে সংবাদ পাঠাইতেন; তখন সুবিধা হইলে ঠাকুরের ঘর হইতে লোক সরাইয়া দিয়া শ্রীমাকে পথ্য লইয়া আসিতে বলা হইত ; নতুবা সেবকগণ তাঁহার নিকট হইতে উহা লইয়া আসিতেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমা ঐ চাতালেই বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে আন্দাজ এগারটার সময় নামিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট ঘরে রাত্রি দুইটা পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন অম্লানবদনে এই কঠিন সেবাব্রত পালন করিতে লাগিলেন। অথচ সেবার সর্বপ্রধান কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার কর্তব্য লোকচক্ষুর অন্তরালে এমনই নীরবে অনুষ্ঠিত হইত যে যাঁহারা প্রত্যহ সেখানে যাতায়াত করিতেন তাঁহারাও তাঁহার উপস্থিতির কথা জানিতে পারিতেন না।

শ্যামপুকুরে আড়াই মাস অবস্থান ও সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ঠাকুরের রোগ না কমিয়া বরং বাড়িতেছে দেখিয়া ডাক্তার স্থির করিলেন যে, নগরের বাহিরে মুক্তবায়ুপূর্ণ কোনও উদ্যানবাটীতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ভক্তগণ কাশীপুরে বড় রাস্তার উপরে ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের বাটী (বর্তমান ৯০, কাশীপুর রোড) ভাড়া লইলেন এবং (২৭ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ইং ১১ ডিসেম্বর) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও সেবক ভক্তদের সহিত ঠাকুর সেখানে পদার্পণ করিলেন।[১] "উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীর-সংলগ্ন পাশাপাশি তিন-চারিখানি ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বসতবাটী ; উহার নিচে চারিখানি এবং উপরে দুইখানিই ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর

১ 'পুঁথি' (২৭৮ ও ৩০৪ পৃঃ) হইতে জানা যায় যে, শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ভক্তদের জন্য সর্বদা রন্ধনাদি করিতেন। 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থে (১৮ পৃঃ) আছে—"এখানেও (শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে) মা (লক্ষ্মীমণি) শ্রীমায়ের একমাত্র সঙ্গিনীরূপে বর্তমান থাকিয়া নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।" এই মতদ্বয় সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব, ৩৩০ পৃঃ) লক্ষ্মীদিদির কাশীপুরে এবং ঐ গ্রন্থে ও অপর কোন কোন গ্রন্থে স্ত্রীভক্তদের মাঝে মাঝে তথায় অবস্থানের উল্লেখ আছে। বরাবর থাকার কথা নাই। শ্যামপুকুরে থাকারও উল্লেখ নাই।

মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুই-খানি ছোট ঘর ; তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্মিত সোপান-পরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারান্ডা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন, উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর ; উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে, প্রাচীর-বেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ ; উহাতে ঠাকুর কখনো কখনো পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন। উত্তরে, সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ; এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর ; উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই-একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত" ('লীলা-প্রসঙ্গ', দিব্যভাব, ৩২০-২১ পৃঃ)। এই বাটীতে শ্রীমা পূর্বেরই ন্যায় সেবা করিতে পারিবেন, অথচ ততটা সঙ্কুচিত থাকিতে হইবে না ভাবিয়া তাঁহার যে অপরিসীম আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যুবক ভক্তগণও এখানে পূর্বেরই ন্যায় সেবাব্রতে নিরত রহিলেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও আকর্ষণে আরও ত্যাগীদের তথায় সমাবেশ হইল। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগকে অবলম্বন করিয়া ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল এবং তাহার কেন্দ্র-স্থলে অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী।

এই নবগৃহেও শ্রীমায়ের জীবনধারা অনেকটা পূর্বেরই ন্যায় ছিল ; যাহা কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার প্রয়োজনে। শ্রীমা এখানেও সাধারণ খাদ্যাদি রন্ধন করিতেন। বিশেষ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে গোপাল-দাদা প্রভৃতি যে দুই-চারিজনের সহিত তিনি নিঃসংকোচে কথা বলিতেন, তাঁহারা চিকিৎসকের নিকট প্রস্তুত করার প্রণালী শিখিয়া লইয়া যথাসময়ে শ্রীমাকে দেখাইয়া দিতেন। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীমা ঠাকুরের ভোজ্য বা পানীয় লইয়া তাঁহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইতেন এবং ভোজন করাইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ফিরিতেন। এই সকল কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং সঙ্গিনীর অভাব মিটাইবার নিমিত্ত এই সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার নিকটে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া শ্রীমায়ের সহিত কখনো দুই-চারি ঘণ্টা, কখনো বা দুই-একদিন কাটাইয়া যাইতেন। লক্ষ্মীদেবী ঠিক কবে আসিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত: স্ত্রীভক্তবৃন্দও সর্বদা আসিতে পারিতেন কিনা বিশেষ সন্দেহ! কারণ পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, শ্রীমাকে অনেক সময়েই সঙ্গিনী-হীন জীবনযাপন করিতে হইত।

কাশীপুরের বাড়িতে যে কাঠের সিঁড়ি ছিল, উহার ধাপগুলির উচ্চতা

এত অধিক ছিল যে, সাধারণ লোকের পক্ষেই উঠানামা কষ্টসাধ্য ছিল; দুর্বল ব্যক্তিদের তো কথাই নাই। একদিন আড়াই সের দুধসমেত একটি বাটি লইয়া ঐ সিঁড়িতে উঠিবার কালে শ্রীমা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। ইহাতে দুধ তো নষ্ট হইলই, অধিকন্তু গোড়ালির হাড় স্থানচ্যুত হইয়া শ্রীমা চলচ্ছক্তিহীন হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম আসিয়া শ্রীমাকে ধরিয়া তুলিলেন। পরে ঐ সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ঐ সময়ে শ্রীমায়ের সেবার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করায় তিনি আপনাকে সহসা কতকটা নিঃসহায় বোধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সদানন্দময় মহামানবের ভাষায় ঐ সমবেদনা ও নির্ভরতা অদ্ভুত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই দুঃখের মধ্যেও সকলের হৃদয়ে আনন্দ-হিল্লোল তুলিল। তিনি বাবুরামকে বলিলেন, "তাই তো, বাবুরাম, এখন কি হবে? খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?" ঠাকুর তখন মণ্ড খাইতেন; শ্রীমা উহা উপরে লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। শ্রীমা তখন নথ পরিতেন। ঠাকুর তাই নাকে হাত দিয়া এবং নথের আকারে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ইঙ্গিতে বাবুরামকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?" শুনিয়া শ্রীযুক্ত নরেন ও বাবুরাম হাসিয়া খুন! তিন দিন পরে শ্রীমায়ের পায়ের ব্যথার একটু উপশম হইলে বালক ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া যাইতেন। এই কয়দিন গোলাপ-মা মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবার ভার লইয়াছিলেন।

কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী তখন সেবানিরত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একদিন স্থির করিলেন যে, উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বের এক খেজুর গাছ হইতে সন্ধ্যার সময় জিরেনের রস খাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। যথাকালে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন প্রভৃতি সকলে দল বাঁধিয়া ঐ দিকে চলিলেন। এমন সময় শ্রীমা অকস্মাৎ দেখিলেন, ঠাকুর যেন তীরবেগে নীচে নামিয়া গেলেন। তিনি চমকিত হইয়া ভাবিলেন, "এও কি সম্ভব? যাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, তিনি কি করে দ্রুত নীচে নামতে পারেন?" অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না। অগত্যা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যাইয়া পরীক্ষা করিতে হইল। দেখিলেন, তিনি সেখানে নাই, ঘর শূন্য। তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও না পাইয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া উৎকট চিন্তাভিভূত হইলেন। একটু পরেই দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর পূর্ববৎ তীরবেগে ঘরে ফিরিলেন। ঔৎসুক্যনিবৃত্তির জন্য তিনি পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি দেখেছ নাকি?" তাহার পর বলিলেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে, সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের এক পাশে যে খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে

যাচ্ছিল। আমি দেখলুম ঐ গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াত। ছেলেরা তা জানত না। তাই অন্য পথে সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলুম। বলে এলুম, 'আর কখনও ঢুকিস নে'।" তিনি ঐ কথা অপর কাহাকেও বলিতে শ্রীমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া শ্রীমায়ের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

কাশীপুরের একটি ঘটনায় ঠাকুরের সেবায় শ্রীমায়ের ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে ঠাকুরের জন্য গুগলির ঝোলের ব্যবস্থা হইল। ঠাকুর শ্রীমাকে উহা করিতে আদেশ দিলে তিনি আপত্তি জানাইলেন, "এগুলো জ্যান্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।" শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "সেকি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে।" তখন শ্রীমা রোখ করিয়া উহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল যে, ঠাকুর নিজের সৃষ্টি নিজেই সংহার করিতেছেন।

ত্যাগী যুবক ভক্তগণ শ্রীমাকে তখন হইতেই কি চক্ষে দেখিতেন, তাহার একটু নিদর্শন এক সামান্য ঘটনায় পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ইহাদিগকে বলিলেন, "তোদের ভিক্ষার অন্ন খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।" ইহা শুনিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার পূর্বে তাঁহাদের মনে হইল যে, শ্রীমায়ের নিকট প্রথম ভিক্ষা লওয়া উচিত। তদনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমা তাঁহাদের পাত্রে একটি টাকা—ষোল আনা—অর্পণ করিলেন। এইরূপে প্রতিকার্যের প্রথমে তাঁহারা শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন; এবং স্নেহময়ী জননীও অকাতরে তাহা দান করিতেন। ঠাকুরের দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছে দেখিয়া কেহ ম্রিয়মাণ হইলে তিনি সান্ত্বনা প্রাদান করিতেন, এবং সেবাদি বিষয়ে কোন সমস্যার উদয় হইলে তাঁহারই পরামর্শে উহার সমাধান হইত। বস্তুতঃ কাশীপুরের প্রতিকার্যের পশ্চাতে বরদাত্রী শ্রীশ্রীমায়ের অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত প্রসারিত থাকিয়া সকলের প্রাণে আশা ও আনন্দ সঞ্চার করিত।

নীরব সাধনা

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূর্বসংস্কার ও অভ্যাসসমূহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নির্ভয়ে সময়োচিত কর্তব্যসম্পাদনে কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। ঐরূপ অভ্যাসাদি-পরিবর্তন অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের ফলে হইত; স্থলবিশেষে শ্রীমা স্বতই অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতেন। কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের তুষ্টিবিধান করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ লোকাচারাদি স্থলেই এই সকল কথা প্রযোজ্য। মৌলিক ভাবরাজ্যে উভয়ের এতই ঐক্য ছিল যে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শ্রীমায়ের চেষ্টাপূর্বক কিছু করিতে বা ঠাকুরের তাঁহাকে শিখাইতে হইত না। একসুরে বাঁধা দুইটি হৃদয় একই ছন্দে আপনাদিগকে বিকাশ করিয়া চলিত। ইহারও দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বে পাইয়াছি। সম্প্রতি অনালোচিত কয়েকটি বিষয়ে আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব।

১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী সমাগত প্রায়। ঐ দিবস কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বকূলে পানিহাটিতে প্রতিবৎসর 'চিঁড়ার (বা দণ্ড) মহোৎসব' হইয়া থাকে। ঠাকুরের ইংরেজী-শিক্ষিত ভক্তদের আগমনের পূর্বে তিনি বহুবার ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্তী কয়েক বৎসর তথায় যাওয়া হয় নাই। সেই বৎসর ঠাকুর ভক্ত-দিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে। তোরা সব 'ইয়ং-বেঙ্গল' কখনও ওরকম দেখিস নাই; চল দেখে আসবি।" তদনুসারে প্রায় পঁচিশ-জন ভক্ত উৎসবের দিন নয় ঘটিকার মধ্যে দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইলেন। ঠাকুরের জন্য একখানি নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। কয়েকজন স্ত্রীভক্তও প্রত্যূষে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর সহিত সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বেলা দশটার সময় সকলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোজনান্তে জনৈক স্ত্রী-ভক্তের দ্বারা শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যাইবেন কিনা। ঠাকুর স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "তোমরা তো যাচ্ছ; যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" শ্রীমা ঐ কথা শুনিয়াই বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাচ্ছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হবে। অত ভিড়ে নৌকা থেকে নেমে উৎসব দেখা আমার পক্ষে দুষ্কর হবে—আমি যাব না।" শ্রীমায়ের অনুমতিক্রমে স্ত্রীভক্তগণ ঠাকুরের নৌকায় উঠিয়া উৎসব-দর্শনে চলিয়া গেলেন। উৎসব ও ভক্তমিলনাদি সমাপনান্তে রাত্রি সাড়ে আটটায় ঠাকুরের নৌকা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলে

স্ত্রীভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীমায়ের নিকটে অবস্থান করিলেন এবং পূর্ণিমাতে স্নানযাত্রার দিবসে দেবীপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিয়া ঐ পর্ব-দর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন স্থির করিলেন। রাতে খাইতে বসিয়া ঠাকুর পানিহাটির কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, "অত ভিড়- তার উপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করছিল—ও সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত, 'হংস হংসী এসেছে!' ও খুব বুদ্ধিমতী।" ঠাকুরেব আহারের পর স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমাকে ঐ কথা শুনাইলে তিনি বলিলেন, "প্রাতে উনি আমাকে যেভাবে যেতে বলে পাঠালেন তাতেই বুঝতে পারলুম, উনি মন খুলে ঐ বিষয়ে অনুমতি দিচ্ছেন না! তাহলে বলতেন 'হাঁ যাবে বই কি?' তা না করে উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর ফেলে বললেন, 'ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক' তখন স্থির করলুম, যাবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

ঐ দিন শ্রীমায়ের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে ঠাকুর স্ত্রীভক্তদিগকে অপর এক উদাহরণ দিয়াছিলেন "মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে তখন আমার মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিলে; মাকে বললুম, 'মা, মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি?' সেই সময় ওর মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বললুম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি ওটা নাও না কেন? কি বল?' শুনেই ও বললে 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ওটাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।' ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

শুধু লৌকিক ক্ষেত্রেই যে তাঁহাদের সমপ্রাণতা প্রকাশ পাইত তাহা নহে; অধ্যাত্মবিষয়েও শ্রীমায়ের প্রতিপদবিক্ষেপ শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অনুরূপ ছিল—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তিনি তাঁহারই অনুবর্তিনী ছিলেন। ষোড়শীপূজা-কালে আমরা ইঁহাদের একাত্মতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। নহবতের ঘরে ও শ্যামপুকুরের চাতালে পতিসেবা ব্যপদেশে শ্রীমায়ের তপস্যার ঈষন্মাত্র আভাস-লাভে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীমা ইহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণেরই ন্যায় সমস্ত জীবনকে এক অবিরাম সাধনায় পরিণত করিয়া-ছিলেন। ইহা লোকাতীত ব্যবহার। তাই মনে হয়, অতঃপর লৌকিক দৃষ্টিতে এই সকল আত্মপ্রচেষ্টার বিবরণ দিতে যাইলে পাঠক হয়তো সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিবেন, "ইহার অর্থ কি? ষোড়শীপূজার অবসানে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনফল অনায়াসে দানস্বরূপে পাইয়াছেন, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক সৌন্দর্য ও

মাধুর্যে যিনি স্বতই সকলের মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুপ্রেরণা জাগান, এবং দৈহিক ক্লেশাদি সহ্য করিয়া যিনি তিতিক্ষাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁহার সেই সকল স্বার্থগন্ধহীন নিরবদ্য ক্রিয়াকলাপই কি চরম তপস্যা নহে? শুধু বিধি অনুযায়ী কতকগুলি নিয়ম-পালন না করিলে কি ধর্মজগতে উন্নতি হয় না? অতএব এ কি নূতন বিষয়ের বৃথা অবতারণা হইতেছে?" উত্তরে আমরা বলি, অধৈর্যের কোনও কারণ নাই। আমরা জীবনী লিখিতে বসিয়াছি; নিরপেক্ষভাবে সবই বলিয়া যাইব। উহার প্রয়োজন বা তাৎপর্য-বিচারের ভার আমাদের উপর নহে; উহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকগণের বিবেচনাধীন। তবে আমরা এইটুকু জানি যে, শ্রীমা প্রভৃতি দেবী-মানবীর কোন প্রচেষ্টাই-নিষ্প্রয়োজন নহে, এবং তাহা কেবল বিধির অনুসরণে না হইয়া অন্তরের আবেগ-বশেই হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক কার্যে একটা নিজস্ব চমৎকারিত্ব, একটা ব্যক্তিগত অভিনবত্ব থাকে। আমরা স্তরে স্তরে তাহারই আলোচনা করিতেছি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই নীরব সাধনার অনেকখানিই অজ্ঞাত কিংবা সুবিদিত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, স্বামী সারদানন্দজীর দিনলিপি এবং শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের স্মারকলিপি হইতে যদিও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীমা একসময়ে (সম্ভবতঃ ২০ মে, ১৮৮৩) সাবিত্রী-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাপি এই উল্লেখমাত্র ভিন্ন অন্য কোন তথ্য আমরা অবগত নহি। তাহা হইলেও এই সকল অমূল্য, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত-অবলম্বনেই আমাদিগকে শ্রীমায়ের জীবনের এই দিকটার পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটে ধর্মাত্মাদিগের উপদেশ ও আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা অনেক ধর্মাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং শিখিয়াছিলেনও যথেষ্ট। আমরা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের কথা বলিতেছি না; দক্ষিণেশ্বরে আগত সাধু-সন্ন্যাসীদের কথাও বলিতেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আলোচিত হওয়ায় এখানে পুনরুল্লেখ বৃথা। শ্রীমায়ের জীবনীর সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর কথা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একজন ভৈরবীর কথাও আমরা জানিতে পারি। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলিলেন, "আজ একজন ভৈরবী আসবে। তার জন্যে একখানি কাপড় ছুপিয়ে রাখবে, তাকে দিতে হবে।" ঐ দিন কালীমন্দিরে ভোগরাগের পর সেই ভৈরবী আসিলে ঠাকুরের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হইল, এবং তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গেলেন। ভৈরবীর একটু মাথাগরম ছিল। তিনি সর্বদা শ্রীমাকে যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তেমনি আবার শাসাইতেন, "তুই আমার জন্যে পান্তা ভাত রাখবি, না রাখিস তো তোকে ত্রিশূলে করে মেরে রেখে যাব।" শুনিয়া শ্রীমায়ের ভয় হইত; কিন্তু ঠাকুর বলিতেন, "তোমার ভয় নেই। ও ঠিক

ঠিক ভৈরবী, সেজন্য একটু মাথা-গরম।" ভৈরবী কোন কোন দিন এত ভিক্ষা করিয়া আনিতেন যে, সাত-আট দিন চলিত। কালীবাড়ির খাজাঞ্চী বলিতেন, "মা, তুমি কেন বাইরে ভিক্ষায় যাও, এখানেই নিতে পার।" ভৈরবী বলিতেন, "তুই আমার কালনেমি মামা, তোর কথায় বিশ্বাস কি ?"

দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবী একসঙ্গে থাকিতেন, তখন ঠাকুর ভোররাত্রে তিনটায় শৌচে যাইবার পথে নহবতের পার্শ্বে আসিয়া ডাকিতেন, "ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়ীকে তোল রে। আর কত ঘুমুবি ? রাত পোহাতে চলল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর, ধ্যানজপ আরম্ভ করে দে।" তখন শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবীর ঘুম পাতলা হইয়া আসিয়াছে; কাজেই তাঁহারা তখনই উঠিয়া পড়িতেন। তবে শীতের সময় ঠাকুরের সাড়া পাইলে শ্রীমা মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে আরও নিদ্রার সুযোগ দিবার জন্যই বোধ হয় আস্তে আস্তে বলিতেন, "তুই চুপ কর; ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনও ওঠবার সময় হয়নি কাক-কোকিল ডাকে নি—সাড়া দিসনি।" ঠাকুর তাঁহাদের সাড়া না পাইলে কিংবা ঘুম ভাঙ্গে নাই মনে করিলে কৌতুকচ্ছলে দরজার নীচে জল ঢালিয়া দিতেন, তখন বিছানা ভিজিবার ভয়ে তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতেন এক এক দিন ভিজিয়াও যাইত। এইরূপ করার ফলে ক্রমে লক্ষ্মীদিদির অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমায়ের অনেক রাত্রি থাকিতে নিদ্রা-ভঙ্গের কথা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

একদিন ঠাকুর লীলাচ্ছলে মাঠাকুরানীর সম্মুখে উচ্চ ভাবাবস্থা অভিব্যক্ত করিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার ধারণাশক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেদিন দিনের বেলায় শ্রীমাকে পান সাজিতে এবং বিছানা ঝাড়িয়া ও ঘরখানি পরিপাটি করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বা-দর্শনে কালীমন্দিরে গেলেন। শ্রীমা ক্ষিপ্রহস্তে গৃহকার্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীমায়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, এখানে পা ফেলিতে সেখানে পড়িতেছে, কথা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কর্মব্যস্তা শ্রীমা বুঝিতেও পারেন নাই যে, ঠাকুর এত নিকটে আসিয়াছেন। অকস্মাৎ ঠাকুর তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ঠেলিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি ?" শ্রীমা পশ্চাতে চাহিয়া স্তম্ভিত হইলেও তখনই উত্তর দিলেন, "না, না মদ খাবে কেন ?" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেন টলছি, তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না ? আমি মাতাল ?" শ্রীমা শশব্যস্তে উত্তর দিলেন, "না, না, তুমি মদ কেন খাবে ? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।" ঠাকুর উহাতে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ', বলিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কখনো বা ঠাকুর উচ্চ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমাকে উপদেশ দিতেন। শ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদির নিকট একদিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনান্তে ঠাকুর লক্ষ্মীদেবীকে

বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে যা সব শুনলি, তোরা দুজনে বলাবলি করবি। গরুগুলো দিনের বেলায় যা সব খায়, রাত্রে সেগুলো জাবর কাটে। তুই আর তোর খুড়ী দুজনে বলাবলি করবি, তাহলে কৃষ্ণের এসব লীলাকথা আর ভুলে যাবি না—বেশ মনে থাকবে।" আর একদিন ঠাকুর নিজ হাতে ষট্চক্র আঁকিয়া শ্রীমাকে দিয়াছিলেন।[১]

ঠাকুর জানিতেন যে, শ্রীমা তাঁহার কীর্তনাদি দেখিতে ভালবাসেন; তাই কীর্তনের আরম্ভে রামলালদাদাকে তাঁহার ঘরের নহবতের দিকের (উত্তরের) দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিতেন, "এখানে কত ভাব-ভক্তি হবে, ওরা সব (শ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদি) দেখবে না? শুনবে না? কেমন করে তবে শিখবে?" দরমার মধ্যে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্র দিয়া তাঁহারা দেখিতেন। ক্রমে সেই ছিদ্র বড় হইয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর রহস্য-সহকারে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল!" ঠাকুরের ভাবগ্রহণে অসমর্থ রামলাল উত্তর দিলেন যে এজন্য ঠাকুরই দায়ী, যেহেতু রামলাল উত্তরের দরজা বন্ধ রাখিতে চাহিলেও ঠাকুরই উহা খুলিয়া রাখিতে নির্দেশ দেন।

শ্রীমায়ের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মক্ষেত্রে নিবিষ্ট রাখার জন্য ঠাকুর এক সময়ে শ্রীমায়ের দ্বারা লব্ধ একটি রোগ-সারানোর মন্ত্র ইষ্টপদে অর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি শ্রীমা শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলেন। যোগীন-মা একদিন ঠাকুরের আহারান্তে তাঁহার হস্তে আচমনের জন্য জল ঢালিয়া দিবার পর ঠাকুর অকস্মাৎ বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বেদনা হয়েছে; তুমি আরাম করবার যে মন্ত্রটি জানতে তা উচ্চারণ করে একবার হাতটি বুলিয়ে দাও তো!" যোগীন-মা ঠাকুরের আদেশ পালন করিলেন। পরে তিনি শ্রীমায়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কি করে বুঝতে পারলেন?" ইহা শুনিয়া শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল কথা জানতে পারেন, অথচ মন-মুখ এক করে সৎ উদ্দেশ্যে যে যা করছে, তার জন্যে তাকে কখনো ঘৃণা করেন না। তোমার ভয় নেই। আমিও এঁর (ঠাকুরের) কাছে আসবার আগে ঐ মন্ত্র পেয়েছিলাম। এখানে এসে ওঁকে ঐ কথা বলায় উনি বলেছিলেন, 'মন্ত্র নিয়েছ, তাতে ক্ষতি নেই—উহা এখন ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও'।"

১ পরে মাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতি সরলভাবে বলিয়াছিলেন, "আহা, মা, এত যে হবে তা কি তখন জানি? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না"। ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃঃ)। মনে রাখিতে হইবে যে, ঠাকুরের অসুখের সময় ও পরবর্তী কালে তাঁহার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। ঐ অবস্থায় হারাইয়া যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমাকে তিনি অতি সাবধানে রক্ষা করিতেন। শ্রীমায়ের কথা হইতেই জানা যায়, "নবতে থাকবার সময় ঠাকুর এমন কি রামলালকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতেন, রামলাল তো ভাসুরপো হয়।" একদিন শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবীকে সকালে নয়টার সময় ভবতারিণী ও রাধাকান্তের প্রসাদী ফল-মিষ্টান্নাদি দিতে গিয়া শ্রীযুত হৃদয় অনেক গল্প ও হাস্যাদি করিয়া ঠাকুরের নিকট ফিরিলে তিনি তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাবি আর দিয়ে চলে আসবি। খবরদার, কখনো যেন আর দেরি না হয়।"১

ঠাকুর এইভাবে উপদেশদান এবং শ্রীমায়ের ধর্মজীবনের উপযোগী অবস্থাসংরক্ষণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ধর্মকৃত্যাদিতে উৎসাহ দিতেন। শ্রীমা বেশ গাহিতে পারিতেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ও লক্ষ্মীদিদি এক রাত্রে মৃদু গলায় গান করিতেছিলেন। ভাবসংবলিত সে ভজনসঙ্গীত বেশ জমিয়াছিল। ঠাকুর তাহা শুনিতে পাইয়া পরদিন শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ, ভাল।" আর একদিন বিকালে শ্রীমা জুঁই আর রঙ্গন ফুলের সাতলহর গড়ে মালা গাঁথিয়া পাথরের বাটিতে জলে রাখিয়া দিলেন। পরে কুঁড়িগুলি ফুটিয়া উঠিলে জগদম্বাকে পরাইতে পাঠাইয়া দিলেন। গহনা খুলিয়া কালীর গলায় মালা দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় আসিলেন এবং শোভাদর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আহা, কাল রঙে কি সুন্দর মানিয়েছে।" জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, শ্রীমা উহা গাঁথিয়াছেন, তখন একজনকে বলিলেন, "আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক" বৃন্দে ঝি শ্রীমাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি দেখিলেন যে, বলরামবাবু সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। সুতরাং তিনি লজ্জায় আত্মগোপনের জন্য ঝির আঁচলের আড়ালে দেহ ঢাকিয়া পশ্চাতের সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে গেলেন। ঠাকুর তাহা দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস না।" ঐ কথা শুনিয়া বলরামবাবু প্রভৃতি সরিয়া গেলেন। তখন শ্রীমা দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

১ ঐ সময়ে অন্দরমহলের ভব্যতা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজ অতিমাত্র সচেতন ছিল। ঠাকুর বর্তমান স্থলে ঐ দেশাচার ও পারিবারিক রীতিই মানিয়া চলিতেছিলেন। কামারপুকুরের বাসগৃহের উত্তরের দেওয়ালে সদর রাস্তার দিকে একবার জানালা ফুটানো হইলে ঠাকুর উহা অবিলম্বে বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার শ্রীমাকে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং কুল-ললনার দ্বারা দক্ষিণেশ্বরের বাজার করাইয়াছিলেন।

শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বেশ মোটা-সোটা, শান্ত ও সুপুরুষ ছিলেন—নাম স্বামী পূর্ণানন্দ। ইনি তখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমায়ের জিহ্বায় একদিন কি লিখিয়া দিলেন। শ্রীমা পরদিন লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন, "কাল তিনি আমার জিবে লিখে দিয়েছেন; তুইও যা না।" ইহার পরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর জিহ্বাতেও 'রাধাকৃষ্ণের বীজ ও নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিতা জানিয়াও বলিয়াছিলেন, "তা হোক, আমি ঠিকই দিয়েছি।"

প্রত্যহ রাতে তিনটায় শয্যাত্যাগান্তে শ্রীমা নহবতের পশ্চিম ধারের বারান্দায় দক্ষিণমুখে বসিয়া ধ্যান করিতেন; এই বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হইত না। একদিন শরীর ভাল না থাকায় ধ্যানে বসিতে একটু দেরি হইল; তারপর কয়েকদিন আলস্যবশতঃ ধ্যানের সময় ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীমা তখন বুঝিলেন যে, ভাল কাজ করিতে গেলে খুব আন্তরিক যত্ন ও রোখ চাই। তাই পরে ঐ বিষয়ে তিনি সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহার জপের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে নলিনীদিদিকে বলিয়াছিলেন "আমি তোদের বয়সে কত (কাজ) করেছি। এসব করেও রোজ এক লক্ষ জপ করতুম।" এই ধ্যানজপের সঙ্গে তাঁহার মনে অবিরাম প্রার্থনাও চলিত। রাত্রে যখন চাঁদ উঠিত, তখন গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তিনি সজলনয়নে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে—আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"

ধ্যানাভ্যাসের ফলে শ্রীমায়ের স্বভাবতঃ অন্তর্মুখীন মন সেই প্রথমাবস্থাতেই একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলব, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম—কোন হুঁশ থাকত না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছি, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারি নি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্য রকম চেহারা ছিল[১]—গয়না পরা, লালপেড়ে শাড়ি। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন (যোগানন্দ) সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে

১ এই সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আগে আমার কি এই রকম রং ছিল? আগে খুব সুন্দর ছিলুম। আমি প্রথমে বেশী মোটা ছিলুম না। শেষে (ঠাকুরের দেহত্যাগের পর) মোটা হয়েছিলুম।"

আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সেসব কি দিনই গিয়েছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি, 'তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'··আহা, তখন কি মনই ছিল আমার! বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি (ঠেলা মেরে) গড়িয়ে দিলে ; আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল।" শ্রীমা তখন সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন ; তাই বাহিরের এই বিকট শব্দ তাঁহার প্রাণে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাজিয়াছিল—তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ধ্যানভজনাদির ফলে শ্রীমায়ের মন যতই অন্তর্মুখ হইতে থাকিল, এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ও ভক্তদের মধ্যে তিনি যতই বিভিন্ন ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার নিজ নিজ জীবনেও উহা পাইবার আগ্রহ বাড়িয়া চলিল। বিশেষতঃ গৌরী-মার ভাব ও প্রেমদর্শনে তাঁহারও মনে ঐরূপ ভাব ও প্রেম-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। সেজন্য একদিন লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা ঠাকুরকে অনুরোধ করাইলেন ; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "সে (গৌরী-মা) কালীঘাটের মেয়ে: সে ওসব সহ্য করতে পারবে। কিন্তু তার (শ্রীমায়ের) পক্ষে গোপনে থাকা ভাল। 'অবলার অবলায় বুদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি।' স্ত্রীলোক ধীর নম্রভাবে থাকবে—লজ্জাই তার ধর্ম; নইলে লোকে তাকে নিন্দা করবে।"

শ্রীমায়ের ধ্যানতন্ময়তা আমরা বহুবার দেখিয়াছি। ঐ সঙ্গে অপরের, এমন কি তাঁহার নিজেরও অগোচরে ভাবের বহিঃপ্রকাশ হইত কি না, জানা নাই। তাঁহার পূর্বোক্ত অনুরোধ হইতে বরং মনে হয়, ভাব হইলেও তিনি বিদিত ছিলেন না, কিংবা উহা গৌরী-মা প্রভৃতির ন্যায় উদ্বেল ছিল না। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণও তাদৃশ উচ্ছলতার পক্ষপাতী ছিলেন না ; কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি বহু লোকের পথপ্রদর্শিতা হইবেন, সেই মাতৃ-গুরু-দেবী-শক্তির সম্মিলিত প্রতিমায় সম্ভবতঃ, অতি নিভৃতে হইলেও শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকার-প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। তাই শ্রীমায়ের মনে সে স্পৃহা চিরশান্ত না থাকিয়া পুনর্বার জাগরিত হইয়াছিল। আর যুগপ্রয়োজনে বিধাতাও বোধ হয় অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই দেবীমূর্তিতে যুগধর্মসাধনের উপযুক্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় সমাগত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীমা পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই অভিলাষ জ্ঞাপনার্থে শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিতেছেন, "ওঁকে বলো, যাতে আমার একটু ভাব-টাব হয় ; লোকজনের জন্য ওঁকে একথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে না। যোগীন-মা কথাটা সহজভাবে লইলেন। তিনি ভাবিতে পারিলেন না যে, শ্রীমা ও ঠাকুরের মধ্যে যে সু-উচ্চ অধ্যাত্মসম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাকে সংসারভূমিতে কার্যকর করিবার জন্য অপরের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন নাই ; অথবা একথাও তাঁহার মনে উদিত হইল না যে, শ্রীমা জন্মাবধি এমনই উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন যে, অপরে না জানিলেও তিনি

সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন। যোগীন-মা শুধু ভাবিলেন, "হবেও বা, মা যখন বলছেন, তখন ঠাকুরকে ঐ কথা অনুরোধ করব।" পরদিন সকালে ঠাকুর একাকী তক্তপোশে বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি প্রণামান্তে শ্রীমায়ের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিলেন, কিন্তু উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় কেহ কথা বলিতে সাহস পাইত না, কাজেই যোগীন-মা বিনা বাক্যব্যয়ে পুনরায় প্রণাম করিয়া নহবতে ফিরিয়া গেলেন।

তিনি যখন আসিলেন, তখন শ্রীমা পূজা করিতেছেন—দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। ঐ ফাঁক দিয়া তিনি দেখিলেন, মা খুব হাসিতেছেন—এই হাসিতেছেন, আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষে ধারার বিরাম নেই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থ। তখন যোগীন-মা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার সেখানে আসিলে শ্রীমা বলিলেন, "এই (ঠাকুরের কাছ থেকে) এলে?" যোগীন-মা সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "তবে, মা, তোমার নাকি ভাব হয় না?" শ্রীমা লজ্জা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

যোগীন-মা কখনো কখনো রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। তিনি পৃথক শুইতে চাহিলেও শ্রীমা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া নিজপার্শ্বে শোয়াইতেন। এক রাত্রে কে বাঁশি বাজাইতেছিল। বাঁশির স্বরে শ্রীমায়ের ভাব হইল—তিনি থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। যোগীন-মা সসঙ্কোচে বিছানার এক কোণে বসিয়া রহিলেন—ভাবিলেন, "আমি সংসারী মানুষ, ওঁকে এই সময় ছোঁবো না।" অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাবের উপশম হইল। শ্রীমা নিজে বলিয়াছিলেন, "তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশি বাজাত; শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত; মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশি বাজাচ্ছেন। অমনি সমাধি হয়ে যেত।"

ভারসমর্পণ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের আগমনের পর হইতে একটি বিষয় ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল—শিক্ষা, দীক্ষা, উদ্দীপনা ইত্যাদি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রমেই স্বীয় ভাবধারার পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতেছিলেন। ষোড়শীপূজা উপলক্ষে আমরা দেবীর আবাহন হইতে দেখিয়াছি। শ্রীমা সেদিন আরাধিত ও স্বরূপসম্বন্ধে সচেতন হইলেও আপনার শক্তিকে যুগোপযোগী, সক্রিয় করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন নাই। আর সে পূজা হইয়াছিল নিভৃতে, নিশীথে—লোকে উহা শুনিয়া থাকিলেও উহার মর্ম সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহার পর শ্রীমাকে স্বকার্যসাধনের জন্য স্পষ্ট আহ্বান জানাইবার সময় আগত, এবং ভক্তদিগকেও সে বিষয়ে অবহিত করা আবশ্যক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পূর্ববর্তী কয়েকটি বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই বিষয়ক চেষ্টা একটা সুপরিকল্পিত ধারায় পরিচালিত হইতে দেখা যায়। মাতাঠাকুরানীকে তিনি পূজা করিয়া, অন্য ভাবে সম্মান দিয়া এবং নানা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার দেবীত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অবচেতনাকে ঐ বিষয়ে জাগরূক রাখিতেছিলেন। স্বীয় সাধনার দ্বারা উজ্জীবিত ও অনন্তশক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র শ্রীমাকে শিখাইয়া এবং কিরূপ অধিকারীকে কীদৃশ মন্ত্র দিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া দিয়া তাঁহার গুরুশক্তিকে কার্যোন্মুখী করিতেছিলেন। অধিকন্তু বালক ও মহিলা ভক্তদিগকে শ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া এবং ঐ সঙ্গে নানা উপদেশ দিয়া তাঁহার মাতৃভাবপ্রসারের ক্ষেত্র রচনা করিতেছিলেন। ইহারই সঙ্গে তিনি আবার তাঁহাকে স্পষ্টই ভারগ্রহণে আহ্বান করিতেন এবং ভক্তগণকেও ঐ ভাবী পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিতেন। আমরা অতঃপর এই সকল ঘটনারই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

এই আলোচনার পূর্বে একটি বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমরা যেন এই মহাভ্রমে পতিত না হই যে, শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-গুণেই শ্রীমা আজ জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। অধ্যাপনাশাস্ত্রের ইহা এক মৌলিক কথা যে, শিষ্যের শুভ সংস্কার না থাকিলে গুরুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত ও কার্যক্ষম হয় না। আবার সেই শুভ সংস্কারের সহিত প্রয়োজন হয় শিষ্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা। আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে, ঠাকুরের যুগধর্ম-প্রবর্তন-চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী সেই দক্ষিণেশ্বরের জীবনকালেই আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং শ্রীরাম-

কৃষ্ণও তাঁহার বিকাশোন্মুখ অসীম শক্তির সহিত পরিচিত থাকায় নিজ কার্য-ভার এই শক্তিরূপিণীর হস্তে তুলিয়া দিতে অতীব ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা গোলাপ-মাকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!" আর ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।" পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে, বালিকাবধূর অঙ্গ হইতে ভূষণ-অপসারণের পর শ্রীরামকৃষ্ণজননী চন্দ্রাদেবী বধূকে ক্রোড়ে তুলিয়া সজলনয়নে প্রবোধবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, গদাই অতঃপর তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইবে। জননীর সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ এবং দেবীর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই সময়ে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "দেখতো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভাল করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিজে অসুস্থ; তবু হৃদয়কে তিন শত টাকা ব্যয়ে তাবিজ গড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু কার্যতঃ ঐ জন্য দুই শত টাকা মাত্র খরচ হওয়ায় বাকি এক শত টাকা শ্রীমাকে নগদ দেওয়া হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে সাধনকালে ঠাকুর যখন সীতার দর্শন পান, তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ডায়মন কাটা বালা আছে। তাই তিনি শ্রীমাকে ঐরূপ বালাও দেওয়াইয়াছিলেন।[১] গহনা দিয়া সকৌতুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।"

সরলা, আধুনিক শিক্ষাবিহীনা ও আভিজাত্যাদিশূন্যা শ্রীমাকে চিনিতে পারা সহজ নহে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বয়ং তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ বর্তমান যুগে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতায় পরিপূর্ণ এই চরিত্রখানি সম্যক্ উপলব্ধি করা আমাদের শক্তির বাহিরে; তাই তিনি শ্রীমা সম্বন্ধে রহস্যচ্ছলে বলিতেন, 'ছাইচাপা বেরাল।' ভস্মাবৃত মার্জারের বর্ণ যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়, শ্রীমায়ের অন্তরের সৌন্দর্যও তেমনি সাধারণের অজ্ঞাত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; কিন্তু মার—তার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। একি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! যে বিষ

---

১ শ্রীযুক্তা যোগীন-মা বলিয়াছেন, "মা সে সময়ে নবতে সীতাঠাকরুনের মতো থাকতেন। পরনে কস্তাপেড়ে চওড়া লাল শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুর, কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, গলায় সোনার কণ্ঠহার, নাকে মস্তবড় নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি (যে চুড়ি মথুরবাবু ঠাকুরকে মধুরভাবসাধনের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন)।" ('শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতি', ২৭-২৮ পৃঃ এবং 'শ্রীম-কথা' দ্রঃ)।

নিজেরা হজম করতে পাচ্ছি নে, সব মা-র নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখি নি। তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন। আর এখানে—মা-র এখানে কি দেখছিস? অদ্ভুত অদ্ভুত। সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা! মা! জয় মা!!" আর বিশ্ববিজয়ী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন, "দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।...মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ওই যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা ; কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।" এই সকল অমূল্য কথা পড়িতে পড়িতে চকিতে লেখনী রুদ্ধ হইয়া যায়—মনে ভয় আসে, 'এ কি অসাধ্যসাধনে অগ্রসর করিলে, মা!' মায়ের চরিত্রাঙ্কন কি আমাদের মতো অকৃতী ভক্তের সাধ্যায়ত্ত? তথাপি তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আরব্ধ-কার্য সমাপ্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে স্পষ্টতঃ শ্রীমায়ের দেবীত্ব ঘোষণা করার পূর্বে কামারপুকুরেও ইহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন ; কিন্তু অশিক্ষিত ও অমার্জিত-বুদ্ধি গ্রামবাসিনীরা নিশ্চয়ই তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। শ্রীমা তখন চতুর্দশ-বৎসর-বয়স্কা কিশোরী। ঠাকুর যখন পল্লী-রমণীদিগকে উপদেশ দিতেন, শ্রীমা সেসব শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িতেন। অন্য মেয়েরা অমনি তাঁকে ঠেলিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত এবং বলিত, "এমন কথাগুলি শুনলে না, ঘুমিয়ে পড়ল।'" ঠাকুর বলিতেন, "না গো, না, ওকে তুলো না। ওকি সাধে ঘুমুচ্ছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না—চোঁচা দৌড় মারবে।" মেয়েরা পরে শ্রীমাকে ইহা বলিয়াছিল। ঠাকুর এই কথাগুলি কি অর্থে বলিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। হয়তো তিনি এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন যে, শ্রীমায়ের মন স্বভাবতই এরূপ ঊর্ধ্বগামী যে, নরলীলার উপযোগী পরিবেশ-রচনার পূর্বে ঈদৃশ উচ্চ তত্ত্ব কর্ণগোচর হইলে মায়াবলম্বনে স্বকার্যসাধনের পূর্বেই তিনি এমন গভীরসমাধি-নিমগ্ন হইয়া পড়িতে পারেন যে, লীলাবিগ্রহ-ধারণই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

যাহা হউক, প্রক্রান্ত বিষয়ের উপলব্ধির জন্য শ্রীমায়ের দেবীত্বের এইটুকু পরিচয়ই আপাততঃ যথেষ্ট। অতঃপর আমরা এই চরিত্রালোচনায় যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব যে, বিবিধ ক্ষেত্রে বিচিত্রভঙ্গিতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকিলেও ইহার অনন্যসাধারণ পরিপূর্তি একটা বিশেষ ক্ষেত্রে হইয়াছিল। তিনি দেবী হইলেও তাঁহার লীলার এই অংশে জগদ্বাসী তাঁহাকে পাইয়াছিল জননীরূপে। ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার। 'শ্রীরামপূর্বতাপনী' উপনিষদে (৭ম শ্লোক) উক্ত হইয়াছে, "উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—উপাসকদিগের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম রূপপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে (৪।১১) আছে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌"—যে ভক্ত যেরূপে আমার স্মরণ লইয়া থাকে, আমি সেরূপ ভাবাবলম্বনেই তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করি। শ্রীচণ্ডীতেও (১২।৩৬) ঋষি বলিতেছেনঃ

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃপুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্‌॥

—"হে রাজন্‌, সেই ভগবতী জন্মাদিশূন্য হইলেও পুনঃপুনঃ এইরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করেন।" তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে দেবীর বিবিধ বিগ্রহ বা প্রতীক প্রচলিত আছে ও পূজিত হইতেছে। দেবীর স্তবস্তুতিও অসংখ্য; দেবীকে আমরা পাইয়াছি বিবিধরূপে, বিবিধ ভাবে। তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি। তিনি ধনদাত্রী, বিদ্যাদাত্রী, নিরাময়কর্ত্রী, ত্রাণকারিণী, অসুরসংহারিণী। চণ্ডীতে তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যারূপিণী ও সমস্ত নারীরূপিণী বলা হইয়াছে। তুষ্ট হইয়া তিনি ভক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, আবার রুষ্ট হইয়া তিনি অধার্মিক, অনাচারীর দণ্ড-বিধান করেন। নারীরূপে, শক্তিরূপে, দেবীরূপে, মাতৃরূপে আমরা অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছি। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ভক্তিতে মুগ্ধ তিনিই আবার স্বর্গের ঐশ্বর্য ছাড়িয়া মর্তের কুটিরে পদার্পণ করেন; এমন কি, তিনি ভক্তের ভাঙা বেড়া বাঁধিয়া দিয়া যান। কন্যা-বেশে, জননী-বেশে তিনি শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করেন। স্বর্গের দেবীর সঙ্গে বাঙালী এমনই করিয়া আত্মীয়তা পাতাইয়াছে। কিন্তু দেবী তবু দেবীই থাকিয়া গেলেন। মানুষের মতো মানুষের শরীরে তখনও বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন না। শ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেবীর এই অবতরণ-ধারারই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। দেবী এখানে সাক্ষাৎ, সচলা, রক্তমাংসের দেহবিশিষ্টা—শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিতা, ভবতারিণী ও স্বীয় গর্ভধারিণীর সহিত অভিন্না—শ্রীমা।

মানুষ দেবীকে এইভাবে চাহিল কেন, আর ভগবতীই বা সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন কেন? আমরা বলিয়াছি, এই মাতৃমূর্তিতে আবির্ভাব না হইলে অধ্যাত্ম-জগতে একটা অপূরণীয় অভাব থাকিয়া যাইত। পূর্বজ্ঞাত বস্তু, ভাষা ও ভাবের সাহায্যে মানুষ উচ্চতর সত্যের পরিচয় পায়। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবান্তে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যপান করান। শিশু চক্ষু মেলিয়াই মাকে পায় স্নেহ, পুষ্টি, তুষ্টি, সৌন্দর্য, পালন প্রভৃতি গুণরাশির একমাত্র আকররূপে। সাধনক্ষেত্রে সাধক তাই জগদম্বাকে দেখিতে চায় ইহারই

পরাকাষ্ঠারূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা।" স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার 'কর্মযোগে' বলিয়াছেন, "জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে; কারণ কেবল এই অবস্থায়ই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা আয়ত্ত করিতে ও কার্যে প্রকাশ করিতে পারে।" 'আমি, আমার' বুদ্ধিকে ইষ্টে বিলয়পূর্বক একান্ত বিশ্বাস ও তদাশ্রয়তা সহায়ে মাধুর্যময় চিদ্রস আস্বাদন করা যদি সাধকের কাম্য হয়, তবে ঈশ্বরীয় মাতৃত্বে সেই অভীষ্টপ্রদানের অমোঘ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্যাদিতে যথাক্রমে অধিকাধিক আত্মীয়তা-বোধের বিকাশ হয় সত্য; কিন্তু মাতৃবক্ষাশ্রিত একান্তনির্ভর শিশুর তন্ময়ত্ব-বোধ এই সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যায়।

আবার সাধক চায়, তাহার ইষ্ট কৃপাপরবশ হইয়া এবং তাহার সমস্ত দুর্বলতা, সর্বপ্রকার অক্ষমতা ভুলিয়া পরিপূর্ণ স্নেহে তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইবেন। ধ্যেয় ইষ্টমূর্তির মুখে সে এই বিচারশূন্য-স্নেহপূর্ণ হাস্য দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। শৈশব হইতে মায়ের মুখে সে এই উচ্চভাব দেখিতে অভ্যস্ত; সাধনার ক্ষেত্রেও সে কেন উহাতে বঞ্চিত থাকিবে? অহেতুক-করুণাময় গুরু শিষ্যকে উচ্চ তত্ত্বের পরিচয় ও উপদেশ দিয়া তাহার মনে জাগতিক ভোগসুখের প্রতি বৈরাগ্যের সঞ্চার করেন। অশেষ ঐশ্বর্যময়ী সর্বগুণালঙ্কৃতা ইষ্টদেবী জাগতিক সসীমতা ও পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে অবস্থানপূর্বক সাধকের সম্মুখে এক অনবদ্য, অতিলোভনীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তাহার মনে তল্লাভের জন্য অবিরাম প্রেরণা জাগাইতে থাকেন। কৃপা সুমুখী, সদাহাস্যবদনা মা সন্তানের হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত করিয়া তাহার দুঃখময় অতীত ভুলাইয়া দেন এবং প্রবল আকর্ষণে এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্ততাময় আনন্দসাগরের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলেন। বিশেষতঃ এই পবিত্র ভাবে আবিলতার স্পর্শমাত্র নাই; আর নাই এখানে স্বার্থলেশ অথবা অর্থহীন উচ্ছ্বাস। এ সংযমের প্রতিমূর্তি ও প্রসাদময়ী মায়ের তুলনা নাই। সাধক মাতার অঞ্চল ধরিয়া, মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে বসিয়া সংসারকান্তার অতিক্রম করিতে পারে। অধিকন্তু ভোগলোলুপ ও ইহলোকসর্বস্ব দেহাত্মবাদী মানব-সমাজকে উচ্চতর অনুভূতিরাজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীভগবতীর এই যুগে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। ভারত তাই আজ অপূর্ব চেতন বিগ্রহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য।

শ্রীমায়ের জীবনের এই মর্মার্থ শ্রীশ্রীঠাকুর অবগত ছিলেন এবং শ্রীমাকেও তিনি উহা বলিয়া গিয়াছিলেন। উত্তরকালে জনৈক উৎসুক ভক্ত একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন; কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন?" তদুত্তরে শ্রীমা বলিলেন, "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের

উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" অন্য এক সময়ে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।"

কাশীপুরে একদিন ঠাকুর মায়ের দিকে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি বলবে, বলই না!" অনুযোগের সুরে ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজদেহ দেখাইয়া) এ-ই সব করবে?" শ্রীমা নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর তখনই উত্তর দিলেন, "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া পায়ে ব্যথা হইবার পরে শ্রীমা সেবার ঐকান্তিক আগ্রহে তিনদিন বিশ্রাম লইয়াই ঠাকুরের জন্য খাবার লইয়া উপরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। মা ডাকিলেন, "এখন খাবে যে, ওঠ।" ঠাকুর যেন কোন্ দূরদেশ হইতে আসিয়া ভাবের ঘোরে মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। তুমি তাদের দেখো!" মা অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজ অঙ্গ দেখাইয়া আপন ভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।" মা সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য কথায় একটু জোর দিয়াই বলিলেন, "সে যখন হবে, তখন হবে। তুমি এখন খাও তো!" ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন।

ইহারও পূর্বে ঠাকুর সুর করিয়া গাহিতেন—

> এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় ব'লব কায়;
> যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?
> হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
> বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া একি দায়!
>
> —'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', ৩১৫ পৃষ্ঠা

আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাকে সজাগ করিয়া দিতেন, "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"

শুধু স্বরূপ স্মরণ করাইয়া বা বাক্য দ্বারা ভারার্পণ করিয়াই ঠাকুর নিরস্ত হইতেন না; তিনি ভক্তদিগকে মায়ের চরণে উপনীত করিয়া তাঁহার শক্তি-বিকাশের ভূমি রচনা করিতেন। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্নকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে) মন্ত্রগ্রহণের জন্য নহবতে শ্রীমায়ের নিকট পাঠাইবার কালে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনার্থে তিনি বলিয়াছিলেন—

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নিশ্চয়ই সেদিন সমীপাগত সারদাকে দীক্ষা দেন নাই; কারণ তিনি স্বমুখে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী যোগানন্দই তাঁহার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। সারদা মহারাজের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র অবশ্য বলেন যে, তিনি মায়েরই নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ইহা পরবর্তী ঘটনা। সে যাহা হউক, আমরা আপাততঃ এই বিষয়টি মায়ের দিক হইতে অনুধাবন না করিয়া ঠাকুরের দিক হইতেই করিতেছি।

ভক্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়ের যখন রুটি করা, পান সাজা, ইত্যাদি কাজে শারীরিক শ্রম খুবই বাড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীযুক্ত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তিনি প্রায়ই পঞ্চবটী প্রভৃতি তপস্যাপূত স্থানে অনেকক্ষণ ধ্যানে বসিয়া থাকিতেন—উহাতেই দিন কাটিয়া যাইত। একদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে যাইবার পথে ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীমা ময়দা ঠাসিতেছেন, আর একটু দূরে গঙ্গাতীরে লাটু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া ভ্রমশোধনার্থে বলিলেন, "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।" তারপর লাটুকে নহবতে লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব, তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো এ করে দেবে।" তদবধি লাটু শ্রীমায়ের পরিবারভুক্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীযুক্ত রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুরই তাঁহাকে তখন শ্রীমায়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালের পত্নী আসিলে তাঁহাকেও শ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "টাকা দিয়া যেন বউ-এর মুখ দেখে।" ঠাকুরেরই নির্দেশে শ্রীযুক্ত গোপাল দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দজী) মায়ের বাজার করিতেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন (স্বামী যোগানন্দজী) নানা কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে আহারের জন্য নহবতে পাঠাইলেন। শ্রীমা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সেদিন পূর্ণকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া ও সস্নেহে পার্শ্বে বসাইয়া বিবিধ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোজন করাইলেন এবং ভোজনান্তে আচমনের জন্য তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে নহবতের পার্শ্বে আসিয়া কি ভাবে কি করিতে হইবে বলিয়া দিতেছিলেন এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া স্বকক্ষে যাইতে যাইতে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া নূতন নূতন নির্দেশ দিতেছিলেন। শ্রীমা হয়তো সেদিন মাতৃত্বের পরিপূর্তির সহিত বালক-নারায়ণের পূজাও শিখিয়াছিলেন।

ভক্তদের প্রতি শ্রীমায়ের আত্মীয়তাবোধ জাগানোর জন্য ঠাকুর বহুভাবে

সচেষ্ট ছিলেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের সহধর্মিণীর কঠিন অসুখের সময় ঠাকুর শ্রীমাকে বলিলেন, "যাও, দেখে এস গে।" শ্রীমা পল্লী-গ্রামে পথ চলিতে অভ্যস্ত থাকিলেও বর্তমান স্থলে নগরের ভব্যতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মর্যাদা-রক্ষার চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় বলিলেন, "যাব কিসে? গাড়ি-টাড়ি নেই।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে—হেঁটে যাও।" শেষ পর্যন্ত শ্রীমাকে আর হাঁটিতে হইল না। একখানি পালকি সংগৃহীত হওয়ায় তিনি উহাতে চড়িয়া বলরাম-ভবনে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, শ্যামপুকুরে থাকা-কালে আর একবার মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পদব্রজে বসুগৃহিণীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

ভক্তদিগকে মধ্যে রাখিয়া রসিক ঠাকুর কিরূপে নিজ কার্যসাধন করিতেন, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত যেমন উপভোগ্য তেমনি আলোচ্য বিষয়ে গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ। শ্রীযুক্ত গৌরী-মা তখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন; কখনও বা শ্রীমায়ের সহিত নহবতে বাস করেন। একদিন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হইয়া গৌরী-মাকে কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ তো গৌরী-দাসী, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস?" রঙ্গময়ী গৌরী-মা সহজ কথায় উত্তর না দিয়ে সেই ভাবের পূর্তির জন্য সুকণ্ঠে গান ধরিলেন—

রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল, 'রাই কিশোরী'।

গানের তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য। শ্রীমা লজ্জায় গৌরী-মার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ঠাকুর হার মানিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অপর দৃষ্টান্তটি আমরা পাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে' (৩৫৩-৫৫ পৃঃ)। একদিন শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের (দানা-কালীর) পত্নী অতি বিষণ্ণবদনে ও আকুলপ্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার স্বামী কুসঙ্গে ও কুকার্যে মত্ত থাকিয়া পারিবারিক জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছেন; সুতরাং ঠাকুর যদি দয়া করিয়া কোন ঔষধ দেন তবেই তিনি অকূলে কূল পান। দানা-কালী তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন নাই এবং কলিকাতার লোক তখনও ঠাকুরের সংসারসম্বন্ধশূন্য সাত্ত্বিক ভাবের সহিত পরিচিত হয় নাই। তাই ঘোষপত্নী তাঁহাকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন সাধুমাত্র ভাবিয়াই ঔষধ যাচ্ঞা করিলেন। ইহা ঠাকুরের দৃষ্টিতে বিসদৃশ হইলেও রহস্য করিবার জন্যই হউক, কিংবা ঘোষপত্নীর কাতরতায় বিচলিত হইয়াই হউক, অথবা কোন অজ্ঞাত দৈবপ্রেরণায় তিনি তাঁহাকে নিরস্ত না করিয়া নহবতে যাইতে পরামর্শ দিয়া বলেন, "সেখানে এক স্ত্রীলোক আছেন; তাঁকে তুমি সব খুলে বললে

তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর এসব মন্ত্রৌষধি জানা আছে; এ বিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশী।" শ্রীমা তখন পূজায় বসিয়াছেন। তাঁহার মন তখন জাগতিক পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে এক অতি করুণাপূর্ণ রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। ঘোষপত্নীর সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুর রঙ্গ করিতেছেন; তথাপি তিনি এই আর্ত হৃদয়কে নিরাশ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি আর কি জানি, বাছা, তিনিই ওষুধ জানেন তুমি তাঁরই কাছে যাও।" বিপন্না নারীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ঠাকুর বোধ হয় বুঝিলেন যে, রঙ্গ জমিয়াছে; সুতরাং আরও রসসঞ্চারের জন্য তিনি তাহাকে পুনর্বার নহবতে পাঠাইলেন। এইরূপে ঘোষজায়াকে বারত্রয় যাতায়াত করিতে দেখিয়া করুণাময়ী মায়ের হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে শুধু রঙ্গরসে আবৃত করিয়া সে ব্যথিত প্রাণে আরও আঘাত দিতে চাহিলেন না। অতএব তাপিতা নারীকে আশ্বস্ত করিয়া এবং পূজার একটি বিল্বপত্র তাঁহার হাতে দিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "বাছা, এইটি নিয়ে যাও, এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।" ঘোষগৃহিণী সে আশীর্বাদ মাথায় তুলিয়া লইলেন। যথাকালে মায়ের অমোঘ বাণী সফল হইয়াছিল; দানা-কালী শ্রীরামকৃষ্ণের অনুচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ঘটনাবলম্বনে ঠাকুর শ্রীমায়ের কৃপাহস্ত উন্মোচিত করাইলেন। শেষোক্ত ঘটনাটি আলোচনা করিয়া আমাদের স্বতই মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মস্থাপন-প্রচেষ্টার সহিত শ্রীমা, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে, ক্রমেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট হইতেছিলেন, আর এই শক্তিবিকাশের ধারা স্বভাবতই তাঁহার মাতৃস্নেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। মাতৃস্নেহের আকারে আকারিত করিয়াই শ্রীমা আপন অনন্ত শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন।

নারী হৃদয়ে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সে মাতৃত্ব সর্বদা একইরূপে প্রকটিত হয় না। স্থলবিশেষে উহা শুধু স্বীয় সন্তানে আবদ্ধ থাকিয়া স্বার্থপরতারই রূপান্তর হইয়া দাঁড়ায়। অন্য ক্ষেত্রে উহা স্বীয় সন্তানের সহিত অপর অনেককেও টানিয়া লইয়া জনহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অল্প স্থলেই উহা দেহসম্বন্ধশূন্য অসীম স্নেহরূপে জীবমাত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া মাতাকে অনুপম অধ্যাত্মভূমিতে উন্নীত করিতে পারে এবং তদপেক্ষাও বিরল স্থলে উহা সর্বংসহ, সুপবিত্র, স্বার্থলেশশূন্য, সংসার-সম্পর্ক-বিরহিত জগজ্জননীকল্প দেবীবিশেষ হইতে জীবন্ত অনুপ্রেরণাপূর্ণ গুরুশক্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া সন্তানকে বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করে। আমরা শ্রীমায়ের জীবনে যে মাতৃত্বের পরিচয়গ্রহণে অগ্রসর হইতেছি, তাহা এতদপেক্ষাও উচ্চস্তরের—চিন্তারাজ্যের অতীত ভগবৎসত্তারই অননুভূত

পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে সে বিকাশের মধ্যে একটা স্তরবিভাগ আছে। প্রতি স্তরের বিশেষ অভিব্যক্তির মর্ম বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সর্বদা ঐ উচ্চ তত্ত্বের কথা হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে এবং উহারই আলোক-সম্পাতে এই ক্রমবিকাশের সোপানশ্রেণী আরোহণ করিতে হইবে।

ভোগস্পৃহামুক্ত মাতৃত্বের প্রথম আকুতি কিভাবে কখন শ্রীমায়ের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল? সম্ভবতঃ এই বিষয় অবহিত হইবার পূর্বেই তিনি মাতৃত্বে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। মনোরাজ্যের ইহাই স্বাভাবিক গতি। আমরাও দেখিয়াছি যে, বাল্যে শ্রীমা ক্ষুদ্র ভাইভগিনীদের লালনভার স্বহস্তে লইয়াছেন এবং বুভুক্ষু-দের পাত্রে পরিবেশিত তপ্ত অন্ন জুড়াইবার জন্য পাখা করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণের সহিত ব্যবহারেও এই প্রকার ঘটনা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে। কিন্তু অধুনা আমরা সে আকাঙ্ক্ষার সজ্ঞানে উদয় ও তদনুযায়ী আচরণের কথাই ভাবিতেছি।

সহানুভূতিসম্পন্না প্রতিবেশিনীদিগকে তিনি দুঃখ করিতে শুনিতেন যে, বিবাহিত জীবনে সন্তানহীন থাকা এক অতি দুর্ভাগ্য বা অলক্ষণের কথা; এমন কি, শ্রীমায়ের গর্ভধারিণীও প্রায়ই অনুশোচনা করিতেন, "এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘরসংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না 'মা'-বলাও শুনলে না।" ঠাকুর একদিন ইহা শুনিয়া বলিলেন, "শাশুড়ী ঠাকরুন, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না; আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা' ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"

লোকের কথা শুনিতে শুনিতে মায়ের মনে কিভাবে সন্তান-লাভের স্পৃহা জাগরিত হইল, তাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"মেয়েদের কাছে কামারপুকুরে আর এখানেও খালি শুনতুম, ছেলের মা না হলে কোন কাজই সে মেয়েমানুষ করতে পারে না। বাঁঝা কোন শুভ কাজে এয়ো হতে পারে না। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম। ঐসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দুঃখ হত—তাইতো একটা ছেলেও আমার হবে না? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঐ কথাটা একবার মনে পড়ে। যেদিন মনে হওয়া—কাউকে কিছু বলিনি—ঠাকুর আপনা হতে বললেন, 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষ পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে'।" ('শ্রীমা', ৮০ পৃঃ)

অনাদিকাল হইতে মানুষের সন্তানলাভের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্বেই শ্রীমা 'মা'-ডাকের আস্বাদ কিছু কিছু পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সন্তানকামনা তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই। মায়ের শ্রীমুখেই আমরা সে অতৃপ্তির পরিচয় পাই—"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, একা একা

বসে ভাবতুম—তখন কামারপুকুরে রয়েছি—'ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে?' একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই সব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা, মা বলে ডাকবে'।" মায়ের এই অভিলাষ এবং ঠাকুরের এই আশ্বাস ঠাকুরের প্রকটলীলাকালে কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, আমরা আপাততঃ তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দক্ষিণেশ্বরে আগত অল্পবয়স্ক ভক্তদিগকে শ্রীমা নিজ সন্তানের মতোই দেখিতেন এবং তাহাদের প্রতি একটা অনুপম আকর্ষণ বোধ করিতেন—প্রয়োজনস্থলে জননী অপেক্ষাও সযত্নে ও আপনার জ্ঞানে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলী ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। প্রথমে সকলে তাঁহাকে শুধু অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া জানিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই অতি সহানুভূতির সহিত আলাপাদি করিতেন। পরে প্রকাশ পাইল, সে মধুরভাবের সাধিকা। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বভাবতই শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি মাতৃভাবাপন্ন। পাগলী অংশত না ভাবিয়া যেদিন তাহার অন্তরের কথা ঠাকুরকে খুলিয়া বলিল, সেদিন এই বিজাতীয় ভাবের আঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিশুমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গ্রাম্যভাষায় এই বিপরীত সম্বন্ধের নিন্দা করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র খসিয়া পড়িল। শ্রীমা নহবত হইতে সবই শুনিতেছিলেন। কন্যার অপমানে লজ্জায় মরিয়া গিয়া তিনি গোলাপ-মাকে বলিলেন, "দেখ দেখি, সে যদি অবিবেচনার কথা বলেই থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়! এভাবে গালাগালি করা কেন?" পাগলীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি গোলাপ-মাকে অবিলম্বে পাঠাইলেন এবং সে নিকটে আসিলে স্নেহভরে বলিলেন, "বাছা, উনি তোমায় দেখে যখন বিরক্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে; আমার কাছে এলেই তো পার।"

সে সময় বালক ভক্তদের অনেকেই দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করিতেন এবং ঠাকুরের নির্দেশে সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ভূরিভোজনে ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে জানিয়া ঠকুর তাঁহাদের আহারাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। শ্রীমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, রাখালকে ছয়খানা, লাটুকে পাঁচখানা, আর বুড়ো-গোপাল ও বাবুরামকে চারিখানা করিয়া রুটি দিতে। মাতৃত্বের উপর এইরূপ কড়া শাসন কিন্তু শ্রীমায়ের সহ্য হইত না; অতএব তিনি বালক ভক্তদিগকে তাহাদের ক্ষুধার অনুপাতে ঠাকুরের নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক খাইতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শ্রীযুক্ত বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি রাত্রে পাঁচ-ছয়খানি রুটি খাইয়া থাকেন, আর এই অধিক খাওয়ানোর জন্য শ্রীমাই দায়ী। সুতরাং তিনি শ্রীমায়ের নিকট যাইয়া অনুযোগ

করিলেন যে, তিনি এইরূপ বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদে শ্রীমা বলিলেন, "ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মনে মনে সর্ববিজয়িনী মাতৃত্বশক্তিকে সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক তখনই স্মিতবদনে সেস্থান হইতে বিদায় লইলেন। শ্রীমা স্বেচ্ছায় স্বীয় ভাবী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয়ই সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন।

পূজনীয়া যোগীন-মার প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমা আপনা হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করিতেন এবং তদ্দর্শনে ঠাকুর বিশেষ প্রীত হইতেন। ভক্তিমতী যোগীন-মা যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান, সেদিন আহার হয় নাই শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নহবতে পাঠাইয়া বলিলেন, "সেখানে ভাত-তরকারি আছে, খাওগে।" শ্রীমা অমনি ভাত, লুচি তবকারি প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা ক্ষিপ্রহস্তে ও সযত্নে তাঁহাকে খাওয়াইলেন। সেই প্রথম দর্শনেই শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। উহা এতই গভীর ছিল যে, কিছুদিন পরে শ্রীমা যখন রামলালদাদার বিবাহোপলক্ষে দেশে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন, তখন যোগীন-মা যতক্ষণ নৌকা দেখা যায়, ততক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিলেন এবং নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেলে কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবং যথাকালে শ্রীমা ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, "সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন সে নবতে বসে খুব কেঁদেছিল।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম যোগেন।" যোগীন-মার উপর মায়ের এত বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল যে, প্রতি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। যোগীন-মা তাঁহার কেশবন্ধন করিয়া দিলে উহা তিন-চারদিন পরেও স্নানের সময় খুলিতেন না; বলিতেন, "না, ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই দিন খুলব।"

যোগীন-মা একদিন দেখিলেন, শ্রীমা কতকগুলি পান শুধু চুন-সুপারি দিয়া সাজিলেন এবং কতকগুলি ভাল করিয়া সাজিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলিতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগুলি কার, এগুলিই বা কার?" মা উত্তর দিলেন, "যোগেন, এগুলি (ভালগুলি) ভক্তদের—ওদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। আর ওগুলি (অন্যগুলি) ওঁর (ঠাকুরের) জন্য, উনি তো আপনার আছেনই।"

ভক্তদের গমনাগমন ও ভজনকীর্তনাদি তখন লাগিয়াই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানে উৎসৃষ্টজীবনা ভক্তজননী শ্রীমায়ের তাই অবসর নাই—দিবারাত্র রান্নাই চলিতেছে কত! এত কাজের মধ্যেও তাঁহার মন সর্বদা ঠাকুরের শ্রীচরণেই

পড়িয়া থাকিত। সেই অলৌকিক মনঃসংযোগের ফলে তিনি, ঠাকুর মুখ খুলিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই, যেন সমস্ত শুনিতে পাইতেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। শ্রীযুক্ত সারদা প্রভৃতি অনেক অল্পবয়স্ক বালক ভক্তের নিকট তখন দারিদ্র্যনিবন্ধন বা অভিভাবকের বিরোধবশতঃ দক্ষিণেশ্বর হইতে গৃহে ফিরিবার উপযুক্ত পয়সা থাকিত না। কাজেই ঠাকুর তাঁহাদিগকে শ্রীমায়ের নিকট হইতে পয়সা লইতে বলিতেন। বরাহনগর বাজার হইতে বিডন স্কোয়ার পর্যন্ত তখন শেয়ারের গাড়ীতে এক আনা ভাড়া লাগিত। পিতার ভয়ে কাতর সারদা আসিলেই লজ্জাশীলা শ্রীমা তাঁহার বাড়ি যাইবার মুহূর্তে চারিটি পয়সা নহবতের দরজার গোড়ায় রাখিয়া সরিয়া যাইতেন। যথাকালে ঠাকুরের আদেশে সারদা তথায় আসিবামাত্র বিনা প্রার্থনায় পয়সা পাইতেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র আসিতেই ঠাকুরকে যাই বলিতে শোনা গেল, "তুই আজ এখানে থাকবি", অমনি শ্রীমা ছোলার দাল চড়াইয়া দিয়া ময়দা ঠাসিতে বসিলেন, কারণ নরেন্দ্র মোটা-মোটা রুটি ও ছোলার দাল পছন্দ করেন। ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইবার পথে শ্রীমাকে নরেন্দ্রের জন্য রাঁধিবার কথা বলিতে গিয়া দেখিলেন, সমস্ত আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহিলা ভক্তগণ দিবাবসানে দক্ষিণেশ্বরে আসিলে তাঁহাদের রাত্রিবাসের স্থান ঠিক করা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পায়তন নহবতে স্থানাভাব[১] জানিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিজের ঘরের রোয়াকে শুইতে বলিতেন, কিন্তু মা তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখিতেন যে, নহবতেই স্থান হইয়া যাইবে। সেখানে রাত্রে আহার সারিয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে একটু আলাপ করিতে আসিতেন। তাঁহারা নহবতে ফিরিবার পূর্বেই শ্রীমা সব পরিষ্কার করিয়া সকলের মতো স্থান করিয়া রাখিতেন। আবার তিনি সকলকে কাছে টানিয়া শোয়াইতেন· সুতরাং কাহারও অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইত না।

এইরূপে একদিকে ঠাকুরের যুগধর্মপ্রচারোপযোগী পরিবেশ-গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং অপর দিকে শ্রীমায়ের সন্তানবাৎসল্য, এই দুইয়ে মিলিয়া শ্রীমাকে ক্রমেই তাঁহার ভাবী কর্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিতেছিল। উভয়ের এই সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই সময়েই শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ মনোনয়নও হইয়া গিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ত্যাগী সন্তানদের বিষয় বলিয়াছি, কথাচ্ছলে আমর

১ নহবতের ঘরখানি অষ্টভুজ। উহার সমদীর্ঘ প্রত্যেক দেওয়ালের ভিতরের মাপ ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি ; এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়ালের সর্বাধিক দূরত্ব ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি ; মেঝের মাপ কিঞ্চিদূন ৫০ বর্গ ফুট। ঘরের চারিদিকে কম-বেশি ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া বারান্ডা। ঘরের উচ্চতা ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণের একমাত্র দরজা উচ্চে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থে ২ ফুট ২ ইঞ্চি। বারান্ডার পূর্ব ভাগে দোতলায় যাইবার সিঁড়ি, উহার নীচে রান্নার জায়গা।

শ্রীমায়ের ভাবী সহচরী যোগীন-মা ও গোলাপ-মার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও দিয়া আসিয়াছি। এই মাতৃলীলায় ইঁহারা জয়া-বিজয়া।[১] ইঁহাদেরই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা বিষয়ান্তরে যাইব।

ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে গিয়াছেন, তখন সেবায় বঞ্চিতা শ্রীমা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। এমন সময় গোলাপ-মা একদিন কথায় কথায় যোগীন-মাকে বলিলেন, "দেখ, যোগেন, ঠাকুর বোধ হয় মার উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।" যোগীন-মার মুখে ঐ কথা শুনিয়া শ্রীমা গাড়ি করিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ?" ঠাকুর বলিলেন, "না, কে তোমায় একথা বলেছে?" মা বলিলেন, "গোলাপ বলেছে।" তখন ঠাকুর রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সে এমন কথা বলে তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানে না তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না!" মা তখন শান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। পরে গোলাপ-মা ঠাকুরের নিকট যাইলে ঠাকুর তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কথা বলে ওকে কাঁদিয়েছ? জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাও গে।" গোলাপ-মা তখনই হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা ঠাকুর আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমি না বুঝতে পেরে অমন কথা বলে ফেলেছি।" মা কোন কথা না বলিয়া খালি হাসিয়া "ও গোলাপ" বলিতে বলিতে পিঠে তিনটি চাপড় দিতেই গোলাপ-মার সব দুঃখ যেন কোথায় চলিয়া গিয়া মন শান্ত হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তিনি প্রাণ-প্রতিমা একমাত্র কন্যা চণ্ডীর শোকে বিহ্বল। ঠাকুর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর শ্রীমাকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তুমি ওকে খুব পেটভরে খেতে দেবে; পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।" আর একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" বলা বাহুল্য যে, শ্রীমা ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গোলাপ-মাও সেই প্রথমাবস্থায়ই শ্রীমায়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই অন্তরঙ্গের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পূর্বোক্তরূপ অনৈক্য নিতান্তই বাহিরের বস্তু ছিল—উহা মনের বহির্দ্বার অতিক্রম করিতে পারিত না।

ঠাকুর যখন কাশীপুরে আছেন, তখন যোগীন-মার বৃন্দাবনে যাইয়া তপস্যা করার বাসনা জাগিল এবং এক সুযোগে তিনি উহা ঠাকুরকে জানাইলেন।

১ উত্তরকালে শ্রীমা ইহাদিগকে ঐরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন।

শুনিয়া ঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাবে? বেশ হবে, যাও; সব সেখানে পাবে।" শ্রীমা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্য লইয়া ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ঠাকুর যোগীন-মাকে বলিলেন, "ওকে বলেছ? ও কি বলে?" মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যা বলবার তুমিই তো বললে। আমি আবার কি বলব?" ঠাকুর যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি যোগীন-মাকে আবার পরামর্শ দিলেন, "ওগো, বাছা, ওকে রাজী করিয়ে যেও—তোমার সব হবে।" মা সেদিকে কান না দিয়া উচ্ছিষ্ট বাটি লইয়া নীচে যাইবার জন্য উঠিলেন। "যোগীন-মাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেদিন আর কোন কথা হইল না।

পরদিন সকালে যোগীন-মা বৃন্দাবন-যাত্রার পূর্বে কাশীপুরে বিদায় লইতে আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি শ্রীমাকেও প্রণাম করিতে গেলেন। তখন শ্রীমা তাঁহার মাথায় করজপ করিয়া দিলেন। ইহার দুইদিন পরেই যোগীন-মা বৃন্দাবনে গেলেন এবং সেখানে যমুনাতীরে বলরামবাবুদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় 'কালাবাবুর কুঞ্জে' আশ্রয় লইলেন।

চিরসীমন্তিনী

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও ত্যাগী সন্তানবৃন্দের হস্তে যুগধর্মপ্রবর্তনের গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করিয়া কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে লীলাসংবরণোন্মুখ দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের রোগজীর্ণ দেহ ক্রমেই শীর্ণতর হইতেছে এবং জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া শ্রীমা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজ জীবনে সিংহবাহিনী দেবীর করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন, জগদ্ধাত্রী দেবীর কৃপায় পিতৃকুলের সুদিন ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছেন; আরও কত দিকে, কত কার্যে কত দুর্দিনে ভগবানের মঙ্গলহস্তের নিদর্শন পাইয়াছেন। আজ কি সেই অনাথনাথ এই সঙ্কটকালে মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা সতীর চোখের জলে তাঁহার হৃদয় গলিবে না? অনেক ভাবিয়া শ্রীমা স্থির করিলেন যে, সর্বজীবের সর্বপ্রকার কামনাপূরণকারী তারকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে হত্যা দিবেন—একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, বিধি-পরিচালিত নিয়তি-চক্রের গতি পরিবর্তিত হয় কিনা, ঈশ্বরের সঙ্কল্পও আর্তের ক্রন্দনে বিচলিত হয় কিনা।

ঠাকুর পাঁচ বৎসর পূর্বেই তাঁহার মহাসমাধিকালের সূচক ঘটনাবলীর কথা বলিয়াছিলেন—তিনি যার তার হাতে খাইবেন, কলিকাতায় রাত্রিবাস করিবেন এবং নিজের খাবারের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া পরে নিজে খাইবেন। দক্ষিণেশ্বর ছাড়িবার পূর্বেই এই লক্ষণগুলি মিলিয়া গিয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথ-যাত্রা উপলক্ষে বলরাম-ভবনে অবস্থানের পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি শ্রীমাকে চতুর্থ আর একটি লক্ষণ বলিয়াছিলেন, "যখন দেখবে অধিক লোক একে দেব-জ্ঞানে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি করবে, তখন জানবে এর অন্তর্ধানের সময় হয়ে এসেছে।" সে লক্ষণও মিলিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। কাশীপুরে অবস্থিতিকালে শ্রীমা উহার আরও নিদর্শন পাইলেন। একবার জনকয়েক ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর চিকিৎসার্থে কাশীপুরে চলিয়া গিয়াছেন; তখন তাঁহারা ঠাকুরের ছবির সামনেই ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে কেন দিলে?" অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া শ্রীমা প্রভৃতি সকলেই ভীত হইলেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।" সুতরাং শ্রীমায়ের বুঝিতে বাকি ছিল না যে, শুধু দেবতাই বাম নহেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও লীলাসংবরণে উন্মুখ। সেদিক হইতে বিশ্বাসে বুক বাঁধিবার মতো কিছুই ছিল না। তবু

বিশ্বাস ভাঙ্গিলেও আশা যায় না। আর অকূলের কান্ডারীকে না ডাকিয়াও কেহ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রীমা তারকেশ্বরে গেলেন। ঠাকুর আপত্তি করিলেন না। সঙ্গে কাহারা ছিলেন জানা নাই, হয়তো লক্ষ্মীদিদি ছিলেন এবং একজন ঝি। সেখানে শ্রীমা দুই দিন নিরম্বু উপবাসে কাটাইলেন দেবতার কৃপায় আভাস মিলিল না। পরবর্তী নিশীথে শ্রীমা ঠিক একই ভাবে মহাদেবের করুণাভিখারিণী হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন সাজানো অনেকগুলি হাঁড়ির একটার উপর আঘাত করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন আওয়াজ হয়, এ যেন সেই রকম। ঐ শব্দে জাগিয়া উঠিয়াই সহসা শ্রীমায়ের মনে হইল "এ জগতে কে কার স্বামী ? এ সংসারে কে কার ? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি ?" এ যেন রুদ্রের প্রলয়বিষাণের অস্ফুট নিনাদে মন হইতে মায়া অপসৃত হইয়া সেখানে ফুটিয়া উঠিল অসীম বৈরাগ্যের ভাস্বর দীপ্তি। শ্রীমা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া অন্ধকারে মন্দিরের পশ্চাতে হাতড়াইতে স্নানজলের কুন্ড পাইলেন এবং সেখান হইতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া দুই দিনের পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিলেন। তখন প্রাণ একটু সুস্থ হইল। ভগ্নমনোরথ হইয়া তিনি পরদিনই তারকেশ্বর ছাড়িয়া চলিলেন। খণ্ড মানব মন কোন কোন বিশেষ সময়ে শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় প্রেরণায় জাগতিক সসীমতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত বিরাট মনের সহিত একীভূত হইয়া এমন এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি প্রাপ্ত হয়, যাহার প্রভাবে সে মরজগতের সম্বন্ধাদির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত সমস্ত পূর্বসংকল্পের অযৌক্তিকতাদর্শনে উহা স্বেচ্ছায় বর্জন করে। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির এই নিমজ্জনকেই আমরা বৈরাগ্য নামে অভিহিত করি। সে বৈরাগ্যপ্রভাবে সংকল্পচ্যুতা শ্রীমা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সব জানিয়া শুনিয়াও রহস্য করিয়া বলিলেন, "কি গো, কিছু হল কিছুই না।"

ঠাকুরের তিরোধানকাল অপ্রতিহতবেগে অগ্রসর হইতেছে, উহার অন্যথাকরণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে—ইহার আভাস শ্রীমা অন্যভাবেও পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঠাকুরও স্বপ্নে দেখেন, ওষুধ আনতে হাতি গেল। হাতি মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্য, এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ ?' দেখলুম মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। বললুম, 'মা, তুমি কেন এমন করে আছ ?' মা কালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলার ঘা দেখিয়ে) আমারও হয়েছে'।" শ্রীমা তখনই বুঝিলেন যে, স্বয়ং মা-কালী ঠাকুরের ব্যথায় ব্যথিত হইয়াও যদি তাঁহাকে নিরাময় করিতে না পারেন বা না চাহেন, তবে মানুষের আর কি কথা ? শুধু তাহাই নহে, শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার একটা সুগভীর তাৎপর্য

দেখাইয়া শ্রীমায়ের মনকে ব্যক্তিগত শোকদুঃখের অতীত এক অনুপম করুণা-ভূমিতে উন্নীত করিলেন। তিনি বলিলেন, "যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ করে গেলুম।" শ্রীমায়ের সত্যই উপলব্ধি হইল যে, জগৎ-কল্যাণে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাধির উহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা; নতুবা তাদৃশ অপাপবিদ্ধ দেহে এইরূপ যন্ত্রণার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

ক্রমে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নানা কথায় নানা ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গগণকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিত্যধামে প্রয়াণের কাল সমাগত। কিন্তু প্রিয়জনের বিচ্ছেদচিন্তায় অপারগ ভক্তবৃন্দ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না—শ্রীভগবানও সেই অতি বিষাদময় সত্যের আবরণ ক্ষণেকের জন্যে উন্মোচিত করিয়াও পরমুহূর্তেই সকলকে মায়ায় ভুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রীমাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য শ্রীযুক্ত শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে) পাঠাইয়া বলিলেন যে, তিনি খুব বুদ্ধিমতী, সুতরাং তিনি আসিলে ঠাকুরের তখনকার অবস্থা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমা উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ গো, কেন জানি না, আমার মনে সর্বদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে।" জননী কি আর উত্তর দিবেন? সে কঙ্কালসার দেহদর্শনে ব্যথিতহৃদয়ে দুইটি প্রবোধ-বাক্য বলিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিলেন; মনে মনে জানিলেন, ব্রহ্মে লীয়মান এ মনকে আর টানিয়া রাখা যাইবে না।

শরীরত্যাগের দিন বিছানায় বালিশে ভর দিয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। একে রোগশয্যা, তাহাতে আশার আলোক নির্বাপিত; তাই চারিদিকে গভীর বিষাদের ছায়া। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শ্রীমা ও লক্ষ্মী-দিদি আসিতেই তিনি বলিলেন, "এসেছ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভেতর দিয়ে, অনেকদূর।" শ্রীমা কাঁদিতে লাগিলেন, ঠাকুর বলিলেন, "তোমাদের ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্রপ্রমুখ) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।"

শ্রীমায়ের অবচেতনা পূর্ব হইতেই সে আশু বিপদের ছায়াপাতে ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছিল। সেদিন সব দিকেই যেন একটা বিপর্যয়ের ভাব দেখা দিল। সেবক-সন্তানদের জন্য তিনি খিচুড়ি রাঁধিতেছিলেন· উহার নীচের অংশ ধরিয়া গেল। সন্তানদের পাতে তিনি উপরের অংশ পরিবেশন করিলেন, নীচের অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাঁহার একখানি দেশী শাড়ী ছাদে শুকাইতেছিল; উহা হারাইয়া গেল। একটি জলের কুঁজা ছিল; তুলিবার সময়ে উহা পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

ক্রমে ৩১শে শ্রাবণের মহানিশা আসিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া একটা দুই মিনিট হইল। শহরের উপকণ্ঠে বৃক্ষগুল্মপরিবৃত সেই বৃহৎ উদ্যানবাটী তখন একেবারে নীরব—শুধু নিদ্রাবিহীন ভক্তবৃন্দ শ্রীপ্রভুর শয্যা-পার্শ্বে সমবেত থাকিয়া সচকিতে দেখিতেছেন, তিনি সমাধিমগ্ন। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না—উহা মহাসমাধিতে পরিণত হইল। চিকিৎসক আসিয়া জানাইলেন, আর আশা নাই। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতদেহ কাশীপুরের চিতাগ্নিতে আহুত হইল। চিতা নির্বাপিত হইলে পবিত্র ভস্মাস্থি একটি পাত্রে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে আনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যায় রাখা হইল।

এদিকে সন্ধ্যাকালে শ্রীমা দেহ হইতে একে একে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পরিশেষে যখন সোনার বালাও খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন অকস্মাৎ ঠাকুর গলরোগের পূর্বেকার মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?" শ্রীমা আর বালা খুলিলেন না। বলরামবাবু তাঁহার জন্য সাদা কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিলেন। উহা শ্রীমাকে দিবার জন্য গোলাপ-মার হাতে দিলে তিনি আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, "বাপরে, এ সাদা থানকাপড় কে তাঁর হাতে দিতে যাবে?" পরে তিনি শ্রীমায়ের নিকটে গিয়া দেখেন, তিনি নিজ হস্তে কাপড়গুলির পাড় ছিঁড়িয়া সরু করিয়া লইয়াছেন। তদবধি তিনি খুব সরু-লালপেড়ে কাপড় পরিতেন। ঠাকুরের নিত্যলীলার বিরাম নাই; চিরসধবা শ্রীমায়েরও সত্যকারের বিচ্ছেদ নাই।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থিপূর্ণ কলসীর সম্মুখে ভোগ নিবেদিত হইল। এদিকে প্রবীণ ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে উদ্যানবাটী রাখার আর কোন সার্থকতা নাই। শ্রীযুত নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণ অবশ্য ঠাকুরের অস্থি-সংরক্ষণ এবং শ্রীমায়ের শোকহ্রাসের জন্য অন্ততঃ আরও কিছুদিন বাড়ীটি ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু অর্থসামর্থ্য না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে তখন প্রাচীনদের মতের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। বয়স্কদের বিচারে স্থির হইল—বাড়িভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলেই উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অস্থি তৎপূর্বেই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ 'যোগোদ্যান' নামে প্রসিদ্ধ ভূমিখণ্ডে সমাহিত হইবে এবং শ্রীমা অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। যুবক ভক্তদের অনেকেই কিন্তু অত সহজে ছাড়িতে চাহিলেন না। কারণ "ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্ত সকলে মিলিত হইয়া প্রথমে পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে, পূত ভাগীরথীতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া উক্ত (তাম্র) কলস তথায় যথানিয়মে সমাহিত করা হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া এবং অন্য নানা কারণে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকে কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।...

তাঁহাদিগের ঐরূপ মতপরিবর্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা পূর্বোক্ত তাম্রকলস হইতে অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থি-নিচয় বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা রক্ষাপূর্বক তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ গুরু-ভ্রাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরামবাবু মহাশয়ের ভবনে নিত্য-পূজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন..." ('উদ্বোধন', ১৭শ বর্ষ, ৪৪০ পৃঃ)। পরে তাঁহারা প্রথমোক্ত তাম্রকলসীটি কাঁকুড়গাছিতে সমাহিত করিতে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছিলেন (২৩শে অগস্ট, ১৮৮৬ খৃীঃ; ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী)।

শ্রীমা এই বিতর্কের অনেকখানি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রখর বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মন কোন পক্ষ গ্রহণ করিতে পারিল না; তিনি শুধু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোলাপ-মাকে বলিলেন, "এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন; দেখেছ, গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!" এইরূপ দুঃসহ শোকেও তাঁহার দৃষ্টি জাগতিক বিবেচনার কত ঊর্ধ্বে প্রসারিত বিচারবুদ্ধি কত নিরপেক্ষ! শ্রীমা কাশীপুর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর বলরামবাবুর সাদর আহ্বানে তিনি ৬ই ভাদ্র বৈকালে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। ঠাকুরের অদর্শন এবং নিজ নিঃসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের শাশ্বত চিন্ময় বিগ্রহের সাক্ষাৎকার পাইয়া এবং সন্তান-গণের মুখে 'মা'-ডাক শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে দুর্বিষহ বিরহ তো সহজে ভুলিবার নহে; প্রতিমুহূর্তে, প্রতিকার্যে, প্রতি-চিন্তায় শ্রীমায়ের কেবলই মনে পড়িতেছিল যে, ঠাকুরের প্রকট বিগ্রহ আর নাই। ইহা ভক্তদেরও অবিদিত ছিল না। অতএব যুগে যুগে ভগবান বিবিধ রূপ ধারণপূর্বক যে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তীর্থে পরিণত করিয়াছেন এবং যে-সকল স্থলে স্বীয় অবিস্মরণীয় স্মৃতি চিরাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তথায় তাঁহার নিত্যাবির্ভাবের নিদর্শন পাইলে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ-দুঃখের অনেকটা লাঘব হইতে পারে এবং ঠাকুরের ব্যক্ত লীলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত স্থানগুলি হইতে কিছুদিন দূরে সরিয়া থাকিলে সেই দুর্জয় শোকেরও কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, ইত্যাদি কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে তীর্থদর্শনে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে বলরাম-ভবনে আট দিন থাকিয়া শ্রীমা ১৫ই ভাদ্র শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী ও মাস্টারমহাশয়ের স্ত্রী এবং পূজনীয় যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ ও লাটু মহারাজ।

পথে তাঁহারা দেওঘরে নামিয়া বৈদ্যনাথদর্শনান্তে পরের গাড়িতে কাশী-ধামে চলিলেন। এখানে আট-দশ দিন অবস্থানপূর্বক তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া

ঁবিশ্বনাথ, ঁঅন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবদেবীকে দর্শন করিলেন। শ্রীমা বেণীমাধবের ধ্বজায় আরোহণ করিয়া ঁবিশ্বনাথের সুবর্ণপুরী দেখিলেন। ঁবিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ এতই বর্ধিত হইল যে, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া অস্বাভাবিক গুরুপদবিক্ষেপে বাসস্থানে ফিরিলেন এবং পরে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, "ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" একদিন তিনি অপর মহিলাদের সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখেন, তিনি উলঙ্গ অবস্থায়। শ্রীমা ও অপর সকলে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "শঙ্কা মৎ করো মাঈ, তুম সব জগদম্বা হো, শরম ক্যা? দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমায়ের যাহা বোধ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পরে বলিয়াছিলেন, "আহা, কি নির্বিকার মহাপুরুষ—শীত-গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন!"

কাশী হইতে সকলে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একদিন থাকিয়া শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি সন্দর্শন করিলেন। অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবন যাত্রার পথে শ্রীমা অভাবনীয়রূপে ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইলেন। শ্রীমায়ের বাহুতে ঠাকুরের সুবর্ণনির্মিত ইষ্টকবচ ছিল।[১] তিনি উহা সযত্নে রাখিতেন ও পূজা করিতেন। রেলগাড়িতে তিনি ঐ বাহু জানালার পার্শ্বে উপর দিকে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়।" মা তৎক্ষণাৎ উহা খুলিয়া যে টিনের বাক্সে ঠাকুরের নিত্যপূজিত ফটোখানি রক্ষিত ছিল, তাহার মধ্যে রাখিয়া দিলেন; তদবধি তিনি উহা আর বাহুতে ধারণ করেন নাই। যথাকালে বৃন্দাবন পৌঁছিয়া তাঁহারা বলরামবাবুদের যমুনাপুলিনস্থ ঠাকুরবাড়ি 'কালাবাবুর কুঞ্জে' উঠিলেন।

তখন ভাদ্র মাস সমাপ্তপ্রায়। বর্ষাশেষে বৃন্দাবনের বনরাজি অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে শ্যামল শোভা, সমস্ত ভূমি নবোদ্গত তৃণাদিতে আচ্ছাদিত, বাতাসে বিবিধ কুসুমের মনোহর সুবাস, দিকে দিকে ময়ূরের কেকা ও গাভীর হাম্বারব, নিঃশঙ্ক মৃগসমূহ পথপার্শ্বে শষ্পাহার করিতে করিতে অকস্মাৎ মনুষ্য-পদশব্দে উৎকর্ণ হইয়া দ্রুত পলাইতেছে, আর পুণ্যসলিলা কালিন্দী কলকল-নিনাদে চঞ্চল গতিতে আপনমনে চলিয়াছে। সেই বৃন্দাবনের শোভা, সেই নিকুঞ্জ কানন, সেই শ্রীরাধিকার বিরহাশ্রুসিক্ত ধূলিকণা, সেই ব্রজগোপীর সতৃষ্ণ-দৃষ্টিনিক্ষাত ব্রজভূমি—সবই রহিয়াছে, সর্বত্রই ব্রজরাজের স্মৃতি

১ 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, ঠাকুরের অপ্রকট হইবার চারি পাঁচ দিন পূর্বে তিনি ইষ্টকবচটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে যান। কবচটি লইয়া নীচে নামিবার পথে শ্রীমা উহা গ্রহণ করিতে চাহিলে লক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে অর্পণ করেন।

জাজ্বল্যমান থাকিয়া প্রাণে তাঁহার দর্শনলালসা জাগাইতেছে; কিন্তু নাই তিনি। বৃন্দাবনে আসিয়া বিরহবিধুরা শ্রীমায়ের মনে হাহাকার উঠিল। ইহার পূর্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততঃ তিন বার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু চির-বাঞ্ছিত যিনি, যাঁহার শ্রীচরণে মনপ্রাণের প্রতিসূত্র দৃঢ়সংবন্ধ, তাঁহার নিয়ত প্রত্যক্ষের অভাব প্রতিমুহূর্তে মর্মকে মথিত করিয়া প্রশ্ন জাগাইতে থাকিল— কোথায় তিনি? বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীমা অবিরাম চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন; আর সে অশ্রুর সহিত যোগ দিল শ্রীমতী যোগীন-মার নয়নবারি। যোগীন-মা ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্বেই বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। অধুনা শ্রীমা তাঁহাকে দেখিয়াই শোকাবেগে 'যোগেন গো' বলিয়া বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুভারাক্রান্তা মাতাঠাকুরানীকে পাইয়া এবং অপরদের মুখে সমস্ত শুনিয়া যোগীন-মারও নয়নজল অবিরল ধারায় প্রবাহিত হইল। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ এক রাত্রে দেখা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এঘর আর ওঘর।"

ইহার পরে শ্রীমায়ের উদ্বেলিত শোকসিন্ধু কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহ এখন হইতে অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রীমদ্ভগবতের গোপীগীতায় উল্লিখিত আছে যে, রাসভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সহসা অন্তর্হিত দেখিয়া গোপীরা বিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু উহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বিরহজনিত তন্ময়তার ফলে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহার শুভ লীলাবিলাসের অনুকরণ করিতে থাকিলেন। শ্রীমায়েরও দেহমনে এই সময়ে অনুরূপ তন্ময়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি কখনো আত্মহারা হইয়া অপরের অসাক্ষাতে একাকী সুবিস্তৃত বালুকাময় তীরভূমি অতিক্রমপূর্বক যমুনায় উপস্থিত হইতেন ; পরে সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিতেন। কে জানে, তখন শ্রীমা আপনাকে শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে হৃদয়বৃন্দাবনে নিত্য-ব্রজলীলায় মগ্ন থাকিতেন কিনা! শোনা যায়, এক সময়ে তিনি জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমিই রাধা।" কখনও আবার শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া যাইতেন। কালাবাবুর কুঞ্জে একদিন ধ্যান করিতে করিতে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া-ছিলেন—সমাধি কিছুতেই ভাঙ্গে না। যোগীন-মা অনেকক্ষণ নাম শুনাইলেও ব্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে যোগীন মহারাজ আসিয়া নাম শুনাইলে সমাধির একটু উপশম হইল এবং সমাধিভঙ্গে ঠাকুর যেমন বলিতেন শ্রীমাও তেমনি বলিলেন, "খাব।" কিছু খাবার, জল ও পান সম্মুখে ধরিলে তিনি ঠাকুরের মতো একটু খাইলেন। এমন কি, ঠাকুর যেমন পানের সরু

দিকটা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন, শ্রীমাও সেইভাবে খাইলেন। তখন যোগীন মহারাজ কয়েকটি প্রশ্ন করিলে ঠিক ঠাকুরেরই মতো উত্তর দিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে তাঁহার হাব-ভাব অবিকল ঠাকুরের মতো দেখাইয়াছিল। সাধারণভূমিতে নামিয়া তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাতে ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল।

বিরহবিদগ্ধা শ্রীমায়ের সবখানি হৃদয় এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রীভূত হইয়া বাস্তব জীবনে এক অপরিসীম বৈরাগ্য আনিয়া দেওয়ায় জাগতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার যেন কোন সুনিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধ ছিল না। তখন তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিলে ও আলাপাদি শুনিলে মনে হইত যেন তিনি অতি সরলা বালিকা। একদিন পত্রপুষ্পসজ্জিত এক শবদেহকে কীর্তনসহ শ্মশানে লইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, দেখ, মানুষটি কেমন বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মরতে এলুম ; তা একদিন একটুও জ্বরও হল না! কত বয়স হয়ে গেল বল দেখি!—আমরা বাপকে দেখেছি, ভাসুরকে দেখেছি।" যোগীন-মা প্রভৃতি শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বল কি মা, বাপকে দেখেছ! বাপকে আবার কে না দেখে?"

শ্রীমা বৃন্দাবনে প্রায় এক বৎসর বাস করেন। মাস্টারমহাশয়ের স্ত্রী এক মাস পরে প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পূজনীয় কালী মহারাজের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। লাটু মহারাজও পাঁচ-ছয় মাস পরে রামবাবুর বাড়ির কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসেন।

দীর্ঘকাল তীর্থবাসের পর শ্রীমায়ের মন অনেকটা স্বাভাবিক ভূমিতে নামিয়া আসিল। তিনি প্রথমে যেমন দুঃসহ বিয়োগ-বেদনায় তাপিত হইয়াছিলেন, পরে ঠাকুর তাঁহাকে তেমনি আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতেন এবং কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া ধ্যানজপ করিতেন। সেইসকল সময়ে তিনি নিশ্চয়ই বহু অতীন্দ্রিয় দর্শন পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। একদিনের ঘটনা শুধু শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন। সেদিন 'রাধারমণের মন্দিরে যাইয়া তিনি দেখিয়াছিলেন—যেন ভক্তবর শ্রীযুক্ত নবগোপালবাবুর স্ত্রী বিগ্রহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেছেন ; গৃহে ফিরিয়া তাই বলিয়াছিলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এইরকম দেখলুম।"

ইহারই কোন এক সময়ে মা সদলবলে বৃন্দাবন-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের পক্ষাধিক সময় লাগিয়াছিল। পরিক্রমার কালে মনে হইত যেন তিনি মনোযোগসহকারে ব্রজের পথ-ঘাট নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোথাও বা তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'না, চল।' সঙ্গিনী যোগীন-মা প্রভৃতির স্পষ্টই বোধ হইত, তিনি যেন ভাবমুখে চলিয়াছেন

এবং দর্শনাদিও হইতেছে। সুতরাং সবিশেষ জানিবার বাসনা জাগিত। কিন্তু মা এই কৌতূহলের উত্তরে শুধু একই কথা বলিতেন, 'না, চল।'

বৃন্দাবনে ঠাকুর শ্রীমায়ের দ্বারা তাঁহার একটি অসমাপ্ত কার্য করাইয়াছিলেন—মায়ের জীবনেও এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি মাকে একদিন দর্শন দিয়া বলিলেন, "তুমি যোগেনকে (যোগানন্দকে) এই মন্ত্র দাও।" প্রথম দিনে মা উহা মাথার খেয়াল ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। লজ্জাও হইল, "সকলে বলবে, 'মা এরই মধ্যে শিষ্য করতে লাগলেন'!" দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ আদেশ পাইয়াও গ্রাহ্য করিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি ঠাকুরকে বলিলেন. "আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না; কি করে মন্ত্র দিই?" ঠাকুর পরামর্শ দিলেন, "তুমি মেয়ে যোগেনকে[১] বলো সে থাকবে।" তিনি কি মন্ত্র দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। অনন্তর শ্রীমা যোগীন-মার দ্বারা যোগীন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করাইলেন, তাঁহার মন্ত্র দীক্ষা হইয়াছে কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, "না, মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নাই। আমি নিজের রুচিমত একটি নাম জপ করি।" যোগীন মহারাজ ইহাও জানাইলেন যে. তিনিও ঠাকুরের নিকট মন্ত্রগ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন, কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারেন নাই। অবশেষে মা তাঁহাকে মন্ত্র দিতে সম্মত হইলেন। দীক্ষার দিনে ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষের কৌটা সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে করিতে শ্রীমায়ের ভাবাবেশ হইল। তখন তিনি যোগীন মহারাজকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন এবং ঐ ভাবাবস্থাতেই মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র এত জোরে বলিয়াছিলেন যে, পাশের ঘর হইতে যোগীন-মা উহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যোগীন মহারাজই মায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

শেষাশেষি শ্রীমা একবার হরিদ্বার ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন যোগীন মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি। হরিদ্বারের পথে রেলগাড়িতে যোগীন মহারাজের ভীষণ জ্বর হয়। যোগীন-মা তাঁহাকে যখন বেদানা খাওয়াইতেছিলেন, তখন শ্রীমা দেখিতে পান, যেন শ্রীঠাকুরকেই খাওয়ানো হইতেছে। জ্বরে অজ্ঞানাবস্থায় যোগীন মহারাজ দেখিয়াছিলেন—এক ভীষণ মূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে, "তোকে দেখে নিতুম; কিন্তু কি করব, পরমহংসদেবের আদেশ, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে।" যাইবার সময় ঐ মূর্তি রক্ত-বস্ত্র-পরিহিতা এক দেবীকে দেখাইয়া তাঁহাকে কিছু রসগোল্লা খাওয়াইবার নির্দেশ দিল। ঐ দর্শনের পরই জ্বর সারিয়া যায়। হরিদ্বারে

১ স্বামী যোগানন্দজী ও শ্রীযুক্তা যোগীন-মা উভয়কেই শ্রীমা যোগেন নামে অভিহিত করিতেন এবং পার্থক্য রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে যথাক্রমে ছেলে-যোগেন ও মেয়ে-যোগেন বলিতেন।

উপস্থিত হইয়া শ্রীমা যথারীতি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। কলিকাতা হইতে তিনি তীর্থজলে বিসর্জনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ ও নখ আনিয়াছিলেন; ব্রহ্মকুণ্ডে উহার কিয়দংশ নিক্ষেপ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভাগীরথী অতিক্রমপূর্বক চণ্ডীর পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেবী দর্শন করিলেন।

অনন্তর মা সদলবলে জয়পুরে গমন করেন। সেখানে সকলে গোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া অন্যান্য বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে এক দেবীবিগ্রহের সম্মুখে আসিতেই যোগীন মহারাজ বলিয়া উঠেন যে, ইনিই তাঁহার জ্বরাবস্থায় দৃষ্টা দেবী। ইনি শীতলা। দেবীকে আট আনার রসগোল্লা ভোগ দেওয়া হয়। জয়পুরের পর তাঁহারা পুষ্করতীর্থে উপনীত হন। শ্রীমা এখানে সাবিত্রী পাহাড়ে আরোহণ করিয়াছিলেন। পায়ে বাতের সূত্রপাত পূর্বেই হইয়া থাকিলেও তিনি তখনও বেশ চলিতে পারিতেন। তাই বৃন্দাবন-পরিক্রমা, চণ্ডীর পাহাড় ও সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠা এবং পায়ে হাঁটিয়া মন্দিরাদি দর্শন সম্ভব হইয়াছিল।

বৎসরান্তে তাঁহারা প্রয়াগ হইয়া কলিকাতায় চলিলেন। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে শ্রীমা ঠাকুরের অবশিষ্ট কেশ বিসর্জন দিলেন। এই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি পরে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের চুল কি কম জিনিস! তাঁর শরীরত্যাগের পর যখন প্রয়াগ যাই, তখন তাঁর চুল তীর্থে দেবার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলুম। গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমের স্থির জলের কাছে ঐ চুল হাতে নিয়ে জলে দেব মনে করছি, এমন সময় হঠাৎ একটি ঢেউ উঠে ওটি আমার হাত থেকে নিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। তীর্থ পবিত্র হবার জন্যে তাঁর চুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেল।" লক্ষ্মীদিদি এখানে মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন, শ্রীমা করেন নাই। শ্রীমায়ের হৃদয়ে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত নিত্য মিলনোৎসব চলিতেছে, এবং চর্মচক্ষেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার শুভদর্শন ঘটিতেছে। তাই অলঙ্কার ত্যাগ যেমন সম্ভব হয় নাই, কেশ ত্যাগও তেমনি সম্ভব হইল না। এইরূপে তীর্থদর্শন ও ঠাকুরের সাক্ষাৎকারের আনন্দ লইয়াই তিনি কলিকাতায় ভক্তবর বলরামবাবুর গৃহে পদার্পণ করিলেন।

স্বামীর ভিটা

শ্রীমা কলিকাতায় আগমনানন্তর পক্ষকাল বলরাম-গৃহে থাকিয়া কামারপুকুর চলিলেন। যাত্রার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সমস্ত দেবদেবীকে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্নগুলিকে আর একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা প্রভৃতি শ্রীমাকে কামারপুকুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে যাইলেন। তাঁহারা সেবারে বর্ধমানের পথে গিয়াছিলেন। হাতে যথেষ্ট পাথেয় ছিল না ; তাই বর্ধমান পর্যন্ত রেলে যাইয়া সকলকেই উচালন পর্যন্ত প্রায় আট ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীমা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন। উচালনে গোলাপ-মা কোন প্রকারে একটু খিঁচুড়ি রাঁধিয়া দিলে ক্ষুধিতা শ্রীমা অহা খাইয়া বার বার বলিয়াছিলেন, "ও গোলাপ, তুমি কি অমৃতই রেঁধেছ!" কামারপুকুরে দিন কয়েক থাকিয়া স্বামী যোগানন্দজী প্রভৃতি সকলেই অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর শ্রীমায়ের অতি দুঃখময় কামারপুকুর জীবন আরম্ভ হইল। ইহার অধিকাংশ সময়ই তিনি একাকী ছিলেন—দুই-চারিজন পূর্বপরিচিত গ্রামবাসী ছাড়া তাঁহার দুঃখের সংবাদ লইবার বা সহানুভূতি করিবার কেহ ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে ছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের কাজের অবসরে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল একদিন সেখানে আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুই ভবতারিণীর সেবা করবি, তা হলে তোর অভাব থাকবে না।" আবার শ্রীমায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "তুমি কামারপুকুরে থেকো, আর লক্ষ্মীর দিকে একটু নজর রেখো। ওকে খেতে দিতে হবে না। তবে সে যেন বাড়ি থেকে কোথাও না যায়। আমাকে ভক্তেরা যেমন ভক্তি করছে, তোমাকেও তেমনি ভক্তি করবে।" পরে পুনর্বার রামলালদাদাকে বলিলেন, "দ্যাখ্ তোর খুড়ী যেন কামারপুকুরে থাকে।" রামলালদাদা উত্তর দিলেন, "ওঁর যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানে থাকবেন।" ইহার তাৎপর্য বুঝিতে ঠাকুরের বিলম্ব হইল না। তাই তিনি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "সেকি রে? তুই পুরুষ মানুষ হয়েছিস কি জন্য?" লক্ষ্মীদেবী বৃন্দাবনে মায়ের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু কামারপুকুরে যাইলেন না। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরে ভ্রাতাদের সহিত থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীমায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন দায়িত্ব তো গ্রহণ করেনই নাই, বরং এক বিষম বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। রানী রাসমণির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীমাকে মাসিক পাঁচ-সাতটি করিয়া টাকা দিতেন। শ্রীমায়ের বৃন্দাবনে অবস্থানকালে রামলালদাদা কালীবাড়ির

খাজাঞ্চী প্রভৃতিকে বুঝাইলেন যে, মা ভক্তদের নিকট যথেষ্ট অর্থ পান; নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সুতরাং কালীবাড়ির টাকা বন্ধ হইয়া গেল।[১] শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দজী) ঐ টাকা বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। শ্রীমা সংবাদ পাইয়া অশেষ বৈরাগ্যভরে কহিলেন, "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেলেন—টাকা নিয়ে আমি আর কি করবো?" এদিকে ভক্তেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, গুরুপত্নীকে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিবেন; কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হইল না।

অতএব শ্রীমায়ের কামারপুকুরের জীবন শুধু নিঃসঙ্গ নহে, অতি নিঃসম্বল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" ইহা আদেশ না হইলেও যুগাবতারের ইচ্ছা বা শ্রীমায়ের জীবনধারণের একটা উপায়নির্দেশ। শ্রীমাকে যেন সেই বাক্য সফল করিবার জন্যই এই কালে ঠিক ঐভাবে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। এমন দিনও গিয়াছে যখন শুধু দুটি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু লবণ জোটে নাই। দীর্ঘকাল পরে বিভিন্ন সূত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে ভক্তগণ শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ শ্রীমা অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও ঠাকুরের ভিটায় পড়িয়া রহিলেন; নিজ দুঃখের কথা কাহাকেও এতটুকু জানাইলেন না; কারণ তখনও তাঁহার কানে ঠাকুরের শেষ আদেশ বাজিতেছিল, "দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিতহাত করো না। তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।...বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।"

এখানে আমরা একবার তখনকার কামারপুকুরের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার কামারপুকুরের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইলেও এবং ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধিতে ও নগরের আকর্ষণে পল্লীবাসীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিলেও শ্রীমায়ের চক্ষে নিশ্চয়ই উহা নূতন ঠেকে নাই। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের কামারপুকুর আর বর্তমানের (১৯৫৩) কামারপুকুরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

১ "ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আত্মীয় যারা ছিল, তারাও মানুষবুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।" ('উদ্বোধন', ২৭শ বর্ষ, ১১-১৩ পৃঃ) ('শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থও দ্রষ্টব্য)।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ির দক্ষিণে, উহারই সহিত সংলগ্ন, শুকলাল গোস্বামীদের পাকা বাড়ি ছিল। গ্রামবাসীদের নিকট উহা 'গোসাঁইমহল' নামে পরিচিত ছিল; অনেকটা কাছারি বাড়ির মতো—চারিদিকে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর, মধ্যে একখানি পাকা কোঠা। বর্তমানে ঠাকুরের মন্দিরের দক্ষিণে যেখানে কুয়া হইয়াছে, উহার পার্শ্বে পশ্চিমের রাস্তার দিকে মহলের প্রবেশদ্বার ছিল। মহলের দক্ষিণে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী এবং তাহার তীরে পাইন-বংশীয়া জনৈকা সতীর স্মৃতিচিহ্ন ছিল। তাহারও দক্ষিণে লাহাবাবুদের অতিথিশালা। লাহাদের বাড়ির পূর্বদিকে গ্রামের মধ্যস্থলে কামারপুকুর নামক বৃহৎ জলাশয়। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে এখনও কর্মকারদের বাসগৃহ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ধাত্রীমাতা ধনী কামারনী এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদের বাড়ির উত্তরে সুবৃহৎ হালদারপুকুর তৎকালীন হালদার-বংশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বর্তমানে তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন : শুধু তাঁহাদের ভিটা, দেবালয় ও দেবসেবা তাঁহাদের স্মৃতি বহন করিতেছে। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের দ্বিতল হর্ম্য তখনও বাসের অযোগ্য হয় নাই। ঠাকুরের বাড়ির নিকট বহু ময়রার বাস ছিল এবং বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে হাটতলা হইয়া বড় রাস্তার দুই দিকে বহু বিপণি সজ্জিত ছিল। বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে রাস্তার পার্শ্বে ডোমপল্লী তখনও জনশূন্য হয় নাই। যুগীরাও তখন স্বগৃহে থাকিয়া মন্দিরে শিবপূজা চালাইতেন। মানিক রাজার আম্রকানন তখনও বৃক্ষশূন্য হয় নাই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ জলাশয়গুলির তীরে অবস্থিত উচ্চ-শির তালবৃক্ষশ্রেণী তখনো নিম্নের স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হইত।

ঠাকুরদের বাড়ির উত্তরভাগের সদর রাস্তার উপর—এখনকার মতো তিন-খানি দক্ষিণদ্বারী ঘর ছিল। বাটীর প্রাচীরের বাহিরে পূর্বদিকের ঘরখানি বৈঠকখানা ; প্রাচীরের ভিতরে মধ্যের অপেক্ষাকৃত বড় ঘরখানিতে রামলালদাদার পিতা রামেশ্বর বাস করিতেন। উহার পশ্চিমে এবং রঘুবীরের ঘরের উত্তরে তদপেক্ষা ছোট ঘরখানিতে ঠাকুর বাস করিতেন। শ্রীমায়ের কামারপুকুর-জীবন এই ঘরেই যাপিত হইয়াছিল। ঐ বাসগৃহ দুইখানির মধ্যস্থলে উত্তরের রাস্তায় নামিবার খিড়কির দরজা। প্রাচীন রন্ধনশালা দক্ষিণের প্রাচীরের গায়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। তিন অংশে বিভক্ত ইহারই একটি কক্ষ পরে মায়ের রান্নাঘরে পরিণত হয়। পশ্চিমের প্রাচীরের মধ্যস্থলে রঘুবীরের আগার। পূর্ব প্রাচীরের মধ্যস্থলে বাড়ির প্রবেশদ্বার। ঐ দ্বার ও রন্ধনশালার মাঝা-মাঝি ঢেঁকিশাল—যেখানে ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল।

তখনকার দিনে রঘুবীরের ঘরে দেবতাদের জন্য যে বেদী ছিল, উহার মাটি

১ ইহা পরে দ্বিতল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজে মাথায় করিয়া আনিয়া স্বহস্তে উহা নির্মাণ করেন। ঐ বেদীতে বর্তমানে চারিটি দেবদেবী স্থাপিত আছেন। গোপাল-মূর্তি লক্ষ্মীদিদির স্থাপিত। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম রামেশ্বর তীর্থ হইতে শ্বেত পাথরের 'রামেশ্বর শিব আনিয়াছিলেন। 'রঘুবীরকে তিনি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। 'শীতলার প্রতীক একটি আম্রপল্লবযুক্ত সিন্দুরলিপ্ত ঘট। শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "ইনিই আমাদের আদি গৃহদেবতা। আমার শ্বশুর নাকি দর্শন করেছিলেন, গল্প শুনেছি, সেই মহামায়াই শীতলামূর্তিতে— অল্প বয়সের মেয়ে, লাল সিঁদুরের রং-এর শাড়ি পরে—হাতে ঝাঁটা নিয়ে সকল অমঙ্গল আবর্জনা ঝাঁট দিচ্ছেন, আর কাঁকালে কলসী করে অমৃতবারি পল্লব দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সকল প্রাণীকে শান্তি দিচ্ছেন, শীতল করছেন। সেই মহামায়ারই একটি রূপ শীতলা; তাই সিঁদুর মাখানো শান্তিজলের ঘট। বিশেষ বিশেষ দিনে জল বদলে দেওয়া হয়। রঘুবীরকে নিরামিষ ও শীতলাকে মাছ ভোগ দেওয়া হয়।" শ্রীমা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, 'রঘুবীর 'রামচন্দ্র—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ; তাই ঠাকুরের পিতা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে খিচুড়ি ভোগ দিতেন।

কামারপুকুর তখন সমৃদ্ধ জনবহুল ও কোলাহলপূর্ণ বলিয়াই লজ্জাশীলা শ্রীমায়ের নিকট ভীতিপ্রদ। বিশেষতঃ অশিক্ষিত, অনুদার ও সহানুভূতিশূন্য পল্লীবাসী এই সহায়হীনার দারিদ্র্যে অবিচলিত, উচ্চ ভাব সম্বন্ধেও অনুসন্ধিৎসাশূন্য। এই অবস্থায় তাঁহার জীবনে বহু সমস্যা দেখা দিল। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি কাশীপুরে হাতের বালা খুলিতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন। চিরসীমন্তিনী শ্রীমায়ের বসনভূষণে বৈধব্যের চিহ্ন নাই দেখিয়া পল্লীর সমালোচনা ক্রমেই মুখর হইয়া উঠিল ; তাই তিনি হাতের বালা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় সমস্যা হইল—এই গঙ্গাহীন দেশে বাস করিবেন কি করিয়া? তাঁহার চিরকালই মা গঙ্গার প্রতি আকর্ষণ ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি পল্লীবাসিনীদের সহিত বারংবার গঙ্গাস্নানে যাইতেন; আর দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর দক্ষিণেশ্বরে বাসকালের তো কথাই ছিল না। এই সব ভাবিয়া মাতাঠাকুরানীর মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল ; এমন কি তিনি একবার গঙ্গাস্নানে যাইবার কথাও ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন দেখেন, সম্মুখের রাস্তা দিয়া ঠাকুর আসিতেছেন—আর তাঁহার পশ্চাতে চলিয়াছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, বাবুরাম, রাখাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীমা আরও দেখিলেন, ঠাকুরের পাদপদ্ম হইতে জলের উৎস নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে পুরোভাগে সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, "দেখছি, ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা!" —তাই সত্বর রঘুবীরের ঘরের নিকট হইতে মুঠা মুঠা জবাফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সেই গঙ্গায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি হাতের বালা ফেলো

না। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো?" শ্রীমা বলিলেন, "বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে।" ঠাকুর কহিলেন, "আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।" সেই দিনই অপরাহ্নে শ্রীযুক্তা গৌরী মার আগমন হইল। বৈষ্ণবশাস্ত্র অবলম্বনে তিনি শ্রীমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বৈধব্য অসম্ভব, কারণ তাঁহার 'চিন্ময় স্বামী'; অধিকন্তু তিনি লক্ষ্মী—তিনি ভূষণ ত্যাগ করিলে জগৎ লক্ষ্মীহীন হইবে। ইহারও কিয়ৎকাল পরে শ্রীযুক্তা যোগীন-মা কামারপুকুরে যাইলে শ্রীমা এই ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ঐ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়েছিলেন। শেষে দেখলুম, ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন!...এখানকার ধূলি খাও, প্রণাম কর।" পরম্পরাক্রমে এই কথা স্বামী বিবেকানন্দের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহে ঠাকুরের প্রবেশের কথা তাঁহাকে না বলাই ভাল ছিল। সে যাহাই হউক, এই ঘটনা অবলম্বনে শ্রীমায়ের মনে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ও কামারপুকুরের প্রকৃত স্বরূপ যে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তদবধি তাঁহার মন হইতে লোকনিন্দার ভয় মুছিয়া গিয়াছিল; তিনি পুনর্বার বালা এবং সরু লালপেড়ে কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত উহা আর ত্যাগ করেন নাই।[১]

পল্লীবাসীর সমালোচনাও শীঘ্রই দৈববিধানে থামিয়া গেল; এই সব বিষয়ে মেয়েমহলেই কলরব হয় অধিক এবং উহার শান্তিও সেখানেই হইয়া থাকে। মেয়েদের জটলা ক্রমে শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার বালবিধবা কন্যা সর্বজন-মানিতা ও পূতচরিত্রা প্রসন্নময়ীর নিকট পৌঁছিলে তিনি সসম্ভ্রমে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, "গদাই, গদাই-এর বউ—এঁরা দেবাংশী।" পল্লীর মুখরাগণ সেই দিনই নীরব হইয়া গেল।

শ্রীমায়ের অলঙ্কারধারণ ও গঙ্গাসমীপে বাসরূপ দুইটি সমস্যার এইরূপে সমাধান হইলেও অবশিষ্ট জটিল বিষয়গুলির মীমাংসা তেমন সহজ হইল না। গ্রামে আসিয়াই তিনি পূর্বপরিচিত প্রসন্নময়ী ও ধনী কামারনী প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী তাঁহাকে ভরসা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তা বউ, তোমাকে ভাবতে হবে না; আমার ঝি গিয়ে রাত্রে তোমার কাছে শোবে।" শ্রীমাকে একাকী দেখিলে ধনী কামারনীর ভগিনী শঙ্করীও মাঝে মাঝে মায়ের বাড়িতে রাত্রে শুইতে আসিতেন এবং তাঁহাদের এক ভ্রাতা নানা কাজে মাকে সাহায্য করিতেন।

১ কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বৃন্দাবনে দ্বিতীয়বার শ্রীমা বালা খুলিতে চাহিলে ঠাকুর নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'গৌরী-মা'র ১১০-১২ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থিত। তথাপি আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠার অনুসরণ করিলাম।

প্রসন্নময়ী সর্বদা খোঁজ-খবর লইতেন, মাও সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। প্রসন্নময়ী তখন গোসাঁইমহলে থাকিতেন। তিনি খুব ভক্তিমতী এবং দেবদ্বিজ-অতিথিপরায়ণা ছিলেন, সুতরাং দুইজনের আলাপ খুব জমিত এবং সদালোচনায় দীর্ঘকাল কাটিত।

এইরূপ দুই-চারিজনের আন্তরিক ও মৌখিক সহানুভূতি এবং সাময়িক সাহায্য পাইলেও শ্রীমা নিজেকে একান্তই বিপন্ন মনে করিতেন। শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে গাঁট দিয়া এবং কোদাল-হাতে মাটি কোপাইয়া ও শাক বুনিয়া তিনি কালাতিপাত করিতে একরূপ প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক অনৈক্য এবং সামাজিক ঔদাসীন্য বা উৎপীড়নের উপর তো তাঁহার হাত ছিল না। অবশ্য মনের দিক হইতে এই সকল ভয় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের ফলে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। শ্রীমা স্বয়ং বলিয়াছেন, "তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলুম; তখন সে ভয় ক্রমে দূর হল।" এই দর্শনগুলি খুবই ঘনিষ্ঠতাসূচক ছিল। একদিন ঠাকুর দর্শন দিয়া বলিলেন, "খিচুড়ি খাওয়াও।" মা ভাবিলেন, 'রঘুবীরই আর একরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ; তাই খিচুড়ি রাঁধিয়া 'রঘুবীরকে ভোগ দিলেন; পরে বসিয়া ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মনে শান্তি আসিলেও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তন হইল না।

এখানে সহজেই প্রশ্ন উঠিবে, শ্রীমা যখন এইরূপ অপ্রীতিকর আবেষ্টনীর মধ্যে দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃকুলের সকলে কি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন? আমরা জানি যে, তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; তাঁহার জননী শ্যামাসুন্দরীকে অতি দুঃখে দিন কাটাইতে হইত। তথাপি কন্যার অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি মধ্যমপুত্র কালীকুমারকে কামারপুকুরে পাঠাইলেন। সে সময় শ্রীমা পিতৃগৃহে যাইলেন না। ইহার পরে তিনি যখন জয়রামবাটী যাইয়া তিন-চারি দিন ছিলেন, তখন কন্যার ভিখারিণী বেশ দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহা সম্ভবতঃ 'জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে হইয়াছিল; কারণ 'জগদ্ধাত্রীর প্রতি মায়ের এমন একটা প্রাণের টান ছিল যে, আমাদের বিশ্বাস, তিনি ঐ সময়ে পিত্রালয়ে অবশ্যই গিয়াছিলেন। এই সুযোগে শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কন্যা বলিলেন, "এখন তো মা কামারপুকুরে যাচ্ছি, পরে তিনি যা করবেন, তাই হবে।"

ইহারই একসময়ে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে এক বিপর্যয় হইয়া গেল। মাতাঠাকুরানীর ভাশুরপুত্র রামলাল ও শিবরাম এবং ভাশুরপুত্রী লক্ষ্মী তখন সাধারণতঃ দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। তবে তাঁহারা দেশে আসিয়া কখনও যে স্বল্পকাল থাকিতেন না, তাহা নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, রাম-

লালদাদা শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরানীর বিষয় কতকটা উদাসীন ছিলেন। শিবরাম-দাদার (শিবুদাদার) সম্বন্ধে উহা বলা চলে না। শ্রীমা ছিলেন তাঁহার ভিক্ষা-মাতা এবং শিবুদাদা তাঁহার প্রতি পুত্রেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেন। অনেক পরে শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে বাস করিতে থাকেন, তখন কামারপুকুরে একদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া অর্ধেক ভোজনান্তে শিবুদাদার হঠাৎ মনে হইল যে, জয়রামবাটীতে ভিক্ষামাতার হস্তের ব্যঞ্জন খাইতে হইবে। অমনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুনর্বার আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে অপরাহ্নে স্বগৃহে ফিরিলেন। শ্রীমাও ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করিতেন—ইহার পরিচয় আমরা যথাকালে পাইব। সম্প্রতি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরবর্তী কয়েক বৎসরেরই আলোচনা করিতেছি। ইহারই এক সময়ে লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি অনেকেই কামারপুকুরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমা তখন পর্যন্ত একান্নবর্তী ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে ঐক্য আর রক্ষিত হইল না।

শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদিদি বৈষ্ণবভাবাপন্না ছিলেন। তিনি কখনও কখনও বাড়ির ভিতরে মধুরকণ্ঠে মনোহর কীর্তন করিতেন। উহা শুনিতে লোকসমাগম হইত। লজ্জাশীলা শ্রীমা ইহা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার স্মরণ ছিল যে, লক্ষ্মীদিদি যখন ঠাকুরের সম্মুখে কীর্তনিয়াদের অনুকরণে অঙ্গভঙ্গি করিয়া কীর্তন গাহিতেন, তখন ঠাকুর উহাতে আমোদিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাকে সাবধান করিয়া দিতেন, "লক্ষ্মীর ঐ ভাব; তুমি যেন ওর লয়ে লয় দিয়ে লজ্জা-শরম ভেঙ্গো না।" এই পার্থক্য ছাড়াও দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারে শ্রীমায়ের সহিত অপর সকলের ভাবগত বৈষম্য ক্রমেই স্ফুটতর হইতে লাগিল। আবার তিনি চাহেন বাকি দিনগুলি ঠাকুরের চিন্তায় নির্বিবাদে কাটাইতে; অথচ অপর সকলকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের দাবি ক্রমেই বাড়িয়া উঠে, আর উহা শ্রীমাকেও নিজের আবর্তে টানিতে চায়। সর্বংসহা শ্রীমা উপায়ান্তর না দেখিয়া মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতেছিলেন; কিন্তু এইরূপ স্থলে অন্যান্য পরিবারে যাহা হইয়া থাকে এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল– একাংশে ক্রিয়া এবং অপরাংশে নিষ্ক্রিয়তা থাকিলেও পরিবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। মাতৃগৃহ হইতে একবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমা দেখিলেন, রামলালদাদা বাড়ির ও গৃহদেবতার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের ঘরখানি তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল; উহাতে প্রবেশ করিয়া তিনি একাই স্বামীর ভিটা আগলাইতে লাগিলেন।

মাতাঠাকুরানীর জীবন আলোচনায় জানা যায় যে, বৃন্দাবন হইতে ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে কামারপুকুরে ফিরিবার পর হইতে ঐ বৎসরের বৈশাখ মাস (১৮৮৭-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৮৮-এর এপ্রিল) পর্যন্ত আন্দাজ নয়

মাস তিনি তথায় ছিলেন। পরে ভক্তগণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। কলিকাতা হইতে পর বৎসর ফেব্রুআরি মাসে তিনি আবার কামারপুকুরে যাইয়া পূর্ববারের মতো দীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। সম্ভবতঃ এই দুই বারের মতো দীর্ঘকাল তিনি আর কামারপুকুরে থাকেন নাই। তবে অনুমান হয় যে অল্পকালের জন্য হইলেও তিনি আরও অনেকবার কামারপুকুরে ছিলেন।[১] এই বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বহু ঘটনার যথাযথ কালনির্ণয় অসম্ভব। আমরা সে চেষ্টা না করিয়াই পূর্বোদ্ধৃত বিবরণগুলি লিপিবন্ধ করিয়াছি। পরবর্তী কয়েকটি ঘটনাও এইভাবেই উপস্থাপিত হইতেছে।

শ্রীমায়ের কামারপুকুরে অবস্থানকালে কালেভদ্রে কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীভক্ত তথায় আসিয়া দুই-চার দিন থাকিয়া যাইতেন। অবশ্য তাঁহারা অনেকেই দরিদ্র। তথাপি পরিচিত এবং একভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মিলন স্বতই আনন্দপ্রদ। এই হিসাবে মায়ের সেই একঘেয়ে পল্লীজীবনেও কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ভক্তমাত্রেরই আগমন বা অবস্থিতি আনন্দপ্রদ হয় না; বরং কখনও কখনও উহা অবাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। শ্রীমাকেও একবার অনুরূপ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিশ সাধুদের নিকট যাতায়াত করেন দেখিয়া তাঁহার পত্নী ঔষধ প্রয়োগপূর্বক তাঁহাকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে হরিশের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। তদবস্থায় তিনি কামারপুকুরে উপস্থিত হন। শ্রীমা হরিশের ব্যবহারে চিন্তান্বিত হইয়া পত্রদ্বারা মঠের সাধুদিগকে সব জানাইলেন। ঐ পত্র পাইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই হরিশের পাগলামি মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীমাকে একদিন উহার প্রতিকার করিতে হইল। ঘটনাটি আমরা শ্রীমায়ের নিজের ভাষায় লিপিবন্ধ করিলাম:

"হরিশ এই সময় কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরিশ তখন ক্ষেপা—পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই—আমি কোথায় যাই? তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের পাশে ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম

১ মাস্টার মহাশয়ের নোট দৃষ্টে শ্রীমায়ের কামারপুকুরে অবস্থানকাল এইরূপ অনুমিত হয়—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ; ১৮৯১-এর ফেব্রুআরি, ও জুলাই হইতে অক্টোবর; ১৮৯২-এর জুলাই; ১৮৯৩-এর জানুআরি ও জুলাই; ১৮৯৫-এর ১৩ই মে এবং নভেম্বর হইতে পরবর্তী জানুআরি; ১৮৯৭-এর মে ও আশ্বিন (পূজা)।

না। তখন...আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল।"

শ্রীমা আলোচ্যস্থলে 'নিজমূর্তি' শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা এখন নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীমা যখন জগদম্বারই অবতার, তখন তাঁহার পক্ষে দেবীর সর্বপ্রকার রূপ ধারণই সম্ভব ছিল এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি অসুরশমনী 'বগলামূর্তিতে' হরিশের কুপ্রবৃত্তিকে কঠিনহস্তে দমন করিয়াছিলেন। ভক্তের পক্ষে ইহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। কিন্তু যুক্তিবাদীও দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে শ্রীমা লজ্জা, বিনয়, করুণা ইত্যাদি নারীজনোচিত গুণরাজির জন্য সর্বত্র সুবিদিত, প্রয়োজনস্থলে তিনিও কিরূপ কঠোর হইতে পারিতেন। তাঁহার জীবনের এই ঘটনাটি আলোচনা করিলে মনে হয় যে যিনি চণ্ডীতে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি" ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বস্তুতই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। সেই শাসনের ফলে হরিশ যে শুধু সেইদিনের জন্য শান্ত হইলেন তাহাই নহে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ আসিতেই তিনি ভয়ে বৃন্দাবনে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষে (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) আঁটপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত শ্রীযুক্ত বলরামবাবু মহাশয়ের গৃহিণী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী ও শ্বশ্রূ শ্রীমতী মাতঙ্গিনী একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্রিতা ব্রাহ্মণকন্যা ও একজন বিশ্বাসী লোকের সহিত ঠাকুরের পুণ্য জন্মস্থানে উপনীত হন। একে ব্রাহ্মণগৃহ, তাহাতে আবার প্রভুর বাল্যলীলাস্থল, তাই এখানকার অন্ন অব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণ করা অবিধেয় জানিয়া বসুগৃহিণী তথায় পৌঁছিয়াই গৃহদেবতার ভোগের জন্য শ্রীমায়ের হস্তে প্রচুর অর্থ দিলেন। শ্রীমা তিন দিন যথাসাধ্য ভক্তসেবা করিয়া চতুর্থদিন অতি প্রত্যূষে তাঁহাদিগকে জয়রামবাটী লইয়া গেলেন। এখানেও তিন রাত্রি কাটাইয়া আগতা ভক্ত মহিলাগণ কামারপুকুর হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন[১]।

কামারপুকুর-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, আপদ-বিপদের মধ্যেও শ্রীমা তাঁহার

১ অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীমা যদিও নিজ অভাব ইঁহাদের চক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন নাই। ইঁহারা কলিকাতায় গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া দেন এবং তাহার ফলে ভক্তগণ শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। আমাদের অনুমানের ভিত্তি এই যে, শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী ঠাকুরানীর প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই শ্রীমা কলিকাতায় যান। অন্যমতে—প্রসন্ন-মামা তখন কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি রামলালদাদা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে শ্রীমায়ের অকথা জানাইলে গোলাপ-মায়ের আন্তরিক চেষ্টায় ভক্তগণ শ্রীমাকে কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা করেন।

আধ্যাত্মিক বর্তিকা পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার তাঁহার তথায় অবস্থানকালে উড়িষ্যাদেশীয় এক সাধু গ্রামে বাস করিতেন। ধর্মদাস লাহার ধর্মশীলা কন্যা প্রসন্নময়ীর ব্যবস্থায় গোঁসাই-মহলের প্রাচীরের বাহির দিকে একখানি চালাঘরে ঐ সাধু স্থান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাদৃপ্ত কয়েকজন হঠকারী যুবকের বিরাগদৃষ্টিতে পড়িয়া তিনি কামারপুকুর ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হন। সাধুকে গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধা করিত, শ্রীমাও তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। অতএব তিনি সমানুরাগীদের সাহায্যে হালদারপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁহার জন্য একখানি কুটীর নির্মাণে অগ্রণী হইলেন। তখন বর্ষা আগতপ্রায়—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বুঝি বা এখনই বৃষ্টি হয়। শ্রীমা কাতরপ্রাণে করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, রাখ গো, রাখ; ওঁর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক, তারপর যত পার ঢেলো।" সাধুর মাথা গুঁজিবার স্থান হইয়া গেলে নিজের শত অভাবসত্ত্বেও তাঁহার ভোজ্যসামগ্রী যোগাইতেন এবং সকালে বিকালে প্রশ্ন করিতেন, "সাধু বাবা, কেমন আছ গো?" সাধু কিন্তু সেখানে বেশীদিন বাস করেন নাই; ভগবদিচ্ছায় কিছুদিন পরেই তিনি ঐ কুটীরে দেহত্যাগ করেন।

কামারপুকুরের প্রথমাবস্থায় শ্রীমায়ের জীবন অতীব অভাবগ্রস্ত হইলেও পরে অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। ভক্তগণ পরম্পরাক্রমে সবিশেষ জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য অর্থাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের সংগৃহীত শিহড়ের দেবোত্তর জমি ও লক্ষ্মীজলার জমি হইতে শ্রীমা নিজ ভাগে যে ধান্য পাইতেন, তাহা নিজের পক্ষে তো যথেষ্ট হইতই, উহা হইতে তিনি কিছু দানও করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ আলোচ্য সময়েরই একেবারে শেষের দিকে সাগরের মা নামে একজন ঝি মায়ের বাড়িতে কাজ করিত। ঝির মুখে শোনা গিয়েছে যে, সে মায়ের বাড়ির হাট-বাজার করিয়া দিত। শ্রীমা প্রত্যহ যাহা রাঁধিতেন, তাহার কিছু কিছু একটা বাটিতে তুলিয়া রাখিতেন; বিকালবেলা ঝি আসিলে তাহাকে সাদরে দিয়া বলিতেন, "আগে মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে পরে কাজে লেগো।" আশ্বিন মাসে পূজার সময় নবমীর দিন ঠাকুরবাড়িতে মা শীতলার ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ, ছাগবলি[১] এবং ব্রাহ্মণভোজন হইত। শ্রীমা পূর্ব হইতেই স্বহস্তে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং নিজেই রন্ধন করিতেন। পরিবেশনের সময় তিনি শিবুদাদাকে বলিতেন, "শিবু, তুই পাতা করে জল নুন দে। আমি সব ব্রাহ্মণদের পাতে ভাত দিচ্ছি।" সাগরের মা বলে, "তাঁর ছিল যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কোন জিনিস কম পড়ত না। যা বাঁচত তা যত্ন করে রেখে দিতেন। পরদিন

১ পরে বলি বন্ধ হইয়া যায়।

আমাদের ডেকে আবার আদর করে খাওয়াতেন।” এইসকল উৎসব ব্যতীত দৈনিক অতিথি-সেবাও তিনি করিতেন—অভ্যাগত কাহাকেও তিনি ফিরাইতেন না।

শ্রীমায়ের কর্মকুশলতা আমরা দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে দেখিয়াছি। কামারপুকুরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাঁহারই উপর আসিয়া পড়ায় সে কর্মশক্তি বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ও নিজহাতে রান্না করিয়া ‘রঘুবীরকে ভোগ দিতেন। শিবুদাদা কামারপুকুরে থাকিলে তিনিই, নতুবা অপর কেহ, নিত্য-পূজা করিতেন। তাঁহার আগেই শ্রীমা হালদারপুকুরে স্নানান্তে দুইটি উনানে রান্না চাপাইয়া দিতেন এবং বারান্ডা হইতে রৌদ্র নামিবার পূর্বেই দুই-একটি তরকারি ও ভাত রাঁধিয়া ফেলিতেন।

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা পালনের জন্য শ্রীমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া-ছিলেন—তিনি কামারপুকুরে অনশনে, অর্ধাশনে, কায়ক্লেশে রুগ্নদেহে দিনাতি-পাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মানবের দেহমনের সহনশীলতার একটা সীমা আছে। অবস্থা যেখানে সর্বপ্রকারে প্রতিকূল সেখানে মানুষ স্বীয় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া সাধনভজন লইয়া দীর্ঘকাল কাটাইতে পারে না। গৃহের ভাবানৈক্য ও বিসংবাদ তো ছিলই, তদুপরি গ্রামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়াও শ্রীমায়ের পক্ষে অসহ্য ছিল। প্রসন্নময়ীকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া প্রতিপত্তিশালী গ্রাম্য যুবকগণ উড়িষ্যাদেশাগত সাধুর প্রতি যে অসদাচরণ করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীমা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর পুনঃপুনঃ আসিতে লাগিল কলিকাতাস্থ সন্তানগণের সাদর আহ্বান। সে ‘মা’-ডাকে জননীর হৃদয় বিগলিত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি কামারপুকুরের মমতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আর কামারপুকুরে আসেন নাই বা স্বামীর ভিটার মর্যাদা রক্ষা করেন নাই, তাহা নহে। তথায় তিনি আসিতেন; কিন্তু স্থায়িভাবে অবস্থান আর হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহখানি তিনি অর্থাদি ব্যয় করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। কোন বিশেষ ভক্ত কখনও ঐ অঞ্চলে যাইলে শ্রীমা ঠাকুরের ঐ ঘরখানির পবিত্রতার কথা তাঁহাকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং উহাতে বাস করিতে বলিতেন। রামলাল দাদাদের ঘরখানি দোতলা করার সময় তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ‘রঘুবীরের সেবা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন এবং ঐজন্য অর্থাদির ব্যবস্থা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে কামার-পুকুরে তাঁহার স্থায়িভাবে বাস অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের ইচ্ছা তিনি অন্যভাবে যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন।

তবু উত্তরকালে ভক্তেরা যখন আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে মায়ের কামারপুকুর ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিত এবং শ্রীমাও যথা-

সম্ভব তাঁহাদের ঔৎসুক্য মিটাইতে চেষ্টা করিতেন। একবার জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, আপনি তো ঠাকুরের বাড়ি একবারও যান না; কলকাতা থেকে দেশে এলেই বাপের বাড়িতে উঠেন। এটি কি আপনাদের পূর্ব পূর্ব ধারা?" মা সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "তা নয়, বাবা। ঠাকুরের বাড়ি কি ভুলতে পারি? শিবু আমার ভিক্ষেপুত্তুর। তবে ঠাকুর এখন স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন, গেলে বড়ই কষ্টবোধ হয়; তাই যাই না।" এই কষ্টবোধের পশ্চাতে অন্তরের অসীম বিরহ তো ছিলই, তাহার সহিত আবার বাহিরের বিরূপভাবও মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বজনের দোষোদ্ঘাটনে পরাঙ্মুখ হইয়া তিনি উহা সাধারণতঃ প্রকাশ করিতেন না, অতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকেই মাত্র বলিতেন। জনৈক সেবককে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের শরীর যাবার পর কিছুদিন ঘুরে ফিরে যখন কামারপুকুরে গিয়ে আছি, আত্মীয়েরা যেন উপেক্ষার ভাব দেখাতে লাগল, আর গাঁয়ের লোকদের দস্যিগিরির কথা শুনে মা আমাকে এখানে (জয়রামবাটীতে) নিয়ে এলেন—আমায় আর কামারপুকুরে বাস করতে দিলেন না। সেই থেকে ভাইদের সংসারে এদের দুঃখে সুখে এতদিন পড়ে রয়েছি। এখন আবার ওরা বলে, 'তিনি আমাদের দেখেন না।' মানুষের মন এমনি।"

যাহা হউক, আমরা আপাততঃ শ্রীমায়ের জয়রামবাটী জীবনের আলোচনা না করিয়া কামারপুকুরের কথা ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গে চলিলাম। শ্রীমাকে এখন আমরা পাইব কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভক্তসঙ্গে।

ভক্তসঙ্গে

শ্রীমা কামারপুকুরে অতি দুঃখে জীবন কাটাইতেছেন—এই সংবাদ কলিকাতায় ভক্তদের নিকট পৌঁছিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। যুবক ভক্তগণ তপস্যার উদ্দীপনায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন; তাঁহারা এই সব জানিতেন না। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী পরে বলিয়াছিলেন, "আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মার নুনটুকুও জোটে না।" আট-নয় মাস পরে ভক্তগণ যখন যথার্থ অবস্থা অবগত হইলেন, তখন শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসার সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শ্রীমা ভক্তদের আন্তরিকতা জানিতেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ আপনার লোকের অনুরোধ না শুনিয়া কামারপুকুরে শত বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়িয়া থাকা অযৌক্তিক। কিন্তু তথাপি দুই-একটি জটিল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা না করিয়া তিনি অকস্মাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, লজ্জাই নারীর ভূষণ। নগরে ভক্তগৃহে সে লজ্জা অক্ষুণ্ণ থাকিবে তো?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুতর, অথবা উহাও প্রথম সমস্যারই রূপান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ যতদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ততদিন তথায় যাতায়াত প্রচলিত সামাজিক নিয়মেই চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে শ্রীমা আজ কিরূপে অশিক্ষিত পল্লীসমাজের বিরুদ্ধ আলোচনা অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতায় যাইবেন? তিনি স্বয়ং এই সময়ের কথা এইরূপ বলিয়াছেন, "ঠাকুর চলে যাবার পর আমার যখন এখানে (কলকাতায়) আসার কথা হল, তখন আমি কামারপুকুরে। ওখানকার অনেকেই বলতে লাগল, 'ওমা, সেই সব অল্প বয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে কি থাকবে!' আমি তো মনে জানি, এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, 'তা যাবে বইকি, তারা সব শিষ্য।' আমি শুধু শুনি। পরে, আমাদের গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা আছেন (ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী), তিনি ভারী ধার্মিক ও বুদ্ধিমতী বলে সকলে তাঁর কথা মানে, আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি বল?' তিনি বললেন, 'সে কি গো? তুমি অবিশ্যি যাবে। তারা শিষ্য, তোমার ছেলের মতো। একি একটা কথা! যাবে বইকি!' তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিল। তখন এলুম।"

১২৯৫ সালের আরম্ভে (সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে বা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) শ্রীমা ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া বলরামবাবুর বাড়িতে

উঠিলেন। এই সময় কিংবা ইহারই কাছাকাছি কোন এক সময়ে শ্রীমায়ের ধ্যান-তন্ময়তা ও সমাধির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে ধ্যান করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং ব্যুত্থিতাবস্থায় শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদরযত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে—সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনে! একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁশ এল।" মনে হয় যেন শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ ও সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাই ঐ দর্শনের মধ্যে চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রীমা নিজের দেবীত্বসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, অথচ বুঝিতেছিলেন যে, দৈবনির্দেশে তাঁহাকে এই অননুকূল অবস্থার মধ্যেই থাকিয়া লোককল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

অল্পদিনের মধ্যেই ভক্তগণ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ি ঠিক করিয়া শ্রীমাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে প্রায় ছয় মাস ছিলেন। ঐ সময় শ্রীযুক্তা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেন; ত্যাগী ভক্তেরা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীমা সহচরী-দ্বয়ের সহিত ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। যোগীন-মার ধ্যান ভাঙ্গিলে তিনি দেখেন যে, শ্রীমা তখনও বসিয়া আছেন—স্পন্দনহীন, সমাধিস্থ। অনেক-ক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় নামিয়া আসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" সহচরীদ্বয় তাঁহার হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলেন—"এই যে পা, এই যে হাত।" তথাপি তাঁহার দেহবোধ আসিতে বহু সময় লাগিল। নীলাম্বরবাবুর বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইলে কার্তিক মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৮৮৮ ইং) শ্রীমা কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে প্রত্যা-গমন করেন এবং তথায় দুই-এক দিন থাকিয়াই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন।

শ্রীমাকে নীলাচলে যাইতে উন্মুখ দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, শ্রীযুক্তা যোগীন-মা, যোগীন-মার জননী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী দেবী তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তখনও রেল লাইন প্রস্তুত না হওয়ায় তাঁহারা কলিকাতা হইতে বড় জাহাজে চাঁদবালিতে উপনীত হন (৭ই নভেম্বর); অতঃপর ছোট লঞ্চে কটক পর্যন্ত এবং কটক হইতে গোযানে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। পুরীধামে সকালে পৌঁছিয়াই তাঁহারা অবিলম্বে 'জগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন; কেননা সেই দিনই দর্শন না হইলে অকাল পড়িয়া যাইবে। পরে শ্রীমা এবং মহিলাবৃন্দ বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' আশ্রয় লইলেন;

ত্যাগী ভক্তদের অন্যত্র বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। শ্রীমা এই বাড়িতে কিঞ্চিদধিক দুই মাস অবস্থানের পর পৌষ মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে পুরীর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে যান নাই বলিয়া শ্রীমা তাঁহার ছবি বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া গিয়া 'জগন্নাথদর্শন করাইয়াছিলেন, যেহেতু শ্রীমায়ের বিশ্বাস ছিল, "ছায়া-কায়া সমান।" 'জগন্নাথকে দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।" তিনি অন্য সময় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার স্বপ্নে 'পুরুষোত্তমকে শিবরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'জগন্নাথদর্শনকালে শতসহস্র নরনারীকে ভগবানের সাক্ষাৎকারার্থে সমাগত দেখিয়া এই ভাবিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুপ্লাবিত হইতে লাগিল, "আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে।" আবার পরেই তাঁহার মনে এই সত্য উদ্ভাসিত হইল, "না, যারা বাসনাশূন্য, সেই এক-আধটি মুক্ত হবে।" এই কথা শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিলে তিনিও উহা সমর্থন করিলেন।

পুরীতে শ্রীমায়ের বিনয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। শ্রীযুক্ত বলরামবাবুদের গুরুপত্নীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক জানিয়া তাঁহাদের পান্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী শ্রীমায়ের জগন্নাথমন্দিরে যাইবার জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে তিনি পান্ডাকে বলিয়াছিলেন, "না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীনহীন কাঙ্গালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে 'জগন্নাথদর্শনে যাব।" কার্যতঃ তাহাই হইয়াছিল। পুরীতে তিনি সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত 'লক্ষ্মীর মন্দিরে বসিয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি (২৯শে পৌষ ১২৯৫ সাল) কলিকাতায় উপনীত হইয়া শ্রীমা 'নগা' নামক জনৈক ভক্তের গৃহে উঠেন। পরদিন তিনি নিমতলায় গঙ্গাস্নান করেন এবং ২২শে জানুআরি কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করেন। ইহার পর ৫ই ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, মাস্টার মহাশয়, সান্যাল মহাশয় প্রভৃতি অনেকের সহিত তিনি স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুরে গমন করেন। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিবার পর তিনি শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় প্রভৃতির সহিত গোযানে তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

এইবারও পূর্ববারের ন্যায় দীর্ঘকাল কামারপুকুরে কাটাইয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং ভক্তগণের ব্যবস্থানুসারে কিছুকাল বেলুড়ে গঙ্গাতীরে

১ মাস্টার মহাশয়ের দিনলিপি।

রাজু গোমস্তার ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করেন। তারপর ৪ঠা মার্চ (১৮৯০) কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে আসেন এবং সেখান হইতে ২৫শে মার্চ বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর সহিত গয়া যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ জননীর দেহান্তে শ্রীমাকে গয়াধামে গমনপূর্বক ৺বিষ্ণুপাদপদ্মে বৃদ্ধার জন্য পিণ্ডদান করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমা এক্ষণে সে আদেশ পালন করেন। এই সুযোগে তিনি পথে ৺বৈদ্যনাথ দর্শন করেন এবং গয়া হইতে বুদ্ধগয়াতেও যান। তীর্থদর্শনান্তে ২রা এপ্রিল কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি পুনরায় মাস্টার মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে থাকেন।[১] এই সময় শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের শেষ অসুখ চলিতেছিল। ভক্তপ্রবরের প্রভুসেবা এবং তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমা তাঁহার বাটীতে চলিয়া আসেন। ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ (১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০) বলরামবাবু বাঞ্ছিত লোকে গমন করেন।

পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমাকে বেলুড়ের ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে একখানি ভাড়াবাড়িতে আনিয়া রাখা হয়। এই বাড়িতে শ্রীমায়ের অবস্থান-কালে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মনে অকস্মাৎ অজ্ঞাত সুদূরের আহ্বান আসিল--তিনি স্থির করিলেন যে, জ্ঞানান্বেষণে মঠ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিবেন। কিন্তু বিদায়ের প্রাক্কালে শ্রীমায়ের আশীর্বাদগ্রহণ একান্ত আবশ্যক জানিয়া জুলাই মাসের একদিন তিনি ঐ বাটীতে আসিয়া ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন। অতঃপর অন্তরের আকুতি জানাইয়া বলিলেন, "মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।" শ্রীমা বলিলেন, "সে কি!" তখন স্বামীজী কহিলেন, "না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।" মা সন্তানের আগ্রহ বুঝিতে পারিলেন, আর দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ; অতএব প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং জ্ঞানলাভ ও কার্যসমাপনান্তে অচিরে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন। সে মঙ্গলাশীর্বাদে পরিতৃপ্ত স্বামীজী পরিব্রাজকবেশে ভারতের তীর্থাদি দর্শনে নির্গত হইলেন।

ভাদ্র মাস পর্যন্ত শ্রীমা এই বাড়িতে ছিলেন। অনন্তর রক্তামাশয় হওয়ায় তাঁহাকে গঙ্গার অপর পারে বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াবাড়িতে রাখিয়া চিকিৎসা করানো হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তখন বরাহনগরেই অবস্থিত

১ পুরী ও গয়া যাত্রার ক্রম ও সময় শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের স্মারকলিপিদৃষ্টে স্থিরীকৃত হইল। ইহার সহিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা ও ৩১৭-১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণের উল্লেখযোগ্য সামঞ্জস্য আছে।

ছিল। চিকিৎসার ফলে রোগের উপশম হইলে শ্রীমা বলরামবাবুর বাড়িতে আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কার্তিক মাসে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। তিনি পিতৃগৃহে কিরূপে দিন কাটাইয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত নহে।[১] তবে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজাকালের (২৫শে কার্তিক, ১২৯৮; ১০ই নভেম্বর, ১৮৯১) যে বিবরণ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শ্রীমা তখন পূর্ণরূপে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার দেবীত্বও ভক্ত এবং পরিচিতগণের নিকট সুপরিজ্ঞাত। তখন শ্রীমায়ের পিতৃগৃহে জগদ্ধাত্রীপূজা হইবে, এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ পূজোপকরণাদি লইয়া জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে চলিলেন শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়, হরমোহন মিত্র, কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দজী), গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। তাঁহারা বর্ধমান হইতে গরুর গাড়িতে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানাদি দর্শনান্তে পদব্রজে জয়রামবাটী পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া মায়ের আনন্দ ধরে না—কিরূপে তাঁহাদের যত্ন করিবেন, কি খাওয়াইবেন, ভাবিয়া পান না। প্রতিদিন তিনি স্বহস্তে তরকারি কুটিতেন ও রন্ধনান্তে পার্শ্বে বসিয়া সকলকে সযত্নে খাওয়াইতেন। তাঁহার অপরিসীম স্নেহে সকলের হৃদয় গলিয়া গেল। দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ তরুণতাপস কালীকৃষ্ণকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। কালীকৃষ্ণের সর্বত্র অবাধ গতি ছিল। তিনি বয়স্কদের ফরমাশ খাটিতেন—পান বা জলখাবার আনিতে অথবা স্বামী সারদানন্দজী ও সান্যাল মহাশয়ের জন্য তামাকের আগুন আনিতে প্রায়ই ভিতরে যাইতেন। সন্তানকে হাতে করিয়া আগুন দিতে নাই বলিয়া শ্রীমা ঘুঁটের বা কাঠের আগুন মাটিতে ফেলিয়া কালীকৃষ্ণকে চিমটার দ্বারা উহা তুলিয়া লইতে বলিতেন।

শ্রীমায়ের জননী শ্যামাসুন্দরীকে ইঁহারা দিদিমা বলিতেন। দিদিমা বড়ই সরল ও অনলস—দিবারাত্র তাঁহার কাজের বিরাম ছিল না। গরুসেবা, মজুরদের খাওয়ানো, ধানভানা প্রভৃতি কার্য একটার পর একটা চলিয়াছে; অথচ মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়াই আছে—বিরক্তি বা ক্রোধের লেশমাত্র নাই। শ্রীমা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। দিদিমা নাতি-জ্ঞানে ভক্তদিগকে খুব যত্ন করিতেন এবং তাঁহাদের 'দিদিমা' ডাকে বিশেষ আহ্লাদিত হইতেন। নাতিদের প্রতি তাঁহার এই প্রীতি খুবই স্বাভাবিক ছিল; পরেও যখনই যিনি গিয়াছেন, তিনি

১ এই গ্রন্থের 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' অধ্যায়ে ইহার কতক বিবরণ পাওয়া যাইবে। মাস্টার মহাশয়কে লিখিত ৩রা ফাল্গুন, ১২৯৭ (ফেব্রুআরি, ১৮৯১)-এর পত্রে জানা যায় যে, শ্রীমা তৎপূর্বে কামারপুকুর গিয়াছেন এবং অভয় মামার নিকট গীতা শুনিতেছেন আর লক্ষ্মীদিদি গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন।

দিদিমার স্নেহযত্নে মুগ্ধ হইয়াছেন। দিদিমা সমস্ত বৎসর ধরিয়া নাতিদের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতেন আর বলিতেন, "আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।"

সেবারে জগদ্ধাত্রীপূজায় আগত কালীকৃষ্ণাদি নাতিদিগকে দিদিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক গল্প শুনাইয়াছিলেন। একদিন বাড়িতে দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী আসিয়া বেহালা বাজাইয়া গান ধরিল--

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)!
(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী--
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে;
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে!
হিমালয়-বাস হর করিয়াছে,
ভিক্ষায় দিন-রক্ষা এমন দিন গেছে,
এখন কুবের-ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে।
ফিরেছে কি কপাল তোর কপালক্রমে?
বিষয়-বুদ্ধি, বটে, বিশ্বাস হইল মনে;
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব কেনে?
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকায়ে রয় শ্রীরাধিকার নামে॥

গানটি যেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেরই অবিকল ছবি; তাই সকলেই মুগ্ধচিত্তে শুনিলেন। ভিতর হইতে যোগীন-মা ও গোলাপ-মার অনুরোধ আসায় গানটি আবার গাওয়া হইল। অনন্তর পয়সা ও সিধা লইয়া ভিখারী চলিয়া গেলে দিদিমা বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ গো, তখন সকলেই জামাইকে ক্ষেপা বলত, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আমায় কত কথা শোনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ কত বড়ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা-পূজা করছে।"

শ্রীমায়ের পিতৃগৃহে প্রথানুযায়ী জগদ্ধাত্রীপূজা তিন দিন ধরিয়া মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইল। মাকে সর্বদাই রন্ধনাদিতে ব্যস্ত দেখা গেল। কয়-

দিনই সন্ধ্যারতি এবং প্রধান পূজাকালে তিনি করজোড়ে দাঁড়াইয়া জগদম্বাকে দর্শন করিলেন, অথবা চামর ব্যজন করিলেন। তিন দিনই দূর-দূরান্তর হইতে আগত সর্বশ্রেণীর লোক প্রসাদ পাইলেন। সকলেই দেশের রীতি অনুযায়ী ভাত, কড়াইয়ের দাল, পোস্ত চচ্চড়ি, বিবিধ তরকারি, দই ও মিঠাই তৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ করিলেন। দুই রাত্রি যাত্রাও হইল।

পূজার তিন দিন পরে কলিকাতা হইতে আগত সারদানন্দজী প্রমুখ সকলেই ম্যালেরিয়ায় শয্যাগ্রহণ করিলেন। মায়ের তখন চিন্তার অবধি নাই—কেবলই বলেন, "মাগো, কি হবে? ছেলেরা সকলেই পড়ে পড়ে ভুগছে।" কাজের অবকাশে, তিনি প্রায়ই দরজার বাহিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রোগীদের দেখিয়া যান। গ্রামে দুধ দুষ্প্রাপ্য ; তথাপি তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া এক পোয়া, আধ পোয়া—যাহা পান, সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং তদ্দ্বারা পথ্যের ব্যবস্থা করেন। অন্নপথ্য করার পর ইঁহারা স্থির করিলেন যে, অধিকদিন থাকিলে মায়ের খাটুনি বাড়িবে ; অতএব কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক। মা কিন্তু বলিতে লাগিলেন, "আর একটু সেরে ও বল পেয়ে যাবে।" তথাপি নির্দিষ্ট দিনে ইঁহারা আহারান্তে গরুর গাড়িতে উঠিলেন। মা খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার চক্ষে অবিরাম ধারা বহিতেছে। গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাও অশ্রু নিরোধ করিতে পারিলেন না। কালীকৃষ্ণেরও চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়ি চলিতে লাগিল। অনেক দূর যাওয়ার পর কালীকৃষ্ণ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মা তখনও তালপুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন। ক্রমে গাড়ি দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল। মঠে ফিরিতে ফিরিতে কালীকৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন, "মার কথা যা সামান্য শুনেছিলুম, তাতে কে জানত যে, মা এরকম মা; এরকম করে মনপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হতেও আপনার করে নেবেন! বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসতুম, তিনিও কত ভালবাসতেন ; কিন্তু এ যে জন্ম-জন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা।"

১২৯৭ সালের কার্তিক মাস হইতে ১৩০০ সালের প্রথম পাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল দেশে কাটাইয়া শ্রীমা আষাঢ় মাসে কলিকাতায় আসিলেন। বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এখানে তাঁহার অন্যতম সেবকরূপে সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মহারাজ থাকিতেন। সেবক নিষ্ঠাসহকারে প্রতি-সন্ধ্যায় শিউলি গাছের তলায় পরিষ্কার কাপড় পাতিয়া রাখিতেন, যাহাতে শ্রীমায়ের পূজার ফুল মাটিতে পড়িয়া অব্যবহার্য না হয়।

এই সময়ে অন্যতম প্রধান ঘটনা শ্রীমায়ের পঞ্চতপানুষ্ঠান। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর মায়ের মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল ; কর্তব্যবোধে

উপস্থিত কার্য করিয়া গেলেও তাঁহার কেবল মনে হইত—এমন সোনার ঠাকুরই যখন চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার থাকার সার্থকতা কি? কিছুই ভাল লাগিত না, কাহারও সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হইত না। শ্রীমায়ের অন্তরের বিষাদ দূরীকরণার্থে ত্যাগী সন্তানগণ তাঁহাকে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। শ্রীমা যখন কাশীতে ছিলেন, তখন এক নেপালী সাধুনী তাঁহার নিকট আসিতেন; তিনি নানাপ্রকার অনুষ্ঠানাদিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। মাতা-ঠাকুরানীর মানসিক অবস্থা দেখিয়া তিনি একদিন পরামর্শ দিলেন, "মাঈ, পঞ্চতপা করো।" সাধুনীর কথায় শ্রীমায়ের চিন্তাস্রোত নবধারায় প্রবাহিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বাহিরের আগুন যদি দুঃসহরূপে প্রজ্বলিত হয়, তবে মনের আগুন নিভিতেও পারে। অধিকন্তু তদবধি তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে শরীররক্ষারও হয়তো একটা প্রয়োজন আছে, কারণ তখনও তাঁহার কর্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ধ্বনিত হইতেছিল, "তোমার মরা হবে না- তোমায় থাকতে হবে।" এইরূপ দ্বিধাসঙ্কুল চিত্ত লইয়াই তিনি দিন কাটাইতেছিলেন। এমন সময় দুইটি দৈব দর্শন বা নির্দেশ তাঁহাকে যেন ঐ কার্যে প্ররোচিত করিতে থাকিল। তিনি কামারপুকুরে সাদা চোখে দেখিয়াছিলেন, একাদশ কিংবা দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা এক কন্যা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে—কখনও সম্মুখে কখনও পশ্চাতে: তাহার কেশ রুক্ষ, পরিধানে গৈরিক আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত অন্তরের বৈরাগ্য যেন মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। ঠাকুরের অন্তর্ধানের কিছুকাল পর হইতে তিনি আর একটি দর্শন পাইতেন। তিনি প্রায়ই দেখিতেন, শ্মশ্রু-আদিবিমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে পঞ্চতপা করিবার কথা বলিতেছেন। শ্রীমা প্রথমে এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন।

অবশেষে বেলুড়ে অবস্থানের সময় শ্রীমায়ের মনে পঞ্চতপার আগ্রহ বর্ধিত হইল। পঞ্চতপা কি, তাহা তিনি জানেন না: তাই যোগীন-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ তো, মা, আমিও করব।" সুতরাং উভয়ের জন্য পঞ্চতপানুষ্ঠানের আয়োজন হইল। একতলার ছাদের উপর মাটি ফেলিয়া উহার উপর পাঁচ হাত অন্তর ঘুঁটে দিয়া সকালে চারিটি আগুন জ্বালানো হইল। আগুনের পরিধি বেশ বড় এবং উহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, আর আকাশে রহিয়াছে গ্রীষ্মকালের মার্তণ্ড! গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়া সেই পাঁচটি আগুনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া শ্রীমা ভাবিলেন, এই ব্রতানুষ্ঠান কি সম্ভব হইবে? যোগীন-মা সাহস দিয়া বলিলেন, "মা, ঢুকে পড়, ভয় কি?" অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া শ্রীমা সেই অগ্নিকুণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; যোগীন-মাও পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীমা দেখিলেন, উহা যেন তেজোহীন। এদিকে

সকালের সূর্য মস্তকোপরি উঠিয়া দ্বিপ্রহরের অগ্নিজাল ঢালিয়া অবশেষে সন্ধ্যায় বিদায় লইলেন। তখন শ্রীমা সহচরীর সহিত সেই অগ্নিরাশি হইতে উঠিয়া আসিলেন। এইরূপ ক্রমাগত সাত দিন উদয়াস্ত তপস্যা চলিল—শরীর ঝলসিয়া অঙ্গারবর্ণ হইল। তখন মনের আগুন অনেকটা নিভিল; গৈরিক পরিহিতা কিশোরীও চিরদিনের মতো বিদায় লইল।

বিষম অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীমা উত্তীর্ণ হইলেন। অথচ পরবর্তী কালে ভক্ত সন্তানদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি এই পঞ্চতপাকে অতি সাধারণ ভাবেই বর্ণনা করিতেন। ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "তপস্যার কি দরকার?" মা বলিলেন, "তপস্যা দরকার।...পার্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন।...এসব করা লোকের জন্য। নইলে লোকে বলবে, 'কই, সাধারণের মতো খায় দায়, আছে।' আর পঞ্চতপা-টপা এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না? ঠাকুর সব সাধনা করেছেন। বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে'।" অন্তরঙ্গ সন্তান জানিতে চাহিলেন, "আপনার অত শত করার দরকার কি?" মা উত্তর দিলেন, "বাবা, তোমাদের জন্যে। ছেলেরা কি অত করতে পারবে? তাই করতে হয়।"

পঞ্চতপার ফলে প্রাণের জ্বালা নিভিলেও শরীর-ধারণের প্রয়োজন তাঁহার নিকট তখনও চূড়ান্তরূপে প্রতিভাত হয় নাই। আর এক অভিনব দর্শনের ফলে উহারও বিলম্ব হইল না। সেদিন পূর্ণিমা তিথি। বিস্তৃত জাহ্নবীবক্ষে জ্যোৎস্নারাশি মৃদুপবনে গলিত রজতের ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমা উদ্যানবাটী হইতে গঙ্গায় অবতরণ করিবার সোপানে উপবিষ্ট হইয়া মুগ্ধনেত্রে সুরধনীর অপূর্ব শোভা দর্শন করিতেছেন—মনে অন্য কোন চিন্তা নাই। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন হইতে আসিয়া দ্রুতপদে গঙ্গায় নামিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ যুগযুগান্তরারাধিতা ভাগীরথীর পাপহারী পবিত্র নীরে মিশিয়া গেল। তদ্দর্শনে শ্রীমায়ের সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দুই হস্তে সেই ব্রহ্মবারি লইয়া চারিদিকে অগণিত নরনারীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীমা চাহিয়া দেখিলেন, অসীম জনসঙ্ঘ সেই জলস্পর্শে সদ্যোমুক্তি লাভ করিতেছে। দৃশ্যটি এতই জীবন্ত বোধ হইয়াছিল যে, কয়েক দিন পর্যন্ত উহা যেন তাঁহার নয়নসমক্ষে ভাসিতেছিল; তাই ঠাকুরের দিব্যদেহ-বোধে কিছুকাল তিনি পদস্পর্শ হওয়ার ভয়ে গঙ্গাজলে নামিয়া স্নান করিতে পারেন নাই। এই অলৌকিক দর্শন মাতাঠাকুরানীর মনে যুগাবতারের লীলার তাৎপর্য পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিল এবং উহার মর্ম

উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, সে লীলার পুষ্টিবিধানের জন্য তাঁহারও এই নরদেহে অবস্থানের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।

কল্যাণসাধনের যে মহতী ইচ্ছা এইরূপ বিবিধ অনুভূতি ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া ক্রমে অন্তররাজ্যে রূপগ্রহণ করিতেছিল, তাহা এই বাটীতেই এক অপূর্ব ঘটনা অবলম্বনে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল। এই বাড়িতে নাগ মহাশয় শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। নাগ মহাশয় শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়াই জানিতেন। তিনি যেদিন আসিলেন, সেদিন একাদশী, শ্রীমা আহারে বসিয়াছেন। তখন পর্যন্ত কোন পুরুষ ভক্ত শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন না—সিঁড়িতে মাথা ছোঁয়াইয়া প্রণাম করিতেন ; একজন ঝি আসিয়া নাম কবিয়া বলিত, "মা, তোমাকে অমুক-বাবু প্রণাম করছেন", শ্রীমাও আশীর্বাদ জানাইতেন। আলোচ্য দিনে ঝি আসিয়া বলিল, "মা, নাগ মশায় কে? তিনি প্রণাম করছেন ; কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হয় রক্ত বেরুবে। মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) পেছন থেকে কত বলছেন থামবার জন্যে, কিন্তু কোন বাক্যই নেই—যেন হুঁশ নেই। পাগল নাকি, মা?" শ্রীমা এই তন্ময় ভক্তের কথা শুনিয়াই স্নেহে বিগলিত হইলেন এবং ঝিকে বলিলেন, "ওগো, যোগেনকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।" যোগানন্দজী[১] নিজেই ধরিয়া লইয়া আসিলে মা দেখিলেন, নাগ মহাশয়ের কপাল ফুলিয়া গিয়াছে, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, পা এখানে পড়িতে সেখানে পড়িতেছে, চোখের জলে সেখানে শ্রীমাকে পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন না—নাগ মহাশয় যেন এ জগতেই নাই। স্নেহবিচলিতা শ্রীমা তাঁহার চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ ভুলিয়া গিয়া ভক্তিবিহ্বল সন্তানকে ধরিয়া বসাইলেন। নাগ মহাশয়ের মুখে তখনও কেবল "মা, মা" শব্দ—যেন উন্মাদ, অথচ শান্ত ধীর স্থির। শ্রীমা তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন ; সম্মুখে একাদশীর আহার্য ছিল—লুচি, মিষ্টি, ফল—উহা হইতে কিছু নিজমুখে দিয়া স্বহস্তে নাগ মহাশয়কে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু নাগ মহাশয়ের মন তখন মোটেই বাহিরের দিকে নাই—মুখে খাদ্য তুলিয়া দিলেও গিলিতে পারেন না, কেবল "মা, মা" বলিতেছেন, আর শ্রীমায়ের পায়ে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। মাকে মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার তো খাওয়া হল না। মহারাজকে বলি, এঁকে সরিয়ে নিতে।" মা বলিলেন, "থাক, একটু স্থির হয়ে নিক।" শ্রীমা কিছুক্ষণ তাঁহার গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে ও ঠাকুরের নাম করিতে হুঁশ আসিল। তখন মা খাইতে বসিলেন ও নাগ মহাশয়কে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

১ মতান্তরে স্বামী প্রেমানন্দজী নাগ মহাশয়েব সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনিই তাঁহাকে শ্রীমায়ের নিকট লইয়া আসিযাছিলেন।

আহার শেষ হইলে নাগ মহাশয়কে যখন নীচে নামানো হইতেছিল, তখন তিনি শ্রীমাকে কেবলই বলিতেছিলেন, "নাহং, নাহং ; তুহুঁ তুহুঁ।" যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীমা বলিলেন, "দেখ কি বুদ্ধি।" তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এই ভক্তপ্রবর তাঁহার জন্য সব করিতে পারিতেন। মাতাঠাকুরানীর শ্রীহস্ত হইতে প্রসাদ-লাভের আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাগ মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।"

নাগ মহাশয়ের প্রতি শ্রীমায়ের বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহারের আর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। উহা অন্য সময়ের এবং হয়তো অন্য স্থানের হইলেও বর্ণনার সুবিধার জন্য আমরা এখানেই লিপিবদ্ধ করিলাম। একবার একখানি ময়লা জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া এবং নিজেদের গাছের এক ঝুড়ি আম মাথায় লইয়া তিনি শ্রীমায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমগুলি খুবই ভাল ছিল ; কতকগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া ছিল। মায়ের বাটীতে আসিয়া তিনি ঝুড়ি মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কাহারও হাতে উহা দেন না। তাঁহার মনের ভাব ছিল, মাকে বসিয়া খাওয়াইবেন ; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। অবশেষে স্বামী যোগানন্দজী খবর পাঠাইলেন, "মাকে বল, নাগ মহাশয় আম নিয়ে এসেছেন—কিছু বলেনও না, কারও কাছে দেনও না।" শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন, "এখানে পাঠিয়ে দাও।" নাগ মহাশয় ঝুড়ি মাথায় করিয়াই আসিলেন এবং একজন ব্রহ্মচারী উহা নামাইয়া লইলে মাতাঠাকুরানীর চরণবন্দনা করিলেন। মা দেখিলেন, তিনি এবার পূর্ববারেরই মতো বেহুঁশ—মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও "মা, মা" রব, আর বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছে। তখনও ঠাকুরপূজা হয় নাই। আমগুলি কাটিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইল। পূজান্তে যোগীন-মা আসিয়া একখানি শালপাতায় শ্রীমাকে প্রসাদ দিয়া গেলে তিনি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং গোলাপ-মাকে বলিলেন, "আর একখানা শালপাতা দাও।" পাতা দেওয়া হইলে উহাতে কিছু প্রসাদ তুলিয়া দিয়া তিনি নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "খাও।" কিন্তু কে খাইবে? তাঁহার দেহজ্ঞানই নাই—হাত যেন অবশ। শ্রীমা তাঁহার হাত ধরিয়া অনেক করিয়া খাইতে বলিলে তিনি খাইলেন না, শুধু এক টুকরা আম লইয়া মাথায় ঘষিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমা নিরুপায় হইয়া নীচে সংবাদ পাঠাইলেন এবং একজন আসিয়া নাগ মহাশয়কে লইয়া গেলেন। নীচে গিয়া প্রণাম করিতে করিতে তিনি মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন এবং বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন, অন্নপ্রসাদ আর গ্রহণ করিলেন না।

শ্রীমা যখন বাগবাজারে গঙ্গার ধারে গুদাম বাড়িতে ছিলেন, তখন নাগ মহাশয় তথায় আসিলে তিনি তাঁহাকে একখানি শালপাতায় প্রসাদ দিয়াছিলেন।

নাগ মহাশয় ভক্তির আতিশয্যে পাতাসুদ্ধ প্রসাদ খাইয়া ফেলেন। অন্য একবার মা তাঁহাকে একখানি কাপড় দিয়াছিলেন। নাগ মহাশয় উহা না পরিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। তাঁহার প্রতি শ্রীমায়ের অপার স্নেহ তাঁহার দেহত্যাগের পরেও শতধা প্রকাশিত হইত। জনৈক ভক্ত একদিন দেখিয়াছিলেন, মাতাঠাকুরানী তাঁহার শয়নঘরের দেওয়ালে ঝুলানো স্বামীজী, গিরিশবাবু ও নাগ মহাশয়ের ছবিগুলি একে একে মুছিয়া, উহাতে চন্দনের ফোঁটা দিয়া হাত দিয়া চুমা খাইলেন এবং সর্বশেষে নাগ মহাশয়ের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "কত ভক্তই আসছে ; কিন্তু এমনটি আর দেখছি না।"

আলোচ্য সময়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে কয়েক মাস কাটাইয়া শ্রীমা সম্ভবতঃ জয়রামবাটী চলিয়া যান। অতঃপর ১৩০০ সালের পৌষ মাসে বলরামবাবুর কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী শোকে জর্জরিত ও রোগে বিশীর্ণ হইয়া পড়িলে যখন স্থির হইল যে, তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য বিহারের অন্তর্গত আরার আট মাইল পূর্ববর্তী কৈলোয়ারে যাইতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন যে, শ্রীমা সঙ্গে থাকিলে তবেই তাঁহার যাওয়া চলিবে। অতএব ভক্তের অনুরোধে শ্রীমা ঐ বৎসর মাঘ মাসে কলিকাতায় আসিলেন এবং অচিরেই কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁহার জননী, গোলাপ-মা, স্বামী সারদানন্দ, যোগানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কৈলোয়ার গমন করিলেন। এখানে তাঁহারা দুই মাস ছিলেন। কৈলোয়ারে শ্রীমা দেখিয়াছিলেন—বন্য হরিণকুল দলবদ্ধ হইয়া ত্রিভুজাকারে চলিয়াছে, আবার বিপদের আভাস পাইবামাত্র যেন পাখা মেলিয়া নিমিষে অন্তর্হিত হইতেছে : আর দেখিয়াছিলেন —ছোট ছোট খেজুর গাছ হইতে পাছে শিয়ালে রস খাইয়া ফেলে, এই ভয়ে লোকেরা মাটিতে গর্ত করিয়া সারারাত্রি তাহাতে বসিয়া পাহারা দেয় : গর্তের মুখে তাহাদের মাথার উপর মাটির খোলা চাপা থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহারা মাথা তুলিয়া দেখে ও 'দূর দূর' করিয়া শিয়াল তাড়ায়।

কৈলোয়ার হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মা দেশে চলিয়া যান[১] এবং পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৩০১ সালের (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের) 'দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত বেলুড়ে অবস্থানান্তর পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের জননী শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী ঘোষের সাদর আমন্ত্রণে আঁটপুরে তাঁহাদের বাড়িতে দেবীর পূজা-

১ শ্রীমা দেশ হইতে ১৩০১ সালের ৬ই ভাদ্র এক পত্রে মাস্টার মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ও দিদিমা অসুস্থ হইয়াছিলেন।—"অক্ষয় মাস্টার ডাক্তার আনিয়া আমায় আরোগ্য করিয়াছেন।" 'বসুমতী'তে (১৩৬০) প্রকাশিত শ্রীমায়ের তিনখানি পত্র হইতে জানা যায়, তিনি আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এবং ভাদ্র মাসের প্রথমভাগে জয়রামবাটীতে ছিলেন।

সন্দর্শনে গমন করেন। কয়েক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর সেবার নূতন করিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তাই শ্রীমাকে গৃহে পাইয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পূজা দেখিবার জন্য শ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত শান্তিরাম ঘোষ, শ্রীযুক্তা যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং স্বামী সদানন্দও আঁটপুরে গিয়াছিলেন। পূজা শেষ হইয়া গেলে মাতাঠাকুরানী জয়রামবাটী চলিয়া যান।

ঐ বৎসরের শেষভাগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তীর্থভ্রমণের অভিলাষ হওয়ায় তিনি স্বীয় জননী ও সহোদরগণকে দেশ হইতে আনাইয়া একসঙ্গে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনে বাহির হন। স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাও তাঁহাদের সঙ্গী হন। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে তাঁহারা সম্ভবতঃ ফাল্গুন ও চৈত্র—এই দুই মাস কাটাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং আত্মীয়বর্গ দেশে চলিয়া গেলেও শ্রীমা শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের কলুটোলাস্থ ৫১ নং ভবানী দত্ত লেনের বাড়িতে এক মাস থাকিয়া কামারপুকুর (১৩ই মে, ১৮৯৫) হইয়া জয়রামবাটী যান।[১]

বৃন্দাবন হইতে তিনি পিত্তলনির্মিত এক ক্ষুদ্র বালগোপাল-মূর্তি আনিয়াছিলেন। উহা জয়রামবাটীতে তাঁহার ঘরে অপূজিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। একদিন শ্রীমা শুইয়া আছেন, এমন সময় দেখেন, ছোট গোপাল হামাগুড়ি দিয়া চৌকির কাছে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি আমায় এনে ফেলে রেখেছ—খেতে দাও না, পুজো কর না ; তুমি আমায় পুজো না করলে কেউ করবে না।" শ্রীমা অমনি গোপালকে বাহিরে আনিয়া শ্রীহস্তদ্বারা তাঁহার চিবুক স্পর্শপূর্বক চুম্বন করিলেন ; পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে নিত্য-পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। গোপাল তদবধি পূজা পাইতে থাকিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশে অবস্থানকালে শ্রীমা কামারপুকুরও যাইতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার সহিত সেখানে ছিলেন এবং ঐ সময় গোলাপ-মা জ্বরে ভুগিয়াছিলেন।[২]

ইহার পর ১৩০৩ সালের গোড়াতে মা কলিকাতায় আসেন[৩] এবং শ্রীযুক্ত বলরামবাবু মহাশয়ের পুত্র রামকৃষ্ণবাবুর বিবাহোপলক্ষে বসুগৃহ লোকপূর্ণ থাকায় ঐ বাটীর পশ্চিমস্থ সরু গলির উপর শ্রীযুক্ত শরৎ সরকারের বাটীতে

১ শ্রীমা "সেখান (বৃন্দাবন) হইতে ফিরিয়া মাস্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাড়িতে প্রায় একমাস ছিলেন। তারপর দেশে যান।" ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ)। মাস্টার মহাশয়ের দিনলিপিও দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়কে লিখিত ২৬।১১।৯৫-এর পোস্ট-মার্ক যুক্ত পত্র।

৩ মাস্টার মহাশয়ের দ্বারা ৫।৪।৯৭ এবং ২১।৪।৯৭ তারিখে প্রাপ্ত পত্রদ্বয় অনুসারে শ্রীমা তখনও জয়রামবাটীতে ছিলেন।

(৫৯/২ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট) এক মাস অবস্থান করেন। সেখানে একদিন মঠের সকলের উদ্দেশ্যে লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্র শ্রীমাকে শোনান হয়। পত্রে নরনারায়ণের সেবার্থে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হইয়াছে। পত্র শুনিয়া মা বলিলেন, "নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে, নরেনকে দিয়ে এসব লিখাচ্ছেন।" এক মাস পরে মা বাগবাজারে গঙ্গার ধারে সরকারবাড়ি লেনের ভাড়াবাড়িতে চলিয়া যান। উহার একতলায় হলুদের গুদাম ছিল বলিয়া লোকে উহাকে 'গুদাম বাড়ি' বলিত। উহার "দ্বিতল ও ত্রিতল বাসোপযোগী ছিল। গোপালের মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তদের লইয়া মা ত্রিতলে বাস করিতেন, সেখান হইতে বেশ গঙ্গাদর্শন করা যাইত। শ্রীমায়ের সেবা ও যত্নের কোন ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য স্বামী যোগানন্দ ও অপর দুই একজন সাধু-ব্রহ্মচারী সহ মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) স্বয়ং দ্বিতলে বাস করিতে লাগিলেন" ('স্বামী ব্রহ্মানন্দ,' ১৭০ পৃঃ)। এই বাড়িতে পাঁচ ছয় মাস অবস্থান করিয়া শ্রীমা কালীপূজার পরে দেশে যান। আবার ১৩০৪ সালের শেষে কলিকাতায় আসিয়া তিনি বোসপাড়া লেনের ১০/২ নং বাড়িতে বাস করিতে থাকেন। বেলুড় মঠের দিনলিপি হইতে জানা যায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে ঐ বৎসর ১৪ই মার্চ শ্রীশ্রীমাতৃসন্দর্শনে বাগবাজারে আসিয়াছিলেন। ঐ বৎসর মে মাসে মায়ের কেদারবদরী দর্শনের প্রস্তাব উঠিয়াছিল ; কিন্তু নানাকারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইহার পর ২১শে জুন তিনি জয়রামবাটী ফিরিয়া যান এবং দুর্গাপূজার পূর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

মায়ের ভারী

১৩০৫ বঙ্গাব্দ শ্রীমায়ের জীবনেরও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচার ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩০৪-এর শেষ হইতেই মা ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার সেবার জন্য স্বামী যোগানন্দ থাকিতেন। 'উদ্বোধনে'র কার্যে নিরত স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকেও কর্মের অবসরে প্রায়ই তথায় দেখা যাইত। অপর কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন।

ইতোমধ্যে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন (২০শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৭) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থায়ী গৃহাদি নির্মাণের জন্য তিনি যে অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুআরি বেলুড় গ্রামে গঙ্গার ধারে এক খণ্ড জমি কেনার বায়না হইবার পর ঐ জমির অনতিদক্ষিণে নীলাম্বরবাবুর বাড়ি ভাড়া লইয়া আলমবাজার হইতে মঠ সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এপ্রিল মাস হইতে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে মঠের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলে ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীমাকে একদিন নৌকা করিয়া মঠে লইয়া আসা হইল। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (স্বামী ধীরানন্দ) এবং গোলাপ-মা। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র মঠে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল এবং শ্রীমা অবতরণ করিলে সন্ন্যাসীরা তাঁহার শ্রীচরণ ধুইয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে ঠাকুরঘরের দালানে বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন—তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। ক্রমে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া গেলে তিনি পূজার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন ; পূজাশেষে তিনি ভোগ নিবেদন করিলেন ও পরে ঠাকুরকে শয়ন দিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া বিকালে চারিটার সময় ফিরিবার জন্য সঙ্গীদের সহিত নৌকায় উঠিতে যাইবেন, এমন সময় ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন, "মা যাবার আগে যেন মঠের নূতন জমিতে একবার পদধূলি দিয়ে যান।" অতএব শ্রীমা নৌকা করিয়াই ঐ জমিতে চলিলেন, যোগানন্দ পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তখন সেখানে থাকিতেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সাগ্রহে শ্রীমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া সমস্ত জমি দেখাইলেন। শ্রীমায়ের ইহাতে কত আনন্দ! সব দেখিয়া তিনি সাহ্লাদে বলিলেন, "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার

জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।” অনন্তর নৌকায় উঠিয়া তিনি পুনর্বার কলিকাতাভিমুখে চলিলেন।

কাশ্মীরে অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনানন্তর স্বামীজী ১৮৯৮-এর অক্টোবর মাসে মঠে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। মহাষ্টমী-পূজার দিনে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, প্রকাশানন্দজী ও বিমলানন্দজীর সহিত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শ্রীমা তাঁহার স্বভাবানুযায়ী সমস্ত দেহ একখানি চাদরে আবৃত করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল স্পষ্টস্বরে ব্যক্ত করিতেছিলেন। স্বামীজী প্রণাম করিলে শ্রীমা দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর মায়ের আদরের কৃতী সন্তান ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, “মা, এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত যেত ব’লে সে শাপ দিলে, ‘তিন দিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।’ আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।” শ্রীমা উত্তর দেওয়াইলেন, “বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বইকি বাবা! তাঁরা তো আর ভাঙতে আসেন না! আমাদের ঠাকুর হাঁচি, টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জান, খুড়তুত দাদার (হলধারীর) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।” স্বামীজী তখনও অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীমা যতই বলুন না কেন, তিনি মানিতে রাজী নহেন; বস্তুতঃ ঠাকুর কিছুই নহেন। তখন শ্রীমায়ের সকৌতুক উত্তর আসিল, “না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।” সে কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া পুনঃ চরণবন্দনান্তে স্বামীজী সজলনয়নে বিদায় লইলেন।

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া ভগিনী নিবেদিতা কোন হিন্দুগৃহে থাকিয়া হিন্দু রীতিনীতি শিখিতে চাহিলে শ্রীমা তাঁহাকে সানন্দে স্বগৃহে রাখিলেন। কিন্তু নিবেদিতা যাই বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশিনীর পক্ষে ব্রাহ্মণপরিবারে এইরূপ অবাধ মিশ্রণের ফলে তাহাদিগকে সমাজে বিব্রত হইতে হয়, অমনি মা কিছু না বলিলেও তিনি বোসপাড়ার অপর এক বাড়িতে (১৬নং) উঠিয়া গেলেন।

ঐ বৎসর শ্যামাপূজার পূর্বদিন (১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮) বলিয়া নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ যথোচিত আয়োজন করিয়াছেন। প্রভাতে শ্রীমা তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের ছবিসহ নৌকাযোগে আসিয়া মঠের ঘাটে নামিলে সাধুবৃন্দ তাঁহাকে সাদরে মঠগৃহে লইয়া গেলেন। পরে তিনি

নূতন মঠভূমিতে চলিলেন। এখন তিনি নিজহস্তে পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিলেন। পরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঐ দিনই অপরাহ্ণে ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমৎ স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী সারদানন্দজীর সহিত শ্রীমা কলিকাতায় আসিলেন এবং পরদিন সকালে সকলে ১৬নং বোসপাড়া লেনে উপস্থিত হইলেন। এখানে শ্রীমা স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিলেন। পূজা সমাপনান্তে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লইয়া বিদ্যালয়ের আরম্ভ বিঘোষিত হইল।

এইবারেই হউক বা অন্যবারে, শ্রীমায়ের মঠের জমি দর্শনকালে স্বামীজীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি মাকে মঠের চতুঃসীমা ঘুরাইয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।" পরে শ্রীমা এই ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপরে ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন (বেলুড়) মঠ, কলা-বাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।" মায়ের উক্ত অলৌকিক দর্শনকালে মঠের জমি কেনা হয় নাই।

নূতন মঠের কার্য সমাপ্ত হইলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর (১৩০৫ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ) পূজ্যপাদ স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত দেহাবশেষপূর্ণ 'আত্মারামের কৌটা' বহন করিয়া আনিয়া নূতন জমিতে এক বৃহৎ বেদীর উপর স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধানে পূজাহোমাদি সম্পন্ন করিলেন। গৃহপ্রবেশকার্য সমাপ্ত হইলে অনেকেই নীলাম্বরবাবুর বাগানে ফিরিয়া গেলেন, কয়েক জন নূতন মঠে রহিলেন; পর বৎসরের ২রা জানুআরি ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া সকলেই নূতন মঠে চলিয়া আসিল। শ্রীমায়ের মনে সঙ্কল্প উঠিয়াছিল—তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের একটা স্থায়ী বাসস্থান হউক। আজ সে সঙ্কল্প রূপ ধারণ করিল। ইতোমধ্যে ২০শে ডিসেম্বর তিনি আর একবার মঠভূমিতে পদধূলি দিতে আসিয়াছিলেন।

এদিকে হরিষে বিষাদ ঘটিল—অগ্রহায়ণ মাসেই শ্রীমায়ের ভাড়াবাড়িতে পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত ও প্রথিতযশা দুইজন ডাক্তার—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন যে, রোগ গ্রহণী। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলিল; কিন্তু ফল না হওয়ায় কবিরাজীর ব্যবস্থা হইল। মঠের গুরুভ্রাতারা ও অপর সাধু-ব্রহ্মচারীরা সেবায় নিরত রহিলেন, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। এদিকে সন্তানবৎসলা শ্রীমা ভাবিয়াই আকুল। ঐ চিন্তায় তাঁহারও শরীর কৃশ হইতে লাগিল। রোগীর অবস্থার উন্নতি হইলে তিনি সুস্থ বোধ করেন, আর অবনতি হইলে বসিয়া কাঁদেন।

এই সময় শ্রীমা যোগেন মহারাজের সহধর্মিণীকে সেবার জন্য আনিতে চাহিলে যোগানন্দজী আপত্তি করিলেন। শ্রীমা তবুও তাঁহাকে যোগানন্দজীর নিকট উপস্থিত করাইয়া বলিলেন, "একে উপদেশ দাও।" কিন্তু জাগতিক সম্বন্ধমুক্ত ও অনন্তের প্রতি প্রসারিতদৃষ্টি সন্ন্যাসী যোগানন্দজী বলিলেন, "সেসব তুমি বুঝবে।" শেষের দিন যখন আসন্ন, সেই সময় শ্রীমায়ের জনৈক সেবক একদিন উপরে পূজার ফুল দিতে গিয়া দেখেন শ্রীমা নিজ কক্ষে পশ্চিমাস্য হইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার কপোলদ্বয়ে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সেবক নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শ্রীমা অধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আমার ছেলে যোগেনের কি হবে বাবা?" সেবক বুঝাইতে চাহিলেন যে, উদ্বেগের কোন কারণ নাই, যোগেন মহারাজ নিরাময় হইবেন। কিন্তু মা বলিলেন, "বাবা, আমি যে দেখছি।...ভোর বেলায় দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন।" বলিয়াই মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে একটু ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, "কাউকে বলো না—বলতে নেই।"

১৫ই চৈত্র দ্বিপ্রহর (২৮শে মার্চ, ১৮৯৯) হইতে রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল। অপরাহ্ণ তিনটা দশ মিনিটে তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। অমনি শিয়রে উপস্থিত কৃষ্ণলাল মহারাজ কাঁদিয়া উঠিলেন; দ্বিতলে উপবিষ্টা শ্রীমাও তৎশ্রবণে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লজ্জারূপিণী তাঁহাকে এইরূপ বিচলিত দেখিয়া সেবক দ্রুত উপরে গিয়া তাঁহার চরণ দুইখানি ধারণপূর্বক সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি বিরক্তি-সহকারে বলিলেন, "তুমি যাও, যাও! আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল—কে আমায় দেখবে?" সব শেষ হইয়া গেল। পরদিন শ্রীমাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে বলিতে শোনা গেল, "বাড়ির একখানি ইট খসল; এবার সব যাবে।"

মা তাঁহার এই সন্তানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার উপর কতখানি ভরসা রাখিতেন, তাহা তাঁহার উত্তরকালীন বহু কথা ও কার্যে প্রকাশ পাইত। তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন, "যোগেনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগেনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত; বলত, 'মা তীর্থে-টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন।' সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকত। মেয়েদের কাছে থাকত বলে ওরা (ছেলেরা) সকলে তাকে ঠাট্টা করত। যোগেন আমাকে বলত, 'মা, তুমি আমাকে যোগা যোগা বলে ডাকবে।' যোগেন যখন দেহ রাখলে, সে বললে 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর।'...যোগেনকে (ঠাকুর) অর্জুন বলতেন।...শরৎ আর যোগেন—"এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।"

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বামী সারদানন্দজী (শরৎ মহারাজ) ও

স্বামী যোগানন্দজীকে শ্রীমা তাঁহার ভারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। যোগেন ছিল। কৃষ্ণলালও আছে—ধীর স্থির—যোগেনের চেলা।" আর একসময়ে বলিয়াছিলেন, "ছেলে-যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ। ছেলে-যোগেনের পর থেকেই শরৎ করছে। আমার ঝক্কি পোয়ানো বড় শক্ত, মা! শরৎ ছাড়া আমার ভার আর কেউ নিতে পারবে না।" স্বামী সারদানন্দজীর অনুপম সেবার পরিচয় পরে আমরা বহুবার পাইব। আপাততঃ আমরা যোগানন্দ-প্রসঙ্গের অনুসরণ করি।

মাতাঠাকুরানীর পিত্রালয়ে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আমরা জানি। দরিদ্রের সংসার, আবার লোকজনও অল্প, তাই পূজার সময় বাসন মাজিতে শ্রীমা দেশে যাইতেন। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য স্বামী যোগানন্দ অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাঠের বাসন কিনিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।"

স্বামী যোগানন্দের প্রত্যেক স্মৃতিটি মায়ের নিকট অতি প্রিয় ছিল। যোগানন্দ মহারাজ তাঁহাকে একখানি লেপ করাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে উহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীমা একদিন শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ ঘোষকে বলিয়াছিলেন, তুলাটা পিঁজাইয়া এবং খোল বদলাইয়া যেন লেপখানিকে নূতন করিয়া আনা হয়। কিন্তু একটু পরেই মায়ের মনে হইল, এরূপ করিলে প্রিয় সন্তানের প্রদত্ত জিনিসটির রূপ বদলাইয়া যাইবে; সে স্মৃতিরও বিকৃতি ঘটিবে। কথাটা ভাবিতেও যেন তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল; তাই সংশোধন করিয়া বলিলেন, "না, বিভূতি, লেপটা নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এ লেপ যোগেন দিয়েছিল—দেখলেই তাকে মনে পড়ে।"

দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীমা একবার বেলুড় মঠে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর-ঘরের বাহিরের দেওয়ালে স্বামী যোগানন্দের একখানি তৈল-চিত্র টাঙ্গানো রহিয়াছে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি ছবিখানি দেখিলেন; তারপর ভিতরে গেলেন। কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন—মন যেন তখন কোন্ লোকাতীত রাজ্যে স্নেহপাত্রের সন্ধানে ফিরিতেছে, ইহজগতে উহা নিবদ্ধ থাকিতে চাহে না! স্বামী যোগানন্দজীকে শ্রীমা ঈশ্বরকোটি এবং কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জুন বলিয়াই জানিতেন। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গরূপে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল (১৮৮৬-এর শরৎকাল হইতে ১৮৯৯-এর বসন্তকাল পর্যন্ত) একান্ত মনে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

যোগানন্দের দেহত্যাগের পূর্বেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইয়া-ছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী একবার যোগানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "যোগীন,

নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কত রকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে, তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, যেন অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।” যোগানন্দ বলিলেন, “শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর; তিনি যা বলবেন, তাই ঠিক।” এইখানেই ক্ষান্ত না হইয়া তিনি সারদানন্দজীকে মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। এইরূপে সারদানন্দজী ক্রমে মায়ের সেবাধিকার পাইয়া ও সেই সুযোগে মাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পরেই তিনি ঐ কার্যে ব্রতী হন নাই। তাঁহার দেহত্যাগকালে তিনি স্বামীজীর আদেশে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইহার পরে মঠে ফিরিয়া তাঁহাকে নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। অতএব শ্রীমায়ের সেবকরূপে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালই তখন তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন এবং সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী) দিনে ‘উদ্বোধন’ পাক্ষিক পত্রের কার্যসমাপনান্তে রাত্রে মায়ের বাটীতে আসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ এই সময়ে ত্রিগুণাতীতানন্দজীর উপরেই মায়ের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল; ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে আমেরিকা গমন[১] পর্যন্ত তিনি ইহা দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

স্বামী যোগানন্দের দেহরক্ষার কিঞ্চিদধিক চারি মাস পরে শ্রীমায়ের অতি স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন (২রা অগস্ট, ১৮৯৯; ১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৬)। মাতাঠাকুরানীর অপর দুই ভ্রাতা—প্রসন্ন ও বরদা—তখন চোরবাগানের এক ভাড়া বাড়িতে পালাক্রমে থাকিয়া যাজনক্রিয়া চালাইতেন। অভয়ও তখন ঐ বাটীতে ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করেন। মাত্র অল্প দিন পূর্বে তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শেষ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় এই কালব্যাধি উপস্থিত হইল। শ্রীমা তাঁহাকে পালকি করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন এবং স্বামী সারদানন্দজী ও সুশীল মহারাজ (স্বামী প্রকাশানন্দ) তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধিলিপি অলঙ্ঘনীয়। তাই শ্রীমা ও অপর সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মায়ের এই উপযুক্ত ভ্রাতা চির-বিদায় লইলেন।[২] এই বেদনা শ্রীমায়ের মনে এমনি গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে তিনি পরবর্তী কালে আপনার ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রগুলির সম্বন্ধে বলিতেন,

১ তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুআরি সান্‌ফ্রান্সিস্কো পৌঁছেন।

২ ভ্রাতৃগৃহে অভয়-মামার দেহত্যাগ হইলেও পুরাতন পত্র হইতে মনে হয় যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ হইতে তিনি অধিকাংশ সময় মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন।

"এরা সব মুখ্খু হয়ে বেঁচে থাক।" ইহাতে যদি ভ্রাতৃজায়ারা আপত্তি করিতেন, "ঐ রকম আশীর্বাদ করে নাকি?" তবে শ্রীমা ম্লানমুখে বলিতেন, "হ্যাঁরে, হ্যাঁ! তোরা কি জানিস? অভয়কে মানুষ করলুম, অভয় চলে গেল।"

অভয়ের মৃত্যুর পর প্রায় তিন মাস কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীমা ৩০শে অক্টোবর বর্ধমানের পথে দেশে ফিরিয়া চলিলেন। দামোদর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গোযানে চলিয়াছেন; আর সম্মুখে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ যষ্টিস্কন্ধে প্রহরীর ন্যায় পদব্রজে যাইতেছেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। অকস্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দ দেখিলেন, বানের জলে পথের এক জায়গা এমনভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, উহা অতিক্রম করিতে গেলে গাড়িখানি উলটাইয়া যাইবে, অথবা বিষম ঝাঁকুনি লাগিয়া মাতাঠাকুরানীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে, এমন কি, আঘাত-প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ঐ গর্তের মধ্যে উপুড় হইয়া শুইয়া গাড়োয়ানকে তাঁহার স্থূল, সবল দেহের উপর দিয়া গাড়ি চালাইতে বলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শ্রীমা চন্দ্রালোকে নিমেষমধ্যে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন এবং গাড়ি হইতে নামিয়া ত্রিগুণাতীতানন্দকে এইরূপ হঠকারিতার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি হাঁটিয়াই সেই খানা পার হইলেন।

এখানে সারদা মহারাজের অপূর্ব মাতৃভক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শ্রীযুক্তা যোগীন-মা একবার তাঁহাকে মায়ের জন্য বাজার হইতে ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক ঝাল লঙ্কা কিনিবার আগ্রহে সারদা মহারাজ বিভিন্ন বাজারে লঙ্কা চাখিতে চাখিতে পদব্রজে বাগবাজার হইতে বড়বাজার উপস্থিত হইয়া মনোমত লঙ্কা পাইলেন। ততক্ষণে জিহ্বা ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় অবস্থানকালেও তিনি শ্রীমাকে ভুলেন নাই—প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে তাঁহাকে কিছু প্রণামী পাঠাইতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অন্তরঙ্গ বা সেবকদের প্রসঙ্গে এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর প্রথম কয়েক বৎসর শ্রীমায়ের কলিকাতা বা পার্শ্ববর্তী স্থানসকলে অবস্থানকালে ত্যাগী ভক্তেরা সেবাভার লইলেও শ্রীযুক্তা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন; অনেক সময় সঙ্গেও থাকিতেন। তাঁহারা জয়রামবাটীতেও মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত বাস করিতেন। ইহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া মাতাঠাকুরানী পরে বলিয়াছিলেন, "গোলাপ যোগীন না থাকলে কলকাতা থাকা হবে না।"

মায়াস্বীকার

অভয়চরণের দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীমা যখন ভ্রাতার মস্তকটি কোলে লইয়া উহাতে সাদরে হাত বুলাইতেছিলেন, তখন দিদির চক্ষে চক্ষু রাখিয়া অভয় বলিয়াছিলেন, "দিদি, সব রইল—দেখো।" শ্রীমা মনে মনে সে কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অভয়চরণের স্ত্রী সুরবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা এবং পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি জন্মদুঃখিনী; শৈশবে মাতৃহারা হইয়া তিনি দিদিমা ও মাসীমার ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন। অধুনা স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই দিদিমাও লোকান্তর গমন করিলেন। শ্রীমা তখন ভ্রাতার অন্তিম অনুরোধ স্মরণপূর্বক সুরবালাকে জয়রামবাটীতে আপনার নিকট লইয়া আসিলেন। ইহারই কিছুদিন পবে সুরবালার শেষ অবলম্বন মাসীমাও ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। পর পর এতগুলি আঘাত সহ্য কবিতে না পারিয়া সুরবালার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল। এই অবস্থায়ই তিনি ১৩০৬ সালের ১৩ই মাঘ (২৬শে জানুআরি, ১৯০০) এক কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার নাম রাখা হইল রাধারানী—ডাক নাম রাধু বা রাধী। পাগলীর পক্ষে শিশুর লালন পালন অসম্ভব জানিয়া শ্রীমায়ের তখন চিন্তার অবধি নাই। দৈবক্রমে পরের মাসে স্বামী অচলানন্দের সহিত কুসুমকুমারী দেবী নামে জনৈক স্ত্রীভক্ত আসিলেন। শ্রীমা এই মহিলার হস্তে রাধুর প্রতিপালনভার অর্পণ করিলেন। কুসুমকুমারী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত জয়রামবাটীতে থাকিয়া এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

শ্রীমাকে বিভিন্ন কারণে প্রধানতঃ জয়রামবাটীতেই বাস করিতে হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে বাসভূমি বড় সুখকর ছিল না; আর বিধির বিধানে তাঁহার পারিবারিক দায়িত্ব যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। 'বিধির বিধান' কথাটি আমরা একটু ভাবিয়া চিন্তিয়াই প্রয়োগ করিয়াছি—উহা আমাদের কল্পনা-প্রসূত নহে। শ্রীভগবান শ্রীশ্রীমায়ের সদা ঊর্ধ্বগামী মনকে ব্যবহারিক জগতে বাঁধিয়া রাখিয়া স্বীয় যুগধর্মপ্রবর্তনকার্য সুসম্পাদিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র স্নেহনিগড় রচনা করিতেছিলেন। তাহার মধ্যে দৃঢ়তম ছিল রাধু।

ঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমায়ের সংসারে আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না, মন হু হু করিতেছে এবং তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, "আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে?" সেই সময় হঠাৎ দেখিলেন, লাল কাপড়-পরা দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর তাহাকে দেখাইয়া

বলিলেন, "একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।" পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন, মেয়েটিকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না। অনেক পরে শ্রীমা একদিন জয়রামবাটীতে মামাদের বাড়িতে বসিয়া আছেন। রাধুর মা সুরবালা দেবী তখন বদ্ধ পাগল। তিনি কতকগুলি কাঁথা বগলে করিয়া টানিতে টানিতে চলিয়াছেন, আর রাধু হামা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পিছনে যাইতেছে। ইহা দেখিয়া মায়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল—তিনি ভাবিলেন, "তাইতো, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে? বাবা নেই, মা ঐ পাগল।" তিনি ছুটিয়া গিয়া রাধুকে তুলিয়া লইলেন; আর অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর সামনে দর্শন দিয়া বলিলেন, "এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।"

শ্রীমায়ের বিবিধ সময়ের অন্যান্য উক্তি হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। রাধুর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ দেখিয়া সমালোচনাপ্রবণ মনে বহু সন্দেহ উঠিত ও সময় সময় উহা প্রশ্নাকারে বাহির হইয়া পড়িত। একদিন জনৈক ভক্ত বলিয়া বসিলেন, "মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধা, রাধী' করছেন, ঘোর সংসারীর মতো। অথচ, এত ভক্ত আসছে, তাদের দিকে একটুও মন নই। এত আসক্তি? এগুলো কি ভাল?" পূর্বেও এইরূপ প্রশ্ন মা বহুবার শুনিয়াছিলেন এবং নম্রভাবে বলিয়াছিলেন, "আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এই রকমই।" আজ কিন্তু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের কর দেখি! কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।" অন্য সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, সব বলে কিনা আমি 'রাধু, রাধু' করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধী, রাধী' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ দেহ থাকবে না।" আর বলিয়াছিলেন, "এই যে 'রাধী, রাধী' করি, এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি।" বুদ্ধিমান পাঠক এইসকল কথার তাৎপর্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সুতরাং আমাদের মন্তব্যদ্বারা ইহার সৌন্দর্য নষ্ট করিতে চাহি না।

শ্রীমায়ের আশ্চর্য জীবনলীলার এইরূপ পটভূমিকা-রচনার হয়তো এতদতিরিক্ত অপর উদ্দেশ্যও ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলরোগদর্শনে ইহলোকে অভ্যুদয়কামী কোন কোন সকাম ভক্ত যেমন তাঁহার নিকট আসা নিরর্থক মনে করিয়াছিলেন, তেমনই আপাতপ্রতীয়মান এই সাংসারিক বহিরাবরণ দ্বারা

শ্রীভগবান হয়তো শ্রীমাকে অনুরূপ ভক্তের অবাঞ্ছিত দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর যদিও গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয় শ্রেণীর ভক্তের জন্যই অনুপম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবন প্রধানতঃ পারিবারিক গণ্ডির বাহিরে ব্যয়িত হইয়াছিল। সুতরাং শত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রতিকূল সাংসারিক ক্ষেত্রে মানুষ কিরূপে আত্মস্থ থাকিয়া দিব্য জীবনের আস্বাদ পাইতে পারে তাহার চাক্ষুষ পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা অধিক পাই না। শ্রীমায়ের দিনগুলি কিন্তু পারিবারিক ঘটনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; আর সে ঘটনাসমূহের অধিকাংশ সাংসারিক দৃষ্টিতে উদ্বেগজনক, বিরক্তিকর অথবা ক্লেশদায়ক। অথচ তাঁহার আচার-ব্যবহার সর্বদা সর্বক্ষেত্রে দৈব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই দেবমানবতার অপূর্ব সংমিশ্রণে শ্রীমায়ের লীলাবলী বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই মধুর। বস্তুতঃ তাঁহার পারিবারিক জীবনের অনুধ্যান সংসারী জীবের পক্ষে অতীব শিক্ষাপ্রদ ও কল্যাণকর। এই বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার সহিত আমরা ক্রমে পরিচিত হইব। বর্তমানে আমরা মাত্র দিগ্‌দর্শনে অগ্রসর হইয়াছি।

শ্রীমায়ের জয়রামবাটী-জীবনের প্রতিকূল অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের জন্য এখানে মামাদের (শ্রীমায়ের ভ্রাতাদের) কথাই ধরা যাউক। শ্রীমায়ের অন্যত্র অবস্থানকালে মামারা পত্রে অর্থের আকাঙ্ক্ষা বা পারিবারিক বিবাদের কথা তাঁহাকে প্রায়ই জানাইতেন। পত্র পড়িয়া শ্রীমাকে শুনাইতে গিয়া কেহ হয়তো মন্তব্য করিতেন, "মা, তাঁদের খুব করে টাকা দাও। ঠাকুরকে বল। বেশ ভোগ করুক, যাতে নিবৃত্তি হয়।" শ্রীমা তাহাতে উত্তর দিতেন, "ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না—শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়? ওদের ওখানে কেবল দুঃখের কাহিনী। কেলেটাই (কালীমামা) কেবল টাকা টাকা করে। আবার ওর দেখাদেখি প্রসন্নও এখন করছে। বরদা কখনও চায় না—বলে, দিদি কোথায় টাকা পাবে?" আর একদিন তিনি ভ্রাতাদের সম্বন্ধে বিরক্তিসহকারে বলিয়াছিলেন, "বাবা, ওরা কেবল টাকা টাকা করেই গেল। কেবল 'ধন দাও, ধন দাও'—ভুলেও কখনও জ্ঞানভক্তি চাইলে না। যা চাচ্ছিস তাই নে!" বলা বাহুল্য, মাতাঠাকুরানীর কৃপায় ইহাদের সংসারে সচ্ছলতা আসিয়াছিল।

ইহা হইতে পাঠক যেন বুঝিয়া লইবেন না যে, মামাদের কোন সুকৃতি অথবা উচ্চভাব ছিল না। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদা বলিয়াছিলেন যে, মামারা পূর্ব পূর্ব জন্মে মাথাকাটা তপস্যা করিয়াছিলেন; তাই বর্তমান জন্মে স্বয়ং জগদম্বাকে ভগিনীরূপে পাইয়াছেন। অধিকন্তু ঘটনাপরম্পরা হইতে জানা যায় যে, শ্রীমায়ের ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না; তবে সে জ্ঞান সাংসারিক অভাব মিটাইবার বাসনায় আবৃত থাকায় তেমন কার্যকর ছিল

না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার অনেক পরের ঘটনা হইলেও বিষয়টি বুঝাইবার জন্য আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৩১৪ সালে গিরিশবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজা-সমাপনান্তে দেশে ফিরিবার সময় শ্রীমা মামাদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন, যাহাতে তাঁহারা আমোদরের ধারে লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। যথাকালে কোয়ালপাড়া হইতে সন্ধ্যায় আমোদরের তীরে পেঁৗছিয়া দেখা গেল যে, কেহই আসে নাই! অতএব শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বহু অসুবিধার মধ্যে নদী পার হইয়া জয়রামবাটীতে আসিতে হইল। রাত্রে আহারের সময় জনৈক ভক্ত বলিলেন, "মা, দেখলেন এঁদের (মামাদের) কি আক্কেল! আপনি এলেন, তা একটি লোকও নদীর ধারে পাঠালেন না।" শ্রীমা তাই প্রসন্নমামাকে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে আমি এলুম, তুই নদীর ধারে লোক পাঠালি না কেন? আমার এই ছেলেগুলি এল। তুই একটি লোকও পাঠালি নে, নিজেও গেলি নে।" মামা উত্তর দিলেন, "দিদি, আমি কালীর ভয়ে পাঠাইনি—পাছে কালী বলে, 'দিদিকে হাত করে নিতে যাচ্ছে।' আমি কি বুঝি না, তুমি কি বস্তু, আর এঁরা (ভক্তেরা) কি বস্তু? সব জানি, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই। ভগবান এবার আমাকে সে ক্ষমতা দেননি। এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমাকে এবারে যেভাবে পেয়েছি, এই ভাবেই জন্মে জন্মে পাই; অন্য আর কিছু চাই নে।" শ্রীমা বলিলেন, "তোদের ঘরে আর? এই যা হয়ে গেল। রাম বলেছিল, 'মরে যেন আর না জন্মাই কৌশল্যার উদরে।' আরও তোদের মধ্যে?"

আর একদিন প্রসন্নমামা শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "দিদি, শুনলুম তুমি নাকি কাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছ, তাকে মন্ত্র দিয়েছ, আবার এও বলে দিয়েছ যে, তার মুক্তি হবে। আর আমাদের তুমি কোলে করে মানুষ করেছ—আমরা কি চির-দিনই এমনি থাকব?" মা উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। আর দেখ, শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকদের সঙ্গে কত খেলেছেন, হেসেছেন, বেড়িয়েছেন, তাদের এঁটো খেয়েছেন; কিন্তু তারা কি জানতে পেরেছিল কৃষ্ণ কে?"

শ্রীমা সব সময় যে এইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেন তাহা নহে; স্নেহপালিত ভ্রাতাদের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি ইহকালে ও পরকালে সর্ববিষয়ে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রসন্নমামা একদা প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, এক পেটে জন্মেছি; আমাদের কি হবে?" শ্রীমা অভয় দিয়া বলিলেন, "তা তো বটেই; তোদের ভয় কি?"

এই সমর্থ অথচ বিবেচনাহীন ভ্রাতাদের সঙ্গে ছিলেন আবার অবুঝ, অসমর্থা ভাইঝিরা। পরে আমরা দেখিব যে, ইঁহাদের কাহারও কাহারও ভার শ্রীমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তদুপরি ছিলেন অভয়মামার বিধবা পত্নী

সুরবালা বা ভক্তদের সুপরিচিতা পাগলী মামী। মামীর পাগলামি সময় সময় এতই বাড়িত যে, শ্রীমাকে বলিতে শোনা যাইত, "হয়তো কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা শিবের মাথায় দিয়েছি, তাই আমার এই কণ্টক হয়েছে।"

শ্রীমা যতদিন জয়রামবাটীতে থাকিতেন, তাঁহাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হইত। কোনদিন হয়তো সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করা চলিতেছে, অন্যদিন ঢেঁকিতে ধান ভানা হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা—সবই আছে। তাঁহার জননী যেমন বৃদ্ধ বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন, তিনিও তেমনি সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া প্রতিকার্যে সাহায্য করিতেন। একবার সহোদরের সংসারে কোনও এক ব্যাপারে শ্রীমাকে অসম্ভব পরিশ্রম করিতে হয়। তাঁহার-পা ফুলিয়া যাওয়ায় তিনি উহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবু সত্যই বলেছিলেন, এরা মাথা-কাটা তপস্যা করেছিল।"

যাহা হউক, আমরা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়ের দেশে অবস্থানের ঘটনাবলীতেই ফিরিয়া যাই। এই কালে শ্রীমা সাধারণতঃ জয়রামবাটীতে বাস করিলেও মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাইয়া কিছুদিন কাটাইয়া আসিতেন। এইবারও তিনি সেখানে যান এবং অসুস্থ হইয়া পড়েন।[১] মায়ের বাড়ির ঝি সাগরের মা বলে যে, সে অসুখের সময় তাঁহার সেবা করিয়াছিল। দারুণ উদরাময় ও বমিতে শ্রীমা অবশ হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন, আর ঝি নির্বিকারে পরিষ্কার করিতেছে দেখিয়া ঐ অবস্থায়ও তিনি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোর ঘেন্না হচ্ছে না তো?" ঝি বলিল, "ঘেন্না হলে হাতে করে তুলব কেন?" রোগ আরম্ভ হইতেই বেলুড় মঠে এবং জয়রামবাটীতে সংবাদ পাঠানো হয়। জয়রামবাটী হইতে কালীমামা আসিয়া গরুর গাড়ি করিয়া শ্রীমাকে লইয়া যান—তখন অসুখটা কিছু কমিয়াছে। তিন-চারি দিনের মধ্যে বেলুড় হইতে দুইজন সাধু মাকে লইয়া যাইতে আসেন; কিন্তু মা সেবারে গেলেন না। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমা সাগরের মাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "তোর ভাত-কাপড়ের কষ্ট হবে না।" এই ঘটনা বর্ণনার শেষে বৃদ্ধা বলে, "তা সত্যি, বাবু এখন পর্যন্ত আমার ভাত-কাপড়ের কষ্ট হয়নি—ঠাকুর চালিয়ে নিচ্ছেন।"

১ বেলুড় মঠের দিনলিপি হইতে জানা যায়—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়ের একবার কলেরা হয়; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী সংবাদ পাইয়া জয়রামবাটী যান এবং দিন কয়েক পরে ফিরিয়া আসেন। ঐ বৎসর অক্টোবরে মঠের একজন সাধু জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে শ্রীমা বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য সময়ে শ্রীমা সওয়া বৎসর দেশে কাটাইয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে পাগলী মামী, রাধু, খুল্লতাত নীলমাধব ও পল্লীবাসিনী ভানু-পিসীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং প্রায় এক বৎসরকাল ১৬এ, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে অবস্থান করেন; নিবেদিতা বিদ্যালয় তখন ১৭নং বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে।

পরবৎসর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব করেন। ঐ সময়ে শ্রীমায়ের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় জানিয়া তিনি পূজার কয়দিন নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে স্ত্রীভক্তগণসহ তাঁহাকে আনাইয়া রাখেন (১৮ই-২২শে অক্টোবর, ১৯০১)। সেবার পূজার সঙ্কল্প শ্রীশ্রীমায়ের নামে হইয়াছিল; কারণ স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমরা তো কপনিধারী—আমাদের নামে হবে না।" মায়ের সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ এই পূজায় পূজকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তন্ত্রধারক হইয়াছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী শ্রীমায়ের হাত দিয়া তন্ত্রধারককে পঁচিশ টাকা প্রণামী দেওয়াইয়াছিলেন।

শ্রীমায়ের বাটীর পার্শ্বে যে সঙ্কীর্ণ গলির মতো স্থান ছিল, সেই পথে এক রাত্রে চোর আসিয়া রান্নাঘরের জানালা ভাঙিগয়া ভিতরে প্রবেশ করে। চিরকালের অভ্যাসমত শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া পাগলী মামী প্রদীপহস্তে বাহিরে আসিয়াই রান্নাঘরে চোরকে দেখিতে পান এবং ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। বাড়ির সকলের চেষ্টায় তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কবিকৃতি খুব বাড়িয়া গেল। শ্রীমা অগত্যা স্থির করিলেন, তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিবেন। মায়ের কলিকাতায় আগমনের পর কুসুমকুমারীর হস্তেই রাধুর লালনপালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাই শ্রীযুক্তা যোগীন-মা প্রভৃতি শ্রীমাকে বলিলেন যে, ঐরূপ একটি স্ত্রীলোকের উপর রাধুর প্রতিপালনের ভার দিয়া সপুত্রী সুরবালাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত এবং কলিকাতার ভক্তগণ সে ব্যয় বহন করিবেন; কিন্তু শ্রীমায়ের কোনমতেই দেশে যাওয়া উচিত নহে, তাঁহার কলিকাতায় থাকাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রীমা তখন সব শুনিয়া গেলেন, কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়া তাঁহার মানসচক্ষে অকস্মাৎ যে দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল, তাহাতে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, জয়রামবাটীতে কন্যাটি উন্মাদিনী মাতার যথেচ্ছ ব্যবহারে কষ্ট পাইতেছে; এমন কি যে-কোন সময়ে তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা। দেখিয়াই মা এত বিচলিত হইলেন যে, তখনই আসন-ত্যাগপূর্বক যোগীন-মার নিকট গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, রাধুকে ফেলিয়া তাঁহার কলিকাতায় থাকা চলিবে না; বালিকার কল্যাণার্থে তাঁহাকে জয়রামবাটী যাইতেই হইবে।

শ্রীমা রাধু ও তাহার গর্ভধারিণীকে লইয়া জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন। খুল্লতাত নীলমাধবও সঙ্গে যাইলেন। শুধু ভানু-পিসী আরও কিছুদিন গঙ্গাস্নানের জন্য কলিকাতায় রহিলেন। ইহার পর প্রায় দুই বৎসরের ইতিহাস আমরা অবগত নহি। তবে ইহা জানা আছে যে, শ্রীমা প্রায়ই 'জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বে দেশে যাইতেন এবং শীতের শেষে কলিকাতায় আসিতেন। এই দুই বৎসরও ঐরূপই হইয়া থাকিবে।

১৩১০ সালের পৌষ মাসে স্বামী সারদানন্দজী মাতাঠাকুরানীর অবস্থানের জন্য ২/১নং বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ মাসে (১৯০৭-এর ১৪ই ফেব্রুআরি) কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমা ঐ বাড়িতে উঠেন। এখানে তিনি প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। এবারে শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, শ্রীযুক্তা যোগীন-মা প্রভৃতি কেহ কেহ বর্ধমানের পথে জয়রামবাটী গিয়াছিলেন এবং ভানু-পিসী, নীলমাধব প্রভৃতি অনেকে ঐ পথেই মায়ের সহিত আসিয়াছিলেন। বাগবাজারের বাটীতে সারদানন্দজী নিজে থাকিয়া মায়ের সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময় হইতে শ্রীযুক্তা ওলি বুল মায়ের সেবার জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিতে থাকেন।

ইতোমধ্যে মাতাঠাকুরানীর পোষ্যবর্গের সংখ্যা, তাঁহার 'সংসার' বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার খুল্লতাত নীলমাধব পাইকপাড়ার রাজবাটীতে পাচকের কার্যের দ্বারা উদরপালন করিতেন; শেষ বয়সে ঐ কাজ ছাড়িয়া পেন্সন ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি অবিবাহিত ছিলেন—দেশে শ্রীমা ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার ভার লইবার মতো ছিল না। অতএব শেষ কয় বৎসর তিনি মায়েরই তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁহার এই দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসা। শ্রীমা স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিতেন; নিজের জন্য যে-সকল জিনিস আসিত, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া উত্তম জিনিসগুলি নীলমাধবের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার জন্য ভক্তগণ কলিকাতার বাজার অন্বেষণ করিয়া ম্যাঙ্গোষ্টিন, অসময়ের আম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ফল লইয়া আসিলে নীলমাধবই প্রথমে তাহা ভক্ষণ করিতে পাইতেন। ইহাতে কেহ প্রতিবাদ করিলে শ্রীমা বলিতেন, "বাবা, খুড়োর আর কদিন? এখন সাধ মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমরা তো অনেক দিন বাঁচব, অনেক খেতে পাব।" তাঁহার প্রতি কথায় ও কার্যে এইরূপ আন্তরিকতা শুধু নীলমাধবের বেলায়ই যে ফুটিয়া উঠিত তাহা নহে, অপরের চিত্তও সে অকৃত্রিম স্নেহডোরে সর্বদা এই ভাবেই বদ্ধ থাকিত। ইহার পরিচয় আমরা যথাসময়ে পাইব।

বাগবাজারের ঐ বাটীতে অবস্থানকালে শ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাঁহার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়িতে তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং ছুটির দিনে ঐ গাড়িতে কখনো কখনো গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কোম্পানিবাগান, কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া আসিতেন। ঐ অবকাশে তিনি একটু চলিয়াও বেড়াইতেন—উদ্দেশ্য, উহাতে পায়ের বাতটা যদি একটু কমে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের যে বাত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার চিরসাথী ছিল এবং তাঁহাকে এই সময়েও খোঁড়াইয়া চলিতে হইত।

১৩১১ সালে জন্মাষ্টমীর উৎসব উপলক্ষে শ্রীমা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রাতে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী ও রাধু ছিলেন। উৎসব দেখিয়া শ্রীমা বিশেষ আনন্দিত হন। কিন্তু যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগবিনোদ মহারাজের অনুরোধে তাঁহাকে সেখানে গরমের মধ্যে চাদর-মুড়ি দিয়া নীরবে অপরাহ্ণ ছয়টা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে এবং শত শত লোকের অবিরাম প্রণাম গ্রহণ করিতে হয়—ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয়। তিনি গৃহে ফিরিয়া গোলাপ-মা প্রভৃতিকে জানাইয়াছিলেন, তৎপূর্বে কিছুই বলেন নাই।

বাগবাজারের এই বাড়িতে থাকাকালেই শ্রীমা গিরিশবাবুর অনুরোধে এক রাত্রে 'বিল্বমঙ্গল'-অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেমদর্শনে তিনি 'আহা, আহা' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অতিবৃদ্ধা ও পীড়িতা গোপালের মা ভগিনী নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয়ের বাড়ির একখানি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহাকে শ্রীমা শাশুড়ীর ন্যায় সম্মান করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতেন। গোপালের মার আহার শ্রীমায়ের বাটী হইতেই পাঠানো হইত। শেষাশেষি বৃদ্ধার বাহ্যজ্ঞান বড় একটা থাকিত না। শুধু জপের মালা সম্বন্ধে তিনি বড়ই হুঁশিয়ার ছিলেন; উহা না পাইলে ছটফট করিতেন। কাহাকেও চিনিতে পারিতেন না; কিন্তু শ্রীমা নিকটে গেলে অস্ফুটস্বরে বলিতেন, "কে, বউমা? এস।"

১৩১১ সালের 'জগদ্ধাত্রীপূজায় শ্রীমায়ের দেশে যাওয়া হয় নাই; কারণ তখন তাঁহার 'সংসার' এতই বৃহৎ যে, সকলকে লইয়া গমনাগমন বহু ব্যয়সাধ্য। অধিকন্তু ঐ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হইতেছিল। তখন ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করিলে রোগের পুনরাক্রমণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। কিন্তু 'জগদ্ধাত্রীপূজা তাঁহার অতি প্রাণের জিনিস ছিল। তাই তিনি সহোদর বরদাপ্রসাদ ও জনৈক ভক্তের দ্বারা সমস্ত পূজাসামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন এবং পূজাসমাপনান্তে ইঁহারা ফিরিয়া

আসিলে আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। অতঃপর অগ্রহায়ণের মধ্যভাগে তাঁহার জগন্নাথক্ষেত্রে গমনের আয়োজন চলিতে লাগিল।

তখন পুরী পর্যন্ত বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। শ্রীমায়ের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর এক রিজার্ভ গাড়িতে স্থান পাইলেন নীলমাধব, পাগলী মামী, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি, রাধু, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, চুনীলাল বাবুর স্ত্রী ও কুসুমকুমারী। আর মধ্যম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলেন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি তিন জন পুরুষ। সারা রাত্রি গাড়িতে কাটাইয়া ইঁহারা পরদিবস প্রাতে পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্দিরের রাস্তার উপর বলরামবাবুদের যাত্রিনিবাস 'ক্ষেত্রবাসীর মঠ' শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গীদেব জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রেমানন্দজী বলরামবাবুদের সমুদ্রের নিকটবর্তী অপর বাটী 'শশী নিকেতনে' চলিয়া গেলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া শ্রীমা ধুলা-পায়ে 'জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিলেন। পরে তিনি ভক্তদের সহিত প্রত্যহ প্রাতে দেবদর্শনে যাইতেন এবং প্রতিসন্ধ্যায় আরতির সময় মন্দিরে উপস্থিত থাকিতেন। একদিন ক্ষেত্রবাসীর মঠে 'কথা' দেওয়া হইয়াছিল। পাণ্ডা আসিয়া প্রাচীন পুঁথি-অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য শুনাইলেন। এই উপলক্ষে ঐ দিন প্রায় পঞ্চাশ জন পাণ্ডাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। শ্রীমা প্রভৃতির জন্য তখন প্রত্যহ শ্রীমন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিত; পাণ্ডাদের ভোজনও ঐ ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

পুরীতে শ্রীমায়ের পায়ে একটি ফোঁড়া হয়। সে ফোঁড়া পাকিয়া উঠায় চলিতে কষ্ট হইতেছিল; অথচ তিনি অস্ত্রোপচারে সম্মত হইতেছিলেন না। একদিন ঐ অবস্থায় শ্রীমন্দিরে ভিড়ের মধ্যে একব্যক্তি ঐ স্থানে ব্যথা দেওয়ায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন। এই সংবাদ পাইয়া প্রেমানন্দজী পরদিন এক যুবক ডাক্তারকে লইয়া আসিলেন। তিনি অস্ত্র লইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলে শ্রীমা অভ্যাসবশতঃ চাদর মুড়ি দিয়া বসিলেন। এই অবকাশে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিবার ছলে ডাক্তার ফোঁড়ার মুখ চিরিয়া দিলেন এবং "মা, অপরাধ নেবেন না" বলিয়া বিদায় লইলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে শ্রীমা প্রথমে একটু বিরক্ত হইলেও ভালভাবে বাঁধিয়া দিবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ, আরাম হল!" এবং যেসব সন্তানের দ্বারা এই অতিসাহসিক কার্য সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। দুই-চারিদিনের মধ্যে ক্ষতস্থান আরাম হইয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে শ্রীমায়ের ইচ্ছা হইল যে, দেশ হইতে তাঁহার মাতা প্রভৃতিকে 'জগন্নাথ-দর্শনার্থে' আনাইবেন। তদনুযায়ী জনৈক ভক্ত জয়রামবাটীতে প্রেরিত হইলেন। ইহা অবশ্য পাগলী মামীকে না জানাইয়াই করিতে হইল।

কারণ তিনি চাহিতেন না যে, তিনি এবং রাধু ব্যতীত পরিবারের আর কেহ শ্রীমায়ের স্নেহযত্নের অংশী হয়। তখন বিষ্ণুপুরের রেল লাইন খুলিয়া গিয়াছে। ভক্ত বিষ্ণুপুরে নামিয়া উটের গাড়িতে কোতুলপুরে উপস্থিত হইলেন এবং বাকি পথ পদব্রজে যাইয়া শ্রীমায়ের জননী ও কালীমামাকে তাঁহার সাদর আহ্বান জানাইলেন। পূর্বে কেবল এই দুই জনকেই লইয়া যাইবার কথা ছিল ; কিন্তু তীর্থ-যাত্রার নামে দল বাড়িয়া চলিল। শেষ পর্যন্ত দিদিমা, কালীমামা, কালীমামার শ্বশুর, স্ত্রী ও দুইটি পুত্র এবং সীতারাম নামক জয়রামবাটীর এক বৃদ্ধ সদ্গোপ গড়বেতার পথে পুরী যাত্রা করিলেন।[১] ইঁহারা সকলে ক্ষেত্রবাসীর মঠে উপস্থিত হইবামাত্র সুরবালার ক্রোধ সপ্তমে উঠিল। তিনি শ্রীমায়ের সম্মুখে হাত নাড়িয়া গ্রাম্য ছড়া কাটিয়া নানা কথা শুনাইতে লাগিলেন।

জগন্নাথক্ষেত্রের রীতি এই যে, এখানে মহাপ্রসাদধারণ-বিষয়ে জাতি-বিচার করা হয় না। এমন কি, শ্রীমন্দিরের অন্তর্গত 'আনন্দবাজারে' যাত্রীরা আচণ্ডালে পরস্পরের মুখে প্রসাদ তুলিয়া দেন ও সকলের হাত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিরাচরিত এই প্রথার মর্যাদা স্বীকার করিয়া শ্রীমা একদিন 'জগন্নাথের বাল্যভোগ খিচুড়ি মহাপ্রসাদ সকলের মুখে দিয়াছিলেন এবং "তোমরা আমার মুখে প্রসাদ দাও" বলিয়া স্বয়ং তাঁহাদের হাত হইতে উহা লইয়াছিলেন। এই আনন্দোৎসবের সময় দৈবযোগে মাস্টার মহাশয় ও বরদামামা কলিকাতা হইতে তথায় আসিয়া পড়ায় তাঁহারাও ঐ ভাবে প্রাসাদ পান।

জয়রামবাটী হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, দিদিমা ব্যতীত তাঁহারা সকলেই পৌষ মাসে দেশে ফিরিয়া যান। ইহার পর শ্রীমা আরও কিছুদিন পুরীতে ছিলেন। তখন তাঁহার পায়ের ফোঁড়া সারিয়া গিয়াছে, পায়ের বাত তেমন প্রবল নহে এবং শরীরও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। তাই এই সময় তিনি পুরীর অনেক দ্রষ্টব্য স্থান—'জগন্নাথের রন্ধনশালা, গুণ্ডিচা বাড়ি,

১ 'শ্রীমা' গ্রন্থে (৪৭ পৃঃ) এই কয়জনেরই পুরীগমনের কথা আছে, কিন্তু শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে (৯৬ পৃঃ) বলা হইয়াছে, মায়ের সকল ভ্রাতৃজায়াই এই সময় পুরীতে আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, বরদামামার স্ত্রী ইন্দুমতী দেবীকে দেখিয়া পাগলীমামী মাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ভাল ভাজ, মা, সকলকে নিয়ে এসেছে।" মা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "তা আনব নি? আমার বুড়ো মা! তোকে এনেছি, আর তাকে আনব নি?" সুরবালা অপেক্ষা ইন্দুমতী বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন। বিবাহের সময় ইন্দুমতী একাদশ-দ্বাদশ বৎসরের বালিকা ছিলেন এবং শ্রীমায়ের যত্নে মানুষ হইয়াছিলেন। মা ইঁহাকেও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; তাই ঈর্ষান্বিতা সুরবালা 'ভাল ভাজ' বলিয়া শ্লেষ করিতেন।

লক্ষ্মীজলা, নরেন্দ্র সরোবর ও তৎসংলগ্ন মঠ এবং গোবর্ধন মঠ প্রভৃতি দর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন এবং দুইদিন সমুদ্রস্নান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনও তখন বেশ প্রফুল্ল ছিল। তাই সঙ্গীদের সহিত বসিয়া অনেক প্রাচীন কথা আলোচনা করিতেন। এইরূপে কিছুকাল আনন্দে নীলাচলে কাটাইয়া তিনি স্বীয় জননী ও অবশিষ্ট সকলের সহিত মাঘ মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় বাগবাজারের বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। অল্প কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া দিদিমা জয়রামবাটীতে চলিয়া যান।

স্বজনবিয়োগ

শ্রীমায়ের খুল্লতাত নীলমাধব হাঁপানি রোগে ভুগিতেন—বিভিন্ন সময়ে রোগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত। পুরী হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পরেই রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি একেবারে শয্যাগত হইলেন—চিকিৎসায় ফল না হইয়া অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হইতে চলিল। শ্রীমা নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সাগ্রহে খুল্লতাতের সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ভক্তেরাও নীলমাধবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনের মাস দুই পরে একদিন চিরবিদায়ের চিহ্ন সমস্ত দেহে স্পষ্টরূপে দেখা দিল—কখন কি হয় ভাবিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত। ইহারই মধ্যে শ্রীমা সেবকের অনুরোধে একবার উপরে গিয়া ঠাকুরপূজা ও ভোগ-নিবেদনাদি সারিয়া আসিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে ভোজনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং ভরসা দিলেন যে, খুড়ার এত শীঘ্র কিছু হইবে না। তদনুসারে শ্রীমা তাড়াতাড়ি কিছু গ্রহণ করিয়াই নীলমাধবের নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন, সেবকগণ বিমর্ষ ও নতমুখ। তিনি চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি খুড়ো নেই?" কে তখন উত্তর দিবে? অপরের প্ররোচনায় দুইটি অন্নগ্রহণের জন্য খুড়ার শেষ মুহূর্তে শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পারিলেন না ভাবিয়া শ্রীমায়ের বদন তখন ক্রোধ ও অনুশোচনায় বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত তিনি বলিলেন, "ও ছাই-পাঁশ খেতে কেন আমায় পাঠালে? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম না।" বলিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—যেন অবুঝ বালিকা পিতৃহারা হইয়াছেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে শ্রীমা আপনাকে কোন প্রকারে সামলাইয়া জনৈক সেবককে মৃতের নিকট বসিতে বলিয়া স্বয়ং উপরে গেলেন এবং নির্মাল্য-হস্তে নামিয়া আসিয়া উহা শবের মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে স্থাপনান্তে উভয় স্থলে করজপ করিয়া দিলেন। তারপর শবযাত্রা আরম্ভ হইল। বাহক তিনজন ব্রাহ্মণ এবং একজন শূদ্র। গোলাপ-মা শ্রীমাকে এই অবৈধ ব্যাপার দেখাইয়া বলিলেন, "মা, শুদ্দুর হয়ে ব্রাহ্মণের মড়া ছুঁলে?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?" কাশীমিত্রের ঘাটে লইয়া গিয়া মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করা হইল; প্রসন্নমামা মুখাগ্নি করিলেন (চৈত্র [?], ১৩১১)।

প্রসন্নমামা তখন সিমলা স্ট্রীটে একখানি ছোট খোলার বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে (মাঘ, ১৩০৬) রাধুর জন্মের অল্প

পরেই মামার অল্পবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাতার নাম শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য—বাড়ি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোঘাটে। মামার পরিবারে তখন বড় মামী এবং তাঁহাদের দুই কন্যা—নলিনী ও মাকু ছিলেন; জামাতাও সেখানে বাস করিতেছিলেন। এই সময় প্রমথ অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—রোগ ডবল নিউমোনিয়া বলিয়া নির্ণীত হইল। শ্রীমা সর্বদা জামাতার সংবাদ লইতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। প্রমথের চিকিৎসাব্যপদেশে একজন ডাক্তার মাতাঠাকুরানীর পদাশ্রয় লাভ করেন; আমরা এখন তাঁহারই কথা বলিব।

ডাক্তার তখন যুবক; কিন্তু পারিবারিক বৃথা মনোমালিন্যের ফলে নিজের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছেন এবং সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য স্বহস্তে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। একদিন শ্রীমায়ের সেবক ও ডাক্তারের বন্ধু জনৈক যুবক ডাক্তারকে মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণসমীপে লইয়া গেলেন। প্রমথ তখন অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছেন; তাই শ্রীমায়ের মনও স্বচ্ছন্দে আছে। সেদিন তিনি কয়েকজন ভক্তের সহিত শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার ঝামাপুকুরের বাটীতে আসিয়া পূজায় রত আছেন, এমন সময় ডাক্তার বন্ধুসহ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীমায়ের আদেশক্রমে তখনই পূজাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি বন্ধুর হঠাৎ আহ্বানে একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, হয়তো প্রমথকে দেখিতে যাইতে হইবে। সেদিন তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গিয়াছে; দীক্ষার কথা তখন পর্যন্ত মনেই উঠে নাই। পথ চলিতে চলিতে বন্ধু যখন দীক্ষার প্রস্তাব করিলেন, তখন ডাক্তার নিজের অসুবিধার কথা বলিলেন। কিন্তু বন্ধু বুঝাইলেন যে, এই বিষয়ে নিজের মতামত ছাড়িয়া দিয়া মায়ের নির্দেশ মানিয়া লওয়াই উচিত। ডাক্তার শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সব জানিয়াও তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। অমনি ডাক্তারের মুখে এক দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল, চোখের কোলের কালিমা কোথায় চলিয়া গেল, আর মন এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সেদিন সকলের সহিত প্রসাদগ্রহণে বসিয়া ডাক্তার জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া একই মায়ের সন্তানবোধে অব্রাহ্মণ বন্ধুর পাত্র হইতে অন্ন তুলিয়া খাইয়াছিলেন। ইঁহাদের এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনে যেন সহোদর ভ্রাতা। ভক্তদ্বয়ও বলিয়াছিলেন, "তা তো ঠিকই, মা—আমরা যে আপনারই সন্তান।" ক্রমে ডাক্তারের মানসিক অবস্থার এতই উন্নতি হইয়াছিল যে তিনি সমস্ত অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে ও মঠের সাধুদের চিকিৎসাদি ব্যাপারে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকারপূর্বক প্রকৃত ভক্তের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাগবাজারের বাটীতে অবস্থানকালে কয়েক বার শ্রীমায়ের ফটো তোলা হয়। তন্মধ্যে কয়েকখানি ছবি ১৩১১ সালের ২২শে চৈত্র চিৎপুর রোডের বি. দত্তের স্টুডিওতে তোলা হয়। উহার একখানিতে শ্রীমা, লক্ষ্মীদিদি, নলিনীদিদি, রাধু প্রভৃতির সহিত বসিয়া আছেন। অপর একখানি ছবি পরের মাসে বিরজানন্দজীর আগ্রহে ভ্যান ডাইক কোম্পানির চৌরঙ্গীস্থ স্টুডিওতে লওয়া হয়। উহাতে শ্রীমা সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার দক্ষিণে টবে একটি ছোট গাছ রহিয়াছে। শ্রীমায়ের যে ছবিখানি আজকল সর্বাধিক প্রচলিত এবং বহু স্থলে পূজিত, উহা শ্রীযুক্ত ওলি বুলের ব্যবস্থানুসারে ১৩০৫ সালে তোলা হয়। ঐ সময় ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে বসাইয়া চুল ও আঁচল প্রভৃতি যথাযথ বিন্যাস করিয়া দেন।

পূর্বোক্ত ডাক্তার ব্যতীত এইকালে শ্রীমায়ের নিকট আর একজন বিশিষ্ট ভক্তের আগমন হয়; তাঁহার নাম শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমায়ের নিকট যাতায়াত ও ভক্তদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলে তিনি দীক্ষাগ্রহণে উৎসুক হন এবং একদিন মাকে নিজ ছুতারপাড়া লেনের বাড়িতে লইয়া গিয়া সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনিও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং বিবিধরূপে মাতাঠাকুরানীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের বিনোদবিহারী সোম নামক জনৈক ছাত্র তাঁহারই অনুকম্পায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করেন। ইনি পরে থিয়েটারে যোগ দেন এবং ভক্তদের নিকট 'পদ্মবিনোদ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। সঙ্গদোষে তিনি পানাসক্ত হইয়াছিলেন এবং অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিবার সময় অনেক অসংলগ্ন কথা বলিতেন। স্বামী সারদানন্দজীকে ইনি 'দোস্ত' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমায়ের বাগবাজারের বাটীর পার্শ্ব দিয়া গভীর রাত্রে গমনকালে তিনি 'দোস্ত'কে আহ্বান করিতেন, কিন্তু শ্রীমায়ের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার ভয়ে বাড়ির কেহ সাড়া দিতেন না। এক রাত্রে ভিতর হইতে কোন আওয়াজ না পাইয়া পদ্মবিনোদ নেশার ঝোঁকে গান ধরিলেন—

উঠ গো করুণাময়ি খোল গো কুটীর-দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার।
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার॥
সন্তানে রেখে বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে।
'মা, মা,' বলে ডেকে মোর হল অস্থিচর্মসার॥
ধ্বনি-বর্ণ-তান-লয়ে তিন গ্রাম বসাইয়ে।
এত ডাকি তবু নিদ্রে ভাঙ্গে নাকি মা তোমার॥
খেলায় মত্ত ছিলাম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে।

চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর॥
রাম বলে ত্যজি তোরে যাব কার কাছে আর।
মা বিনে কে লবে এই অকৃতী অধম ভার॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে উপরে মায়ের জানালার পাখি খুলিয়া গেল; ক্রমে বাতায়নটি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। পদ্মবিনোদ তাহা দেখিয়া তৃপ্তিসহকারে বলিলেন, "উঠেছ, মা? ছেলের ডাক শুনেছ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও," বলিয়া তিনি রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে পথের ধূলি মাথায় তুলিয়া পুনর্বার গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন--

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে॥

আবার সজোরে আখর দিলেন, "আমি দেখি, দোস্ত না দেখে।" পরদিন শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কে?" সব শুনিয়া বলিলেন, "দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে।" পদ্মবিনোদ অন্ততঃ আর একবার এইভাবেই শ্রীমায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন। পরদিন ভক্তেরা যখন অনুযোগ করিলেন যে, তাঁহার এইরূপ শয্যাত্যাগ করা অনুচিত, তখন স্নেহময়ী মা উত্তর দিলেন, "ওর ডাকে যে থাকতে পারি নে।" অল্পদিন পরেই পদ্মবিনোদ কঠিন উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে যান। শেষ মুহূর্তে তিনি 'কথামৃত' শুনিতে চাহেন। ঠাকুরের অমৃতবাণী-শ্রবণে তাঁহার নয়নকোণে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, আর 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। শ্রীমা এই বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "তা হবে না? ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, এখন যাঁর ছেলে তাঁরই কোলে গেছে।"

১৩১২ সালের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের) জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমায়ের দেশে যাওয়া স্থির হইল। এইবার সর্বপ্রথম তিনি বিষ্ণুপুরের রাস্তায় গমন করেন। বিষ্ণুপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া সকলে সেখানকার এক চটিতে দ্বিপ্রহরের আহার সমাপ্ত করিলেন। পরে সঙ্গে আগত কৃষ্ণলাল মহারাজ ও অপর একজন ভক্ত কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন; অবশিষ্ট সকলে সন্ধ্যার সময় চারিখানি গরুর গাড়িতে কোতুলপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রত্যূষে সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা রন্ধন ও আহার শেষ করিলেন। তারপর শ্রীমা ও রাধু পালকিতে এবং অপরেরা ঘুরপথে গরুর গাড়িতে জয়রামবাটীতে উপনীত হইলেন।

পূর্ব বৎসর শ্রীমা জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে দেশে আসেন নাই; সুতরাং এবারের পূজা বেশ ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইল। স্বামী সারদানন্দজী পূজার বহু উপকরণ কলিকাতা হইতে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমা এই কয়দিন পূজার কার্যে ও চিন্তায় বহু ভাবে ব্যাপৃত ও বিভোর রহিলেন। এই সময়ে এক

ঘটনায় শ্রীমা কত বিনয়ী ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে কত শ্রদ্ধা করিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঠশালার সহপাঠী কামারপুকুরের গণেশ ঘোষাল মহাশয় একবার শ্রীমাকে দেখিতে আসিলে তিনি সসম্ভ্রমে ঘোষাল মহাশয়কে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঘোষাল মহাশয় ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনি মা; মা সন্তানকে প্রণাম করিলে তাহার অকল্যাণ হয়। তাই নতজানু হইয়া তিনিই মাকে প্রণাম করিলেন।

১৯০৫ খৃীষ্টাব্দের শেষার্ধে একদিন দ্বিপ্রহরে দীক্ষাপ্রার্থী ব্রহ্মচারী গিরিজা (স্বামী গিরিজানন্দ) মায়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার বন্ধু বটুবাবুর সহিত কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে জয়রামবাটী উপস্থিত হন। তাঁহারা আসিতেই মা বলিলেন, "বাবা, বড় বউ-এর (প্রসন্নমামার প্রথম পক্ষের স্ত্রী) কলেরা হয়েছে। এই দুপুরে রান্না-বান্না করলে, চাকরদের খাওয়ালে, তারপর থেকে হঠাৎ ভেদ-বমি চলছে।" প্রসন্নমামা তখন কলিকাতায়। গ্রামে চিকিৎসক বা ঔষধ নাই। বার ঘণ্টার মধ্যে মামীর দেহত্যাগ হইল। তাঁহার কন্যাদ্বয়—নলিনী ও মাকু—তখনও খুবই ছোট; তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। শ্রীমা পূর্বেই রাধুর ভার লইয়াছিলেন, নলিনী এবং মাকুকেও তিনিই আশ্রয় দিলেন।

গিরিজা মহারাজের তখন স্বতই মনে হইতেছে যে, এই শোকের মধ্যে আর দীক্ষার কথা উঠিতেই পারে না; সুতরাং তিনি আনুড়ে ৺বিশালাক্ষী-দর্শনে যাইবার জন্য মাতাঠাকুরানীর অনুমতি লইতে গেলেন। মা বলিলেন, "কত আশা করে এসেছ; স্নান করে এস, যা হয় বলে দি।" কৃপাময়ী সেই দিনই তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। বটুবাবু দীক্ষাপ্রার্থী ছিলেন না। অহেতুক করুণাময় শ্রীমা তাঁহাকেও দীক্ষা দিলেন।

ক্রমে মাঘ মাস আসিয়া পড়িল—বেশ শীত। প্রাতঃকালে অনেকেই শ্রীমায়ের বাড়ির দাওয়ায় রৌদ্রে বসিয়া আছেন। পূর্বদিন শিরোমণিপুরের হাট হইয়া গিয়াছে। ঐ হাটে তরকারী কিনিয়া একটি স্ত্রীলোক জয়রামবাটীতে বেচিতে আনিত; আজও সে আসিয়াছে। ধান্য, সরিষা ইত্যাদির বিনিময়ে দিদিমা তাহার নিকট হইতে কিছু শাকসবজি কিনিয়া আনিলেন। পরে শৌচে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া ঢেঁকিশালে ধান-কোটায় সাহায্য করিলেন। ঐ কাজ সারিয়া আবার শৌচে যাইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া কালীমামার দাওয়ায় শুইয়া পড়িলেন এবং শ্রীমায়ের জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, আর বাঁচব না—মাথা কি রকম করছে।" সেবক প্রমাদ গণিয়া শ্রীমাকে ডাকিলেন। তিনি তখনই আসিলেন; কিন্তু কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, বৃদ্ধার অন্তিমকাল সত্যই আসন্ন। তিনি আবার শৌচে যাইতে চাহিলে

শ্রীমা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দিদিমা বলিলেন, "কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে" বলিয়াই শুইয়া পড়িলেন। শ্রীমা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে, সে সামান্য জিনিসের জন্য ভাবিতে হইবে না; সারিয়া উঠিলেই ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু বৃদ্ধা বলিলেন যে, আর খাওয়া হইবে না, সম্প্রতি শেষবারের মতো জল খাইবেন মাত্র। শ্রীমা তাড়াতাড়ি গঙ্গাজল লইয়া আসিয়া বৃদ্ধার মুখে তিনবার দিলেন। অতঃপর, রত্নগর্ভা শ্যামাসুন্দরী দেবীর দেহ নিস্পন্দ হইল। শ্রীমা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মস্তকে ও বুকে জপ করিয়া দিলেন—ততক্ষণ দিদিমার চক্ষু দুইটি ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়াছে। তখন সকাল নয়টা। বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সংবাদ পাইয়া বরদামামা মাঠ হইতে ফিরিলেন। যথাসময়ে আমোদরের তীরে বৃদ্ধার দেহের সংকার হইল।

ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী পূর্বসুকৃতিবশতঃ সাক্ষাৎ জগদম্বাকে কন্যারূপে পাইয়াছিলেন। শ্রীমা একদা বলিয়াছিলেন, "বাবা পরম রামভক্ত ছিলেন—পরোপকারী; মায়ের কত দয়া ছিল! তাই এঘরে জন্মেছি।" শ্রীমায়ের বিবাহের পর শ্যামাসুন্দরী অপর দশজনের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়াই ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইয়া জামাতার প্রতি এক অপূর্ব স্নেহ-মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ দিদিমার অশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনি ভাল চাউল প্রভৃতি যাহা পাইতেন, সব ইঁহাদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন; বলিতেন, "আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) হয়তো কখনও আসবে, যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) আসবে; এসব দরকার।" আর বলিতেন, "আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন—সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন; তোরা কি যত্ন করতে পারবি? আমার ভক্তভগবানের সংসার।" দিদিমার এই বাৎসল্য পল্লীর বালকবালিকাদের প্রতিও প্রসারিত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, শেষ দিনও সবজি ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে তিনি পল্লীর 'নাতিনাতিনী'দের সহিত অনেকক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিলেন।

দিদিমা সজ্ঞানে দিব্যধামে প্রয়াণ করিলে শ্রীমা সংসারী লোকেরই ন্যায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আজ তিনি মাতৃহারা! শুধু তাহাই নহে, আজ আর তাঁহার এমন কেহই নাই, যাঁহার নিকট তিনি স্নেহের আবদার লইয়া দাঁড়াইতে পারেন। পিতা, পতি, খুল্লতাত, মাতা—একে একে সকলেই বিদায় লইলেন। ইহারই মধ্যে তিনি তাঁহার একান্ত-নির্ভরস্থল স্বামী যোগানন্দকে হারাইয়াছেন, স্নেহের ভ্রাতা অভয়ও চলিয়া গিয়াছেন। এখন বিপুল সংসারের দায়িত্ব তাঁহারই উপর। শ্রীমায়ের আজিকার অন্তরের ব্যথা লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

তবু সংসারের একটা ধারা আছে, কালের একটা প্রভাব আছে। আবার যাঁহারা আদর্শ-স্থাপনার্থে ধরায় অবতীর্ণ হন, একদিকে তাঁহাদের শোকানুভূতি যেমন অতীব তীব্র, অপর দিকে কর্তব্য-নিষ্ঠাও তেমনি সুদৃঢ়। অতএব শোকে অভিভূত হইলেও শ্রীমা উহাতে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ দিদিমার শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে ভ্রাতারা তাঁহারই মুখাপেক্ষী। কলিকাতায় সংবাদ পেঁৗছিলে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির যত্নে অচিরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত ও জয়রামবাটীতে প্রেরিত হইল। শ্রাদ্ধে বেশ ঘটা হইল—পঁচিশটি পিতলের ঘড়া, ছত্র, আসন, পাদুকা ইত্যাদি দান করা হইল; ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের ভূরিভোজন হইল এবং দিদিমার শেষ বাসনানুযায়ী কুমড়ার ঘ্যাঁটও যথেষ্ট খাওয়ানো হইল।

মাতৃশোকে এবং শ্রাদ্ধের কঠোর পরিশ্রমের ফলে শ্রীমায়ের শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে তাঁহার প্রায় এক মাস লাগিয়াছিল। ইহার পর ঠিক কোন্ সময় তিনি পুনরায় কলিকাতায় যান. তাহা জানা নাই। সম্ভবতঃ ১৩১২ সালের শেষে তিনি তথায় যাইয়া ২।১, বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা গোপালের মা তখন নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শেষ রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার দেহত্যাগের দিন কয়েক পূর্বে শ্রীমা সেই অতিবৃদ্ধা বাৎসল্যরতিময়ীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইবামাত্র গোপালের মা ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গোপাল এসেছ?" বলিয়াই কি একটা পাইবার জন্য যেন হাত বাড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সেবিকা বুঝাইয়া দিলেন যে, গোপালের মা তাঁহাকেই গোপালজ্ঞানে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অভিন্নবোধে এইরূপ সম্বোধন করিতেছেন এবং তাঁহার চরণধূলি চাহিতেছেন। শ্রীমা এযাবৎ গোপালের মাকে শাশুড়ীজ্ঞানে সম্মান দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই চরম অবস্থায় আর তিনি দ্বিধা করিতে পারিলেন না—সেবিকা অঞ্চলের দ্বারা শ্রীমায়ের পদধূলি লইয়া গোপালের মার অঙ্গে লেপিয়া দিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, সেই ভাগ্যবতীর গোপাল-লোক-গমনে অধিক বিলম্ব নাই। ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়াই শ্রীমা গৃহে ফিরিলেন। ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় গোপালের মা ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বেই শ্রীমা পুনর্বার স্বগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে বৎসর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) প্রভৃতির উপস্থিতিতে পূজা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এই পর্যন্ত আমরা শ্রীমায়ের দিক হইতেই তাঁহার চরিত্র-বিকাশের ধারার অনুসরণ করিয়াছি। অতঃপর ভক্তদের দিক হইতেও উহা দেখা আবশ্যক। শ্রীমাকে ভক্তদের অনেকেই প্রথমে জগদম্বারূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে গুরুপত্নীরূপে জানিতেন; অতএব তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা এবং কর্তব্য-বুদ্ধি ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, এক যুবক কোন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের (কালী-দানার) বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন, সেখানে ঠাকুরের ও অন্যান্য দেবদেবীর ছবি থাকিলেও শ্রীমায়ের ছবি নাই, তখন তিনি কালীবাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীবাবু করজোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ইঁনিই আমাদের মা, ইঁনিই আমাদের বাবা।" জিজ্ঞাসু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে জানাইলেন। সমস্ত শুনিয়া ভক্তবর বলিলেন, "আমরাই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলে।" পূজ্যপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তখন শুধু যে মাকে মানিতেন তাহাই নহে, ভক্ত-মহলে অকুণ্ঠহৃদয়ে তাঁহার মহিমা খ্যাপন করিয়া বেড়াইতেন। ত্যাগী সন্তানেরা প্রথমাবধিই শ্রীমাকে জগদম্বাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে স্বহৃদয়ে স্থাপনপূর্বক ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেন; কিন্তু নিরঞ্জনানন্দজীর মতো তাঁহারা ডাকিয়া হাঁকিয়া প্রচার করিতেন না। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অকুতোভয়ে সর্বসমক্ষে প্রচার করিতেন। ইহারই ফলে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে শ্রীমায়ের স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস পাঁচ সিকে পাঁচ আনা। শ্রীমাকে গুরুপত্নী হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা তো করিতেনই, অধিকন্তু যেদিন তিনি তাঁহাকে জগদম্বারূপে গ্রহণ করিলেন, সেদিন সে শ্রদ্ধা ঐরূপ প্রকৃষ্ট ভক্তির আসনেই উন্নীত হইল। পরবর্তী ঘটনা হইতে আমরা আংশিক পরিচয় পাই। তখনও গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জীবিত আছেন। গিরিশ একদিন তাঁহার সহিত নিজগৃহে ছাদে বেড়াইতেছিলেন। এদিকে শ্রীমাও অদূরবর্তী বলরাম-ভবনের ছাদে উঠিয়াছেন। উহা যে গিরিশের ছাদ হইতে দেখা যায়, তাঁহার জানা ছিল না। গিরিশচন্দ্রের পত্নী শ্রীমাকে দেখিয়াই পতিকে বলিলেন, "ঐ দেখ, মা ও বাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন।" গিরিশচন্দ্র অমনি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না, না, আমার পাপনেত্র; এমন করে লুকিয়ে

মাকে দেখব না।" এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গেলেন। শ্রীমা পরে ইহা গিরিশ-জায়ার নিকট শুনিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা, এই সুলক্ষণা পত্নী হইতেই গিরিশের গুরুলাভ অর্থলাভ, যশোলাভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ইহার গর্ভে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রের জন্মের পর প্রসূতি যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া চিরবিদায় লইলেন (১২ই পৌষ, ১২৯৫ ; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮), তখন গিরিশচন্দ্র চারিদিক শূন্য দেখিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বকলমা দিবার পর তাঁহার শোক করিবার পর্যন্ত অধিকার ছিল না, সুতরাং অন্তর্দাহে জ্বলিতে থাকিলেও তিনি অধুনা গণিতশাস্ত্রের চর্চা ও পুত্রের লালনপালনে আপনাকে সর্বদা নিরত রাখিয়া এই গভীর শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

এই পুত্রের প্রতি আকর্ষণের অন্য কারণও ছিল। ভক্ত চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র একদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঠাকুর যেন তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর অবশ্য তাহাতে সম্মত হন নাই; তথাপি তাঁহার লীলাসংবরণের পর যখন এই পুত্র জন্মিল, তখন গিরিশের স্থির বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুর তাঁহার আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ঐ রূপে গৃহ আলোকিত করিয়াছেন। এই পুত্রকে তাই তিনি দেবতাজ্ঞানে পালন করিতেন। ছেলেটির স্বভাব অতি মধুর ছিল; গিরিশগৃহে আগত সকলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং একবার অন্ততঃ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। শ্রীমা কখনও গিরিশ-ভবনে পদার্পণ করিলে শিশু তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) শ্রীমা যখন বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে বাস করিতেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দেরই আগ্রহে মহাকবি এই পুত্রের সহিত শ্রীমাকে দর্শন করিতে যান। শ্রীমায়ের জীবনে এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে; কারণ শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত পূর্ব হইতেই তাঁহাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি গিরিশের আগমনের পর হইতেই প্রকাশ্যভাবে জগদম্বারূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে লজ্জাশীলা মা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন; ভক্তগণ তাঁহার দর্শন পাইতেন না, নীচে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইতেন। গিরিশাদির আগমনের পর হইতে শ্রীমাও ভক্তজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিলেন।

গিরিশের পুত্রের বয়স তখন তিন বৎসর। তখনও কিন্তু সে কথা বলিত না—হাবভাবে সব জানাইত। সেদিন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সে শ্রীমাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইল। সে তাঁহাকে পূর্বেও দেখিয়াছে;

কিন্তু গিরিশ দেখেন নাই। কথা না বলিতে পারিলেও সে অস্থির হইয়া শ্রীমা উপরে যেখানে ছিলেন, সেইদিকে দেখাইয়া উঃ উঃ করিতে লাগিল। প্রথমে কেহ বুঝিতে পারেন নাই; পরে বুঝিতে পারিয়া জনৈক সেবক তাহাকে উপরে লইয়া গেলে সে মায়ের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম করিল। তারপর নীচে নামিয়া সে পিতাকে উপরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানিতে থাকিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী!" বালক কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। তখন তাহাকে কোলে করিয়া গিরিশচন্দ্র কম্পিতকলেবরে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে উপরে গিয়া একেবারে শ্রীমায়ের পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বলিলেন "মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণদর্শন হল আমার।"

পুত্রটি কিন্তু স্বল্পায়ু ছিল—তিন বছর বয়সেই সে দেহত্যাগ করে।[১] ইহার কিছুকাল পরে পুত্রশোক ভুলিবার জন্য নিরঞ্জনানন্দজীর পরামর্শে গিরিশচন্দ্র তাঁহার সহিত জয়রামবাটী যাইয়া কয়েক মাস কাটাইয়া আসেন।[২] তাঁহাদের সঙ্গে সেবারে স্বামী সুবোধানন্দজী, নির্ভয়ানন্দজী এবং বোধানন্দজীও গিয়াছিলেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে এক পাচক ব্রাহ্মণ এবং একজন চাকর ছিল। তাঁহারা বর্ধমান ও উচালনের পথে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। ইহা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[৩]

মায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া গিরিশচন্দ্র স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে মাকে প্রণাম করিতে চলিলেন। মায়ের দর্শনচিন্তায় তখন তিনি বিভোর, সমস্ত অঙ্গ ভাবে কম্পমান। শ্রীমায়ের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া তিনি যেমন উপরের দিকে চাহিয়াছেন, অমনি মায়ের মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন, "এ্যাঁ, মা তুমি।" এই বিস্ময়ের সহিত গিরিশের জীবন-মরণের একটি ঘটনার সংযোগ ছিল। সে

১ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে (৩৬৪ পৃঃ) আছে—"প্রায় ৩ বৎসর বয়ঃক্রমে (অর্থাৎ মাতার দেহত্যাগের দুই বৎসর পরে) শিশুটি ইহলোক ত্যাগ করিল। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৯০-এর শেষের কথা। ইহার এক বৎসর পরে গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটী যান (ঐ, ৩৬৯ পৃঃ) ১৫শ বর্ষ 'উদ্বোধন'-এর ৩৫৪ পৃষ্ঠায় আছে—"পুত্র তিন বৎসর হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।"

২ "গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি বয়স প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া পিতার স্নেহের বালক হইয়া যাইতেন, এখানেও তদ্রূপ সকল কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্তমনে কাটাইয়াছিলেন।" ('গিরিশচন্দ্র', ৩৭১ পৃঃ)

৩ শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়কে ৯।৫।৯১ (২৯।১।১২৯৮) তারিখে লিখিত অভয়মামার এক পত্রে জানা যায় যে, ঐ দিন গিরিশবাবু, নিরঞ্জনানন্দজী ও সুবোধানন্দজী জয়রামবাটীতে উপস্থিত ছিলেন।

বহুকাল পূর্বের কথা। যুবক গিরিশ তখন বিসূচিকায় শয্যাগত—জীবনের আশা নাই। হঠাৎ তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ আনিয়া তাঁহার মুখে দিয়া বলিতেছেন, "খাও"। তাঁহার পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, দেহে এক অপার্থিব জ্যোতি, আর মুখে চিত্তহারী স্নেহ। সে প্রসাদ বড় সুস্বাদ ছিল। উহা খাইতে খাইতে গিরিশের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তখনও চক্ষে সে দেবীমূর্তি ভাসিতেছে, আর জিহ্বায় প্রসাদের স্বাদ রহিয়াছে। ক্রমে তিনি নীরোগ হইলেন। গিরিশ দেখিলেন, স্বপ্নের সেই দেবী আজ অকস্মাৎ সম্মুখে উপস্থিত। তিনি পূর্বে কখনও শ্রীমায়ের মুখ নিরীক্ষণ করেন নাই। আজ বুঝিলেন, এই দেবীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তবু মায়ের মুখে সত্য জানিবার জন্য বাহিরে আসিয়া অপরের দ্বারা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, শ্রীমা গিরিশকে পূর্বে ঐ ভাবে কখনও দর্শন দিয়াছেন কিনা। মা অহা স্বীকার করিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় গিরিশ আর একদিন তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন, "তুমি কি রকম মা?" মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"

প্রায় দুই সপ্তাহ সেখানে অবস্থানের পর গিরিশবাবু ও নিরঞ্জনানন্দজী ব্যতীত আর সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেবারে দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে বাস করিয়া মহাকবির মনে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। শহরের কোলাহল ও শত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিয়া তিনি শ্রীমায়ের গৃহে অতি সুখে দিন যাপন করিতেন। তিনি মাঠে ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন। উদর পূর্ণ করিয়া শ্রীমায়ের নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া স্বতই সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলোচনায় ও অধ্যাত্ম চিন্তায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। সূর্যাস্তের পর মুক্ত প্রান্তরে যাইয়া তিনি আপনমনে বসিয়া চক্ষু ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করিতেন। তিনি নাট্যকার ও নাট্যাচার্য—এই সংবাদ প্রচারিত হইতে অধিক দিন লাগে নাই। তাই পল্লীবাসীরা তাঁহার মুখে গান শুনিতে চাহিত। তিনি যতই বুঝাইতেন যে, তিনি রচয়িতা হইলেও গায়ক নহেন, তাহারা ততই অনুনয় করিতে থাকিত। অগত্যা তাঁহাকে গাহিতে হইত। শ্রীমা দূর হইতে তাঁহার মুখে গান শুনিয়া দুই-একখানি শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে একদিন জনৈক সেবককে গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন—

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়, রানী পাছে তোলে কোলে।
রানী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।

একদিন দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী আসিয়া বেহালা-সংযোগে গান শুনাইয়া গেল—

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)

(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?—ইত্যাদি (১৩৩ পৃঃ দ্রঃ)।

শ্রীমা ও ঠাকুরের জীবনলীলার বর্ণনাসদৃশ ভাববহুল সে সংগীতশ্রবণে একদিকে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির এবং অপরদিকে গৃহাভ্যন্তরে শ্রীমায়ের অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল।

জয়রামবাটীতে কালীমামার সহিত গিরিশবাবুর একদিন তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল—বিষয়, শ্রীমা দেবী কিনা। মামা তাঁহাকে দিদি বলিয়াই জানিতেন। আর ইহা তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নহে; কারণ পুরাণেও দেখা যায় যে, যদুবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিয়াও তাঁহাকে ঈশ্বররূপে চিনিতে পারেন নাই। এদিকে ভক্ত গিরিশের বিশ্বাসও অটল। কালীমামা বলেন, "তোমরা দিদিকে 'মা জগদম্বা, জগজ্জননী' ইত্যাদি কতই বল। কই, আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি- আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।" গিরিশবাবু দৃঢ় ও গম্ভীর-কণ্ঠে বলেন, "কি বলছ? তুমি এক সাধারণ পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে; যজন-যাজন, পঠন-পাঠন ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষ-বাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি একটা চাষের বলদ দেবে বলে তো তুমি তার পেছনে পেছনে অন্ততঃ ছ মাস ঘুরতে থাক। আর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবনে ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও। আমি বলছি, যাও!" কথার মধ্যে একটা শক্তি ছিল; তাই কালীমামা দিদির নিকট গেলেন এবং গিরিশবাবুর পরামর্শানুযায়ী চরণ ধরিয়া শরণ লইলেন। কিন্তু শ্রীমা বলিলেন, "ওরে কালী, আমি তোর সেই দিদি। আজ তুই এ কি করছিস?" সুতরাং কালীমামা সাধারণ মনোভাব লইয়াই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গিরিশবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। সব শুনিয়া তিনি কালীমামাকে আবার পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু মামা আর গেলেন না।

শ্রীমায়ের স্নেহ-যত্নে সেবারে গিরিশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে দুগ্ধ সহজলভ্য নহে; অথচ গিরিশবাবুর প্রভাত হইলেই চা আবশ্যক। শ্রীমা স্বয়ং সন্ধান করিয়া তাঁহার জন্য দুধ লইয়া আসিতেন। গিরিশচন্দ্র আরও দেখিতেন যে, তাঁহার বিছানার চাদর প্রতিদিনই ধপধপে সাদা। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি একদিন দেখিলেন, শ্রীমা পুষ্করিণীর ঘাটে সাবান দিয়া তাঁহার চাদর কাচিতেছেন।

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীমায়ের বিচারশক্তি এবং স্বীয় অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসারতাপে ক্লিষ্ট গিরিশবাবু একদিন তাঁহার শ্রীচরণে সন্ন্যাসগ্রহণের বাসনা নিবেদন করিলে শ্রীমা সম্মতি দিলেন না। তখন বুদ্ধিমান ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধ ঘণ্টা ধরিয়া

নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্প লোকই স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারতেন; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ঐ অঞ্চলে থাকার সুযোগে গিরিশবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানেও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমাও সঙ্গে গিয়াছিলেন।[১] গিরিশবাবু জয়রামবাটী হইতে "ফিরিবার কালে শ্রীশ্রীমাকে অকপটে অন্তরের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া অতঃপর তাঁহার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক-সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন" ('উদ্বোধন', আষাঢ়, ১৩২০)।

সূক্ষ্মদর্শী ও সুকবি গিরিশের চক্ষু যেমন সুন্দর ও পবিত্র দৃশ্যাবলী চিরকালের মতো হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া লইত, তাঁহার নিপুণ ভাষাও তেমন প্রয়োজনস্থলে উহার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া অপরের তৃপ্তি ও কল্যাণ বিধান করিত। মা যখন সরকারবাড়ি লেনে গুদামবাড়িতে ছিলেন (১৮৯৬ খৃঃ), তখন গিরিশ প্রায়ই সেখানে তাঁহাকে প্রণাম জানাইতে যাইতেন। মা যেদিন সে বাড়ি হইতে দেশে ফিরিবেন, সেদিন কবিবর সেখানে আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু স্বামী যোগানন্দকে ডাকিয়া লইয়া গম্ভীর-ভাবে উপরে চলিয়া গেলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। গিরিশ শ্রীমাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যুক্ত-করে বলিলেন, "মা, তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমি বয়স্ক ছেলে হলেও মায়ের সেবা করতে পারতুম। কিন্তু সবই উলটা ব্যাপার, তুমিই আমাদের সেবা কর, আমরা তোমার করি না। এই তো জয়রামবাটী যাচ্ছ। সেখানে পাড়াগাঁয়ের উনুনের পাশে বসে দেশের লোকের জন্য রাঁধবে আর তাদের সেবা করবে। আমি কেমন করে তোমার সেবা করব? আর মহামায়ীর সেবার কিই বা জানি?" বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ ও মুখ আরক্তিম হইল। একটু পরে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ

১ মাস্টার মহাশয়কে লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে, অন্ততঃ ২৩শে জুলাই হইতে ২৬শে অগস্ট (১৮৯১) পর্যন্ত শ্রীমা কামারপুকুরে ছিলেন।

তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।" গিরিশের উদ্দীপনাময়, ভাব-গম্ভীর বাক্যে সকলে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাইয়া শ্রীমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গিরিশ শ্রীমাকে প্রথমে গুরুপত্নীরূপে এবং পরে মাতা ও দেবীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত আত্মীয়তাবোধ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি শুধু মায়ের সেবা ও প্রকাশ্যে মহিমা খ্যাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজ হৃদয়ে মায়ের প্রতি সন্তানবৎ একটা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারেরও শক্তি পাইতেন। গিরিশচন্দ্রের মাতৃসেবা সম্বন্ধে শ্রীমায়ের নিজের উক্তি হইতে জানা যায় যে, গিরিশ একসময়ে দেড় বৎসর কাল মায়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল-পুত্রবৎ আচরণেরও একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

শ্রীমা একবার দীর্ঘকাল পরে দেশ হইতে ফিরিতেছেন ; সঙ্গে যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও আছেন। বিষ্ণুপুরের গাড়ি হাওড়া স্টেশনে সকালে পৌঁছিবার কথা। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী প্রেমানন্দজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুরামদা, মা আসছেন অনেক দিন পরে ; একবার কি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মাকে দর্শন করা যায় না।" প্রস্তাবে প্রেমানন্দজী সহজেই সম্মত হইলেন। কিন্তু স্টেশনে আসিয়া জানিলেন যে, গাড়ি প্রায় তিন ঘণ্টা দেরীতে পৌঁছিবে। তথাপি এতদূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলে না বলিয়া তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম, সকলের খুবই কষ্ট হইতেছিল, তথাপি কেহ দর্শন না করিয়া ফিরিলেন না। নির্দিষ্ট কালের বহু পরে গাড়ি আসিলে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা সন্তর্পণে মাকে নামাইলেন। ব্রহ্মানন্দজী ও সমবেত ভক্তদের প্রতি গোলাপ-মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া শাসাইয়া গেলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, তোমাদের কি একটু আক্কেল নাই? এই রোদে মা তেতেপুড়ে এলেন, আর তোমরাই যদি পেন্নাম করবার জন্য এখানে এসে বিভ্রাট কর, তো অপরের আর কথা কি?" নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মহারাজ আর প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন না, ভক্তদেরও তখন সেই অবস্থা। শ্রীমাকে বাগবাজারে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ভাবিলেন, প্রণাম না করিলেও একবার মায়ের বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসা উচিত—ব্যবস্থাদি ঠিক ঠিক হইয়াছে কিনা। সুতরাং ভিন্ন গাড়িতে তাঁহারাও সেখানে পৌঁছিয়া নীচে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত—ঘর্মাক্ত-কলেবর, গায়ে সামান্য একটা পিরান ; তিনিও মায়ের দর্শনার্থী। মহারাজ প্রভৃতিকে নীচে দেখিয়া তিনি মায়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাসাধ্য নিম্নস্বরেই কথা কহিতেছিলেন ; তথাপি

গলার স্বাভাবিক গম্ভীর আওয়াজ উপরেও পৌঁছিতেছিল ; ইহা শুনিয়া গোলাপ-মা নীচে আসিয়া আবার হাওড়া স্টেশনেরই মতো ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন! কিন্তু এবার পট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, আর নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন মহারাজের স্থলে গিরিশচন্দ্র! তাই গোলাপ-মা যেমন বলিলেন, "বলিহারি যাই ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে। বলি, গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছ! মা তেতেপুড়ে এলেন—কোথায় একটু জিরবেন, না এখানেও এলে কিনা জ্বালাতন করতে!" অমনি গিরিশবাবু সে কথায় কান না দিয়া সোজা উপরে চলিলেন এবং স্বামীজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "চল, চল, মহারাজ, বাবুরাম, মাকে দেখে আসি।" গোলাপ-মার শাসনবাণী পুনরুচ্চারিত হইলে, গিরিশ সেবিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঝাঁজা মেয়ে বলে কিনা মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি! কোথায় এত দিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি মাতৃস্নেহ শেখাচ্ছেন!" তাঁহারা উপরে চলিয়া গেলেন এবং মাও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। গোলাপ-মাও ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সজলনয়নে অভিযোগ করিলেন, "শেষে কিনা গিরিশবাবু আমাকে এরকম বললে!" শ্রীমা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে না অনেক বার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেও না?" গিরিশবাবু জয়লাভ করিয়া সগর্বে নীচে নামিয়া আসিলেন।

১৩১৪ সালের শারদীয়া পূজার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে শ্রীযুক্ত গিরিশ এবং তাঁহার দিদি শ্রীযুক্তা দক্ষিণা স্বামী সারদানন্দজীর দ্বারা জয়রামবাটীতে পত্র লিখাইলেন, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, শ্রীমা গিরিশবাবুর বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত থাকেন, তিনি না আসিলে পূজাই ব্যর্থ হইবে ; শ্রীমায়ের সম্মতি পাইলেই তাঁহারা পাথেয় পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীমায়ের শরীর তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া খুবই খারাপ। তথাপি তিনি পত্র শুনিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা হইল। যথাসময়ে শ্রীমা বিষ্ণুপুরের পথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন ; তাঁহার সঙ্গে চলিলেন পাগলী মামী ও রাধু। বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় ও ললিতবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় উপস্থিত আছেন এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেবার কলিকাতায় দাঙ্গা হইতেছিল—রাত্রে শহর অন্ধকার—তাই তাঁহারা শ্রীমায়ের নিরাপত্তার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। আহারাদি হইয়া গেলে সকলে ট্রেনে উঠিলেন। সন্ধ্যার পর ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, শ্রীমাকে লইয়া যাইবার জন্য ললিতবাবুর ঘোড়ার গাড়ি উপস্থিত আছে। উহাতে শ্রীমাকে বসাইয়া এবং প্রহরিরূপে পাদানে ও কোচবাক্সে কয়েকজন ভক্ত দাঁড়াইয়া

বা বসিয়া সকলে বলরামবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এখানেই শ্রীমায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

পরদিন গিরিশের দিদি আসিয়া প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, শ্রীমা আসাতে তাঁহাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, কারণ গিরিশ বাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, মা না আসিলে পূজা করা নিরর্থক ; সুতরাং সেরূপ স্থলে তিনি পূজা করিবেন না।

দিন কয়েক পরে গিরিশ-ভবনে পূজা আরম্ভ হইল—শ্রীমায়ের সম্মুখেই কল্পারম্ভ হইল। এদিকে আবার বলরাম-ভবনে আর এক পূজার সূত্রপাত হইল। সপ্তমীর দিন প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে ভক্ত আসিয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি শত শত ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন ; পরে গিরিশ-ভবন হইতে সংবাদ পাইয়া পূজা-দর্শনার্থে তথায় গেলেন এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন। মহাষ্টমী-দিনেও শ্রীমা বলরাম-গৃহে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করিলেন ; গিরিশ-ভবনেও তাহাই করিতে হইল। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকিলেও চাদর মুড়ি দিয়া তিনি সকলের পূজা স্বীকার করিলেন, কাহাকেও বিফলমনোরথ করিলেন না। দুই দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর স্থির হইল যে, সন্ধিপূজায় মা উপস্থিত থাকিবেন না। সেবার গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। গিরিশ ও তাঁহার দিদি সংবাদ পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইলেন এবং আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতিতে কিছুই করিবার নাই। এদিকে সন্ধিপূজার কিছু পূর্বে শ্রীমা বলিলেন যে, তিনি গিরিশ-ভবনে যাইবেন, এবং তদনুসারে বলরাম-বাবুর বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সরু গলি দিয়া তিনি ও স্ত্রী-ভক্তগণ হাঁটিয়া চলিলেন! গিরিশের খিড়কির দরজায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমা দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি এসেছি।" সে সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। ঝি দরজা খুলিয়া দিল। গিরিশ সানন্দে শুনিলেন, সাক্ষাৎ জগদম্বা তাঁহার পূজা গ্রহণার্থে সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গভীর রাত্রে সত্য সত্যই পূজামণ্ডপে অবতীর্ণা।

একটু পূর্বে তিনি ভক্তদের সহিত উপরে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, মা-ই যখন আসিলেন না ; তখন পূজামণ্ডপে যাওয়া বৃথা। এখন মায়ের আগমনসংবাদে সোল্লাসে, গদ্‌গদ স্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম আমার পূজাই হল না—এমন সময় মা দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন, 'আমি এসেছি'।" তাড়াতাড়ি সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমা প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। নবমী-পূজাও এইভাবেই কাটিয়া গেল—তিন দিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন ;

গিরিশের আত্মীয়স্বজন, এমন কি, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত, কেহই বঞ্চিত হইল না। মহাপূজা শেষ হইল।[১]

পূজার পর শ্রীমা দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাকে 'কালীপূজার পূর্বে' ছাড়িতে চাহিলেন না। অতএব উক্ত পূজার পর ২৪শে কার্তিক যাত্রার দিন স্থির হইল। এবারেও শ্রীমা বিষ্ণুপুরের পথে দেশে গিয়াছিলেন। যাইবার পূর্বে বাড়িতে পত্র লিখিয়া খবর দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে দেশড়া গ্রামে পালকি ও বাহক রাখা হয়। কিন্তু মামারা কিছুই করেন নাই। সুতরাং সন্ধ্যার অন্ধকারে হাঁটিয়া আসিতে শ্রীমা ও অপর সকলের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। এই সব কথা আমরা পূর্বে 'মায়াস্বীকার' অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। তখন শ্রীমায়ের শরীর ভাল নহে, এবং ভ্রাতাদের সংসারে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া কলিকাতার ভক্তগণ এবার শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা ও কুসুমকুমারীকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমাকে একটু সুস্থ দেখিয়া গোলাপ-মা কিছুদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১ গিরিশচন্দ্রের মাতৃভক্তির আর একটি নিদর্শন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ডে (৮৯ পৃঃ) আছে। মা বলিতেছেন, "আমাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে।" সময়ের উল্লেখ না থাকায় ইহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে খুব বেশি না হইলেও শ্রীমায়ের ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই জয়রামবাটী যাইতেন। ১৩১৪ সালের শেষে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল তথায় গিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি গ্রামের লোকদের জন্য অনেকগুলি অত্যাবশ্যক ঔষধ লইয়া যান এবং তদ্দ্বারা গ্রামবাসীদের সেবা করেন। তাঁহার নাম শুনিয়া তখন দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক আসিত। শ্রীমা তাহা দেখিয়া সানন্দে বলিয়াছিলেন, "আমার গুণী ছেলে এসেছে—লোক আসবে না?" গ্রামের লোকেরা ডাক্তারকে বহু ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল এবং তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীমা নিজে গ্রামের বাহির পর্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিয়াছিলেন।

জযরামবাটীতে শ্রীমায়ের শরীর সে-বার বিশেষ ভাল ছিল না। পায়ে বাত তো ছিলই ; ডাক্তার কাঞ্জিলাল চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। গায়ের উত্তাপ এত বাড়িয়াছিল যে, নিকট আত্মীয়েরাও ভয় পাইয়াছিলেন। এক রাত্রে শোনা গেল, তিনি বিকারের মুখে বলিতেছেন, "যেতে হবে। —না। কেন? —রাধীর জন্যে। —আচ্ছা তাই।" মনে হইল, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা হইতেছে ; মা বিদায় চাহিতেছেন, কিন্তু ঠাকুর রাধুর জন্য তাঁহাকে থাকিতে বলিতেছেন। যাহা হউক, ডাক্তার কাঞ্জিলাল যাইবার সময় গুটি কয়েক পেটেন্ট ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিলেন ; উহারই একটির ব্যবহারে সে যাত্রা তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শ্রীমা দেশে থাকিলেও স্বামী সারদানন্দজী সর্বদা পত্রদ্বারা কিংবা লোক পাঠাইয়া তাঁহার খবর লইতেন এবং প্রয়োজনমত অর্থ কিংবা ঔষধাদি পাঠাইতেন। শ্রীমাকে কলিকাতায় আনিবার জন্যও তিনি আগ্রহ দেখাইতেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতেন না। এবারও অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু মা আসেন নাই। ইতোমধ্যে কলিকাতায় একটা বড় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমা কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে অনেক সময় ভক্তগৃহে উঠিতে হইত। তিনি অত্যন্ত সহনশীলা হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পরের বাড়িতে অনিবার্য কারণে খর্ব হইতে দেখিয়া সারদানন্দজী কষ্ট পাইতেন। অধিকন্তু ইদানীং শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্ত-মহিলা দুই-চারি জন প্রায়ই থাকিতেন। গৃহস্থের পক্ষে এত লোকের সুব্যবস্থা করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইত। ভাড়াবাড়িতে সেবিকাদিসহ বাসের

ব্যবস্থা করাও স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীর পক্ষে বড় সহজ ছিল না। আবার সময়মত উপযুক্ত বাড়ি পাওয়া যাইত না ; পাইলেও উহা প্রায়ই গঙ্গা হইতে দূরে থাকায় শ্রীমায়ের গঙ্গাস্নানের অসুবিধা হইত। এতদ্ব্যতীত 'উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনার জন্য এবং ঐ কার্যে নিযুক্ত সাধুদের বসবাসের জন্যও বাড়ির প্রয়োজন ছিল। এই সব কথা ভাবিয়া সারদানন্দজী এক গুরু-দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে উদ্যত হইলেন—তিনি বাগবাজার অঞ্চলে মায়ের জন্য একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিবেন।

শ্রীযুত কেদারচন্দ্র দাস মহাশয়[১] ঠাকুরবাটী নির্মাণের জন্য বাগবাজারে গোপাল নিয়োগী লেনে তিন কাঠা চারি ছটাক জমি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বেলুড় মঠকে দান করেন। প্রথমে উহাতে 'উদ্বোধনে'র জন্য একখানি খোলার ঘর করার প্রস্তাব হয় ; কিন্তু সারদানন্দজী ছোট পাকা বাড়ির পক্ষপাতী ছিলেন। বাড়ি করার পুঁজির মধ্যে তাঁহার হাতে ছিল তখন স্বামীজীর পুস্তক-বিক্রয় হইতে সঞ্চিত ২৭০০৲ টাকা। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, উহা, ভিত্তিনির্মাণেই নিঃশেষিত হইবে। তথাপি তিনি ঋণ করিয়া বাড়ি শেষ করার আশায় ঐ জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিল ; তবুও শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভরসা করিয়া তিনি ৫৭০০৲ টাকা ঋণ লইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কার্যে অবতীর্ণ হইলেন। অবশ্য ইহাতে ব্যয়সঙ্কুলান হইল না—আরও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইল। অবশেষে অশেষ পরিশ্রমের ফলে প্রায় একাদশ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে গৃহনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'উদ্বোধন' কার্যালয় নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইল। এই বাটীতে তখন একতলায় ছয়খানি, দ্বিতলে তিনখানি এবং ত্রিতলে একখানি—সর্বসমেত দশখানি ঘর ছিল। নীচের ঘরগুলি 'উদ্বোধনে'র জন্য এবং উপরের গুলি শ্রীমায়ের ও তাঁহার সঙ্গিনীদের জন্য নির্ধারিত রহিল। শ্রীমা তখনও জয়রামবাটীতে ছিলেন। বাটী প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ পাইয়াও তিনি তখনই আসিতে চাহিলেন না।

১৩১৫ সালের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ঐ সালের ফাল্গুনের শেষে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব করিবার জন্য কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে স্বামী যোগবিনোদ তথায় উপস্থিত হন এবং উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য শ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে লইয়া যান। উৎসবে শ্রীমা খুবেই আনন্দ পাইয়াছিলেন।

উৎসবের অব্যবহিত পরেই জয়রামবাটীতে এক নূতন পরিস্থিতিব উদ্ভব হইল এবং উহার প্রতিবিধানের জন্য শ্রীমা তাঁহার অতিবিশ্বস্ত এবং ধীরস্থির

১ ইনি খড়ের ব্যবসায় করিতেন বলিয়া 'খোড়ো কেদার' নামে পরিচিত ছিলেন।

সন্তান স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাসুন্দরী দেবীর দেহ-ত্যাগের পর শ্রীমাই ভ্রাতাদের সংসারে অভিভাবিকা ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ও ভ্রাতৃবধূগণ সকলেই সাবালক। তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ ও স্বার্থের সংঘর্ষ প্রতিপদে প্রবলভাবে দেখা দিতে লাগিল। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীমা স্থির করিলেন যে, ভ্রাতাদের ইচ্ছানুযায়ী বিষয় বণ্টন করিয়া দেওয়াই শ্রেয়। ইহাতে মধ্যস্থতা করিবার জন্য সারদানন্দজীর তথায় যাওয়া আবশ্যক।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ স্বামী সারদানন্দজী শ্রীযুক্তা যোগীন-মা গোলাপ-মা এবং একজন ব্রহ্মচারীর সহিত জয়রামবাটী যাত্রা করিয়া পরদিনই তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি নবাসন, কামারপুকুর ইত্যাদি স্থানে কয়েকদিন বেড়াইয়া আসিলেন। এই সময় দেখা যাইত যে, বৈষয়িক কার্যের জন্য আসিলেও শ্রীযুক্ত শরৎ মহারাজ অধিকাংশ সময় সকলের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গাদি করিতেন অথবা স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' সম্পাদনা করিতেন।

শ্রীমা তখন খুবই ব্যস্ত থাকিতেন ; সংসারের দৈনন্দিন কর্ম ছাড়াও সারদানন্দজীর জন্য দুইবেলা কিছু তরকারী প্রভৃতি রান্না করিতেন। জল পড়িয়া উঠানের মাটি অসমতল হইলে স্বহস্তে উহা সমান করিয়া দিতেন। দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মচারীর মনে শ্রীমাকে সাহায্য করার আগ্রহ জাগিল ; কিন্তু জয়রামবাটীতে ঐ ভাবে শ্রীমায়ের হাত হইতে কাজ কাড়িয়া লইলে মামীদের অখ্যাতি হইবে বলিয়া সারদানন্দজী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

এই ভাবে দিন কয়েক কাটিয়া গেলে জমি-জমা মাপ-জোখ করিবার জন্য কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তকে[১] আনানো হইল। কেদারবাবু আসিয়া কার্যভার লইলেন; এদিকে স্বামী সারদানন্দজীর দৈনন্দিন সৎপ্রসঙ্গ ও সম্পাদনা-কার্যাদি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। জমির মাপ হইয়া গেলে ভাগা-ভাগির প্রসঙ্গ আসিল। দলিল সমস্তই তখন কালী মামার হাতে ছিল ; প্রসন্নমামা উহা নিজের জিম্মায় রাখিতে চাহেন। সুতরাং প্রথমে দলিল ভাগেরই প্রশ্ন উঠিল ; কিন্তু স্বামী সারদানন্দজী রায় দিলেন, জমি ও দলিল একই সঙ্গে বিভক্ত হইবে। বড়মামার তাহা মনঃপূত হইল না ; তাই যে ঘরে বসিয়া কথা হইতেছিল, সারদানন্দজী সেখান হইতে একটু অন্যত্র যাইবামাত্র তিনি দলিলগুলি হস্তগত করিতে চাহিলেন। ইহাতে দুই ভ্রাতার কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। এমন সময় সারদানন্দজী আসিয়া পড়ায় বড়মামা বিফলমনোরথ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ গৃহস্থবাটীতে এইরূপ স্থলে যে প্রকার মনোমালিন্য ও গোলমাল হইয়া থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার বিন্দুমাত্র অল্পতা ছিল না।

১ ইনি পরে কোয়ালপাড়ায় আশ্রম স্থাপন করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী কেশবানন্দ নামে পরিচিত হন।

তথাপি দেখা গেল যে, সারদানন্দজী সব সময়েই সুমেরুবৎ অচল-অটল রহিয়াছেন, এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া শ্রীমাও এই সমস্তের উর্ধ্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মায়ের এই স্থিতপ্রজ্ঞত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাই সারদানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীরস্থির!"

ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা শেষ হইয়া যথাকালে সালিসী দলিল লিখা হইল। সালিস ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, তাজপুরের শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং জিবটার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র রায়। সারদাবাবু মামাদের দ্বারা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি কোন্ ঘরে থাকিতে চাহেন। শ্রীমা উত্তর দেওয়াইলেন, "ইঁদুরে গর্ত করে, সাপ সেই গর্তে বাস করে।" সারদাবাবু পুনর্বার বলিয়া পাঠাইলেন, জমি-জমা বাড়িঘর সবই ভাগ হইয়া যাইতেছে; এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার জন্য কোনও বাড়ি নির্দিষ্ট না থাকিলে তিনি জয়রামবাটীতে কিরূপে থাকিবেন? এবারেও শ্রীমা উত্তর দিলেন, "দুদিন প্রসন্নের ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।" আর প্রশ্ন না করিয়া সারদাবাবু মায়ের ব্যবহৃত গৃহখানি প্রসন্ন-মামার ভাগে ফেলিয়া দিলেন। দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল, যথাকালে কোতুলপুরে রেজিস্ট্রি হইল এবং মামারা নিজ নিজ সম্পত্তির দখল লইলেন। অনন্তর শ্রীমা যোগীন-মা ও গোলাপ-মাকে জানাইলেন যে, তিনি কলিকাতায় যাইবেন। তদনুসারে সারদানন্দজী যাত্রার দিন স্থির করিলেন—২১শে মে, শুক্রবার।

ঐদিন বিকালে চারিটার সময় গাড়িগুলি কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিবে এবং একটু বিশ্রামের পর বিষ্ণুপুর রওনা হইবে--ইহাই কথা ছিল। কিন্তু গাড়ি পৌঁছিতে দেরি হইয়া গেল। চারিখানি গাড়ির একখানিতে শ্রীমা ও মায়ের ভাইঝি রাধু ও মাকু, দ্বিতীয় খানিতে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা, তৃতীয় খানিতে স্বামী সারদানন্দজী এবং চতুর্থ খানিতে পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারী ও আশুতোষ নামক জয়রামবাটীর জনৈক ভক্ত। গাড়িগুলি সন্ধ্যার অনেক পরে রাত্রি আটটা-নয়টায় কোয়ালপাড়ায় আসিলে গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ির বলদ খুলিয়া দিয়া নিজেরাই টানিয়া চলিলেন এবং ক্রমে সকলে কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিলম্বের কারণ জানা গেল—শিহড়ের রাস্তায় নদীর ধারে গাড়ি দ'কে পড়িয়া গিয়াছিল। কোয়ালপাড়ায় শ্রীমাকে কেদারনাথের ঠাকুরঘরে এবং অপর সকলকে স্থানীয় বিদ্যালয়গৃহে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল। এত বিলম্ব হইবে বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণ বৈকালের জলযোগের জন্য সামান্য মিঠাই ও নারিকেলের সন্দেশ রাখিয়াছিলেন; রাত্রির আহারের কথা তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র উদিত হয় নাই। তাঁহারা নিশ্চিন্ত-

মনে মায়ের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অথচ কোয়ালপাড়াবাসীরাই ঐ ব্যবস্থা করিবেন ভাবিয়া কলিকাতাযাত্রীরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শেষে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে, তখন বয়স্কদের নির্দেশে ব্রহ্মচারীজী সদর দরজায় গিয়া হাঁক দিলেন, "বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।" তখনি সকলে আবার গাড়িতে উঠিয়া বিষ্ণুপুরের দিকে চলিলেন। পথে রাত্রি দশটায় তাঁহারা কোতলপুরে নামিলেন এবং এক ময়রার বাড়ি হইতে কোন প্রকারে গরম লুচি সংগ্রহ করিয়া শান্তিনাথের মন্দিরে রাত্রের আহার শেষ করিলেন। কোয়ালপাড়ার ভক্তদের এই অজ্ঞতাপ্রসূত অসৌজন্য সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবল শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা দীর্ঘকাল পরেও "অত রাত্রে ঠকঠকে নারকেলের সন্দেশ"—এই বলিয়া কোয়ালপাড়ার ভক্তদিগকে খোঁটা দিতেন। পরদিন সন্ধ্যার পর বিষ্ণুপুরে পেঁাছিয়া তাঁহারা রাত্রের ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

২৩শে মে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে; ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬), রবিবার, সকালে 'উদ্বোধন'-বাটীতে শ্রীমায়ের প্রথম শুভ-পদার্পণ হইল। শ্রীমাকে তাঁহার স্বগৃহে এবং স্বকক্ষে অধিষ্ঠিত দেখিয়া মাতৃবৎসল শ্রীমৎ সারদানন্দজী আপনার সকল শ্রম সার্থক বোধ করিলেন। এই বাটীর অবস্থান তেমন মনোরম না হইলেও অনেক বিষয়ে শ্রীমায়ের অনুকূল ছিল। সম্মুখের ভূমিতে তখন কোন কুটির ছিল না, উহা তখন উন্মুক্ত মাঠ, মধ্যে মধ্যে গৃহপালিত পশু বিচরণ করিত মাত্র। অদূরে ভাগীরথী; ছাদে উঠিলেই গঙ্গাদর্শন হয়। উত্তরে সুদূরে দৃষ্টিপাত করিলে দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষ নয়নপথে পতিত হয়। বাড়ি দেখিয়া ভক্ত-জননী উৎফুল্লহৃদয়ে সারদানন্দজীকে অজস্র আশীর্বাদ করিলেন।

বাড়ির দ্বিতলে ঠাকুরঘরে বেদীর উপর ঠাকুরকে বসানো হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা স্বহস্তে বেদীর জন্য সুন্দর রেশমী চন্দ্রাতপ করিয়া দিয়াছেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে শ্রীমায়ের জন্য একখানি নূতন খাট ও রাধুর জন্য তাহারই পার্শ্বে পুরাতন পালঙ্ক পাতা হইয়াছে। শ্রীমা ব্যবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিতও নয়।" তখন ঐ খাট এবং পালঙ্ক ঠাকুরঘরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথম রাত্রি ঐ ভাবেই কাটিল। পরদিন শ্রীমা বলিলেন যে, তাঁহার খাটে শুইতে অস্বস্তি বোধ হয়, কারণ তিনি রাধুকে ছাড়িয়া শুইতে পারেন না, রাধুও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কাজেই সারদানন্দজী শ্রীমায়ের অভিপ্রায়ানুসারে পূর্বোক্ত একই পালঙ্কে উভয়ের শয়নের ব্যবস্থা করাইলেন—খাট অন্যত্র অপসৃত হইল। এইরূপে ছোটবড় প্রতি কার্যে সারদানন্দজী আপনাকে মায়ের ভৃত্য জানিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমায়ের প্রতি পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর অপূর্ব ভক্তির এবং সারদানন্দজীর প্রতি শ্রীমায়ের অনুপম স্নেহের কিঞ্চিত পরিচয় না দিলে ইঁহাদের অলৌকিক সম্বন্ধের সমুচিত ধারণা হইবে না বলিয়া আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ঘটনাগুলির সময়নির্দেশ বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে অবান্তর, আর উহা সহজসাধ্যও নহে। সুতরাং সম্ভবস্থলে সময়ের আভাসমাত্র দিয়াই আমরা ঘটনাগুলি লিখিয়া যাইব।

সারদানন্দজী মহারাজ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাশীধামে আছেন, এমন সময় শ্রীমায়ের দেশ হইতে কলিকাতায় যাইবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "শরৎ কলকাতায় না থাকলে আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব? আমি সেখানে আছি, আর শরৎ যদি বলে, 'মা কয়েকদিন অন্যত্র যাচ্ছি', তাহলে আমি বলব, 'একটু থাম, বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে।' শরৎ ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে?" আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "শরৎ যে কদিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। শরৎই সর্বপ্রকারে পারে, শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" শ্রোতা মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) পারেন না?" মা উত্তর দিলেন, "না ; রাখালের সেভাব নয়। ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারে না। মনে মনে পারে, কি কাউকে দিয়ে করাতে পারে। রাখালের ভাবই আলাদা।" প্রশ্ন হইল, "বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ)?" মা বলিলেন, "না, সেও পারে না।" "মঠ চালাচ্ছেন যে?" "তা হোক। মেয়েমানুষের ঝঞ্ঝাট! দূর থেকে খবর নিতে পারে।" আর একদিন বলিলেন, "আমার ঝক্কি পোয়ানো বড় শক্ত, মা। শরৎ ছাড়া আমার ভার কেউ নিতে পারবে না।"

রাঁচির ভক্ত জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া (১৯১৮) শ্রীমাকে বলিলেন, "আপনাকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে যেতে এসেছি। বাড়িভাড়া ইত্যাদি সব ঠিক করেছি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ জানে?" ভক্ত বলিলেন, "না।" মা জবাব দিলেন, "তবে আমার যাওয়া হতে পারে না। শরৎ এসে ফিরে গেছে। আগে কলকাতায় যাই। সে যদি বলে তখন দেখা যাবে।" ভক্ত আবার বলিলেন, "মা, আমরা যে সব যোগাড় করেছি।" মা তাহাতে উত্তর দিলেন, "তোমরা আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন?" ভক্ত চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "দেখ, মা, ওরা মনে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া খুব সোজা। ওরা কেবল হুজুগ করতেই জানে। আর একবার তারা ঢাকাতে কাগজ ছাপিয়ে দিলে, আমি নাকি সেখানে যাব। অথচ আমি কিছুই জানি না! দু-চার দিন সবাই কবুতে পারে। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি।

সে আমার বাসুকি—সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে ; যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একদিন তাঁহার ভ্রাতা সৌরীন্দ্রনাথকে লইয়া দীক্ষার জন্য শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীমা তখন অসুস্থ ; তাই কিছুদিন পরে আসিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া জিদ করিতে লাগিলেন। তখন মা বলিলেন, "শরতের কাছে যাও ; সে যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে।" ভক্ত ধরিয়া বসিলেন, "আর কাউকে আমরা জানি না—আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে দিতেই হবে।" মা উত্তর দিলেন, "বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি। শরৎ যা করবে তাই হবে।" শ্রীমা এমন জোর দিয়া কথাগুলি বলিলেন যে, ভক্তদ্বয় বুঝিলেন, আদেশ মানা ভিন্ন উপায় নাই; অতএব সারদানন্দজীর নিকট যাইয়া দীক্ষার প্রস্তাব করিলেন। তিনিও বলিলেন যে শ্রীমায়ের অসুখের সময় দীক্ষা হওয়া অসম্ভব। তখন ভক্তদ্বয় শ্রীমায়ের সমস্ত কথা একে একে নিবেদন করিলেন। সব শুনিয়া সারদানন্দজী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "মা এ কথা বলেছেন? আচ্ছা তোমরা অমুক দিন প্রস্তুত হয়ে এসো।"

স্বীয় আরাধ্যা দেবীর নিকট এরূপ মান পাইলেও সারদানন্দজী নিতান্ত নিরভিমান ছিলেন। তিনি তখন 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছোট ঘরখানিতে দপ্তর খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় জনৈক ভক্ত আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। সারদানন্দজী ভক্তের দিকে চক্ষু তুলিয়া সকৌতুকে বলিলেন, "এত বড় প্রণামটা যে করছ, এর মানে কি বল তো?" ভক্ত কহিলেন, "সেকি, মহারাজ, আপনাকে প্রণাম করব না তো করব কাকে?" দৈন্যের প্রতিমূর্তি শরৎ মহারাজ প্রত্যুত্তর দিলেন, "তুমি যাঁর কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।"

শরৎ মহারাজ আপনাকে মায়ের বাড়ির দ্বারী বলিয়াই মনে করিতেন। এই স্বেচ্ছায় গৃহীত দারোয়ানের কার্য কিন্তু সব সময় সুখকর ছিল না। একদিন বরিশালের ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় মাতৃদর্শনমানসে হ্যারিসন রোড হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে ঘর্মাক্ত-কলেবরে দুই-তিনটার সময় উদ্বোধনে উপস্থিত হইলেন। তাহার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্বে মাতাঠাকুরানী বাহির হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইতে দেখিয়া দ্বারী সারদানন্দজী বলিলেন, "এখন মার কাছে যেতে দেব না ; তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।" ভক্ত ঝোঁকের মাথায় তাঁহাকে একপার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মা কি কেবল একা আপনার?" কিন্তু উপরে যাইয়া কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ফেরবার

সময় দেখা না হলেই মঙ্গল।” শ্রীমাকেও নিজের অন্যায়ের কথা জানাইলেন। তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, ছেলের কোন দোষ নাই, এবং তাঁহার ছেলেরাও অপরাধ গ্রহণ করেন না। তথাপি সলজ্জভাবেই নামিতে নামিতে ভক্ত দেখিলেন, সারদানন্দজী ঠিক একই স্থানে একই ভাবে পাহারায় নিযুক্ত আছেন। তিনি প্রণাম করিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলে সারদানন্দজী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়?”

নূতন বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীমা পানি-বসন্তে আক্রান্ত হইলেন।[১] তখন তাঁহাকে বাগবাজার স্ট্রীটের এক শীতলার পূজারীর চিকিৎসাধীন রাখা হয়। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আসিতেন এবং মাতাঠাকুরানী তাঁহাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেন ও পদধূলি লইতেন। একদিন জনৈক সেবক প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বিনয়প্রদর্শন অশোভন—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হয়তো চরিত্রহীন। শ্রীমা সহজভাবে উত্তর দিলেন, “কি জান?—হাজার হোক ব্রাহ্মণ। ভেকের মান দিতে হয়, ঠাকুর তো আর ভাঙ্গতে আসেননি!” রোগশয্যা ছাড়িয়া আরোগ্যস্নান করিয়া শ্রীমা স্বামী শান্তানন্দজীকে বলিলেন, “আমার শরীর খুব দুর্বল, নিজে উপোস করতে পারব না। তুমিই আমার হয়ে শীতলার উপোস কর, আর তাঁর পুজো দিয়ে এস।” তদনুযায়ী শান্তানন্দজী চিৎপুরের নিকট দেবীর পূজা দিয়া আসিলেন।

আরোগ্যলাভের পর শ্রীমাকে গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত ললিত-বাবুর গাড়িতে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এইরূপে তিনি পার্শ্বনাথের মন্দির, রামরাজাতলা, হাওড়ায় নবগোপালবাবুর গৃহ প্রভৃতি স্থান এবং দুই বার (২১শে অগস্ট ও ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন) কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যান। ১২ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে ‘পাণ্ডবগৌরব’ অভিনয়কালে দেবীমূর্তির আবির্ভাব দেখিয়া এবং “হের হরমনোমোহিনী” ইত্যাদি সুললিত গান শুনিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ঐ অভিনয়ে গিরিশবাবু কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন।

এখন হইতে শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা মায়ের বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ছোটমামীর সহিত ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে শুইতেন। ঐ ঘরেই শ্রীমা তেল মাখিতেন ও পান সাজিতেন। দক্ষিণের ঘরখানি তখন ভোজনগৃহরূপে

১ স্বামী শান্তানন্দের স্মারকলিপিতে আছে যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তিনি কাশী হইতে শ্রীমায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, “মায়ের বসন্ত হয়েছে। তাঁকে ছুঁয়ো না।”

ব্যবহৃত হইত। যোগীন-মা তখন দুইবেলাই আসিতেন—আসিয়া ভাঁড়ার বাহির করিতেন ও কুটনা কুটিতেন।

এই বাড়িতে শ্রীমায়ের আগমনের পর একবার ১নং লক্ষ্মী দত্ত লেনের দত্তগৃহে শ্রীযুক্ত যতীন মিত্রের কীর্তন হয়। ঐ উপলক্ষে শ্রীমা ও ভক্তগণ আমন্ত্রিত হন। মিত্র মহাশয় পেশাদার কীর্তনিয়া না হইলেও সুগায়ক ছিলেন। সেদিন মাথুর-কীর্তন হইতেছিল—উহা সবটাই বিরহে পূর্ণ। কীর্তনের ভাব ও সঙ্গীতের মাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিকের ভিতরে স্ত্রীভক্তদের মধ্যে উপবিষ্ট শ্রীমা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে যতীনবাবুর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ট্রেনে অন্যত্র যাইতে হইবে, তাই তিনি বিরহের মধ্যেই গান সমাপ্ত করিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভাবাবিষ্টা শ্রীমা গোলাপ-মার দ্বারা বলাইলেন যে, কীর্তনটি মিলনে শেষ করা উচিত। যতীনবাবু মিলন গাহিয়া গান সমাপ্ত করিলেন এবং উদ্দেশ্যে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এদিকে মিলনগানের ভাব, তানলয় ও স্বরমাধুর্যে এমন এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, শ্রীমা গানের শেষে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। এইরূপ ভাবাবস্থার সহিত সুপরিচিতা বুদ্ধিমতী গোলাপ-মার বুঝিতে বাকি রহিল না, সুতরাং তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং নামমাত্র জলযোগান্তে গাড়িতে তুলিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গাড়িতে উঠিবার সময়ও মায়ের দেহ স্ববশে নাই—পা এখানে পড়িতে ওখানে পড়িতেছে; সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে হইল। উদ্বোধনবাটীতে পৌঁছিলে তাঁহাকে দুইজনে ধরিয়া ঠাকুর-ঘরে লইয়া গেলেন। মা সেখানেও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, চক্ষের পলকও পড়ে না। এই অবস্থা দেখিয়া গোলাপ-মা বলিলেন, "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর আজ এই দেখলুম।" সে রাত্রে কোন প্রকারেই তাঁহার মন বাহ্য ভূমিতে নামিতেছে না দেখিয়া ভক্তেরা পরামর্শ-ক্রমে স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে 'মা' বলিয়া আহ্বান করাই কর্তব্য; কারণ সন্তানের কল্যাণার্থে অবতীর্ণা জননী ছেলের ডাক অবশ্যই শুনিবেন। তদনুসারে জনৈক সেবক তাঁহার কানের কাছে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। উহার ফলে অঙ্গে স্পন্দন দেখা দিল; ক্রমে তিনি স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কেন, বাবা!" ভক্তগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অবশেষে শ্রীমা যথাবিধি ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

সারদানন্দজীর তখন বহু কার্য—মায়ের সেবা, রামকৃষ্ণ-মঠ মিশনের সম্পাদকীয় কর্তব্য, ঋণশোধ প্রভৃতির জন্য 'লীলাপ্রসঙ্গ'-প্রণয়ন, মায়ের দর্শনে আগত স্ত্রীপুরুষ ভক্তদিগকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়ন ইত্যাদি। ইহারই মধ্যে

তিনি আবার মায়ের আদেশে তাঁহাকে সন্ধ্যার পরে ভজনসংগীত শুনাইতেন। সন্ধ্যারতির পর জপাদি সারিয়া মা উপর হইতে কোন কোন দিন বলিয়া পাঠাইতেন, "শরৎকে বল দুটো গান করতে।" নীচে বৈঠকখানায় তানপুরা ও ডুগি তবলা থাকিত ; আদেশ পাইলেই নিরলস সুকণ্ঠ গায়ক গান ধরিতেন— "একবার এস মা, এস মা," "শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে," "নিবিড় আঁধারে মা তোর", "নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে," "দনুজদলনী নিজজন প্রতিপালিনী শ্রীকালী", ইত্যাদি।

সেবারে প্রায় ছয় মাস ঐ বাটীতে কাটাইয়া শ্রীমা ৩০শে কার্তিক (১৬ই নভেম্বর, ১৯০৯), মঙ্গলবার জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরই (১৪ই ডিসেম্বর) উদ্বোধন-বাটীর প্রসারের জন্য সারদানন্দজী পার্শ্ববর্তী জমিখণ্ড (১ কাঠা চারি ছটাক) ১৮০০, টাকায় সংগ্রহ করিলেন। পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে উহাতে আরও কয়েকখানি কক্ষ নির্মিত ও পূর্বের বাড়ির সহিত সংযোজিত হইয়া বর্তমানে সম্পূর্ণ মায়ের বাটীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীমা এবারেও জয়রামবাটীর পথে কোয়ালপাড়ায় নামিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহার পথে পদ্মফুল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহার উপর দিয়া চলিয়া বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং পরে স্নান ও কিছু জলযোগের পর জয়রামবাটী যাইলেন। সাত-আট মাস পরেই তিনি পুনর্বার কোয়ালপাড়া হইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং কেদারবাবুর মাকেও সঙ্গে আনিলেন। তখনই শুনিতে পাওয়া গেল যে, তাঁহার দাক্ষিণাত্য-গমনের কথা হইতেছে।

এবারে তিনি কলিকাতায় নিজ বাটীতে অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিলেন। তখন খুব শীত পড়িয়াছে ; তাই ভক্তগণ শ্রীমাকে গরম গেঞ্জি পরাইতে চাহিলেন। তদনুসারে পূজনীয় শরৎ মহারাজের প্রদত্ত দশ টাকায় বিলাতী দোকান হইতে একটি ভাল গেঞ্জি আনানো হইল। শ্রীমা উহা পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন এবং তিন দিন ব্যবহার করিলেন ; কিন্তু চতুর্থ দিন মনের ভাব খুলিয়া বলিলেন, "মেয়েমানুষের কি জামা পরতে আছে, বাবা? তবু তোমাদের মন রাখতে তিন দিন পরেছি।" অবশেষে উহা খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। আর গায়ে দিলেন না। জামা না পরিলেও তিনি বগলের নীচে ছোট একটি গাঁট দিয়া এমনভাবে কাপড় পরিতেন যাহাতে সমস্ত দেহই সুন্দর আবৃত থাকিত। বস্তুতঃ সামর্থ্য থাকিতেও বিলাসিতার প্রশ্রয় না দিয়া শহরের মধ্যেও তিনি যেভাবে পল্লীর সরলতা রক্ষা করিতেন, তাহাতে চক্ষু জুড়াইত।

দাক্ষিণাত্যে

নানা কারণে শ্রীমায়ের তীর্থযাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতেছিল। এদিকে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসুর জননীর ঐ ইচ্ছা দীর্ঘকাল যাবৎ মনে উদিত হইতেছিল ; বিশেষতঃ শ্রীমাকে একবার তাঁহাদের উড়িষ্যার জমিদারি কোঠারে লইয়া গিয়া কিছুদিন রাখার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বলবতী ছিল। অতএব স্থির হইল যে. ১৩১৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীমা কোঠারে যাইবেন, এবং তাঁহার সহযাত্রী হইবেন গোলাপ-মা, রামকৃষ্ণবাবুর মা ও খুড়ী-মা, ছোটমামী ও রাধু, এবং শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ), কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ), রামকৃষ্ণবাবু প্রভৃতি পুরুষ ভক্তগণ। শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল এবং পুরুষগণ মধ্য শ্রেণীতে উঠিলেন। ভদ্রক স্টেশনে শ্রীমৎ প্রেমানন্দ মহারাজের ভ্রাতা তুলসীরামবাবু যানবাহনাদিসহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভদ্রকের কাছারিবাড়িতে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাইলেন এবং পরে পালকি প্রভৃতি দ্বারা আট-নয় ক্রোশ দূরবর্তী কোঠারে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে স্বামী অচলানন্দও আসিয়া যোগ দিলেন। এখানে ইঁহারা প্রায় দুই মাস বেশ আনন্দে ছিলেন ; কিন্তু পরের বাড়িতে দীর্ঘকাল আবদ্ধ অবস্থায় থাকায় ছোটমামীর পাগলামি বৃদ্ধি পাইল ; সুতরাং শ্রীমা তাঁহাকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিলেন।

দলের মধ্যে শ্রীমায়ের যতগুলি দীক্ষিত সন্তান ছিলেন, তাঁহাদের একজন দুই মাস যাবৎ মাছ খাইতেন না। তাঁহার যুক্তি এই যে শ্রীমা যখন খান না, তখন তিনিও খাইবেন না। কিন্তু মা একদিন জোর করিয়াই তাঁহার পাতে মাছ দিয়া খাইতে বলিলেন। ভক্ত তখনকার মতো সে আদেশ পালন করিলেন , কিন্তু বিকালে ঐ বিষয়ে বিচারের অবতারণা করিয়া শ্রীমাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কেন খান না ?" মা উত্তর দিলেন, "আমি কি একমুখে খাই ? বোকামি করো না—আমি বলছি খাবে।" সেদিন হইতে ভক্তের দ্বিধা দূরীভূত হইল।

শ্রীমা উপস্থিত থাকায় সেবার ঘটা করিয়া সরস্বতীপূজা হইল। পূজার দিনে সস্ত্রীক রামবাবু মায়ের নিকট দীক্ষা লইলেন ; শিলং হইতে আগত তিনজন ভক্তেরও—শ্রীসুরেন্দ্রকান্ত সরকার, শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র ও শ্রীবীরেন্দ্র-কুমার মজুমদারের দীক্ষা হইল। কোঠারের পোস্ট মাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাচক্রে যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন ; অধুনা

তিনি বিশেষ অনুতপ্ত ও স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র হইয়া সকলের নিকট পরামর্শ চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তদের মুখে শ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বিধান দিলেন যে, সরস্বতীপূজার পূর্বদিন দেবেন্দ্রবাবু রামবাবুদের গৃহদেবতা 'রাধাশ্যামচাঁদজীর সম্মুখে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত সমাপনান্তে গায়ত্রী ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেই পুনঃ ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তদনুসারে দেববিগ্রহের পূজারীর সাহায্যে দেবেন্দ্রবাবুর শুদ্ধিক্রিয়া হইয়া গেল এবং পরে তিনি কৃষ্ণলাল মহারাজের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পাইলেন। ব্রাহ্মণত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মুণ্ডিতমস্তক দেবেন্দ্রবাবু শ্রীমাকে প্রণাম করিলে মাও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করিলেন। সরস্বতীপূজার দিন দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা এবং একখানি প্রসাদী কাপড় পাইলেন।

পূজার রাত্রে যাত্রাভিনয় হইল। সে যাত্রায় কথোপকথন আদৌ নাই—আছে শুধু গীত ও নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার বেশধারী দুইটি বালকের মধুর কণ্ঠ ও নৃত্যকলায় শ্রীমা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশে পরের রাত্রেও ঐ অভিনয় হইয়াছিল। পূজাও দুই দিন হইযাছিল। তৃতীয় দিন প্রতিমাবিসর্জন হয়।

কোঠারের একদিনের ঘটনা এখানে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমা দ্বিপ্রহরে স্বল্প বিশ্রামের পর খিড়কি মহলে বসিয়া জনৈক সেবকের দ্বারা পত্রাদি লিখাইতেন। সরস্বতীপূজার পরে একদিন লেখক যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীমা পা মেলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন ; কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইলেও দৃষ্টি বহির্জগতে নাই। দশ-পনর মিনিট ঐ ভাবে থাকিয়া তিনি যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন, "কতক্ষণ এসেছ?" সেবক বলিলেন, "বেশীক্ষণ নয়।" মা নিজের ভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "বার বার আসা—এর কি শেষ নেই? শিবশক্তি একত্রে; যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—নিস্তার নেই! তবু লোকে বোঝে না।" এই ভাবের কথাই অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীমা এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, জীবকল্যাণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয় ; কারণ জীব যে তাঁহারই। এই সঙ্গে তিনি নিজের এক অনুভূতির কথাও বলিলেন। একসময় তিনি দেখিয়া-ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই সব হইয়া রহিয়াছেন—কানা, খোঁড়া সবই তিনি , জীবের কষ্ট তাঁহারই; তাই শ্রীমাকেও সে কষ্টনিবারণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই অসীম করুণার ভাব যখন তাঁহার কোমল হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন নিদ্রা বিশ্রাম সবই ঘুচিয়া যায় ; তখন মনে হয়, সব ছাড়িয়া জীবের কল্যাণচিন্তাই তাঁহার কর্তব্য। তাই অপরেরা যখন বিশ্রাম লইতেছে, তখনও তাঁহার অবকাশ নাই। কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অকস্মাৎ

চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

কোঠার হইতে শ্রীমায়ের রামেশ্বরদর্শনে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তথায় গমনের প্রস্তাব উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাব। আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন।" তীর্থযাত্রার সংকল্প স্থিরীকৃত হইলে কলিকাতায় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ এবং মাদ্রাজে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সবিশেষ জানানো হইল। শরৎ মহারাজের অনুমোদনপত্র শীঘ্রই আসিল। রামকৃষ্ণানন্দজীও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সর্বপ্রকার দায়িত্বগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া শ্রীমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে শ্রীমায়ের সহিত কৃষ্ণলাল মহারাজ, শুকুল মহারাজ, গোলাপ-মা, রামবাবুর মা ও খুড়ীমা, রাধু এবং পূর্বোক্ত সেবকের যাওয়া স্থির হইল। বিদায়ের পূর্বে শ্রীমা ছোটমামীকেও দেশ হইতে আনাইয়া লইলেন; কোয়ালপাড়ার কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের জননীও সঙ্গে চলিলেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেলে ইঁহারা মাঘ মাসের শেষে একদিন দক্ষিণগামী মাদ্রাজ-মেলে উঠিয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণবাবু তাঁহাদের সহিত খুরদা-রোড পর্যন্ত যাইয়া পুরী চলিয়া গেলেন।

খুরদা-রোডের পরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গাড়ি বিস্তীর্ণ চিল্কা হ্রদের ধারে ধারে চলিল। তখন প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে হ্রদের বক্ষে বীচিমালা অপূর্ব ছন্দে নৃত্য করিতেছে। সদ্যোজাগ্রত বকসমূহ আহারান্বেষণে স্বল্প জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথবা বিচিত্র মাল্যাকারে নীলাকাশে উড়িতেছে। হ্রদের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। উহাদের আশে-পাশে নীলকণ্ঠাদি বিহগকুল উড়িয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমা নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং বালিকার ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রদবক্ষ হইতে নানা আকারের বাষ্পরাশি উঠিতে লাগিল। গাড়ি হু হু করিয়া ছুটিয়াছে, আর যাত্রীরা জানালা দিয়া হ্রদের এই সৌন্দর্য এবং পরে উভয় পার্শ্বের বৃক্ষাদিসমাকুল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। এই-ভাবে আন্দাজ আটটার সময় তাঁহারা গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে উপনীত হইলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর ব্যবস্থানুসারে কেলনার কোম্পানীর বাঙালী ম্যানেজার স্টেশনে উপস্থিত হইয়া সমাদরপূর্বক সকলকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। অপরাহ্ণে সেই গৃহে অনেক তদ্দেশীয় ভক্তের সমাগম হইল। সকলে শ্রীমায়ের সম্মুখে কদলী ও নারিকেলাদি ফল স্থাপনপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। যাত্রিবৃন্দ পরদিন প্রাতে আবার ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন। অপরাহ্ণে ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্য-নিবাস ওয়ালটেয়ার শহর চক্ষে পড়িল। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ভবনগুলি দেখিয়া শ্রীমা সোল্লাসে বলিলেন, "দেখ দেখ. ঠিক যেন ছবির মতো।" পরদিবস দ্বিপ্রহরে তাঁহারা মাদ্রাজে পৌঁছিলেন।

মাদ্রাজ স্টেশনে শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গী-দিগকে লইয়া যাইবার জন্য সদলবলে উপস্থিত ছিলেন এবং ময়লাপুর অঞ্চলে তাঁহাদের জন্য একখানি দ্বিতল বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। রেলগাড়ি হইতে অবতরণের পর জয়ধ্বনি ও গম্ভীর হর্ষসহকারে মাকে ঐ বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি এখানে প্রায় একমাস ছিলেন। এই সময়-মধ্যে তাঁহাকে নগরের বহু দ্রষ্টব্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় প্রতি সায়াহ্নে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। এইরূপে একদিন মৎস্যাগার দেখিতে যান, উহা তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত কোন দিন সমুদ্রতীর, কোন দিন কপালীশ্বর শিবের মন্দির বা বৈষ্ণবদের পার্থসারথির মন্দির, কোন দিন কেল্লা প্রভৃতি বহু স্থান তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। কেল্লা দেখিতে যাইয়া তিনি সর্বপ্রথম রিক্সা গাড়িতে চড়েন। তাঁহার বাসগৃহে আসিয়া নারী-বিদ্যালয়ের মহিলারা একদিন তামিল ভজন শুনাইয়াছিলেন এবং কুমারীরা সুন্দর বেহালা বাজাইয়াছিলেন।

মাদ্রাজে অনেক দক্ষিণদেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীভক্ত মায়ের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ঐক্যবশতই হউক অথবা মাতাঠাকুরানীর ভাবপ্রকাশের অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রভাবেই হউক, অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীতই তিনি মন্ত্র, জপপ্রণালী ও ধ্যানের প্রক্রিয়া প্রভৃতি দীক্ষিত-দিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তবে দীক্ষা ভিন্ন অন্য সময় ভাববিনিময়ের জন্য দোভাষীর প্রয়োজন হইত।

কিছুদিন পরে রামেশ্বর-দর্শনাভিলাষে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলালদাদা মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে যখন স্থির হইয়া গেল যে, সকলে মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর দর্শনে যাত্রা করিবেন, ঠিক তখনই রামকৃষ্ণবাবুর খুড়ী-মা অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাত্রা আপাততঃ স্থগিত রহিল। পরে যখন দেখা গেল যে, নিরাময় হওয়া সময়সাপেক্ষ, তখন সেখানেই রোগিণীর শুশ্রূষাদির বন্দোবস্ত করিয়া বাকি সকলে রাত্রের গাড়িতে মাদুরাভিমুখে চলিলেন। শশী মহারাজের সুব্যবস্থায় সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইলেন এবং মাতাঠাকুরানীর সেবা যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তাহা দেখিবার জন্য তিনি স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। প্রত্যূষে মাদুরায় পৌঁছিয়া তাঁহারা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

মাদুরা নগর বৈকৈ নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও বিশাল; স্থাপত্যনৈপুণ্যে সমগ্র ভারতে উহার স্থান অতি উচ্চে। উহার গোপুরম্ বা প্রবেশদ্বারগুলি উচ্চতা, গাম্ভীর্য ও শিল্পকলায় পথচারীর নয়ন-মন হরণ করে এবং মন্দিরের সর্বত্র ক্ষোদিত পৌরাণিক ঘটনাবলী ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রকে দীর্ঘকাল মুগ্ধ করিয়া রাখে। মন্দিরমধ্যে সুন্দরেশ্বরস্বামী

নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং ৺মীনাক্ষী দেবীর মূর্তি বিরাজিত। এমন নয়নাভিরাম দেবীমূর্তি ভারতে বড় বিরল। ৺সুন্দরেশ্বর ও ৺মীনাক্ষীর লীলাবিলাসের জন্য মন্দিরমধ্যে কতকগুলি মণ্ডপ আছে; তন্মধ্যে সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ ও বসন্ত-মণ্ডপ সুপ্রসিদ্ধ। মন্দির-পার্শ্বে প্রস্তরনির্মিত শিবগঙ্গা নামক জলাশয় আছে। শ্রীমা প্রভৃতি সকলে অপরাহ্ণে উহাতে স্নানান্তে দেবদর্শনাদি করিলেন এবং স্থানীয় প্রথানুসারে শিবগঙ্গার তীরে নিজ নিজ নামে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাদুরায় অবস্থান-কালে তাঁহারা তিরুমল নায়কের প্রাসাদ এবং তেপ্পাকুলম নামক সুবৃহৎ (১০০০ ফুট×৯৫০ ফুট) সরোবর প্রভৃতিও দেখিয়াছিলেন। রাজভবনটি এখন জজের আদালতরূপে ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদের বিশাল ছাদ একশত পঁচিশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই সকল দেখিয়া শ্রীমা হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "কি সব ঠাকুরের লীলা!"

মাদুরা হইতে ইঁহারা রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিয়া দ্বিপ্রহরের গাড়িতে মণ্ডপম্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; সেখান হইতে স্টীমার-যোগে সমুদ্রের খাড়ি অতিক্রম করিয়া পাম্বান দ্বীপে পদার্পণ করিলেন।[১] বন্দর হইতে পুনর্বার রেলগাড়িতে চড়িয়া রামেশ্বর তীর্থে পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। সেখানে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহারা পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বরের সংগৃহীত একখানি ভাড়াবাড়িতে উঠিলেন। রাত্রে ৺রামেশ্বরকে শুধু উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যাত্রীরা পরদিন প্রত্যূষে সমুদ্রস্নানান্তে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ৺রামেশ্বরের প্রস্তরময় মন্দিরটি বিশালত্বে বোধ হয় অদ্বিতীয়। গর্ভমন্দিরকে ঘিরিয়া পর পর তিনটি মহলে তিনটি পরিক্রমা রহিয়াছে। বাহিরের মহলে অবস্থিত পরিক্রমাটি প্রস্থে ১৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪২ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৩৯৫ ফুট লম্বা। মধ্যেরটি যথাক্রমে ৫০০ ফুট ও ৩০০ ফুট। এইরূপে তিন মহলে বিভক্ত মন্দিরের প্রবেশপথে অত্যুচ্চ গোপুরম্। এই বিরাট স্থানের প্রতি অংশ সুন্দর ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরের প্রত্যেক মহলে দেবতার বিবিধ লীলা প্রস্তরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। বাহিরের মহলদ্বয় অতিক্রম করিয়া ৺রামেশ্বরের মহলে প্রবেশ করিলে প্রথমে দেখা যায় প্রায় একতলা সমান উচ্চ প্রস্তরের বৃষ বা নন্দী। তাহার নিকটে এক উচ্চ স্তম্ভ। ৺রামেশ্বর বালুকাময় লিঙ্গমূর্তি—গর্ভমন্দিরে অবস্থিত। লিঙ্গটি প্রস্তরবৎ কঠিন নহে বলিয়া উহাকে সর্বদা সুবর্ণমুকুটে ঢাকিয়া রাখা

১ বর্তমান খাড়ির উপর রেলসেতু নির্মিত হওয়ায় আর স্টীমারে পার হইতে হয় না। দ্বীপটি রামেশ্বর দ্বীপ নামেও পরিচিত।

হয়; স্নানজল ঐ আবরণের উপর ঢালা হয়। তবে অতিপ্রাতে অনাবৃত মূর্তিরও দর্শন পাওয়া যায়। 'রামেশ্বরের প্রাত্যহিক স্নান ও ভোগে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়; যাত্রীরাও অর্থের বিনিময়ে মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পূজার জন্য গঙ্গাজল লইতে পারেন।

পাম্বান দ্বীপ ও তদুপরি অবস্থিত 'রামেশ্বরের মন্দির তখন রামনাদের রাজার অধীনে ছিল। তিনি পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীজীর শিষ্য। সুতরাং তিনি মন্দিরের কর্মচারীদিগকে তারযোগে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, "আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন—সব ব্যবস্থা করবে।" গর্ভমন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও রাজার পূর্বপ্রাপ্ত আদেশানুসারে মন্দির-কর্মচারিগণ শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে সাদরে ভিতরে লইয়া শিবলিঙ্গের কনকাবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন এবং শ্রীমা মনের সাধে 'রামেশ্বরকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া রামকৃষ্ণানন্দজী কর্তৃক সংগৃহীত একশত আট সুবর্ণ-বিল্বপত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। রামেশ্বরে তাঁহারা ত্রিরাত্র ছিলেন, ঐ সময়ে প্রতিদিন যথারীতি পূজা ও আরাত্রিক দর্শন করিতেন। তৃতীয় দিন শ্রীমা মন্দিরে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেন, পাণ্ডাদের পুঁথি হইতে 'রামেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণান্তে তাঁহাদিগকে ভোজন করান এবং প্রত্যেককে একটি করিয়া জলের ঘটি দেন। পুরাণকথা শ্রবণকালে হাতে পান, সুপারি ও পয়সা লইয়া বসিতে হয় এবং পাঠসমাপনান্তে উহা কথকঠাকুরকে দান করিতে হয়। শ্রীমা এই সকল আচার যথাযথ পালন করিয়াছিলেন।

রামনাদের রাজা কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহার মন্দির-সংলগ্ন রত্নাগারটি খুলিয়া শ্রীমাকে দেখান এবং কোন কিছু চাহিলে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপহার দেন। কর্মচারীদের মুখে ইহা শুনিয়া শ্রীমা ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার চাহিয়া লইবার মতো কি জিনিস সেখানে থাকিতে পারে। তাই বলিলেন, "আমার আর কী প্রয়োজন? আমাদের যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করেছে।" পরক্ষণেই তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন মনে করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।" রাধুকে বলিলেন, "দেখ্, তোর যদি কিছু দরকার হয়, নিতে পারিস।" শ্রীমা ভদ্রতা হিসাবে ঐরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু যখন কোষাগার খুলিতেই হীরা-জহরতের সব জিনিস ঝকমক করিয়া উঠিল, তখন তাঁহার বুক কেবলই দুরদুর করিতে থাকিল, আর তিনি ঠাকুরের শ্রীপদে আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, "ঠাকুর, রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।" ঠাকুর সে মিনতি শুনিলেন—সব দেখিয়া রাধু বলিল, "এ আবার কি নেব? ওসব আমার চাই না। আমার লেখবার পেনসিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেনসিল কিনে দাও।" শ্রীমা এইকথা শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে

আসিলেন এবং রাস্তার দোকান হইতে দু-পয়সার একটা পেনসিল কিনিয়া রাধুকে দিলেন।

শ্রীমায়ের তীর্থযাত্রার সঙ্গী ও সেবক স্বামী ধীরানন্দজী একদিন সরলা দেবীকে বলিয়াছিলেন যে, অনাচ্ছাদিত শ্রীরামেশ্বর-লিঙ্গকে দর্শন করিয়া শ্রীমা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।" কাছে যে ভক্তেরা ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ও কি বললে?" মা তখন আত্মসংবরণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।" শ্রীরামেশ্বরাদি দর্শনান্তে তিনি কলিকাতায় ফিরিলে কোয়ালপাড়ার কেদারবাবু প্রশ্ন করিলেন, "রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?" মা উত্তর দিলেন, "বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।" সদা উৎকর্ণা গোলাপ-মা তখন পাশের বারান্ডা দিয়া যাইতেছিলেন। কথাটা কানে উঠিবামাত্র তিনি সোৎসাহে চাপিয়া ধরিলেন, "কি বললে, মা?" মা একটু চমকিত হইয়া উত্তর দিলেন, "কই, কি বলব? বলছি এই—তোমাদের কাছে যেমন শুনেছিলুম, ঠিক তেমনটিই দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।' গোলাপ-মাও নাছোড়বান্দা হইয়া বলিলেন, "না, মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কি হবে? কেমন গো কেদার?" বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন এবং সকলকে উহা জানাইয়া দিলেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, যিনি ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র-প্রেয়সী, জন্মদুঃখিনী সীতাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া সমুদ্রতীরে বালুকানির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন, তিনিই পুনঃ কলিতে সর্বংসহা, অশেষ কল্যাণময়ী ভক্তজননীরূপে অবতীর্ণা হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে এত দীর্ঘকাল পরে একইরূপে থাকিতে দেখিয়া সহসা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া ত্রেতাযুগে উপনীত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার সেই সময়কার অনুভব অজ্ঞাতসারে কতকটা স্বগতোক্তির মতো এইভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

রামেশ্বর হইতে রেলপথে চৌদ্দ-পনর মাইল দূরে দ্বীপের অপর প্রান্তে ধনুষ্কোটি-তীর্থে শ্রীমায়ের যাওয়া হয় নাই। সেখানে সোনা বা রূপার তীর-ধনুক দিয়া সমুদ্রের পূজা করিতে হয় বলিয়া শ্রীমা দুজন সেবককে পূজার জন্য রূপার তীর-ধনুকসহ পাঠাইয়া দেন।

রামেশ্বর হইতে সকলে মাদুরায় ফিরিয়া আসিয়া একদিন তথায় ছিলেন; তারপর তাঁহারা মাদ্রাজে আসেন। মাদ্রাজে কয়েক দিন থাকার পরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি আসিয়া পড়িল। শ্রীমায়ের অবস্থান হেতু সে বৎসর উৎসবে বেশ একটা জমাট ভাব দেখা গিয়াছিল। ঐ দিবস কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। উৎসবান্তে তিনি ১০ই চৈত্র বাঙ্গালোরে গমন করেন।

বাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ শহরের যে অংশে অবস্থিত তাহা তখন অতি

সুন্দর ও নির্জন ছিল। বর্তমানে নগরে গৃহাদির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রস্তরনির্মিত আশ্রমবাটীর নীরবতা অব্যাহত রহিয়াছে। আশ্রমভূমি বহু ফল-ফুলের বৃক্ষে সুশোভিত। সম্মুখে প্রশস্ত বুল টেম্পল রোড; উহা অদূরে অবস্থিত সুবিদিত বাসভনগুডি বা বৃষভ-মন্দিরে গিয়াছে। মন্দিরে সুবৃহৎ বৃষভমূর্তি—অন্য কোন দেবতা নাই। সেখানে পূজাদির জন্য প্রত্যহ শত শত যাত্রীর সমাগম হয়। শ্রীমাকে এবং তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে আশ্রমবাটীতে থাকিতে দেওয়া হইল এবং ভক্ত ও সাধুবৃন্দ তাঁবু খাটাইয়া বাহিরে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের শুভাগমন-সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় প্রত্যহ দলে দলে ভক্ত আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনীত ফুল এক এক দিন স্তূপাকার হইয়া উঠিত।

বাঙ্গালোরে মা প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী তাঁহাকে গাড়ি করিয়া আশ্রমের পশ্চাতে অদূরবর্তী গবিপুরে কেভ্ টেম্পল (গুহা-মন্দির) পর্যন্ত বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমা গাড়ি হইতে নামিয়া মন্দিরে দর্শনাদি করিলেন এবং আবার গাড়িতে চড়িয়া আশ্রমে ফিরিলেন। যাইবার সময় আশ্রম-প্রাঙ্গণে আশ্রমবাসীরা ছাড়া প্রায় কেহ ছিল না; কিন্তু ফিরিবার সময় ফটকে পৌঁছিতেই দেখা গেল, আশ্রমের সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড জমি লোকাকীর্ণ। মায়ের গাড়ির শব্দ পাইয়াই তাহারা নিমেষে যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই ভূতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। সে দৃশ্য দর্শনে অভিভূতা মা সেখানেই গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং অভয়মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ—অথচ সে শান্তির মধ্যেও যেন অজ্ঞাতে কি এক শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, যাহার স্পন্দনে সকলে বিহ্বল! একটু পরে শ্রীমা ধীরে আশ্রমবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বড় ঘরে উপবেশন করিলেন; ভক্তগণও আসিয়া বসিলেন। এখানেও সেই মৌনব্যাখ্যান; অথচ তাহারই ফলে সমস্ত সংশয়ের নিরাস। সেই নিবিড় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীমা পার্শ্ববর্তী বিশুদ্ধানন্দজীকে বলিলেন, "এদের ভাষা তো জানি না; দুটি কথা বলতে পারলে এরা কত শান্তি পেত।" বিশুদ্ধানন্দজী উহা ভক্তদিগকে ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বলিলেন, "না, না. এই বেশ; এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে—এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন দরকার নেই।" ধন্য জননী. আর ধন্য তোমার সন্তানগণ!

আর এক সায়াহ্নের কথা। আশ্রমের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রমেরই জমির উপর এক ঈষদুচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা একদিন অপর দুই-একজনের সঙ্গে উহার উপরে উঠিয়া আপনমনে সূর্যাস্ত দেখিতেছিলেন, এমন

সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট ঐ সংবাদ পেঁৗছিল। শুনিয়াই তিনি যেন কেমন বিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "এ্যাঁ, মা পর্বতবাসিনী হয়েছেন!" বলিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। সংবাদদাতা ইহার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলেও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর দেহ স্থূল, দ্রুত চলিতে পারেন না; আবার ঐটুকু পাহাড় উঠিতেই হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐ ভাবেই তিনি সেখানে পেঁৗছিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মায়ের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আর বলিতে লাগিলেন, "কৃপা, কৃপা!" শ্রীমা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া যেন অবোধ সন্তানকে শান্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামকৃষ্ণানন্দজী প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদায় লইলেন। মঠাধ্যক্ষের অনুরোধে শ্রীমা ঐ পাহাড়ের উপর পশ্চিমাস্যে বসিয়া জপও করিয়াছিলেন! সে স্থান তদবধি তীর্থবিশেষে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালোরে একটি কৌতুকাবহ ঘটনাও ঘটিয়াছিল। একদিন শ্রীমা বড় ঘরের এক পার্শ্বে সাধারণ পরিচ্ছদে অনাড়ম্বরভাবে বসিয়া আছেন এবং ঐ দেশীয় স্ত্রীভক্তেরা আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। ইহাদের সঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তথায় আসিলেন এবং গৃহের কেন্দ্রস্থানে আসন লইলেন। অল্পপরেই কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া মধ্যস্থলে ঐ ঐশ্বর্যময়ীকে দেখিয়া ভাবিলেন, ইনিই শ্রীমা হইবেন; অতএব তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। মহিলাটি তখন দেশীয় ভাষায় আপত্তি জানাইতে লাগিলেন। নবাগতারা তথাপি নিরস্ত না হইয়া তাঁহার চরণ ধরিতে অগ্রসর হইলেন। তখন ধনিকবধূ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নিষেধ করিতে থাকিলেন; কিন্তু ততক্ষণে সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং সকলেই প্রথম স্পর্শের জন্য উদ্গ্রীব। অগত্যা তিনি কোন প্রকারে সে ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মা অদূরে বসিয়া সমস্তই দেখিলেন এবং ভাষা অবোধ্য হইলেও ব্যাপার সহজেই বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং ঐশ্বর্যের এবংবিধ বিড়ম্বনায় তিনি মৃদু হাস্য করিলেন।

বাঙ্গালোরে প্রায় সাতদিন অবস্থানের পর শ্রীমা ও সকলে মাদ্রাজে

ফিরিয়া আসেন এবং তথায় দুই-একদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তাঁহারা রাজমহেন্দ্রীতে স্থানীয় জেলা জজ এম. ও. পার্থসারথি আয়েঙ্গার মহাশয়ের গৃহে অতিথি হন[১] এবং তথায় একদিন বিশ্রাম ও গোদাবরীস্নান করেন। রাজমহেন্দ্রীর পরে তাঁহার দ্বিতীয় বিশ্রাম-স্থল ছিল পুরী। এখানে এবারে তিনি ক্ষেত্রবাসীর মঠে না থাকিয়া সমুদ্রের নিকট বলরামবাবুদেরই অপর গৃহ 'শশী নিকেতনে' তিন-চারদিন ছিলেন। অবশেষে তিনি ২৮শে চৈত্র কলিকাতায় পেঁাছিলেন।

এই তীর্থদর্শনের পর শ্রীমা যেদিন প্রথম বেলুড় মঠে শুভাগমন করিলেন, সেদিন তাঁহাকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল। দীর্ঘকাল তীর্থ-ভ্রমণের ফলে তাঁহার মন তখন বেশ প্রফুল্ল এবং শরীরও সুস্থ। ইহাতে ভক্তদের হৃদয়েও অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে তাঁহার উপস্থিতি এবং অব্যক্ত বাণীর যে মহিমা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রাণের ভক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য তখন সকলেই সমুৎসুক। মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল এবং পথের উভয় পার্শ্বে শতাধিক ভক্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। মাতাঠাকুরানীর গাড়ি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র কয়েকটি বোমা ছোঁড়া হইল এবং প্রবেশদ্বার হইতে শ্রীমা যেমন স্ত্রীভক্তগণসহ মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি ভক্তগণের মুখে উচ্চারিত হইতে থাকিল "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি প্রণামমন্ত্র। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আদেশ করিলেন যে, ঐ অবস্থায় কেহ মায়ের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে পারিবে না। শ্রীমা নির্বিবাদে অগ্রসর হইয়া চলিলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত—যেন শুদ্ধ শুক্লপটাবৃত একখানি সচল সাত্ত্বিক প্রতিমা মঠের দক্ষিণভাগ হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। অকস্মাৎ কে যেন দ্রুতবেগে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া শ্রীমায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তেমনি ঝটিতি চরণবন্দনা করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ব্রহ্মানন্দজী সকৌতুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ধর, ধর; কে, কে?" জানা গেল তিনি খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দজী)। সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীমাকে মঠ-বাড়িতে লইয়া গিয়া উপরের একখানি ঘরে বসানো হইল। তখন নীচে কালীকীর্তন চলিতেছে; আর ব্রহ্মানন্দজী বিভোর হইয়া শুনিতেছেন। সহসা দেখা গেল, তাঁহার শরীর অসাড়, হুঁকার নল হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বহুক্ষণ। বহুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে শ্রীমাকে

১ ঐ বাড়িটি গোদাবরী তীরেই অবস্থিত ছিল। এখন উহার চিহ্ন নাই, স্থানটি মিউনিসিপ্যালিটি জলসরবরাহ-কারখানার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সংবাদ দেওয়া হইল; তিনি ব্রহ্মানন্দজীর কানে একটি মন্ত্র শুনাইতে বলিলেন। উহাতে আশ্চর্য ফল ফলিল; মহারাজ ব্যথিত হইয়া গায়কগণকে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, চলুক, চলুক"—যেন সবেমাত্র তিনি অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন! শ্রীমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হইলে তিনি একটু গ্রহণ করিয়া নীচে পাঠাইয়া দিলেন; ভক্তগণ উহা সানন্দে ভাগ করিয়া লইলেন। দিবাবসানে তিনি যখন বিদায় লইলেন, তখন আবার কয়েকটি বোমা ছুঁড়িয়া সেই পুণ্যাহের উৎসব সমাপ্ত হইল।

দৃষ্টিকোণ

রাধারানী (রাধু) তখন বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য শ্রীমা ১৩১৮ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ জয়রামবাটী রওনা হইলেন এবং ৫ই জ্যৈষ্ঠ কোয়ালপাড়া পৌঁছিলেন। কোয়ালপাড়ার গুরুত্ব তখন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৩১৬ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা যাতায়াতের পথে শ্রীমা এখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেন; বলিতেন, "এ আমার বৈঠকখানা।" জয়রামবাটীগামী মাতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণও সেখানে থাকিতেন। আশ্রমবাসীরা শ্রীমায়ের অতীব অনুরক্ত ছিলেন এবং সর্বদা সর্বতোভাবে তাঁহার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। এবার শ্রীমা আসিতেছেন জানিয়া আশ্রমবাসীরা বাঁড়ুজ্যেপুকুরের ঘাটে তালপাতার বেড়া দিয়া, নূতন ঠাকুরঘর সুসজ্জিত ও বারাণ্ডা বস্ত্রাবৃত করিয়া এবং রাস্তা পরিষ্কৃত, বস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পাকীর্ণ করিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া ছিলেন। তিনি আসিয়াই শীঘ্র স্নানাহার শেষ করিলেন এবং একটু বিশ্রামের পর রাধুকে লইয়া পালকিতে উঠিলেন। যাত্রার পূর্বে আশ্রমবাসীদিগকে স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "দেশে এখন তোমাদের ভরসাই ভরসা। এখানে দেখছি ঠাকুর তাহলে বসেছেন। আমাদের সকলেরও পথের বিশ্রামের স্থান হল।" একে একে সকলে প্রণাম করিলে তিনি তাহাদের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে সকলে জয়রামবাটী যেও। বিশেষ করে রাধুর বিয়েতে সব যেতে হবে। সেখানে আমার সব কাজকর্ম তোমাদের দেখতে হবে।"

কয়েকদিনের মধ্যেই পূজনীয় সারদানন্দজী, গোলাপ-মা, যোগীন-মা ও দুই-একজন ব্রহ্মচারী কোয়ালপাড়া হইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাধুর বিবাহের তারিখ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। বর তাজপুরের জমিদারবংশীয় শ্রীমান মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। চাটুজ্যেদের তুলনায় শ্রীমায়ের পিতৃকুল দরিদ্র। কিন্তু মাতৃসেবক শ্রীমৎ সারদানন্দজী মায়ের সন্তোষবিধানার্থে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া রাধুকে জমিদার-বধূর মতোই সাজাইলেন; বিবাহের আয়োজনও তদনুরূপ হইল। সুযোগ বুঝিয়া বরপক্ষীয়েরা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সারদানন্দজীর নিকট হইতে বহুগুণ অর্থ আদায় করিলেন। আলাপ-আলোচনাকালে কোয়ালপাড়ার কেদারনাথ দত্ত মহাশয় বরপক্ষের অযৌক্তিকতা দেখাইতে থাকিলে মাঙ্গলিক কার্যের পূর্বে মনোমালিন্য অশোভন ভাবিয়া শ্রীমা তাঁহাকে ডাকিয়া সরাইয়া লইলেন। রাধু আপাদমস্তক সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত বিবিধ অলংকারে ভূষিত হইয়া বিবাহবাসরে আসিল। জ্যেষ্ঠতাত

প্রসন্নকুমার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাধুর বয়স তখন একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং মন্মথের পঞ্চদশ বৎসর চলিতেছে।

পরদিবস ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইল। বর ও কন্যা—উভয়পক্ষীয় সকলে পরিতোষপূর্বক আহারান্তে যখন বাড়ি ফিরিতেছিলেন, তখন মা পিছনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "খাওয়া-দাওয়া কেমন হল?" তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিতেছিলেন, "বর-কনে সুখে থাকুক, মা!"

বিবাহান্তে রাধুর শ্বশুরগৃহে গমনকালে মা তাহাকে একটা বড় কাল বাক্স দিয়াছিলেন। রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "এক হাজার টাকা রাধুর বাক্সে দিয়ে দিলে?" মায়ের তখন স্মরণ হইল যে, ঐ বাক্সে ঐ পরিমাণ টাকা ছিল; রাধুকে বাক্স দিবার সময় উহা সরাইয়া রাখা হয় নাই। পরদিন সকালে মায়ের আদেশে ভক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ জনৈক সাধুর সহিত তাজপুরে গেলেন এবং সব ঘটনা জানাইয়া টাকা ফিরাইয়া আনিলেন।

শ্রীমা বিবাহের সব ব্যবস্থা করিয়া আপ্রাণ পরিশ্রমসহকারে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য সুসম্পন্ন করাইলেন। কিন্তু পারিবারিক কার্যে আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার মন সর্বদা কিরূপ সংসারাতীত স্তরে বিরাজ করিত তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বোক্ত ঘটনায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাকে পাঠক হয়তো ভ্রমমাত্র মনে করিবেন। তাই আমরা এখানে ঐ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মা রাধুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন—ইহা সর্বজনবিদিত। সুতরাং কন্যাটি যাহাতে সুপাত্রস্থা হয়, ইহা যেমন মায়ের কাম্য, তেমনি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। তাই জনৈক ভক্ত একদিন মাকে পরামর্শ দিলেন যে মাস্টার মহাশয় মর্টন ইন্‌স্টিটিউশনের অধ্যক্ষ; তাঁহাকে বলিলে তিনি অনায়াসে উত্তম বরের সন্ধান দিতে পারেন। শ্রীমা ইহাতে উদাসভাবে উত্তর দিলেন, "আপনা থেকে জোটে তো জুটুক—আমি কখনও কাউকে বন্ধনে ফেলবার জন্য বলতে পারব না।" তাঁহার সাংসারিক জীবন এইরূপ সরোবরে ভাসমান পদ্মপত্রেরই ন্যায় ছিল। অথচ কর্তব্য কর্মে তাঁহার বিন্দুমাত্র অবহেলা ছিল না।

শ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শনে যাত্রার পূর্বেই আত্মীয়বর্গের আগ্রহে তাজপুরে বিবাহ স্থির হয়।[১] পরে জ্যোতিষীকে কোষ্ঠী দেখাইয়া জানা যায় যে, রাধুর বৈধব্যযোগ আছে। তথাপি শ্রীমা পূর্বসিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ

১ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত শ্রীমায়ের ১৩১৭ সালের ৮ই আষাঢ় তারিখের পত্রে আছে—"১৫ই আষাঢ় পাত্রটি'কে আশীর্বাদ করতে যাব। ১৭ই আষাঢ় তাঁরা কন্যা আশীর্বাদ করতে আসবেন। এই কার্যসমাধার পর আমি ১৯শে আষাঢ় কলকাতা যাব।"

করেন নাই। বিবাহের অনেক পরে মন্মথ যখন তাঁহাকে দীক্ষার জন্য ধরিয়া বসিল, তখন আত্মীয়কে দীক্ষা দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অবশেষে দীক্ষা দিয়া তিনি বলিলেন যে, বিধির বিধানে হাত দেওয়া অনুচিত হইলেও এই দীক্ষার প্রভাবে রাধুর বৈধব্য খণ্ডিতে পারে।[১]

রাধুর বিবাহের কিঞ্চিদধিক দুইমাস পরে (৪ঠা ভাদ্র; ২১শে অগস্ট, ১৯১১) শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের এক উজ্জ্বল মুকুটমণি খসিয়া পড়িল—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী কলিকাতায় 'উদ্বোধনে' মহাপ্রয়াণ করিলেন। দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে তিনি শ্রীমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে লইয়া যাইবার জন্য জয়রামবাটীতে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু অনেক ভাবিয়া তিনি যান নাই। রামকৃষ্ণানন্দজী দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যে আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা তখনও তাঁহার চক্ষে জাজ্বল্যমান ছিল। এরূপ অনুরক্ত সন্তানের দেহত্যাগ তিনি জননী হইয়া কিরূপে দাঁড়াইয়া দেখিবেন? আর 'উদ্বোধনে'র মতো স্বল্পায়তন বাটীতে তিনি সদলবলে উপস্থিত হইলে রোগীর আরাম না হইয়া অসুবিধাই ঘটিবে। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি আগত ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিলেন। তথাপি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই রামকৃষ্ণানন্দজী দিব্যচক্ষে শ্রীমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "মা এসেছেন!" পরে তাঁহার মনোভাব-অবলম্বনে গিরিশবাবু একখানি মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়া দিলে উহা শুনিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং অচিরে চিরকালের মতো চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সে সংবাদ জয়রামবাটীতে পোঁছিলে শ্রীমা সকাতরে বলিলেন, "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।"

ঐ বৎসর জগদ্ধাত্রী-পূজোপলক্ষে কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ উত্তম শাকসবজি প্রভৃতি লইয়া জয়রামবাটী উপস্থিত হইলে শ্রীমা প্রসন্নমুখে বলিলেন, "এখানে তরকারি-পাতি সব সময় মেলে না। মাঝে মাঝে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। তা ঠাকুরই এখন তোমাদের দিয়ে সব যোগাবেন দেখছি।" ভক্তগণ পূজার কয়দিন মায়ের আদেশানুসারে সর্বপ্রকার কার্য করিয়া যখন ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের জন্য মুড়কি, নাড়ু প্রভৃতি বিস্তর প্রসাদ বাঁধিয়া দিলেন। তদবধি শ্রীমা যখনই দেশে থাকিতেন, কোয়ালপাড়া হইতে সপ্তাহে দুই-তিনদিন নিয়মিতভাবে তাঁহার জন্য শাকসবজি আসিত। কোয়ালপাড়া আশ্রমের অবস্থা তখন ভাল নহে—কায়ক্লেশে আশ্রম চালাইতে হইত। সুতরাং দৈনিককার্য সমাপনান্তে কর্মীদের দুই-একজন হাট অথবা আশ্রমের বাগান হইতে সংগৃহীত তরকারি মস্তকে বহিয়া জয়রামবাটীতে পোঁছাইয়া দিতেন।

১ রাধুর বৈধব্য খণ্ডিত হইলেও তাহার শেষ জীবন বৈধব্যেরই তুল্য ছিল—ইহা আমরা পরে দেখিব।

আবার সেখানে গিয়াও প্রয়োজনবোধে অন্য স্থান হইতে শ্রীমায়ের জন্য নুন, তেল, মশলা, আটা প্রভৃতি কিনিয়া ঐ ভাবেই লইয়া আসিতেন। ভক্তগণ যখন পৌঁছিতেন, শ্রীমা হয়তো তখন বিশ্রাম করিতেছেন; তাই শয্যায় শায়িত থাকিয়াই তিনি দেখাইয়া দিতেন, কোন্ জিনিস কোথায় রাখিতে হইবে। শুনিয়া শুনিয়া ভক্তেরাও শিখিয়া গিয়াছিলেন; অতঃপর আপনা হইতেই সব গুছাইয়া রাখিতেন। সব ঠিক হইয়া গেলে তাঁহারা বিদায় লইবার জন্য যখন শ্রীমাকে প্রণাম করিতেন, তখন তিনি এই বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন, "তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তি-বিশ্বাস হোক" এবং পথে খাইবার জন্য তাঁহাদের বস্ত্রপ্রান্তে মুড়ি বাঁধিয়া দিতেন। ভক্তগণ উহা খাইতে খাইতে সন্ধ্যাকালে কোয়ালপাড়া যাত্রা করিতেন। ফলতঃ এই কয় বৎসর কোয়ালপাড়ার আশ্রম শ্রীমায়ের সংসারের মতোই ছিল; উহা তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

জগদ্ধাত্রীপূজার পরে শ্রীমায়ের কলিকাতা যাওয়া স্থির হইয়াছিল; তাই তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বামী সারদানন্দজী ব্রহ্মচারী প্রকাশ মহারাজকে পূজার পূর্বেই জয়রামবাটী পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর ৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা-যাত্রার দিন ধার্য হইল। যাত্রার দুই-চারিদিন পূর্বে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু (পরের নাম স্বামী কেশবানন্দ) জনৈক তরুণ কর্মীর সহিত জয়রামবাটী যাইয়া মা ঠিক কখন কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিবেন ও কিরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক ইত্যাদি জানিয়া লইলেন। মা তখন বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। কাজের কথা সব শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "দেখ, বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর এবং আমাদের পথের বিশ্রামের জন্য স্থান একটু করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর—তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।" কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশী চর্চা হইত এবং ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠ অপেক্ষা তাঁত, চরকা ও স্বদেশী আন্দোলনের দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। কাজেই আশ্রমের উপর পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাহারা প্রত্যহ আশ্রমে আসিয়া সংবাদ লইত এবং নবাগত ভক্তদের নাম ঠিকানাদি লিখিয়া লইয়া যাইত। আশ্রমাধ্যক্ষ ইহা সত্ত্বেও স্বদেশমন্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন; তাই শ্রীমায়ের কথা হঠাৎ মানিয়া লইতে পারিলেন না; অথচ প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে সাহস না পাইয়া প্রকারান্তরে বলিলেন, "স্বামীজী (বিবেকানন্দ) তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না হত।" কেদারবাবু যুক্তির মুখে অজ্ঞাতসারে মায়ের হৃদয়ের অনেক-

গুলি তন্ত্রীতে আঘাত করায় নূতন যে সুর উত্থিত হইল, তাহাও পূর্বেরই ন্যায় মধুর ও সুগভীর এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদে ভরপুর। দত্ত মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে শ্রীমা বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল! বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি, এবং সেখানেও দেখলুম, ঠাকুরের কি মহিমা, কত সজ্জন লোক আমার কাছে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগ্রহসহকারে শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে।' তারাও তো আমার ছেলে—কি বল?" সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ কেদারবাবু মৌন অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথম ভুল করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের কার্যধারার অনুমোদনার্থ স্বামীজীর দৃষ্টান্ত টানিয়া আনিয়া, এবং দ্বিতীয় ভুল করিয়াছিলেন স্বদেশী-আন্দোলনকে বিদেশীর বিদ্বেষে পরিণত করিয়া। মায়ের কথা হইতে ইহাও অনুভব করিলেন যে, সাধন-ভজন না থাকিলে কর্ম ঠিক নিষ্কামভাবে করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমায়ের এই বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানেই করিয়া রাখিতে চাই। ১৩২৪ সালে তাঁহার জয়রামবাটীর নূতন বাটী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। পূজার সময় তিনি ঐ বাড়িতে আছেন এবং জনৈক ব্রহ্মচারীকে মামাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য নূতন কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিয়াছেন। ইনি কোয়ালপাড়ার সাধু এবং তখনকার দিনের যুবকদের ন্যায় স্বদেশসেবী। সুতরাং তিনি সব দেশী কলের কাপড় কিনিয়া আনিলেন—উহা মোটা, পাড়ও সুন্দর নহে। কাজেই মেয়েদের উহা পছন্দ হইল না; তাঁহারা উহা ফেরত দিয়া মিহি কাপড় আনিতে বলিলে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারীজী বলিলেন, "ওসব তো বিলিতি হবে—ও আবার কি আনব?" শ্রীমা পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি সব শুনিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে, তাই এনে দাও।" অথচ কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল; তাই পরে বিদেশী বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে না পাঠাইয়া অপরকে পাঠাইতেন।

বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ তো দূরের কথা, তাঁহার সর্বগ্রাসী উদারতা তাঁহার নমনীয় মনকে সহসা সমস্ত সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া বিদেশীর সহিতও এক করিয়া ফেলিত। তাই এক ইস্টার উৎসবে নিবেদিতার মুখে ইংরেজী ধর্মসঙ্গীত শুনিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। আর একদিন তাঁহার

আদেশে নিবেদিতা ও কৃষ্টিন খ্রীষ্টান বিবাহপ্রথা বুঝাইবার জন্য যখন বর, কন্যা ও পুরোহিতের আচরণাদি ব্যাখ্যা করিতে করিতে বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—"সুখে-দুঃখে, সৌভাগ্যে-দারিদ্র্যে, রোগে-স্বাস্থ্যে, যতদিন না মৃত্যু আমাদিগকে পৃথক করে—" তখন মা সাগ্রহে বারবার ঐ মন্ত্র শুনিলেন ও সাহ্লাদে বলিতে থাকিলেন, "আহা, কি ধর্মী কথা গো!" আবার কত সহজে তিনি বিদেশী আচারের সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলিতেন। ১৩০৫ সালে শ্রীযুক্তা ওলি বুল মায়ের ছবি তোলাইতে চাহিলে স্টুডিওতে যাওয়া বা অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সম্মুখে ঘোমটা খোলা ব্রীড়াশীলা মায়ের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি প্রথমে অসম্মত হন। কিন্তু পরে ওলি বুলের আকুল মিনতিতে অগত্যা মহিলা ফটোগ্রাফার আনিতে বলিলেন। তাহা যখন সম্ভব হইল না তখন তিনি কোন সাহেবকে আনিতে বলিলেন, কারণ সাহেবদের দেশে মেয়েদের ফটো তোলা নিত্যকার ব্যাপার। সাহেব আসিতেই মা তাঁহার লজ্জাশীলতা কাটাইয়া ফটো তুলিতে বসিলেন বিদেশীর সম্মুখে নিঃসঙ্কোচ হইতে তাঁহার সংকোচ হইল না। শুধু এই পর্যন্তই নহে, স্বামী বিবেকানন্দজীর একখানি পত্রে (মার্চ, ১৮৯৮) আছে, "শ্রীমা এখানে (কলিকাতায়) আছেন। ইওরোপিয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সংগে একসংগে খাইয়াছিলেন। ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?"

কিন্তু বিদেশীর প্রতি প্রীতি ও উদারতা থাকিলেও বিদেশীর অত্যাচারে চুপ করিয়া থাকা চলে না। সিন্ধুবালাদের প্রতি পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী কর্ণগোচর হইলে শান্তপ্রকৃতি মা পর্যন্ত গর্জিয়া উঠিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার যুথবিহার নামক পল্লীর দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েরই নাম ছিল সিন্ধুবালা। ভগিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বিপ্লবাত্মক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এই সন্দেহে একজন সিন্ধুবালাকে ধরিতে আসিয়া পুলিস নামের সামঞ্জস্যবশতঃ প্রথমে ভগিনীকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি সাবাজপুরে বন্দী করে। পরে দেবেনবাবুর স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া জয়রামবাটীতেও পেঁাছিল। কালীমামা ইহা শুনিয়া অতিমাত্র বিচলিত হইয়া শ্রীমাকে আসিয়া জানাইলেন এবং আরও বলিলেন যে, পুলিস এই মহিলাদ্বয়কে বন্দী করিয়া পায়ে হাঁটাইয়া লইয়া গিয়াছে—গ্রামবাসীরা পুলিসকে তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিলেও তাহারা শুনে নাই; এমনকি জামিনে খালাস দেওয়া বা যানবাহনে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া শ্রীমা বলিয়া উঠিলেন, "বল কি?"—বলিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তারপর অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিস সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকের

উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনিনি? এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তো আর বেশীদিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারে?" কিয়ৎক্ষণ পরে কালীমামা যখন খবর আনিলেন যে মহিলাদ্বয় মুক্তি পাইয়াছেন, তখন তিনি অনেকটা শান্ত হইয়া বলিলেন, "এ খবর যদি না পেতুম তবে আজ আর ঘুমুতে পারতুম না।"[১]

আর একবার শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় আছেন। তখন ইওরোপের প্রথম মহাসমর (১৯১৪-১৮) চলিতেছে। ভক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীমা কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, যুদ্ধের কি খবর? কি লোক ক্ষয়টাই না হল—কি মানুষ-মারা কলই না বের করেছে। আজকাল কত রকম যন্ত্রপাতি—টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এই দেখ না, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে গেল। আমরা তখন কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বরে গেছি।" প্রবোধবাবু উৎসাহভরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করেছেন।" সব শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, "কিন্তু, বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।"

আর একদিনের কথা। দেশে তখন বস্ত্রাভাব—মেয়েদের লজ্জানিবারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রাভাবে নারীরা বাহিরে আসিতে পারেন না। লজ্জানিবারণে অসমর্থা মেয়েদের আত্মহত্যার সংবাদ খবরের কাগজে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। একদিন ঐরূপ কয়েকটি ঘটনা শুনিতে শুনিতে শ্রীমা এতই বিচলিত হইলেন যে, প্রথমে তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং পরে আপনাকে আর সামলাইতে না পারিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ওরা (ইংরেজরা) কবে যাবে গো? ওরা কবে যাবে গো?" অবশেষে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সখেদে বলিলেন, "তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কাপাস চাষ হত, সকলেই সুতো কাটত, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিলে। কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিলে—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল—চরকা উঠে গেল। এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।"

১ আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ঘটনা বিবৃত না করিয়া শ্রীমায়ের নিকট যেভাবে নিবেদিত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র লিখিলাম। ইহা ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তখন পল্লীগ্রামে মুখে মুখে সংবাদ প্রচারিত হইত। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সহিত সম্পূর্ণ মিল না থাকারও সম্ভাবনা ছিল।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও অসহযোগ-আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীমায়ের হৃদয় দেশের দুঃখদুর্দশায় বিচলিত হইত; সময়বিশেষে বিদেশী শাসকের শোষণনীতির প্রতিবাদে তাঁহার চক্ষে অগ্নিস্ফুরণ কিংবা অশ্রুবিসর্জন হইত। কিন্তু সমস্ত দুঃখদৈন্যের একমাত্র প্রতিকাররূপে তিনি সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া থাকিতেন এবং অপরকেও তাহাই করিতে বলিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও কার্য ছিল রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। তখন স্বদেশীর যুগ; তাই জনৈক দেশভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এদেশের দুঃখদুর্দশা কি দূর হবে না?" তখন শ্রীমা উত্তর দিয়াছিলেন যে, ঠাকুর ঐ জন্যেই আসিয়াছিলেন। সুতরাং কোয়ালপাড়ার ভক্তদের কর্মোদ্যমে আকৃষ্ট হইলেও তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আশ্রমের অধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণেরই বিরাজমান থাকা আবশ্যক, নতুবা কর্মীরা অচিরে পথভ্রষ্ট হইতে পারেন। তাই তিনি কলিকাতা যাইবার পথে আশ্রমে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।

অগ্রহায়ণের আরম্ভ। তখন ভোরে খুব ঠাণ্ডা হইলেও শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় গিয়া পূজা করিতে হইবে। তাই তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই পালকিতে রওয়ানা হইলেন। লক্ষ্মীদিদি, শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকু ও রাধু এবং রাধুর স্বামী মন্মথ ভিন্ন ভিন্ন পালকিতে যাত্রা করিলেন। ছোট মামী, নলিনীদিদি, ভূদেব প্রভৃতি অন্যান্য সকলে গোযানে উঠিলেন এবং ব্রহ্মচারী প্রকাশ মহারাজ সকলের তত্ত্বাবধায়করূপে চলিলেন।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীমা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ভক্তবৃন্দ যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছেন। মা আশ্রমে পৌঁছিয়া স্নান সারিয়া আসিলেন এবং বেদীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আপনার ফটো স্থাপনপূর্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। তাঁহার আদেশে কিশোরী মহারাজ হোমাদি করিলেন। পূজাশেষে সকলে প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে কেদারবাবুর মা, লক্ষ্মীদিদি ও নলিনীদিদির সহিত শ্রীমা কেদারবাবুদের বাড়িতে পদব্রজে বেড়াইতে গেলেন। প্রকাশ মহারাজ ইহা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া আশ্রমবাসীদিগকে বলিলেন, "তোমরা মার মর্যাদা কিছুই জান না। আমাকে না বলে তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলে কেন? যাই হোক, মাকে ফেরবার সময় পালকি করে নিয়ে এসো।" এই বলিয়া নিজেই পালকি, বেহারা ও আশ্রমবাসী দুইজনকে লইয়া কেদারবাবুর বাড়ির দিকে চলিলেন। মধ্য পথে মাতাঠাকুরানীর সহিত দেখা হইলে প্রকাশ মহারাজ তাঁহাকে পালকিতে উঠিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীমা বিরক্তির সহিত উঠিলেন বটে, কিন্তু আশ্রমে আসিয়াই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হল আমার বৈঠকখানা। এইসব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি এদেশে এসে

একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ—আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামত পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না—শরৎকে লিখে দাও।" তখন প্রকাশ মহারাজ ক্ষমা চাহিয়া কহিলেন যে, তাঁহার নিজের দিক হইতে যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, ঐরূপ করিতে গিয়াই তিনি অজ্ঞাতসারে মায়ের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া ফেলিয়াছেন।

স্থির হইল যে, সন্ধ্যা ছয়টার পূর্বেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব রাস্তার খাবার উহার আগেই প্রস্তুত রাখিতে হইবে। কিন্তু আশ্রম-বাসীদের যথাশক্তি চেষ্টা সত্ত্বেও সময়মত কাজ শেষ হইল না। প্রকাশ মহারাজ ইহাতে বিরক্ত হইতেছেন দেখিয়া আশ্রমবাসীরা পরামর্শ দিলেন যে, কলিকাতা-যাত্রীরা রওয়ানা হইয়া যাইতে পারেন; পরে যেমন করিয়াই হউক পথে খাবার পেঁছাইয়া দেওয়া হইবে। শ্রীমা সকল কথা শুনিয়া প্রকাশ মহারাজকে বলিলেন, "তুমি মাথা গরম করে এত রাগারাগি করছ কেন? এ আমাদের পাড়াগাঁ, কলকাতার মতো এখানে কি সব ঘড়ির কাঁটায় হয়ে ওঠে? দেখছ সকাল থেকে ছেলেরা কি খাটাই খাটছে! তুমি যাই বল না কেন, এখান থেকে না খেয়ে যাওয়া হবে না।" শেষে আহারাদির পর রাত্রি আন্দাজ আটটায় আটখানি গরুর গাড়িতে সকলে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেলুড় ও কাশী

১৩১৯ সালের ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর, ১৯১২) দুর্গাপূজার বোধনের দিন অপরাহ্ণে শ্রীমা বেলুড় মঠে আসিবেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত, অথচ শ্রীমায়ের শুভাগমন হইল না দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দজী ছুটাছুটি করিতেছেন। মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ বসানো হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এসব এখনও হয়নি, মা আসবেন কি!" দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গাড়ি মঠের ফটকে পৌঁছিল। অমনি স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ সাধু-ভক্তবৃন্দ গাড়ির ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া উহা টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিলেন। গাড়ি টানিতে টানিতে প্রেমানন্দজী আনন্দে টলিতে লাগিলেন—চোখে-মুখে যেন আহ্লাদ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গাড়ি প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিলে গোলাপ-মা শ্রীমাকে হাত ধরিয়া সন্তর্পণে নামাইলেন। নামিবার পর সমস্ত দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।" শ্রীমা তদবধি একাদশী পর্যন্ত বেলুড়েই বাস করিয়াছিলেন; মঠের উত্তরদিকে বাগান-বাড়িতে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। শ্রীমা দক্ষিণ দিকের ঘরখানিতে থাকিতেন। ঐ বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি এবং ভানু-পিসীও ছিলেন।

মহাষ্টমীর দিনে তিন শতাধিক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন; তিনি তক্তপোশের উপর পশ্চিমাস্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সকলের প্রণাম লইলেন ও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। সেদিন তিন-চারিজনের দীক্ষাও হইল। ঐ রাত্রে 'জনা' নাটক ও বিজয়ার রাত্রে 'রামাশ্বমেধ-যজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। শ্রীমা মঠের দোতলায় বসিয়া উভয় অভিনয়ই দেখিয়াছিলেন। মহানবমীর দিন দ্বিপ্রহরের পরে গোলাপ-মা আসিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে সংবাদ দিলেন, "শরৎ, মা-ঠাকরুন তোমাদের সেবায় খুব খুশী হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" সে অতিবাঞ্ছিত আশীর্বাণীর উত্তরে কি বলিতে হইবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া সারদানন্দজী শুধু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "বটে?" বলিয়াই অতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্বোপবিষ্ট প্রেমানন্দজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবুরাম-দা, শুনলে?" বাবুরাম মহারাজ শুনিয়াছিলেন ঠিকই এখন সারদানন্দজীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

বিজয়ার দিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল, যে নৌকা করিয়া প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইতেছিল উহাতে, দেবীর সামনে নানা মুখভঙ্গি, রঙ্গব্যঙ্গ করিতে-ছিলেন এবং অনেকেই এই সব দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইতেছিলেন। জনৈক

মার্জিতরুচি ব্রহ্মচারী কিন্তু ইহাতে খুব চটিতেছিলেন। শ্রীমা নিজ বাটীতে থাকিয়া এই সব দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। এমন সময় অপর একজন সাধু উক্ত ব্রহ্মচারীর প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই তিনি বলিলেন, "না, না, এসব ঠিক। গান-বাজনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।" এক সপ্তাহ বেলুড়ে থাকিয়া শ্রীমা (৬ই কার্তিক, ২২শে অক্টোবর) 'উদ্বোধনে' ফিরিয়া যান।

শ্রীমায়ের বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে যোগদান ইহাই প্রথম বা শেষ নহে; এই ঘটনার পূর্বে স্বামীজীর সময়ে এবং পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূজা দর্শন করিয়াছিলেন। বেলুড়ের সঙ্গে তাঁহার একটা প্রাণের সংযোগ ছিল। তিনি বহুবার নীলাম্বরবাবুর বাগানে অথবা ঘুষুড়ির ভাড়াবাড়িতে বাস করিয়াছেন; ঐ সব স্থানে কত ধ্যান-ধারণা, পূজা, পাঠ, সাধন ও অনুভূতি হইয়া গিয়াছে! শ্রীমা একদিন সেই বেলুড়-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম! কি শান্ত জায়গাটি! ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল।" শুধু স্বামীজীরই যে সেরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা নহে, শ্রীমায়ের আকুল আগ্রহও বহুল পরিমাণে ঐ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিয়াছিল। সন্ন্যাসীরা তাহা জানিতেন, আর জানিতেন মায়ের নিজস্ব স্বরূপ—সাক্ষাৎ জগদম্বার উপস্থিতি ব্যতীত তাঁহারা দেবী-পূজাকে পূর্ণ মনে করিতে পারিতেন না। পূজার সঙ্কল্প হইত তাঁহারই নামে, অদ্যাপি তাহাই হয়। সেজন্য পূজোপলক্ষে শ্রীমায়ের বেলুড়ে আগমন ও অবস্থিতির সহিত বিজড়িত বহু পুণ্যময় ঘটনার স্মৃতি আজও সাধুরা সাদরে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন—ঐগুলি তাঁহাদের নিকট বড়ই অনুপ্রেরণাপ্রদ! পূজার দিন শ্রীশ্রীমা মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে দুই হস্তে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতেন; ইহা না করিতে পারিলে যেন তাঁহাদের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে প্রসন্না দেখিলে সকলের মনে হইত দেবী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক পূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহাষ্টমীর দিনে একশত আটটি পদ্মফুল দিয়া শ্রীমায়ের চরণ পূজা করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সালে (১৯১৬ ইং) দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন শ্রীমা মঠে আসিয়া উত্তরের উদ্যানবাটীতে উঠিয়াছিলেন। পূজা-মণ্ডপে আসিয়া পূজাদি দেখিয়া যাইবার পর সংবাদ আসিল যে, রাধুর শরীর অসুস্থ, সুতরাং শ্রীমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। সংবাদদাতা স্বামী ধীরানন্দ স্বামী প্রেমানন্দজীকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন শ্রীমাকে থাকিতে অনুরোধ করেন। শুনিয়া প্রেমানন্দজী বলিলেন, "মহামায়াকে কে, বাবা, নিষেধ করতে যাবে?

তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে?” অবশ্য শ্রীমায়ের কার্যতঃ যাওয়া হয় নাই; কারণ রাধু সুস্থ হওয়ায় তিনি ফিরিয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করেন। সেবার অষ্টমীর দিন সকালে তিনি প্রতিমাদর্শনে আসিলেন। পার্শ্বেই মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা কুটনো কুটিতেছিলেন। শ্রীমা দেখিয়া বলিলেন ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে।” কার্যরত জগদানন্দজী হাসিয়া বলিলেন, “ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই হল উদ্দেশ্য– তা সাধন-ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটেই হোক।”

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূজার একটু বিবরণ স্বামী শিবানন্দজীর ৯।১০।১৬ তারিখের একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল—“শ্রীশ্রীমা উপাস্থত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল। যদিও তিন দিন অনবরত বৃষ্টি, ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন কি, ভক্তেবা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণেব জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগীন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেবা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল, অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন, ‘তাইতো, এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব ভেসে যাবে! মা, রক্ষা কর!’ মাও সত্য রক্ষা করিতেন, তিন দিনই ঐ রকম।”

অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।” ব্রহ্মচারী বুঝিলেন উলটা—তিনি মনে করিলেন, দুর্গাপ্রতিমার সামনে প্রণামী দিতে হইবে; তাই নিঃসন্দেহ হইবাব জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, “ও বাগানে মা আছেন: তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তাঁরই পূজা হল।”

আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য ১৩২৩ সালের দুর্গাপূজার কথা এখানেই শেষ করিলাম। ১৩১৯ সালের দুর্গাপূজার কিছুদিন পর শ্রীমা কাশীধামে উপস্থিত হন (২০শে কার্তিক: ৫ই নভেম্বর, ১৯১২)। বেলা প্রায় একটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে পদার্পণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি পার্শ্ববর্তী বাগবাজারের দত্তবংশের নবনির্মিত বাটী ‘লক্ষ্মীনিবাসে’ চলিয়া যান। এই বাড়িতে তিনি প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। তাঁহার শুভাগমন হইবে বলিয়া গৃহস্বামীরা অল্পদিন পূর্বে গৃহপ্রবেশকার্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইবার শ্রীমায়ের সহিত গোলাপ-মা, জয়রামবাটীর ভানুপিসী, কোয়ালপাড়ার কেদারবাবুর মা, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী ও শ্যালিকা, মাস্টার মহাশয়, বিভূতিবাবু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছিলেন। বাড়ির প্রশস্ত বারান্ডা দেখিয়া মা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও

ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।" শ্রীমা ঐ বাড়ির উপরে থাকিতেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতি পুরুষ-ভক্তরা নীচে বাস করিতেন।

পরদিনই সকালবেলা শ্রীমা পালকি করিয়া ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা-দর্শনে যান। ২৪শে কার্তিক ৺শ্যামাপূজার পরদিন সকালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পদধূলি দেন। ঐ সময় পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজী, শিবানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, চারুবাবু, ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) মাতাঠাকুরানীর পালকির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া রোগীদের আবাসগৃহগুলি দেখাইলেন এবং প্রত্যেক গৃহের পরিচয় দিলেন। সমস্ত দেখা হইলে শ্রীমা উপবেশন করিলেন এবং কেদার বাবার সহিত কথাপ্রসঙ্গে সেবাশ্রমের বাড়ি, বাগান ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" ইহার পর তিনি জানিতে চাহিলেন, প্রথমে এই ভাব কাহার মাথায় আসিয়াছিল এবং কিরূপে সমস্ত পরিকল্পনা রূপ-পরিগ্রহ করিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" তিনি বাসায় ফিরিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই একজন ভক্ত সেবাশ্রমে আসিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের সেবাশ্রমে দান এই দশ টাকা জমা করে নেবেন।" তাঁহার প্রদত্ত সে দশ টাকার নোটখানি অমূল্য রত্নরূপে আজও সেবাশ্রমে সুরক্ষিত আছে।

ঐ দিন জনৈক ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" মা ধীরভাবে বলিলেন, "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।" মায়ের এই অভিমত শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট নিবেদিত হইলে তিনি উহা স্বামী শিবানন্দজীকে বলিলেন। ঠিক তখনই মাস্টার মহাশয় অদ্বৈতাশ্রমে আসিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সাধন-ভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ না করিয়া সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবের অনুকূল নহে। ব্রহ্মানন্দজী ইহা জানিতেন; তাই তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই কয়েকজন ভক্ত ব্রহ্মচারীকে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "মা বলেছেন, সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; আপনি কি বলেন?" মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া সকলে একযোগে প্রশ্ন করিতে লাগিল; মহারাজও উহাতে যোগ দিলেন। তখন মাস্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নেই।"

ব্রহ্মানন্দজী প্রতিদিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া 'লক্ষ্মীনিবাসে' যাইয়া গোলাপ-মার নিকট শ্রীমায়ের কুশলপ্রশ্নাদি করিতেন এবং পরে বালকের মতো রঙ্গ করিতেন। এইরূপে একদিন নীচের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে

মাস্টার মহাশয় ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং উপরের বারান্ডা হইতে গোলাপ-মা বলিলেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞেস করেছেন, আগে শক্তিপূজো করতে হয় কেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" এই বলিয়া তিনি বাউলের সুরে গান ধরিলেন—

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে॥

গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং উহা শেষ হইবামাত্র 'হো, হো, হো' বলিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন। এই অপূর্ব ভাব ও নৃত্য শ্রীমা উপর হইতে দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন; আর নীচে দ্রষ্টা ছিলেন মাস্টার মহাশয় এবং অপর দুই-এক জন ভক্ত।

২৮শে অগ্রহায়ণ বৈকালে শ্রীমা নানা দেবদেবী-দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। অন্য একদিন ৺বৈদ্যনাথ-দর্শনের পর ৺তিল-ভাণ্ডেশ্বর দেখিয়া বলিলেন, "এ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ।" পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৺কেদারনাথের মন্দিরে যাইয়া কিছুক্ষণ গঙ্গাদর্শনান্তে আরতি দেখিলেন ও বলিলেন, "এ কেদার ও সেই (হিমালয়ের) কেদার এক—যোগ আছে। এঁকে দর্শন করলেই তাঁকে দর্শন করা হয়—বড় জাগ্রত।"

একদিন মা সারনাথ দেখিতে যান। মিস ম্যাক্‌লাউড তখন কাশীতে থাকায় শ্রীমায়ের জন্য হোটেল হইতে বড় ফিটন গাড়ির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উহা আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শ্রীমা রাধু, ভূদেব প্রভৃতিকে লইযা ভাড়া-গাড়িতে চলিয়া যান। পরে ফিটন আসিলে ডাক্তার নৃপেনবাবু ও দুইজন সেবকসহ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অবিলম্বে উহাতে চড়িয়া সারনাথে উপস্থিত হন। শ্রীমা যখন সেখানে বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন কয়েক জন সাহেব সবিস্ময়ে ঐসব প্রাচীন কীর্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিয়া মা বলিলেন, "যারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে; আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য সব করে গেছে।" সারনাথ হইতে ফিরিবার সময় মহারাজ মাতাঠাকুরানীকে ফিটনে উঠিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি কিছুতেই উঠিলেন না; বলিলেন, "না, না, ও গাড়িতে রাখাল এসেছে, রাখাল ওরা যাবে। আমার এ গাড়িতে কষ্ট হবে না।" কিন্তু মহারাজের অনুরোধে তাঁহাকে ফিটনে উঠিতে হইল; মহারাজ ভাড়া গাড়িতে

উঠিলেন। মায়ের গাড়ি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে মহারাজের গাড়ি রাস্তার বাঁধের একটি বাঁকের মুখে ঘুরিবার কালে উলটাইয়া পড়িল। ইহাতে মহারাজের কোন গুরুতর আঘাত লাগে নাই; তিনি বরং প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "ভাগ্যিস মা এ গাড়িতে যাননি।" শ্রীমা এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে ছিল; রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে। না হলে ছেলে পিলে গাড়িতে—কি যে হত।"

মা এবার কাশীতে দুইজন সাধুকে দর্শন করেন—এক নানকপন্থী সাধু এবং চামেলী পুরী, গঙ্গাতীরে নবাগত প্রথমোক্ত সাধুকে তিনি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়াছিলেন। অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসী চামেলী পুরীকে দর্শনকালে গোলাপ-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে খেতে দেয়?" পুরীজী তদুত্তরে তেজ ও বিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "এক দুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কোন্ দেতা?" উত্তর শুনিয়া শ্রীমা খুব খুশী হইয়াছিলেন এবং বাড়ি ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা, বুড়োর মুখটি মনে পড়চে—যেন ছেলেমানুষটির মতো।" পরদিন তিনি তাঁহার জন্য কমলা লেবু, সন্দেশ ও একখানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। আর একদিন অন্যান্য সাধু দেখিবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আবার সাধু কি দেখব? ঐ তো সাধু দেখেছি—আবার সাধু কোথা?"

ইহার পূর্বে শ্রীমা দুইবার কাশীতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দিন থাকেন নাই। এই বারে একটু দীর্ঘকাল থাকার সুযোগে তিনি 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করেন এবং পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিক দেবাদি দর্শন করেন। একদিন অদ্বৈতাশ্রমে রাসলীলা অভিনীত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ বালকদ্বয়কে টাকা দিয়া প্রণাম করেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অপর অনেকেও ঐরূপ করেন। আর একদিন তিনি ঐ আশ্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ একজন পাঠকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আবাসস্থলে নিত্য অপরাহ্ণে স্বামী গিরিজানন্দ তাঁহাকে ভাগবত শুনাইতেন। ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে অদ্বৈতাশ্রমে সাড়ম্বরে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীমায়ের জীবনে উচ্চ ভাবস্রোত এবং পারিবারিক ব্যবহারের ধারা একই সঙ্গে এমনই ভাবে চলিত যে, নবাগত সাধারণ মানবের পক্ষে উভয়কে পৃথক করা বা উহাদের স্ব স্ব গূঢ়ার্থ অনুভব করা দুঃসাধ্য ছিল। একদিন কাশীর কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন, শ্রীমা রাধু, ভূদেব প্রভৃতিকে লইয়া খুব ব্যস্ত, আবার গোলাপ-মাকে নিজ ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র একটু সেলাই করিয়া দিতে বলিতেছেন। তাঁহারা এখানেও চিরপরিচিত সংসারলীলারই পুনরাবৃত্তি দেখিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।" অস্ফুট-

স্বরে শ্রীমা উত্তর দিলেন, "কি করব মা, নিজেই মায়া।" সে ইঙ্গিতের তাৎপর্য তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন নাই।

আর একদিন তিন-চারি জন মহিলা আসিলেন। শ্রীমা তখন বারান্ডায় বসিয়া আছেন, আর গোলাপ-মা প্রভৃতি এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। গোলাপ-মাকে ভব্যা ও প্রাচীনা দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক শ্রীমা-জ্ঞানে প্রণাম করিলেন ও কথা বলিতে উদ্যত হইলেন। গোলাপ-মা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ঐ উনিই মা-ঠাকুরুন।" মায়ের সাদাসিধা চেহারায় মহিলা আকৃষ্ট না হইয়া ভাবিলেন, গোলাপ-মা রহস্য করিতেছেন। গোলাপ-মা আবার বলায় অগত্যা প্রণাম করিতে যাইতে হইল। শ্রীমাও তখন রঙ্গ করিবার জন্য হাসিয়া কহিলেন, "না না, ঐ উনিই মা-ঠাকুরুন।" স্ত্রীলোকটি তখন সমস্যায় পড়িলেন—উভয়ে একই কথা বলিতেছেন, সত্যনির্ণয়েরও উপায়ান্তর নাই। অবশেষে তিনি পূর্বসিদ্ধান্তানুযায়ী গোলাপ-মাকে মাতাঠাকুরানী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন। তখন গোলাপ-মা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই! দেখছ না—মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়? বাস্তবিকই মায়ের সরল ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা স্বতই আপন অসাধারণতা জ্ঞাপন করিত। কিন্তু যাহাদের মন সর্বতোভাবে সংসারেই আবদ্ধ, লোকাতীত বস্তুর ধারণামাত্র যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে কিরূপে?

শ্রীমা ২রা মাঘ কাশী হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস কলিকাতায় পৌঁছেন এবং তথায় মাসাধিক অবস্থানের পর ১১ই ফাল্গুন জয়রামবাটী যাত্রা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ তীর্থদর্শন। তাঁহার মর্ত্যলীলার অবশিষ্ট বৎসরগুলি দেশ ও কলিকাতায় ব্যয়িত হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামে

বিষ্ণুপুরে রেল লাইন হওয়ার পরে শ্রীমা ঐ পথেই যাতায়াত করিতেন। প্রথম প্রথম বিষ্ণুপুরে পরিচিত কেহ না থাকায় তিনি পোকাবাঁধ ও লালবাঁধ নামক বিশাল দীর্ঘিকাদ্বয়ের একটির তীরে বিশ্রাম করিতেন এবং চটিতে রন্ধনাদির ব্যবস্থা হইত। পরে সুরেশ্বর সেন মহাশয়ের গড়দরজার বাড়ি শ্রীমা ও ভক্তগণের বিশ্রামস্থানে পরিণত হয়। স্বামী সদানন্দ ১৩১৫ সালের শেষে ও ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে যখন বিষ্ণুপুরে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন, তখন সুরেশ্বরবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে দেহমন অর্পণ করেন। ১৩১৮ সাল হইতে ঐ পথে গমনাগমনকালে শ্রীমা ঐ বাড়িতে দুই-এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন; কোন সময় দুই-এক দিন থাকিয়াও যাইতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "ওগো, বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন; তুমি দেখো।" শ্রীমা তখন ধারণা করিতে পারেন নাই যে, উহা কালে তাঁহার সদর রাস্তায় পরিণত হইবে; তাই বলিয়াছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ; কি করে দেখব?" ঠাকুর তবু পুনরুক্তি করিয়াছিলেন, "না গো, দেখবে, দেখবে।" একবার বিষ্ণুপুর হইয়া যাইবার সময় শ্রীমা লালবাঁধের ধারে সর্বমঙ্গলার মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কথা তো আজ সত্যি হল।" বিষ্ণুপুর বর্তমানে হতশ্রী হইলেও প্রাচীন ভক্তিমান রাজাদের বহু কীর্তি অঙ্কে ধারণপূর্বক তাহার স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং পোকাবাঁধ, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ প্রভৃতি বিপুল তড়াগসমূহ এখনও সকলের বিস্ময়োৎপাদন করে। শ্রীমা এই সমস্ত দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

১৩১৯ সালের ফাল্গুনের গোড়ায় কোয়ালপাড়ায় সংবাদ পৌঁছিল যে, শ্রীমা আসিতেছেন। তাই নির্দিষ্ট দিনে আশ্রমবাসী বালকগণ অনেক দূরে আগাইয়া গিয়া তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহাদের দুইজন ছুটিয়া গিয়া আশ্রমে এই সুসংবাদ প্রচার করিল; বাকি একজন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মায়ের গাড়ির গাড়োয়ানের আসনে বসিয়া সজোরে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি তো বেশ গাড়ি হাঁকাতে জান দেখছি! তা সব কাজই শিখে রাখা ভাল।" যথাকালে গাড়ি আশ্রমে আসিলে শ্রীমা কেদারবাবুর মায়ের হাত ধরিয়া নামিলেন—গরুর গাড়িতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকায় তাঁহার বাতগ্রস্ত চরণ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সকলে প্রণাম করিয়া

চলিয়া গেলে তিনি বাঁড়ুজ্যেপুকুরে সামান্য স্নান করিলেন ও পূর্বোক্ত ছেলেটিকে বলিলেন, "তুমি কাপড়টা ছেড়ে গামছা পরে ফুল তুলে পূজার জোগাড়টা করে দাও তো!" বালক না জানিয়া মায়ের ভিজা গামছা পরিয়াই ফুল তুলিতে চলিল। অমনি কেদারবাবুর মা হাঁকিয়া বলিলেন, "ওরে মার গামছা পরেছিস যে রে—ছাড়, ছাড়।" শ্রীমা কিন্তু বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? ছেলেমানুষ আমার গামছা পরেছে তো কি হয়েছে? বেটাছেলে, দোষ নেই; তুমি ফুল তুলে নিয়ে এস।"

ফুল তোলার পর কেদারবাবুর মা ফুল বাছিতেছেন, পূর্বোক্ত বালক চন্দন ঘষিতেছে, কিশোরী মহারাজ (পরবর্তী নাম স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) রান্না করিতেছেন, আর পরম ভক্ত ও একান্ত অনুগত কেদারবাবু শ্রীমায়ের পার্শ্বে বসিয়া কথা কহিতেছেন। তিনি বলিলেন, "মা, আপনার সব ছেলেই বিদ্বান —আমরা এই কয়টি আপনার একেবারে মূর্খ সন্তান।" মা শুনিয়া বলিতেছেন, "সে কি গো? ঠাকুর যে লেখাপড়া তেমন কিছুই জানতেন না। ভগবানে মতি হওয়াই আসল। তা তোমার দ্বারা এদেশে অনেক কাজ হবে। এইসব ছেলেরা আমার কত কাজ করছে। ভাবনা কি? ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। তোমাদের ভালবাসি—তোমরা আমার আপন লোক।" আহারাদি করিয়া কিছু বিশ্রামের পর তিনি ঐ দিনেই পালকিতে জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন।

১৩২০ সালে বর্ষার প্রথমে জয়রামবাটীতে খুব ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ হয়। তখন আনুড়ের ডাকঘর হইতে সপ্তাহে দুইদিন চিঠি বিলি হইত। ঐ সময় আবার আমোদর নদে বন্যা হওয়ায় কিছুদিন ডাক আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে দীর্ঘকাল সংবাদ না পাওয়ায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামী সারদানন্দজী কলিকাতা হইতে লোক পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমা আমাশয়ে ভুগিতেছেন; অতএব কোতুলপুরে চিঠি ডাকে দিয়া এই সংবাদ কলিকাতায় পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার্থে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও সেবার জন্য নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্তা সুধীরা দেবী জয়রামবাটী আসিলেন। দুই-একদিন পরে যোগীন-মার ভগিনী কালীদাসী এবং মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীও আসিলেন। শ্রীমা ইহাদের যত্নে শীঘ্রই নিরাময় হইলেন; কিন্তু কলিকাতা হইতে আগত এতগুলি লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান তাঁহার নিকট এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বর্ষাকালে পল্লীর রাস্তা নগরবাসীর পক্ষে অব্যবহার্য। আবার তরিতরকারি তখন একেবারে দুর্লভ। সুতরাং শ্রীমা কোয়ালপাড়ার আশ্রমবাসীদিগের স্পষ্টই বলিলেন যে, এরূপ অবস্থায় তাঁহারাই ভরসা। ইঁহারাও প্রত্যহ দুইবেলা শাকসবজি ও অন্যান্য

বস্তু পেঁৗছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং জয়রামবাটীতে থাকিয়া সমস্ত কার্য করিতে লাগিলেন। মাকে সুস্থ দেখিয়া ডাক্তার কাঞ্জিলাল চলিয়া গেলেন।

এদিকে জলে ভিজিয়া অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সকলেই জ্বরে পড়িলেন। আট-দশ দিন আর তাঁহাদের কোন খবর নাই। শ্রীমায়ের ভয় হইল যে, আশ্রমবাসীরা হয়তো অসুখে পড়িয়াছে। তিনি আশ্রমাধ্যক্ষের কৃপণতার কথা জানিতেন বলিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট উদ্বেগেরও সঞ্চার হইল। অবশেষে জনৈকা স্ত্রীলোক-দ্বারা সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য। তাই আবার ঐ স্ত্রীলোকের হাতেই রাধুকে দিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "শ্রীমান কেদার, ও আশ্রমে আমিই ঠাকুরকে বসিয়েছি। তিনি সিদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অতএব আমি বলছি, ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্ততঃ শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে; আর যেমন করেই হোক তিন তরকারির কম ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝবে কেমন করে?" ইত্যাদি।

১৩২০ সালের ১৩ই আশ্বিন শ্রীমা কলিকাতায় চলিয়া যান। পর বৎসর তিনি কেদারবাবুকে লিখিয়া পাঠান, "তোমরা যদি কোয়ালপাড়াতে আমার জন্য একখানা ঘর করে রাখতে পার, তাহলে দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে থাকি। জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারের ঝামেলা দিন দিন বাড়ছে; আর ওদের জ্বালা সব সময় সহ্য করতে পারি না। সামান্য একটু অসুখ-বিসুখ হলে দেশে একটু ঠাঁইনাড়া হবার উপায় নেই।" ইত্যাদি। চিঠি পাইয়া আশ্রমের কর্মীরা পরম উৎসাহে কায়িক পরিশ্রম করিয়া কেদারবাবুর পুরাতন ভিটাতে মায়ের আবাস-বাটী নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। পৃথক পৃথক তিনখানি ঘর, একখানি চালা এবং একটা খাটা পায়খানা সমেত একটি বাড়ি শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া গেল। পরে এই বাড়ির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'জগদম্বা আশ্রম'।

১৩২২ সালের ৬ই বৈশাখ শ্রীমা জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কোয়ালপাড়ায় ঐ নূতন বাটী দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন; তবে জানাইলেন, "এবার আর থাকা হবে না—সঙ্গে সব অনেকগুলি আছে (রাধু, মাকু, তাহাদের স্বামীরা, ইত্যাদি)। এদের সব জয়রামবাটী গিয়ে রেখে পরে নিরিবিলি হয়ে রাধুকে নিয়ে এসে দিন কতক থাকব।" এই বলিয়া তিনি জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন।

তিন মাস পরে শ্রীমায়ের কোয়ালপাড়ায় আসার দিন স্থির হয়। তখন শ্রাবণ মাস। নির্ধারিত দিনে সকাল হইতেই অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আশ্রমবাসীরা ভাবিতে লাগিলেন, এই দিনে শ্রীমাকে আনিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা। অবশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অন্ততঃ সত্যরক্ষার

জন্য যাওয়া উচিত—আসা না আসা মায়ের ইচ্ছা। এই দুর্যোগে কোন প্রকারে পালকি লইয়া বিকালে তিনটা-চারিটায় জয়রামবাটী পৌঁছিবামাত্র কালীমামা গর্জিয়া উঠিলেন, "তোমরা যেমন বাঁদর—দিদির ভক্ত হয়েছ! কেদারের তাঁতী-বুদ্ধি কিনা। যোগেন মহারাজ দিদির কি সেবাটাই করেছেন. শরৎ মহারাজ কি রকম সাবধানে সব কাজ করেন—কী তাঁদের ভক্তি! আর তোমরা এই বাদলে কি বলে দিদিকে নিতে এলে?" শ্রীমা সব শুনিতেছেন ও ভক্তদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তাই একটু ভরসা পাইয়া কোয়ালপাড়া হইতে আগত একজন বলিলেন, "আমাদের কি সাধ্য আছে যে, মাকে নিয়ে যাই বা তাঁর সেবা করি। আজ পালকি নিয়ে আসবার কথা আগেই ঠিক ছিল. তাই এসেছি।" মা তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা কথা রাখতে পার আর আমি বুঝি পারি না? আমাকে এখন নিয়ে চল, রাধু ওরা সব তখন পরে যাবে।" এই কথা শুনিয়া কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ হার মানিয়া বলিলেন, "তা কি হয়? এই বাদলে কেউ বাড়ির বার হতে পারছে না, আর আপনাকে আমরা ভিজিয়ে নিয়ে গিয়ে কি অসুখ করাব?" তখন কালীমামাও হাসিতে লাগিলেন। পালকি রাত্রির অন্ধকারে ফিরিয়া গেল।

ইহার পরের মাসে শ্রীমা রাধু. মাকু. নলিনীদিদি, ছোটমামী প্রভৃতিকে লইয়া কোয়ালপাড়ার নূতন বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং পনর দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া গেলেন —অধিক দিন থাকা হইল না।

এই বৎসর জয়রামবাটীতে 'জগদ্ধাত্রীপূজায় যাঁহার ভাণ্ডারী হইবার কথা ছিল তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় কোয়ালপাড়ার একজন বালক ভক্তকে ঐ কাজ লইতে হইল। তিনি অব্রাহ্মণ; তাই মা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, "একটু আলগোছ রেখে কাজগুলি করো, তা হলেই হবে এখন।" ঐ অঞ্চলে সমাজের বাঁধা-বাঁধি তখন খুবই বেশি ছিল. এখনও শহর অপেক্ষা অধিক। একবার ভগিনী নিবেদিতা মায়ের জননীকে বলিয়াছিলেন, "দিদিমা. তোমার দেশে যাব, তোমার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করব।" দিদিমা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "না, দিদি উ কথাটি বলোনি। তুমি আমার হেঁশেলে ঢুকলে দেশের লোক আমাদের ঠেকো (একঘরে) করবে।" একবার 'জগদ্ধাত্রীপূজার পরিবেশনের কার্যে নিরত সেজোমামার কপালে জনৈক সন্ন্যাসী হোমের ফোঁটা দেওয়াতে ব্রাহ্মণ জমিদারবাবুরা অনাচারের প্রতিবাদকল্পে ও জাতিনাশভয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়েন—শ্রীমা প্রভৃতির বহু অনুরোধেও আর বসেন নাই, অধিকন্তু পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করেন। পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় জয়রামবাটী আসিয়া ঐ সংবাদ জানিতে পারেন। তিনি সঙ্গে গ্রামোফোন আনিয়াছিলেন; গ্রামবাসীকে উহা বাজাইয়া শুনাইতে

লাগিলেন। পল্লীগ্রামে তখন উহা অভিনব বস্তু; সুতরাং সেই আসরে জরিমানা আদায়কারীরাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমায়ের অপমানের প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ পাইয়া বীরভক্ত তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, টাকা ফিরাইয়া না দিলে তিনি তাঁহাদিগকে গুলি করিবেন। বলা বাহুল্য, টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। এই সব অদ্ভুত কীর্তির জন্য ললিতবাবু ভক্তমহলে 'কাইজার' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রীমা পল্লীগ্রামের এই জাতীয় সংকীর্ণতাকে মানিয়া লইলেও ভক্তদের সহিত ব্যক্তিগত ব্যবহারকালে এই সকল কৃত্রিমতাকে যথাসম্ভব অস্বীকার করিয়াই চলিতেন। তিনি তিন দিন দেবীপ্রতিমা রাখিয়া পূজা করিতেন এবং মামীদের সহিত মণ্ডপে যাইয়া অঞ্জলি প্রদান করিতেন। তৃতীয় দিন (একাদশীর) রাত্রে সাধু-ব্রহ্মচারীরা দেবীর গান গাহিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ "মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর। সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার।"—এই গানখানি বারংবার গাহিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। শ্রীমা সবই শুনিতেছিলেন। পরে কোয়ালপাড়ার ভক্ত বালকটিকে বলিলেন, "আহা, গানটি বেশ জমেছিল। তাই তো, ভক্তের আবার জাত! সব ছেলেই তো এক। আমার ইচ্ছা হয়, সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে। যাহোক, মুড়িতে আর দোষ নেই। কাল এক কাজ করো—খুব সকালে কামারপুকুরে গিয়ে সত্যময়রার দোকান থেকে বড় বড় জিলিপি দুসের নিয়ে এসো।" পরদিন প্রায় নয়টায় জিলিপি আসিল। শ্রীমা উহা ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিয়া একখানি বড় থালায় প্রচুর মুড়ি রাখিয়া উহার চারিপার্শ্বে সাজাইয়া দিলেন; পরে তিনি থালাখানি ভক্তদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহারা সকলে একসঙ্গে আমোদ করিয়া খাইতে থাকিলে পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে গ্রামের লোকেও জানিয়া লইল যে, শ্রীমায়ের ভক্তেরা একটা বিশেষ স্তরের লোক। একদিন তিনি বাড়ির সদর দরজার সম্মুখে রোয়াকে বসিয়া আছেন; সম্মুখে অনেকগুলি বালক খেলা করিতেছে। দূরদেশ হইতে আগত কয়েকজন নূতন ভক্ত উহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন; একটি বালক তখন সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কারা?" জিজ্ঞাসিত বালক বিজ্ঞের মতো বলিল, "কেন, ওরা ভক্তেরা! জানিসনি?" পরে তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে বিজ্ঞ বালক উত্তর দিল, "কেন, জানিসনি?—ওরা ভক্ত।" মা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ, ছেলেদের মুখ থেকে অনেক সময় যা বেরোয়, সব ঠিক ঠিক। ওরা বুঝে নিয়েছে, ভক্ত একটা জাত!"

১৩২২ সালের শীতকালের একটি ঘটনা একদিকে যেমন কৌতুকাবহ,

অপরদিকে তেমনি শ্রীমায়ের বিপদে স্থৈর্যের পরিচায়ক। ঐ সময় পূজনীয়া গৌরী-মা একদিন শ্রীমাকে দেখিতে কোয়ালপাড়া হইয়া জয়রামবাটী যান। কোয়ালপাড়া হইতে তিনি ব্রহ্মচারী বরদাকে সঙ্গে লইলেন। আমোদরের ধারে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে গৌরী-মার মাথায় একটা খেয়াল উঠিল। সন্ধ্যার সময়ে মায়ের বাড়ির দরজায় পৌঁছিলে তিনি বরদা মহারাজকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া একটু ভিতরে ঢুকিলেন ও ভিখারীদের অনুকরণে ডাকিলেন, "মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা!" ছোটমামী বারান্ডা হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গো?" গৌরী-মা আবার করুণস্বরে ডাকিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই, মা!" ঐ অসময়ে পুরুষের চেহারা দেখিয়াই ছোটমামী—"ওগো, ঠকুর-ঝি গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মা ধীরভাবে বাহিরে আসিয়া দৃঢ়-স্বরে বলিলেন, "কে রে!" গৌরী-মা পূর্বস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই, মা! আমি রাত-ভিখারী।" অন্ধকারে মুখ দেখিতে না পাইলেও গলার স্বর শুনিয়াই শ্রীমা গৌরী-মাকে চিনিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "ও! গৌরদাসী! এস, এস! কখন এলে?" তখন সকলে মিলিয়া খুব হাসাহাসি হইল; ছোটমামী লজ্জায় আর ঘরের বাহিরে আসিলেন না।[১]

শ্রীমা জয়রামবাটীতে আসিলে বড়মামার বাড়িতেই বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার সঙ্গী অনেক, ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মামাদের সংসারও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় ঐ বাড়িতে থাকা উভয়তঃ অসুবিধাজনক ছিল। অতএব মাতাঠাকুরানীর অনুমোদনক্রমে পুণ্যপুকুরের পশ্চিমতীরে একটি নূতন বাড়ি নির্মিত হয়। উহাতে প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীমায়ের জন্য দক্ষিণদ্বারী ঘর, উহার দক্ষিণে পশ্চিমমুখে বৈঠকখানা বা 'জগদ্ধাত্রীপূজা মণ্ডপ, মায়ের ঘরের ঠিক উলটা দিকে নলিনী-দিদি ও ভক্ত মেয়েদের বাসস্থান এবং বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে রন্ধনশালা; ইহার পরে উত্তর ধারে চালা নামাইয়া আর একখানি ছোট রান্নাঘর। ১৩২৩ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে, ১৯১৬) নূতন বাড়ীর গৃহপ্রবেশকার্য আনু-ষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইল। ঐ বাড়ির ভূমি-সংগ্রহের সমকালেই পুণ্যপুকুরও বহু অর্থব্যয়ে ক্রীত হয় এবং উহার সংস্কার করা হয়। শ্রীমা এই বাড়িতে প্রায় চারি বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

গৃহপ্রবেশের দিনে একটু অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল; শ্রীমায়ের ভক্তবাৎসল্যের

১ 'গৌরী-মা' পুস্তকের ১৯১-৯২ পৃষ্ঠার সহিত এই বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দের) বর্ণনার অনুসরণ করিলাম।

দৃষ্টান্তরূপে তাহাও এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ গৃহনির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহপ্রবেশের আয়োজন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃস্থানীয় দুই-এক জন ধনী, মানী ও বিদ্বান গৃহস্থের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তাঁহারা স্থির করেন যে, প্রতিষ্ঠাদিবসে উপস্থিত থাকিবেন না। ঐ দিন শ্রীমায়ের মনে কেমন যেন একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি বারবার তাঁহাদের সন্ধান করিতে থাকিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই আসিলেন না এবং না আসার কারণও কেহ বলিল না। দুই-এক দিন পরেই দ্রব্যসম্ভার মাথায় করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলেন। উত্তর তাঁহাদিগকে দিতে হইল না—দিলেন নলিনীদিদি। শ্রীমা তাঁহাদের না আসার কারণ জানিলেন এবং ইহাও শুনিলেন যে জনৈক ভক্তের পরামর্শ মতো এবারে তাঁহাকে কোয়ালপাড়া হইয়া বিষ্ণুপুরের পথে না লইয়া গড়বেতার পথে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে। সমস্ত শুনিয়া মা বলিলেন, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! কোয়ালপাড়ার ছেলেরা আমার জন্য, ভক্ত ছেলেদের জন্য, সেখানে ঘাঁটিটি করে আগলে বসে আছে; তারা আমাদের জন্য কি না করে? যোগ্যতা নেই—দিলে তাদের দুটো কথা বলে মনঃক্ষুণ্ণ করে; অমুকের কথায় এই সব নিয়ে নদীনালা পার হয়ে গড়বেতা দিয়ে আমাকে যেতে হবে? এসব বুদ্ধি তাকে কে দিয়েছে? কোয়ালপাড়ার ছেলেরা দেশে আমার এখন ডান হাত, বাঁ হাত। যে যা-ই বলুক, কোয়ালপাড়া দিয়ে আমাকে চিরকাল যাতায়াত করতে হবে।" শ্রীমায়ের সেই স্নেহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যে ভক্তদের হৃদয় বিগলিত হইল—তাঁহারা জানিলেন, মা সত্যকারের মা।

গৃহপ্রবেশের সময় স্বামী সারদানন্দজী বৃন্দাবনে ছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি শ্রীমাকে লইয়া আসিবার জন্য গৃহপ্রবেশের প্রায় দেড় মাস পরে জয়রামবাটী যাইলেন। স্থির হইল যে, ফিরিবার পথে কোতুলপুরের সব-রেজিস্ট্রারের দ্বারা নূতন বাড়ি এবং 'জগদ্ধাত্রীর জন্য ক্রীত কিছু ধান্যক্ষেত্রের অর্পণনামা রেজিস্ট্রি করানো হইবে। ঐ সমস্ত সম্পত্তি শ্রীমা 'জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণ করিয়া বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের উপর উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতেছেন। জয়রামবাটীতে মাত্র কয়েক দিন থাকিয়াই ৬ই জুলাই সায়াহ্নে সারদানন্দজী শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া পরদিন (২৩শে আষাঢ়, ১৩২৩) সব-রেজিস্ট্রারকে আনয়নপূর্বক রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় সারদানন্দজীর শ্রীমায়ের প্রতি আনুগত্য-জনিত সৌজন্যদর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সব-রেজিস্ট্রার জাতিতে মুসলমান ও বয়সে সাতাশ-আটাশ বৎসরের যুবক হইলেও সারদানন্দজী দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে সিগারেট প্রদান প্রভৃতি শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক

নিজেই পাখা করিতে লাগিলেন—যেন অতি সাধারণ ব্যক্তি। অবশেষে নির্বিঘ্নে কার্যসমাধা হইলে সন্ধ্যার পরে ভদ্রলোককে পালকিতে রওয়ানা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেই রাত্রেই তাঁহারা আহারান্তে গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুরে যাত্রা করিলেন। পরদিন সকালে বিষ্ণুপুরে সুরেশবাবুর বাড়িতে পোঁছিয়া সেখানে সারাদিন বিশ্রাম করিলেন; পরে রাত্রের ট্রেনে কলিকাতায় চলিলেন। প্রায় সাত মাস কলিকাতায় 'উদ্বোধনে' থাকিয়া শ্রীমা ১৮ই মাঘ (৩১শে জানুআরি, ১৯১৭) পুনরায় জয়রামবাটি যাত্রা করিলেন। পরে কোয়ালপাড়ায় নিজ বাড়িতে ('জগদম্বা আশ্রমে') উঠিয়া দুই দিন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া গেলেন।

১৩২৪ সালে নূতন বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজায় তিনি এই প্রথম উপস্থিত আছেন। দুর্গাপূজার পর হইতেই দিন গণিতেছেন—"আর এই কদিন আছে। মা আমার এ সময় এই আয়োজন করতেন, কত যত্ন করে সব যোগাড় করতেন। কি করে কি হবে বল দেখি?" কালীপূজার দিন বলিতেছেন, "মা আজ থেকে সলতে পাকাতেন"; এই বলিয়া প্রদীপের সলিতা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সকাল হইতে তিনি গলবস্ত্র হইয়া মধ্যে মধ্যে দেবীর নিকট গিয়া প্রণামান্তে প্রার্থনা করিতেছেন, যাহাতে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। হলদিপুকুরের এক ভট্টাচার্য পূজক এবং মামাদের কুলগুরু তন্ত্রধারক। পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীমা কুলগুরুকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। পূজারীকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি সরিয়া গিয়া বলিলেন, "মা, আপনি আমাদের প্রণাম করছেন কি? আশীর্বাদ করুন!" কুলগুরুর বোধ হয় এতক্ষণে চৈতন্য হইল; কিন্তু তিনি দীনতা না দেখাইয়া বরং নিজ আচরণ সমর্থনের জন্য বলিলেন, "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" শ্রীমাও "তা বই কি" বলিয়া সায় দিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে সাতবেড়ের লালু জেলে আসিয়া ধরিল, "পিসীমা, আমি বাউল-গান করব।" শ্রীমা অসম্মতি জানাইলেন, অসুবিধার কথা তুলিলেন; কিন্তু লালু বলিল যে, সে নিজেই সামিয়ানা, লণ্ঠন ইত্যাদি যোগাড় করিবে; ঐজন্য অপর কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। শ্রীমা বলিলেন, "কেন লোক হাসাবি লালু? তার চেয়ে অমনি বসে দু-একখানি গান জগদ্ধাত্রীকে শুনিয়ে পরে প্রসাদ পেয়ে যাস।" লালু কিন্তু কোন কথা শুনিল না। নিজেই সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া লণ্ঠনটি ঝুলাইয়া সন্ধ্যার পরে আলখাল্লা পরিয়া ঢোলক-কাঁধে আসরে নামিল। তারপর দুই-চারিটি হাস্যরসের গান গাহিয়া সকলকে হাসাইয়া বিদায় লইল।

জগদ্ধাত্রীপূজার পর হইতে শ্রীমায়ের শরীর খারাপ যাইতেছিল। পৌষ-

মাসে জ্বর খুব বাড়িয়া গেল। তাই সংবাদ পাইয়া সারদানন্দজী তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঃ কাঞ্জিলাল, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সরলা দেবী[১] প্রভৃতিকে লইয়া ২১শে জানুআরি (১৯১৮) জয়রামবাটী পেঁাছিলেন। শ্রীমা বলিলেন, "আমি কাঞ্জিলালের ওষুধ খাব।" তাহাই হইল; ঔষধ-ব্যবহারের ফলে তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইলেন। কিন্তু তদপেক্ষাও ফলপ্রসূ হইল স্বামী সারদানন্দজী প্রভৃতির উপস্থিতি। ইহাদিগকে পাইয়া এবং ইঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া শ্রীমা যেন অচিরে দেহের রোগ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই সময় জয়রামবাটীতে এক উৎপাত জুটিয়াছিল। তখন রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্বত্র কড়া পুলিসের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা লোকজনের চলাচলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত; এমন কি, শ্রীমায়ের বাটীতে আসিয়াও ভক্তদের নামধাম লিখিয়া লইয়া যাইত। অন্তরীণদের মধ্যে দুই-চারি জন শ্রীমায়ের ভক্ত ছিলেন; বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গীয় সাধুদের গমনাগমনে পুলিসের সন্দেহ বর্ধিত হইয়াছিল। জয়রামবাটীর শ্রীমায়ের বাড়ি পুলিসের নিকট 'মাতাজীর আশ্রম' বলিয়া পরিচিত ছিল। কোয়ালপাড়ার আশ্রমও তাহাদের অনুরূপ চিন্তার বিষয় ছিল। ইহা শ্রীমায়ের পক্ষে এক বিষম উদ্বেগের কারণ ছিল। ইহা দূরীকরণার্থে শ্রীমায়ের স্নেহভাজন ভক্ত বিভূতিবাবু চেষ্টা করিয়া একবার বাঁকুড়ার পুলিসের এক বড় কর্মচারীকে জয়রামবাটী লইয়া আসেন। তিনি মাতাঠাকুরানীকে দর্শন ও প্রণামান্তর তাঁহার স্নেহাশিস লাভে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, পুলিসের জন্য মায়ের কোন ভয়-ভাবনা হয় কিনা। ভদ্রতার খাতিরে বিভূতিবাবু প্রশ্নটিকে একটু চাপা দিতে চাহিলেন; কিন্তু শ্রীমা সরলভাবে বলিলেন, "ভয় হয় বই কি, বাবা?" এই উত্তর শুনিয়া পুলিস কর্মচারী তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। তখন হইতে খোঁজখবর রাখা ছাড়া পুলিস অন্য কিছু করিত না; এমন কি, স্থানীয় থানার দারোগা প্রভৃতিও শ্রীমাকে সম্মানের চোখে দেখিতেন। স্বামী সারদানন্দজী জয়রামবাটীতে সদলবলে আসিলে গ্রাম্য চৌকিদার অম্বিকা আসিয়া সকলের নাম-ধাম লিখাইয়া লইয়া গেল। পাছে তাঁহাদের ভুল-ত্রুটির জন্য শ্রীমায়ের কোন অসুবিধা হয়, এই জন্য সারদানন্দজী সকলকে ঠিকভাবে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া দিতে বলিলেন।

---

১ অতি কৈশোরেই ইনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে আসিয়া ভগিনী নিবেদিতা ও সুধীরা দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হন। নয়-দশ বৎসর বয়সে ইনি বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে শ্রীমায়ের দর্শন পান এবং ১৯১৩ খ্রীঃ হইতে শ্রীমায়ের তিরোধান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সুযোগমত তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করেন।

শরৎ মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া যান; কিন্তু তিনি যাইতে রাজী হইলেন না। অগত্যা শ্রীমায়ের সেবার জন্য সরলা দেবীকে এবং মা সম্মত হইলে তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য অপর একজনকে রাখিয়া সকলে ফিরিয়া গেলেন। দিন পনর পরেও শ্রীমায়ের যাইবার ইচ্ছা হইল না দেখিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিও বিদায় লইলেন।

ক্রমে শিবরাত্রি সমাগতপ্রায়। উহার পূর্বদিন বিকালে চৌকিদার অম্বিকা আসিয়া খবর দিয়া গেল, আগামীকল্য শিরোমণিপুরের দারোগা আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে স্বামী জ্ঞানানন্দ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া চিকিৎসার জন্য কাটিহারে ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে থাকিতেই শ্রীমায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি একবার জয়রামবাটী ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কাটিহারে ফিরিয়া গেলে পুলিস মনে করে যে, অঘোরবাবুর নজরবন্দী যে ভ্রাতা ফেরার হইয়াছেন তিনিই আত্মগোপন করিয়া জ্ঞানানন্দ নামে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে বাস করিতেছেন। সুতরাং জ্ঞানানন্দের সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতে লাগিল। অম্বিকা জানাইয়া গেল, থানার আলোচনা হইতে সে বুঝিয়াছে যে, এই উপলক্ষেই দারোগা আসিতেছেন। তদন্তের বিষয় জানা থাকিলেও তখনকার দিনে সর্বশক্তিমান পুলিসের পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ মাত্র দিন কয়েক পূর্বে সিন্ধুবালার ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাটীর সকলের মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেও তাঁহারা শ্রীমায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে বিরাজিত রহিয়াছে এক অভয়পূর্ণ স্থৈর্য ও প্রসন্নতা। সুতরাং আপাততঃ সকলেই ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। রাত্রে শ্রীমা চিরদিনের অভ্যাসমত সন্তানদের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে খাওয়াইলেন—তখনও পরদিবসের জন্য কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিন আরামবাগের উকিল মণীন্দ্রনাথ বসু আসিয়া পড়িলেন; ইনি শ্রীমায়ের আশ্রিত। তাঁহাকে দেখিয়া মাতাঠাকুরানীর মন বেশ প্রসন্ন হইল। মায়ের বাটীতে উপস্থিত সেবক মণীন্দ্রবাবুকে সব বলিয়া রাখিলেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু লোকজন সহ উপস্থিত হইলেন। মণিবাবুর সঙ্গেই প্রায় কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে শ্রীমা ভিতর হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, দারোগাবাবুর জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। মণিবাবুর সঙ্গে দারোগাবাবু ভিতরে গিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় লইলেন। তদন্তপর্ব এইভাবেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীমায়ের কলিকাতা যাওয়া হইল না। অতএব কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ অনুনয় জানাইলেন যে, তিনি কিছুদিন সেখানে গিয়া থাকিলে স্বাস্থ্যের

উন্নতি হইবে এবং তাঁহাদেরও সাতিশয় আনন্দ হইবে। তদনুসারে ফাল্গুনের শেষে তিনি কোয়ালপাড়া যাইলেন। এই সময় হইতে পরবৎসরের (১৩২৫) ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। বরদা মহারাজ তখন শ্রীমায়ের নির্দেশানুসারে জয়রামবাটীতে থাকিতেন; তবে প্রায়ই তাঁহাকে কোয়ালপাড়ায় যাইতে হইত। একদিন আন্দাজ এগারটার সময় গিয়া তিনি দেখেন, জগদম্বা আশ্রমে একটা চাঞ্চল্যের ভাব। খবর লইয়া জানিলেন, শ্রীমায়ের ভাবসমাধি হইয়াছে—'ঠাকুর' এই কথা বলিয়াই তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। চোখে-মুখে জল দিবার পরে তিনি সহজভূমিতে নামিলে নলিনীদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসীমা, অমন হল কেন?" মা বলিলেন, "কই, কি হল? ও কিছু নয়। তোদের ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।" অনেক পরে 'উদ্বোধনে' শেষ অসুখের সময় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বরদা মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "জয়রামবাটী থেকে দুর্বল শরীর নিয়ে এসে একদিন দুপুরে বারান্ডায় বসে আছি। নলিনীরা একটু দূরে বসে কি সব সেলাই করছে। খুব রোদ—চারিদিক রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। দেখি—যেন সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠান্ডা বারান্ডায় বসেই শুয়ে পড়েছেন। আমি তাই দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলটা পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে ঐ অবস্থায় কেমন হয়ে গেলুম। কেদারের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগল। তাই তাদের তখন বললুম, ও কিছু নয়।" আলোচ্য ঘটনার পরেও তিনি কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুবার দর্শন পাইয়াছিলেন। 'উদ্বোধনে' পূর্বোক্ত কথাবার্তার দিনেই তিনি বরদা মহারাজকে বলিয়াছিলেন "কোয়ালপাড়াতে অত জ্বর হত; বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়তুম। কিন্তু হুঁশ হলে যখনই তাঁকে শরীরটার জন্য স্মরণ করতুম, তখনই তাঁর দর্শন পেতুম।"

কোয়ালপাড়ায় অবস্থানের শেষ দিকে শ্রীমায়ের জ্বর হয় এবং তাহা ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করে। জ্বর দ্বিপ্রহরে ১০২-১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিত। তাপবৃদ্ধি হইলে তাঁহার হাত জ্বালা করিত; তখন কাহারও অনাবৃত শীতল দেহে উহা রাখিতে পারিলে তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করিতেন। অসুখের ঘোরে শ্রীমা শরৎ মহারাজকে খুব খুঁজিতেন; তিনি তখন কলিকাতায়। অসুখ বাড়িতেছে দেখিয়া ১০ই এপ্রিল (১৯১৮) তাঁহাকে তারযোগে খবর দেওয়া হইল। তিনিও সেই রাত্রেই দুই জন সাধুর সহিত ডাক্তার কাঞ্জিলালকে পাঠাইয়া দিলেন এবং ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী ও যোগীন-মাকে লইয়া নিজে ১৭ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলেন।

শরৎ মহারাজ ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিয়া সোজা মায়ের বিছানার ধারে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন; তারপর ধীরে ধীরে মায়ের শিয়রের দিকে

তক্তপোশের উপর বসিলেন। তখন জ্বর বাড়িতেছে, আর শ্রীমা কিছু ধরিবার জন্য যেন হাতড়াইতেছেন। শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, জ্বর বৃদ্ধির সময় শ্রীমা কোন ঠাণ্ডা জিনিসের উপর হাত রাখিবার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জামা খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের হাত দুখানি আনিয়া নিজের দেহের উপর রাখিলেন। শ্রীমা 'আঃ' বলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঘোমটা টানিলেন না। কাজেই উপস্থিত সকলে ভাবিলেন যে, তিনি জ্বরের ঘোরে সারদানন্দজীকে চিনিতে পারেন নাই। পরদিন জ্বর ত্যাগ হইল এবং ২১শে এপ্রিল তিনি অন্নপথ্য করিলেন। তখন ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ক্রমে মাতাঠাকুরানীর একটু বলসঞ্চার হইলে শরৎ মহারাজ একদিন সকালে প্রস্তাব করিলেন, "মা, এবারে আর আপনাকে ছেড়ে যাব না—আমরা সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যাব।" শ্রীমাও আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একবার জয়রামবাটী গিয়ে যাত্রাটা বদলে আসতে হবে।" তাই ২৯শে এপ্রিল শরৎ মহারাজের সহিত তিনি জয়রামবাটী যাইলেন; ডাক্তার সতীশবাবু কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমা জয়রামবাটীতে পৌঁছিলে গ্রাম-বাসিনীরা তথায় সমবেত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "মা, আমরা যে আর আপনাকে দেখতে পাব, এ আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনি যে সকলকে নিয়ে আজ এখানে এলেন, তাতে আমাদের সকলের খুব আনন্দ।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, খুব অসুখটায় ভুগলুম। শরৎ কাঞ্জিলাল এরা এসে পড়ল—মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলুম। শরৎ বলছে কলকাতায় যেতে। তা তোমরা সকলে মত কর তো গিয়ে একটু সেরে আসি।' সকলে আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীমায়ের যখন কোয়ালপাড়ায় অসুখ, তখন রাধু হঠাৎ তাজপুরে শ্বশুর-বাড়িতে চলিয়া যায়। সে তাঁহার সহিত কলিকাতায় যাইবে কিনা জানিবার জন্য শ্রীমা তাজপুরে লোক পাঠাইলেন। রাধু জানাইয়া দিল যে, সে আপাততঃ যাইবে না।

শ্রীমা মাত্র সাত-আট দিন জয়রামবাটীতে থাকিয়া কলিকাতায় যাইবেন। যাত্রার পূর্বদিন পুণ্যপুকুরে জাল দিয়া মাছ ধরা হইতেছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ পাড়ে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছেন, "আরও ধর, আরও ধর।" যখন প্রায় বিশ-পঁচিশ সের ধরা হইয়া গিয়াছে তখন বলিতেছেন, "এত মাছ ধরে ফেললি; এখন কি করবি? মা-ই বা কি বলবেন?" অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "বেশ তো! আপনি আমায় আদেশ দিলেন—আমি কি জানি? আপনি যা করবেন, তাই হবে।" এ যেন মায়ের ভয়ে দুই ভাইয়ের পরস্পরের উপরে দোষ চাপানোর চেষ্টা! অবশেষে শরৎ মহারাজ নির্দেশ দিলেন, "যা, মাকে সব

দেখিয়ে আজ মামাদের বাড়ির সকলকে নিমন্ত্রণ কর। বেশী করে তেল এনে মাছগুলোর কতক আস্ত আস্ত ভেজে সকলের পাতে এক একটি দিতে বলগে যা।" শরৎ মহারাজের ঐরূপ ইচ্ছা জানিয়া শ্রীমা খুব আহ্লাদিত হইলেন। মামারাও অত বড় মাছ-ভাজা (অল্পাধিক আধ সের) বোধহয় পূর্বে খান নাই; অতএব খুবই খুশী হইলেন। সাধুরা যখন খাইতে বসিলেন, তখন বৃষ্টি শুরু হইয়াছে—বারান্ডা পর্যন্ত জলের ঝাপটা আসিতেছে। তাই শরৎ মহারাজ সকলের পাতা পশ্চিম কোণে নিজের কাছে টানিয়া একত্র ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। সাধুদের প্রথমে একটু সঙ্কোচ হইলেও শরৎ মহারাজের আগ্রহ এবং মায়ের মুখে প্রসন্নতা দেখিয়া একপাত্রেই আহার চলিতে লাগিল এবং মা সহাস্যে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

পরদিন (৫ই মে, ১৯১৮; ২২শে বৈশাখ, ১৩২৫) শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় গিয়া একরাত্রি বিশ্রাম করিলেন; পরে ঘোড়ার গাড়িতে বিষ্ণুপুর যাত্রা করিলেন। ৭ই মে বেলা সাড়ে দশটায় সকলে উদ্বোধনে পৌঁছিলেন।

এবারে কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্রীমায়ের জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনা শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর দেহত্যাগ (৩০শে জুলাই, ১৯১৮; ১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫)। সেদিন সকাল হইতে মায়ের চক্ষে জল ঝরিতেছিল; বিকালে মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত!" কিছুক্ষণ পরে মাঝের ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুরের বড় ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া মর্মভেদী কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর, নিলে!" শুনিয়া উপস্থিত সকলেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

রাধু

রাধুর স্বাস্থ্য ও স্বভাব ছেলেবেলায় ভালই ছিল। তাহার বালিকা-সুলভ সরল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোন ভাবনা ছিল না এবং অর্থের প্রতিও সে স্পৃহাশূন্য ছিল। শ্রীমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত এবং গর্ভধারিণীকে বলিত 'নেড়ী মা'; কেননা পাগলী মামীর মাথা প্রায়ই নেড়া থাকিত। শ্রীমাকে নিজের জিনিস দুইহাতে বিলাইতে দেখিয়া রাধুর মা হিংসায় জ্বলিতেন; কখনও বলিয়া ফেলিতেন, "সব দিয়ে ফেললে; পরে রাধীর কি উপায় হবে?" আবার কখনও কখনও দুহিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরঝি অপরকে সব দিয়ে দিচ্ছে, তোর জন্যে তো আর কিছু রাখছে না—তুই কেন ওখানে পড়ে আছিস? চলে আয় আমার ঘরে।" তাঁহার এই সব কথায় রাধু বিরক্তি প্রকাশ করিত এবং ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিত। তাহার কোন জিনিসের অভাব ছিল না—শ্রীমা তাহাকে যথেষ্ট দিয়াছিলেন। ঐগুলি ব্যবহার করিতে সে ভালবাসিত; কিন্তু অপরেও শ্রীমায়ের নিকট ঐরূপ পাইলে বা তাহাদের প্রাপ্ত জিনিসগুলিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিলে সে হিংসা করিবে কেন?

সে ভালই ছিল; কিন্তু বিধির বিপাকে পরে অসুস্থ হইল এবং বিবাহের পর তাহার অসুখের মাত্রা বাড়িতে লাগিল, মেজাজও তেমনি রুক্ষ হইতে থাকিল। তাই শ্রীমা এই সময়ে একদিন কেদারবাবুকে বলিয়াছিলেন, "কি জান, বাবা, আগে আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানারোগ, আবার বিয়েও হল! এখন ভয় হয়—পাগলের মেয়ে, শেষে পাগল না হয়। শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলুম।" ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মানবলীলার অবলম্বনভূতা যোগমায়াস্বরূপিণী এই কন্যাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেও ইহার জন্য শ্রীমাকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল; আর সে দুঃখময় পরিণতির আভাস রাধুর আচরণাদি হইতে ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলিই এই বিষয়ে প্রমাণ। জনৈক স্ত্রীভক্ত এক-সময়ে একটি ছেলেকে মানুষ করিতে চাহিলে তিনি রাধুর জন্য নিজের অবস্থা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "অমন কাজও করো না। যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে; কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না, আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি।" ইহা অপেক্ষাও গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীমা একদিন উদ্বোধনের বাড়িতে বলিয়াছিলেন, "কি ঠাকুরের লীলা, মা দেখছ! মায়ের বংশটি আমার কেমন দিয়েছেন! কি কুসংসর্গই করছি দেখ!

এইটি তো (ছোটমামী) পাগলই, আর একটিও (নলিনী) পাগল হবার গতিক হয়েছে। আর ঐ দেখ, আর একটি (রাধু)। কাকেই বা মানুষ করেছিলুম, মা, একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারাণ্ডায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে—কখন স্বামী ফিরবে! মনে ভয়—ঐ গানবাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐ খানেই ঢুকে পড়ে, দিনরাত সামলে নিয়ে আছে—কি আসক্তি, মা। ওর যে এত আসক্তি হবে, তা তো জানতুম না।”

রাধু একদিকে যেমন শ্রীমায়ের দেহধারণের অবলম্বন, অপর দিকে তেমন তাঁহার জীবনের একটা দিক প্রকাশের উপলক্ষ। বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে এই জীবনে যে মহত্ত্বগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাধারণ লোকে তাহার প্রকৃত মর্ম এই প্রতিকূল অবস্থাকে বাদ দিয়া কখনই বুঝিতে পারিত না। অনুকূল আবেষ্টনে যে চরিত্রমাধুর্য বিকশিত হয়, তৎসম্বন্ধে গৃহীরা সহজেই বলিতে পারেন, তেমন জীবন হইতে তাঁহাদের কিছুই শিখিবার নাই; কারণ ঐরূপ আদর্শ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আবার সন্ন্যাসীর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া অনেক বুদ্ধিমান মনে মনে হাসিয়া বলেন, “ইহারা সংসারের আনন্দ কিছু না জানিয়া অযথা একটা কাল্পনিক দুঃখময় ছবি আঁকিয়া সংসারসুখকে অবজ্ঞা করিতেছে।” এই উভয় শ্রেণীর লোকের পক্ষেই মাতাঠাকুরানীর জীবন অতীব শিক্ষাপ্রদ। তিনি সংসারকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দৈবজীবনের লীলাখেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অভিজ্ঞতাসম্ভূত; অথচ তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে বৈরাগ্য সুপরিস্ফুট।

১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে রাধুর আঙ্গুলে ফোড়া হওয়ায় সে শ্বশুরবাড়ি হইতে কলিকাতায় যাইতে চাহিল। তাই শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় কেদারবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রাধু তাঁহার নিকট কলিকাতায় আসিতেছে; সঙ্গে মন্মথ (জামাই) ও রাধুর মা আসিবেন। রাধু যদি বলে, তবে ব্রহ্মচারী বরদাকে যেন তাঁহাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। রাধু কোয়াল-পাড়ায় আসিয়াই বরদা মহারাজকে সঙ্গে যাইতে বলিল; কাজেই তিনিও চলিলেন। কলিকাতায় আসিয়া দিন পনর পরেই রাধু সুস্থ হইলে বরদা মহারাজ ছোটমামীকে লইয়া জয়রামবাটী ফিরিলেন। তাঁহাকে আবার অগ্রহায়ণ মাসে ছোটমামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে হইল; রাধু তখন পুনরায় অসুস্থ।

পৌষমাসে একদিন (১৬ই পৌষ, ১৩২৫: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৮) বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী জানাইলেন যে, স্বামী সারদানন্দজীর নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, শ্রীমা ঐ দিন বিকালেই রাধুকে লইয়া মঠে আসিবেন এবং উত্তর দিকের বাগানবাটীতে থাকিবেন; অতএব ঐ বাড়ি যেন

অবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। রাধু তখন অন্তঃসত্ত্বা; ঐ সময়ে তাহার দেহমনের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, কোন শব্দ সহ্য হয় না। কলিকাতার বাহিরে থাকা আবশ্যক বোধে শ্রীমা এই বাড়ি পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দিনই বিকালে সংবাদ আসিল, তিনি আসিবেন না। উদ্যানবাটীর পার্শ্বেই মঠের ঠাকুরঘর; সেখানে পূজাকালে আরতির ঘণ্টা বাজে, আরতিতে স্তবগান হয়; গঙ্গাতে স্টীমারের বাঁশি আছে; আবার কয়েকদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব। কাজেই রাধু কোলাহলময় বেলুড়ে যাওয়া পছন্দ করে না। শ্রীমা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে বাস করিবেন। পরদিন সকালেই সংবাদ লইবার জন্য শিবানন্দজী ব্রহ্মচারী বরদাকে কলিকাতায় মায়ের নিকট পাঠাইলেন। মা তাঁহাকে পাইয়া খেদ করিয়া বলিলেন, "এই দরিয়া নিয়ে এখানে এসে পড়লুম। কি যে হবে, বরদা। তাও এখানে কদিন থাকে দেখ। রাধু সব সময় শুয়ে থাকে, বুকে কোন শব্দ সহ্য হয় না। এ যে কি রোগ, বাবা! কি করে যে উদ্ধার হবে, ঠাকুরই জানেন।"

দিন কয়েক পরেই শ্রীমা বলিলেন, "শুনছ? রাধুর আর এখানেও ভাল লাগছে না। বলে, 'দেশে চল।' কিন্তু ঐ তো অবস্থা! দেশে ডাক্তার কবরেজ তেমন কে আছে? এখানে কত সুবিধা ছিল। যখন যা ধরবে তাই করে ছাড়বে, শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখ।" স্বামীজীর উৎসবের দিন হঠাৎ মঠে গুজব রটিল, শ্রীমা পরদিন সকালের ট্রেনে দেশে যাইতেছেন। ব্রহ্মচারী বরদার ডাক পড়িল; তাঁহাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। তিনি যখন সন্ধ্যায় উদ্বোধনে পোঁছিলেন, তখন শ্রীমা পেটরা, বিছানা প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য নারিকেলের দড়ি গুছাইতেছেন; ব্রহ্মচারীকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই অগাধ দরিয়া (অর্থাৎ রাধুকে) নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমরাই আমার সেখানে ভরসা। এই দড়ি-টড়ি দেখে নিয়ে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল। এখনও কিছুই গোছানো হয় নি। তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে থেকে দড়ি গোছাচ্ছিলুম।" অনেক রাত্রিতে কাজ সারিয়া বরদা মহারাজ নিচে নামিলে সারদানন্দজী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা—মা তোকে তাঁর কাজের জন্য যতদিন রাখেন, তুই তাঁর কাছে থাকিস।" বরদা সহজেই সম্মত হইলেন। ঐ দিন হইতে শ্রীমায়ের লীলা-সংবরণ পর্যন্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন।

পরদিন সকালে (১৩ই মাঘ, ১৩২৫; ২৭শে জানুআরি, ১৯১৯) শ্রীমা, রাধু, রাধুর মা, নলিনীদিদি, মাকু, নবাসনের বউ (মন্দাকিনী রায়)[১] প্রভৃতি

---

১ গোঘাট থানার অন্তঃপাতী নবাসন গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে ইঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু শীঘ্রই ইনি বিধবা হন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভের কিছুকাল পরে ইনি তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবাদি করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর যাত্রা করিলেন। দুইজন সাধুও তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যাইলেন। বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া সকলে সুরেশ্বরবাবুর বাড়িতে উঠিলেন। পরদিন সকালে বৈঠকখানায় চা-পান চলিতেছে, এমন সময় সুরেশ্বরবাবু এক-জন ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোককে সঙ্গে আনিয়া বলিলেন, "ইনি একজন ভাল জ্যোতিষী, এখানেই বাড়ি; কলকাতায় গুরুর কাছে থাকেন। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী।" ইহাতে সকলেরই কৌতূহলবুদ্ধি হওয়ায় হাত-দেখানো চলিতে লাগিল। রাধুর হাত দেখিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, 'এঁর সুখপ্রসব হবে না।" মাকুর হাত দেখিয়া বলিলেন, "এঁর পর পর কয়েকটি সন্তানের পরস্পর দেখা হবে না।" শুনিয়া মাকু শশব্যস্তে শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীমা তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া অতঃপর জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা তুমি ছেলেমানুষ। এরকম কোন অরিষ্ট-যোগ আছে দেখলেও ওকে না বলে গোপনে আমাদের বললেই হত। যা হোক, তোমাদের জ্যোতিষী বিধানে এর কোন প্রতিকার থাকলে বল। তার ব্যবস্থা না করলে মাকুকে প্রবোধ দেব কি করে? তারপর বিধির যা ইচ্ছা।" জ্যোতিষী বলিলেন, "আমাদের মতে এখন তিনদিন মঙ্গলবারে চণ্ডী নিজে পাঠ অথবা শ্রবণ করে তারপর হোম, স্বস্ত্যয়ন—এগুলি করতে হয়।" মাকুর ছেলে ন্যাড়ার বয়স তখন আড়াই বৎসর। সে খুব বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান এবং সকলের প্রিয়পাত্র। এদিকে মাকুর দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার মাত্র দুই-তিনমাস বাকি। কাজেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে বেশ ভাবাইয়া তুলিল।

১৫ই মাঘ প্রত্যুষে ছয়খানি গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া আট মাইল দূরে জয়পুরে আসিয়া তাঁহারা এক চটিতে রান্নার বন্দোবস্ত করিলেন। রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে; পাচক ফেন গালিবার জন্য পাঁচসের চাউলের হাঁড়িটি উনান হইতে নামাইবে এমন সময় হঠাৎ উহা ভাঙিয়া গেল—ভাত ও ফেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আবার রান্না করিতে গেলে অত্যন্ত দেরী হইবে ভাবিয়া সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। শ্রীমা কিন্তু একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি খড়ের একটা নুড়া দ্বারা ধীরে ধীরে ফেন সরাইয়া ভাতগুলি উপর উপর হইতে টানিয়া একত্র করিলেন। তারপর হাত ধুইয়া এবং বাক্স হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিখানি বাহির করিয়া একধারে বসাইলেন। অনন্তর একটি শালের কাঠি দিয়া কতকগুলি ভাত একখানা শালপাতায় তুলিয়া ও উহাতে ডাল-তরকারি সাজাইয়া দিয়া যুক্তকরে ঠাকুরকে বলিলেন, "আজ এই রকমই মেপেছ—শীগগির শীগগির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।" মায়ের কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন, "যখন যেমন তখন তেমন তো করতে হবে। নাও, তোমরা সব এখন বসে খাও দেখি।" সকলের

আহার শেষ হইয়া গেলে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তথাপি কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল।

কথা ছিল যে, কোয়ালপাড়ায় দুই-একদিন থাকিয়াই শ্রীমা জয়রামবাটী চলিয়া যাইবেন; কিন্তু পল্লীর নীরবতায় রাধুর দুই রাত্রি সুনিদ্রা হওয়ায় সে সেইখানেই থাকিতে চাহিল। শ্রীমাও কালীমামা প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রাধুর পক্ষে সব দিক দিয়া কোয়ালপাড়াই ভাল। অতএব ঐ সময় হইতে ১৩২৬ সালের ৭ই শ্রাবণ পর্যন্ত শ্রীমা 'জগদম্বা আশ্রমে'ই বাস করিতে লাগিলেন। এখানে কোয়ালপাড়ার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

কোয়ালপাড়ার আশ্রমটি কোতুলপুর হইতে দেশড়াগামী সদর রাস্তার ঠিক উপরে। শ্রীমায়ের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি—জগদম্বা আশ্রম—সেখান হইতে সওয়া দুইশত গজ পূর্বে, গ্রামের শেষ প্রান্তে। ঐ বাড়ি নির্জন ও চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। মায়ের বাসগৃহখানি বেশ বড়: উহার মেজে সিমেণ্ট করা। পার্শ্বে রান্নাঘর। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখানি বড় ঘরে সাত-আট জন স্ত্রীভক্ত থাকিতে পারেন। দক্ষিণ-পশ্চিমের অপর একখানি ঘরে পুরুষ ভক্তেরা দিনের বেলা দেখা করিতে আসিলে একটু বসিতে পারেন। উহার ভিতর দিকের বারাণ্ডায় ঢেঁকি ইত্যাদি আছে। ঐ বাড়ির দক্ষিণে প্রায় একশত হাত দূরে কেদারবাবুর বাস্তুবাড়ি। শ্রীমা প্রথমে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া সেখানেই পদার্পণ করেন। বাড়িতে পূর্বদ্বারী একখানি বড় ঘর; উহার পূর্বে কেদার-বাবুদের ছোট ঠাকুরঘর। উত্তরে গরু রাখিবার চালা-ঘর। চারিদিকে প্রাচীর। বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণে কাঁটা-গাছের জঙ্গল; পশ্চিমে একটি ডোবা; উত্তরে কয়েকটা কয়েত-বেলের গাছ ও তেঁতুল গাছ। নিকটে অন্য কাহারও বাড়ি নাই। রাধুর এই শেষোক্ত বাস্তুবাড়িই পছন্দ হইল।

কোয়ালপাড়ায় মায়ের দীর্ঘ অবস্থানের সুযোগে আলাপাদির সুবিধা হইবে বলিয়া অনেক সাধু ও ভক্ত সেখানে আসিতেন। পুরুষদের আহারাদি আশ্রমে ও মেয়েদের জগদম্বা আশ্রমে হইত। উভয় আশ্রমে সময়ে সময়ে দৈনিক চল্লিশখানি পর্যন্ত পাতা পড়িত।

এখানে পাঁচ-সাত দিন অবস্থানের পর শ্রীমা বরদা মহারাজকে বলিলেন, "আজকাল মনের যে কি হয়েছে—যা চিন্তা ওঠে তাই উপস্থিত হয়, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক। রাধুর তো এই বুনো জঙ্গলটাই পছন্দ হল—নির্জন কিনা! আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি সারাদিন কাজকর্মে বাইরে যাওয়া-আসা যাই কর, সন্ধ্যার সময় থেকে কিন্তু এখানে এসে আমার কাছেই থেকো আর খাওয়া-দাওয়া এখানেই করো। বড় ভয় হয়, বাবা! রাজেনকেও বলেছি; সে রাত দশটা-এগারটার পর আশ্রমের সব কাজ সেরে আসতে পারবে।"

সেই দিন হইতে বরদা মহারাজ সন্ধ্যা হইতে এগারটা পর্যন্ত রাধুর বাড়ির সদর দরজার বাহিরে কয়েত-বেল গাছের তলায় চৌকি পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। শ্রীমাও আসিয়া আস্তে আস্তে গল্প করিতেন। রাধু তখন বুকে কতকগুলি কাঁথা জড়াইয়া সর্বদা শুইয়া থাকিত—একটুও শব্দ সহ্য হইত না; তাই বালতির হাতলে, দরজার শিকলে—সব ধাতুময় জিনিসে—নেকড়া জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীমা একদিন বলিলেন, "দেখ, যে জঙ্গল—কোনদিন ভালুক-টালুক না বেরিয়ে পড়ে।" বরদা মহারাজ আশ্বাস দিলেন যে, ঐ অঞ্চলে কখনও ভালুক আসে নাই। মা তথাপি বলিলেন, "কে জানে, বাবা, যা অন্ধকার—ভয় হয়।" দুই-একদিন পরে সত্য সত্যই শোনা গেল, এক মাইল দূরে দেশড়ার মাঠে এক প্রকাণ্ড ভালুক আসিয়া এক বৃদ্ধাকে গোবর কুড়াইবার সময় মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ভালুককেও গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমা বলিলেন, "দেখলে আজ ভালুকের কাণ্ড। অম্বিকার (জয়রামবাটীর চৌকিদার) শাশুড়ীকে নাকি মেরে ফেলেছে। তুমি বলেছিলে, এদেশে ভালুক নাকি নাই।"

জ্যোতিষীর নির্দেশানুসারে মাকুর ফাঁড়া কাটাইবার জন্য প্রায় সাত দিন যাবৎ যথাবিধি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হইয়া গেলে সন্ধ্যায় শ্রীমা বলিলেন, "ঠাকুরের সেবার জন্য নবতখানায় কি কষ্টেই না থাকতে হত; তবু কোন কষ্টই গায়ে লাগত না, কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত। আর এখন পড়েছি এদের জন্য এই কষ্টে। মাকুর মনস্তুষ্টির জন্য কাজগুলি আজ সমাধা হল। জঙ্গলে তোমাদের নিয়ে বসে আছি—ধর্মকর্ম, জপতপ সব গেল! এখন তাঁর কৃপায় ভালয় ভালয় রাধু উদ্ধার হলে হয়।" কথা চলিতেছে, এমন সময় নবাসনের বউ আসিয়া বলিলেন, "ও দাদা, শুনেছেন? আজ দুপুরে মা ও আমি এখানে দাওয়াতে বসে আছি—বেশ নির্জন। মা বলছেন, 'সেই কাক দুটি কদিন এসময়ে এসে ঐ গাছে বসে বড় চীৎকার করত, রাধুও বিরক্ত হত। কিন্তু কই, আজ কদিন থেকে সেগুলিকে আর দেখতে পাইনে।' মা ঐ কথা বলতে না বলতে কাক দুটি এসে গাছে ডেকে উঠল।" শ্রীমা হাসিয়া, "হাঁ, বাবা" বলিয়া উহার সমর্থন করিলেন।

১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে কয়েক দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটায় কয়েক জন গাছতলায় বসিয়া আছেন। শ্রীমা অকস্মাৎ বলিলেন, "দেখ, সেই শিহড়ের পাগলটা, কই, অনেক দিন আসেনি। বদ্ধ পাগল! গান-টানগুলি কিন্তু বেশ গায়। কিন্তু বড় ভয় করে, বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে মেচিয়ে উঠে।" নবাসনের বউ অনুযোগ করিলেন, "আর তার নাম কেন, মা? যদি এখন এসে পড়ে, এই রাত্রিবেলায়?" মা বলিলেন, "কে জানে, মা! হাঁ, তুমিও যেমন, এই বাদলে নদী পার হয়ে কি করে আসবে?"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে পাগল একটা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া এক বোঝা সজিনা শাক বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হইয়া শ্রীমাকে বলিল, "তোমার জন্য সজনে শাক নিয়ে এনু।" নবাসনের বউ ভয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়া দরজায় খিল দিলেন। মা বলিলেন, "যা, যা, এত রাত্রে গোল করিস নে।" সে উত্তর দিল, "এখন যাব কি করে? নদীতে বান যে?" বরদা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "তবে এলি কি করে?" সে কহিল, "সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।" মা তখন তাহাকে অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "লক্ষ্মীটি, গোল করিস নে।" পাগল অমনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ইহার পরে সেখানে আর ঐ জাতীয় ঘটনা হয় নাই।

এদিকে রাধুর অসুখ সারে না—বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহানুভূতি-সম্পন্ন অনেকেই আসিয়া প্রতিকারের নানা উপায় বলিতেছেন। শ্রীমা সবই শুনিতেছেন এবং সম্ভবস্থলে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না—তিনি কাহারও মনে ক্ষোভ রাখিতে চাহেন না। ১৩২৫-এর ফাল্গুনের প্রথমে নলিনীদিদি বলিলেন, "দেখ, পিসীমা, রাধুর মা যখন পাগল হয়েছিল, তুমিই তো তাকে তিরোলের ক্ষেপা কালীর বালা পরিয়েছিলে; তবে সে ভাল হল। আমার মনে হচ্ছে, রাধুকেও বালা পরালে সব সেরে যাবে। সেও পাগলের ছিট পেয়েছে; তা না হলে খাওয়া পরা সব ঠিক আছে, অথচ অমন করে সর্বদা শুয়ে থাকতে পারে?" অমনি সতর মাইল দূরে তিরোলে লোক পাঠাইয়া পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া বালা আনানো হইল। বালা সন্ধ্যায় আসিলে উহা রাত্রে গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হইল—মাটিতে রাখা নিষেধ! পরদিন সকালে বিধিপূর্বক বালা পরানো হইল। কিন্তু রাধুর কোন উপকার দেখা গেল না; শুধু তাহার মায়ের পাগলামি একটু বাড়িল—বিনা কারণে মাথা গরম, আর নলিনীদিদির সহিত কথায় কথায় ঝগড়া হইতে লাগিল। দিনকয়েক পরে মামী শ্রীমাকে বলিলেন, "তুমি কলকাতা থেকে রাধুকে এখানে নিয়ে এলে কেন? কলকাতা থাকলে সব ব্যবস্থা হত। এখন গরম পড়ে আসছে; সেখানে থাকলে মাথায় বরফ দিলে ভাল হয়ে যেত।" শ্রীমা পাগলীকে শান্ত করিবার জন্য বিষ্ণুপুর হইতে বরফ আনাইলেন। বরফ দেওয়া চলিতেছে, এমন সময় কালীমামা আসিয়া উহা দেখিয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি পাগলীটার কথা শুনে আসন্নপ্রসবার মাথায় বরফ দিতে গেলে? ঠান্ডা লেগে আর একটা কিছু না হয়। দিদি, তুমি বুঝছ না—কলকাতায় বড় বড় ডাক্তাররা যখন হার মেনেছে, তখন ও রোগ-টোগ কিছু নয়। আমার মনে হয় কোন দৈব অথবা ভুতুড়ে হাওয়া লেগেছে। সুষণেগেড়েতে একজন চাঁড়াল তান্ত্রিক সাধক আছে; তাঁকে একবার নিয়ে এসে সে কি বলে দেখই না একবার।" অমনি বরফ দেওয়া বন্ধ হইয়া তাঁহাকেই আনার ব্যবস্থা হইল। কালীমামা ও বরদা মহারাজ

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই সাধক কিছু সরিষা তাঁহাদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি সব বুঝতে পেরেছি। দু-এক দিনের মধ্যেই আমাকে সেখানে যেতে হবে—আদেশ পেলাম!"

পরদিন বৈকালে সাধক আসিলে শ্রীমা গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রাধুর অবস্থা সজলনয়নে এমন ভাবে বর্ণনা করিলেন, যেন তিনি খুবই বিপদে পড়িয়াছেন এবং এই সময়ে সাধকই একমাত্র ভরসাস্থল। সাধক রোগিণীকে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন যে, ইহা ভৌতিক ব্যাপার। কিন্তু তিনি ঔষধের যেসব অদ্ভুত উপকরণের কথা বলিলেন, তাহা সংগ্রহ করা বোধ হয় কোন কালেই কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। পাঁচ সের কৃষ্ণ তিল ঘানিতে পিষিয়া ঐ তেলের সহিত আধমণ ওজনের একটা রোহিত মৎস্যের তেল ও পিত্ত, নানা দুর্গম স্থান হইতে সংগৃহীত লৌহ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি এবং বৃষের গোময় একসঙ্গে মিশাইয়া ঘুঁটের জ্বালে পাক করিলে যে তৈল প্রস্তুত হইবে, তাহা মালিশ করিতে হইবে; অধিকন্তু মাদুলি ধারণ ইত্যাদি করিতে হইবে। শ্রীমা প্রথমে খুবই আগ্রহ দেখাইলেন; কিন্তু পরে যখন বুঝিলেন যে, ইহা এক অসম্ভব ব্যবস্থা, তখন হতাশ হইয়া বলিলেন, "আমি তো সকল দেবতাদের মান্য করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; কিন্তু কেউ মুখ তুলে চাইছেন না। বিধির বিধান যা আছে—রাধুর কপালে যা আছে—তাই হবে। ঠাকুর, তুমিই রক্ষাকর্তা।" একদিকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরনির্ভরতা, অপর দিকে রোগ-নিবারণের জন্য তাঁহারই নিকট মাতৃহৃদয়ের আন্তরিক আকুলতা—উভয়ের মিশ্রণে এই দৃশ্যটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে শ্রীমা রাধুর জন্য চন্ড নামাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। আশ্রমের পার্শ্বে একখানি পোড়ো ঘরে 'চন্ডের' পূজা ও বলি দেওয়া হইল। চন্ড নানা উৎকট ঔষধের বিধান দিয়া পরে চন্ডের ভট্টাচার্যের বাড়ি হইতে মালিশের তেল আনিতে আদেশ করিলেন। সবই করা হইল; কিন্তু রাধুর অসুখ সারিল না।

দশজনের প্রবোধের জন্য এবং কর্তব্যবোধে শ্রীমা এইরূপ অনেক জিনিসই করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু এই সমস্তের মধ্যেও তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। একদিন রাধুর সুখপ্রসবের জন্য চিকিৎসক আনার প্রস্তাব উঠিলে তিনি প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন, "কুকুর শেয়ালরা যে বনে থাকে, তাদের কি আর প্রসব হয় না?"

১৩২৬ সালের বৈশাখের শেষে কোয়ালপাড়ায় সংবাদ পৌঁছিল যে, শ্রীমায়ের সেবিকা নবাসনের বউ-এর বৃদ্ধা মাতা তাঁহাদের বাড়িতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই এবং দেখাশোনারও লোক নাই। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীমা বৃদ্ধাকে কোয়ালপাড়ায় আনাইলেন এবং আরামবাগের

ডাক্তার শ্রীযুত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিলেন; কিন্তু বৃদ্ধার আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছিল—দুই-এক দিনের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ের মধ্যে দুইটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রথম ঘটনা মাকুর পুত্র ন্যাড়ার মৃত্যু (৭ই বৈশাখ, ১৩২৬; ২০শে এপ্রিল, ১৯১৯) এই সদ্‌গুণবান ছেলেটি শ্রীমায়ের খুবই স্নেহপাত্র ছিল। কাজেই তাহার অকালমৃত্যুতে শ্রীমা মর্মন্তুদ শোক পাইলেন। দ্বিতীয় ঘটনা রাধুর পুত্রসন্তানলাভ। তাহার দীর্ঘকালব্যাপী স্নায়বিক অবসাদ-দর্শনে চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রসবের সময় অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। এইজন্য বাঁকুড়া হইতে বৈকুণ্ঠ ডাক্তার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে ধাত্রীবিদ্যাকুশলা সরলা দেবীকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অস্ত্রোপচার বিনাই ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ রাধুর পুত্র জন্মাইলে সকলেই সুখী হইলেন। প্রসবের পরে কিন্তু রাধুর পীড়া সমভাবে চলিতে লাগিল, বিশেষতঃ অবসাদ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। ন্যাড়ার বিয়োগের পর রাধুর এই অবস্থায় শ্রীমা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এইসব কথা বলেন আর কাঁদেন। নবাসনের বউ-এর মা দেহত্যাগ করিলে প্রভাকরবাবু বিদায় লইতে আসিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, "মা, সংসারে বড় যন্ত্রণা। কি করব!—সংসার করে ফেলেছি। মা, আমাদের কিসে শান্তি হবে? সংসার মোটেই ভাল লাগছে না।" শ্রীমা চক্ষের জল ফেলিয়া সহানুভূতিপূর্ণস্বরে উত্তর দিলেন, "ঠিক কথা, বাবা, সংসারে কোন শান্তি নেই। ঠাকুর আছেন, রক্ষা করবেন তোমাদের। কিন্তু বাবা, সংসার করা বা আত্মীয়স্বজন নিয়ে সংসারে থাকা মহাপাপ। রাধীটার বিয়ে দিয়ে মহা অন্যায় করেছি, এখন ভুগছি।"

১৩২৬ সালের ৪ঠা শ্রাবণ সকলকে লইয়া শ্রীমায়ের জয়রামবাটী যাইবার দিন স্থির হইয়াছিল। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় দিন পালটাইয়া ৭ই শ্রাবণ যাওয়া হয়। সন্তান হওয়ার পরও রাধু সাত-আট মাস যাবৎ এত দুর্বল ছিল যে, দাঁড়াইয়া হাঁটিতে পারিত না, হামাগুড়ি দিয়াই চলিত। সে কাপড়ও পরিত না; সুতরাং কাপড় দিয়া তাহার থাকিবার জায়গাটি ঘিরিয়া রাখিতে হইত। সময় সময় সে এতই অবুঝ হইত যে, তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিতে হইত। কেহ কেহ মনে করিতেন, এ সকল পাগলের খেয়াল, কেহ বা ভাবিতেন সত্যই দৈহিক অবসাদ। ইহারই মধ্যে সে আফিম খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে ও অধিক পরিমাণে উহা পাইবার জন্য শ্রীমাকে কষ্ট দেয়। তিনি আফিমের মাত্রা কমাইতে চাহেন; কিন্তু রাধু উহা মানিয়া লইতে রাজী নয়। ইদানীং মাতাঠাকুরানীর শরীরও ভাল যাইতেছে না—প্রায়ই জ্বর হয়। তাহার উপর আবার এই অত্যাচার!

সেদিন শ্রীমা তরকারি কুটিতেছেন; রাধু আফিমের জন্য আসিয়া বসিয়াছে। শ্রীমা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, "রাধী, আর কেন? উঠে দাঁড়া না; তোকে নিয়ে আর পারি নে। তোর জন্য আমার ধর্ম, কর্ম, অর্থ সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে যোগাই বল তো?" এইরূপ দুই-চারিটি অপ্রিয় কথা বলিতেই রাধু রাগিয়া গিয়া সামনের চুবড়ি হইতে একটা বড় বেগুন লইয়া শ্রীমায়ের পিঠে সজোরে ছুড়িয়া মারিল। দুম করিয়া শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় শ্রীমায়ের পিঠ বাঁকিয়া গেল এবং স্থানটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তিনি ঠাকুরের দিকে চাহিয়া যুক্তহস্তে বলিলেন, "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ!"—এই বলিয়া নিজের পায়ের ধুলা লইয়া রাধুর মাথায় দিলেন ও বলিলেন, "রাধী, এ শরীরকে ঠাকুর কোন দিন একটু শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস। তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে তোরা কি মনে করিস বল দেখি?" রাধু তখন কাঁদিয়া ফেলিল। মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "রাধী, আমি যদি রুষ্ট হই, ত্রিভুবনে তোর আশ্রয় নেই। ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না।"

সন্তান হওয়ার কিছু পূর্ব হইতে রাধুর আচরণে এক অপূর্ব পরিবর্তন আসিতেছিল। ঠিক তখনি মাতাঠাকুরানীর মর্ত্যলীলাও সমাপ্তপ্রায়—আর দুই বৎসর মাত্র বাকি আছে। ভক্তগণ শুনিয়া রাখিয়াছিলেন যে, শ্রীমায়ের মন যেদিন রাধুর উপর হইতে উঠিয়া যাইবে, সেদিন সে ঊর্ধ্বগামী চিত্তকে এই জগতে বাঁধিয়া রাখার আর কোন উপায় থাকিবে না—লীলাময়ীর লীলা সেদিন শেষ হইয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্তনীয় বিধানে ক্রমে ক্রমে সে স্নেহশৃঙ্খল যেন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িতেছিল।

রাধুর উপর হইতে শ্রীমায়ের মন বিগত কয়েক বৎসর হইতেই ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছিল। রাধু ক্রমাগত অসুখে ভুগিতেছে; রোগ আর সারে না—সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও খিট-খিটে হইতেছে—দেখিয়া শ্রীমা একদিন (২৯শে বৈশাখ, ১৩২০) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রাধীর উপর আমার একটুও মন নেই। রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে বিতৃষ্ণা হয়েছে। জোর করে মন টেনে রাখি। বলি, ঠাকুর, রাধীর উপর একটু মন দাও, নইলে ওকে কে দেখবে? এমন রোগও আর দেখিনি। জন্মান্তরীণ রোগ নিয়ে মরেছিল—প্রায়শ্চিত্ত করেনি।" মা মন নামাইয়া রাখিতে চাহিলেও মন যেন আর এ জগতে থাকিতে চাহিতেছিল না। এই অনিচ্ছার কারণ-স্বরূপে ভক্তদের চক্ষে ধরা পড়িত রাধুর রুগ্ন দেহ এবং অসুস্থ চিত্ত। শ্রীমা তাহাকে সৎশিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র আধারে উহা ধারণার শক্তি ছিল না! শ্রীমায়ের স্নেহ তাহার চরিত্রে কোমলতা না আনিয়া ঔদ্ধত্য ও আবদারই বাড়াইয়া তুলিতেছিল। আর জননীর মস্তিষ্ক-বিকৃতিও রাধুর চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া শ্রীমায়ের প্রতি তাহার ব্যবহারকে অতি

বিসদৃশ করিয়া তুলিতেছিল। শেষকালে সে শ্রীমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিত, গালাগালি দিত, এমন কি শ্রীঅঙ্গে হস্তক্ষেপও করিত। শ্রীমা রাধুর চরিত্রের পরিণতি দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "রাধী, তুই সিঙ্গির দুধ খেয়েও শেয়ালই রইলি। আমি যে তোকে এত করে মানুষ করলুম, আমার ভাব কিছুই নিলি নে—তোর মায়ের ভাবই সব নিলি?" রাধু রাগ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ ফিরাইল। শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন, "আমি না হলে তোর চলবে না—আমায় দেখে মাথায় কাপড় দিচ্ছিস?"

ব্যাপার ঐ স্তরেই শেষ হয় নাই। একবার শ্রীমা বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়িতে দেশে যাইতেছেন। কোতুলপুরের কাছে গাড়ি আসিলে রাধু শ্রীমাকে পায়ে ঠেলিয়া বলিতে লাগিল, "তুই সর, তুই সর, তুই গাড়ি থেকে নেমে যা।" শ্রীমা যথাসম্ভব গাড়ির পিছন দিকে সরিতে সরিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি যদি যাব, তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?" আর একবার রাধু শ্রীমাকে লাথি মারিতেই তিনি শশব্যস্তে "করলি কি, করলি কি, রাধী"—বলিয়া নিজের পায়ের ধূলো লইয়া তাহার মাথায় দিলেন।

রাধুর অত্যাচার ধাপে ধাপে উঠিতেছে, মায়ের মনও ক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়াছে—ইহার কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে কে বলিবে? বরং মনে হয়, ইহা যেন বিধির বিধানে একই ব্যাপারের দ্বিবিধ বিকাশ। স্নেহের স্থানে ক্রমেই আসিতেছে উদাসীনতা ও বৈরাগ্য। ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা যাইবার পূর্বে শ্রীমা রাধুকে দেখিবার জন্য শ্বশুরবাড়ি হইতে জয়রামবাটীতে আনাইলেন (১৮ই বৈশাখ) এবং রাধু পাল্কি হইতে নামিবামাত্র তাহাকে পূর্বের ন্যায়, "আয় মা, রাধু" বলিয়া হাত বাড়াইয়া বুকে জড়াইযা ধরিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, রাধুর ব্যক্তিত্ব তখন প্রকাশ পাইতেছে—সে স্বেচ্ছায় শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় ফেলিয়া শ্বশুর গৃহে গিয়াছিল এবং জিজ্ঞাসিত হইয়াও জানাইয়াছিল যে, সে তখন কলিকাতায় যাইবে না। সুতরাং সে স্বাধীনতাকে মানিয়া লইয়া তিনি নিজে কলিকাতা যাইবার পূর্বে তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাধু নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া শ্রীচরণে পড়িয়া প্রণাম করিল; মা একটুও বিচলিত না হইয়া প্রশান্তমুখে আশীর্বাদ করিলেন, স্থিরভাবে বিদায় দিলেন—যেমন আর দশজনকে দিয়া থাকেন; রাধুর সহিত যে তাঁহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল না।

তারপর ১৩২৬ সালে চৈত্রমাসের কথা। রাধু তখন কলিকাতায় শ্রীমায়ের কাছে আছে, রাধুর ছেলেও আছে। শ্রীমা খেদ করিয়া বলিতেছেন, "রাধুর জন্যেই আমার সব গেল—দেহ, ধর্ম, কর্ম, অর্থ, যা কিছু বলো। ছেলেটাকে তো মেরে ফেলবারই জো করেছে। এই এখানে এসে সরলার হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। আর কাঞ্জিলাল দেখছে। কাঞ্জিলাল বলেইছে, 'এ রাধুর কাছে থাকলে

আমি চিকিৎসা করতে পারব না।' ঠাকুরের যে কি ইচ্ছে—ওকে আবার ছেলে দেওয়া কেন, যে নিজের দেহেরই যত্ন জানে না। আবার তো নূতন রোগ করে বসেছে। একি হল, মা? যা হোকগে, আমি আর ওদের নিয়ে পারি নে। বাড়িতে কি অত্যাচারই করত! আমাকে কি ওরা গ্রাহ্য করত?"

১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ। উদ্বোধনে সন্ধ্যারতি শেষ হইয়া গিয়াছে। রাধুর ছেলেকে খাওয়াইবার তখনও সময় হয় নাই; খাওয়াইবার জন্য সরলা দেবীকে ডাকিতে লোক গিয়াছে। কিন্তু ছেলে কাঁদিতেছে বলিয়া রাধু পূর্বেই খাওয়াইতে চায়। শ্রীমা বারণ করায় রাধু গালাগালি দিতেছে, "তুই মর, তোর মুখে আগুন," ইত্যাদি। শ্রীমা দীর্ঘকাল অসুখে ভুগিতেছেন ও অবর্ণনীয় উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন; তাই আজ আর সহিতে না পারিয়া উত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, টের পাবি আমি মলে তোর দশা কি হয়।[১] আজ এই বৎসরকার দিনে, আমি সত্য বলছি—তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।" পরম অনুরাগের সহিত চরম বৈরাগ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ! সে ভাব না বুঝিয়া রাধু আরও বকিতে লাগিল। শ্রীমা আবেগভরে বলিলেন, "বাতাস কর, মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়।" ইহারই তিন মাস পরে শ্রীমা লীলা-সংবরণ করেন।

১ শ্রীমায়ের দেহত্যাগের নয় মাস পরে রাধুর স্বামী মন্মথ ১৩২৮ সালের ১১ই বৈশাখ [এপ্রিল, ১৯২১] দ্বিতীয় বার বিবাহ করে এবং স্বামীর সোহাগে বঞ্চিতা রাধু জয়রামবাটীতে আশ্রয় লয়। ঐ সময় শ্বশুরবাড়ির আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ হইয়া যায়। তাই পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ রাধুর জন্য যে মাসিক অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মন্মথ তাহাতে ভাগ বসাইবার জন্য প্রায়ই জয়রামবাটী আসিত; রাধু প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না।

গৃহিণী

পূর্ব অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে পাঠক নিশ্চয়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সাধক-কবির ভাষায় বলিয়া থাকিবেন, "জীবমঙ্গলে ভূতলে এলে, সহিলে কত না জ্বালা!" সে মর্মান্তিক দুঃখ-অপনোদনের পূর্বেই কর্তব্যানুরোধে আমাদিগকে অনুরূপ আর এক অধ্যায় রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, কারণ সত্য আমাদিগকে প্রকাশ করিতেই হইবে, উহা যতই নিদারুণ হউক না কেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান কালে যাঁহারা যুগপ্রবর্তনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণ বা লীলাবিলাস কেবল প্রাচীনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে আমরা এই সকল জীবনবেদের তাৎপর্য গ্রহণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইব না। এই সকল চরিত্রে বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষ যেমন ছিল, তেমনি ছিল দশের প্রতি অনিন্দ্য কল্যাণস্পৃহা। এখানে তিতিক্ষাদি গুণরাজি পর্বতকন্দরে অনুসৃত না হইয়া নগরের জনকোলাহলের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের মূর্তবিগ্রহ হইয়াও আপন্ন জননীর সেবা পরিত্যাগ করেন নাই, ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, সমীপাগতা সহধর্মিণীকে সাদরে গ্রহণপূর্বক শিক্ষাদীক্ষায় স্বীয় উত্তরাধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং জীবকল্যাণে জীবনপাত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দজী সর্বত্যাগী হইয়াও মাতার সেবা ও সমাজহিতার্থে হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু মোক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের মন সাধারণ অর্থে কখনও সংসারে লিপ্ত হয় নাই; অথচ তাঁহারও জীবনে পারিবারিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে এমন এক মাতৃসুলভ অতুলনীয় সহানুভূতি, ধৈর্যশীলতা, অনুকম্পা ও স্নেহমধুর ক্ষমা উৎসারিত হইয়াছিল, যাহার প্রয়োজন আমাদের নিকট বোধগম্য না হইলেও নবযুগের জন্য উহা নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। অতএব অর্থবোধের বৃথা চেষ্টা না করিয়া আমরা শুধু ঘটনাবলী বলিয়া যাইব মাত্র।

শ্রীযুক্তা যোগীন-মার মনে একবার সন্দেহ জাগিয়াছিল, "ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী—দিনরাত ভাই, ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়েই আছেন।" তারপর একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া জপ করিতেছেন, এমন সময় ভাবচক্ষে দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে।" যোগীন-মা দেখিলেন, এক রক্তাক্ত ও নাড়ীনাল-বেষ্টিত নবজাত শিশু ভাসিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে।

কখনও সন্দেহ করো না। ওকে আর একে (নিজদেহ দেখাইয়া) অভিন্ন জানবে।”

শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবনের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দৃষ্টি-গোচর হয় তাঁহার অনাসক্তি। কার্য তিনি করিতেছেন, এমন কি মনে হইতেছে তিনি যেন সাধারণ মানবেরই ন্যায় শোকতাপে জর্জরিত; কিন্তু পরমুহূর্তেরই আচরণে তাঁহার নির্লিপ্ত স্বরূপ মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে!

১৩২৫ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিকে বেলা দশটা-এগারটার সময় জয়রামবাটীতে শ্রীমা সদর দরজার রোয়াকে বসিয়া আছেন; সাধুব্রহ্মচারীরা বৈঠকখানার বারান্ডায় রহিয়াছেন; সম্মুখে কালীমামা ও বরদামামার খামারের ধান আসিতেছে। খামারের পথের দিকে কালীমামা একটু রাস্তা চাপিয়া বেড়া দিয়াছেন—বরদামামার ধানের বস্তা আনিতে অসুবিধা হইতেছে। ইহা লইয়া দুই ভ্রাতায় প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতির উপক্রম হইতেই শ্রীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহাদের নিকটে গিয়া কখনও একজনকে বলিতেছেন, “তোর অন্যায়” আবার কখনও অপরকে ধরিয়া টানিতেছেন। তিনি বয়সে ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বড়, উভয়কে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সুতরাং দিদির মধ্যস্থতায় হাতাহাতিটা হইল না, কিন্তু ঝগড়া আর থামিতে চায় না। শ্রীমাও ভ্রাতাদিগকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া সরিতে পারেন না। এমন সময় সাধুরা আসিয়া পড়ায় দুই ভাই গর্জন করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীমাও সক্রোধে স্বগৃহে আসিয়া বারান্ডার উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন। মুহূর্তেই রাগ কোথায় মিলাইয়া গেল; ক্রীড়াভূমিতুল্য এই সংসারের স্বার্থ-সংঘর্ষের পশ্চাতে যে শাশ্বত শান্তি রহিয়াছে, উহা তাঁহার নিকট উম্ঘাটিত হওয়ায় তখন তিনি হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, “মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে—এসব পড়েও থাকবে। জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না?” এই পর্যন্ত বলিয়াই মা হাসিয়া কুটিকুটি। সে হাসি আর থামিতে চায় না।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমা সন্তানদিগকে ডাকিয়া বড়মামার ঘরের বারান্ডায় বসাইয়া পিঠা প্রভৃতি খাওয়াইতেছেন এবং কাছে বসিয়া কাহাকে কি দিতে হইবে বলিতেছেন। এদিকে পাগলী মামী রাধুর শ্বশুর-বাড়িতে ও নলিনীদিদি মাকুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাইতে ব্যস্ত; মধ্যে মধ্যে আসিয়া মাকে এক-আধটা কথা বলিয়া যাইতেছেন। সমস্ত দ্রব্য মায়ের সংসার হইতেই যাইতেছে; অর্থব্যয় তাঁহারই। অথচ শ্রীমা যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না—ভাসাভাসা ভাবে ‘হাঁ,’ ‘না’ বলিতেছেন মাত্র। এই নির্লিপ্ততায় মামী ও দিদি উভয়েই মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন। শেষে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। মাও তখন বিরক্তির সহিত বলিলেন, “দেখ, আমার এত ছেলে আছে; ওরা এলে হাতে দাও, পাতে দাও—যেমন খুশী,

আনন্দ করে খেয়ে যাবে। আর এদের একটি এলে বাটিই বের করতে হবে কত গণ্ডা। না দিলে আবার কথা হবে!" ছেলেদের খাওয়া শেষ হইলে শ্রীমা ধীরে সুস্থে উঠিয়া সকলকে পান দিলেন; কিন্তু জামাই-ঘরে তত্ত্ব পাঠানোর কথা আর ভাবিলেন না—তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে হইল, আর ভাবিবেনও না।

বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মাকুর কয়েকটি সন্তানের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে না। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সাত-আট দিন পূর্বে মাত্র তিনদিন ডিপথিরিয়া রোগে ভুগিয়া যথাসম্ভব চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় জয়রামবাটীতে মাকুর প্রথম পুত্র ন্যাড়ার মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠ ডাক্তার মহাশয় তথা হইতে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া শ্রীমাকে ঐ সংবাদ দিলেন। মা ইহাতে শোকে মুহ্যমান হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।[১] ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত হইল; তখনও মায়ের বিলাপের অবসান হয় নাই। অগত্যা কর্তব্যবোধে জনৈক ভক্ত তাঁহাকে ভোগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই শ্রীমা অন্যরূপ হইয়া গেলেন, যেন কিছুই হয় নাই। তিনি যথারীতি ভোগ নিবেদন করিলেন। সে রাত্রে আর ক্রন্দন দেখা গেল না; মাঝে মাঝে ন্যাড়ার সম্বন্ধে সখেদে দুই-চারিটি কথা বলিতে লাগিলেন মাত্র।

সংসারী লোকের আত্মীয়-প্রতিপালন ও তাহাদের সুখসমৃদ্ধিবর্ধন একটা প্রধান কর্তব্য হইলেও নিরপেক্ষ দ্রষ্টার নিকট ঐ সকল প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক স্বার্থপরায়ণতা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু উহা বুঝিয়াও ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি দুর্বলচিত্ত মানবকে অযথা বাধাদানে অগ্রসর হন না, বরং অহাদের যতটুকু অভাব তাঁহার পক্ষে মিটানো সম্ভব, তাহা নির্লিপ্তভাবে পূর্ণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। শ্রীমায়ের জীবনে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

রাধু তখন কোয়ালপাড়ায় অসুস্থ। পূর্ববর্ণিত সুষণেগেড়ের তান্ত্রিক সাধকের সহিত দেখা করিয়া কালীমামা ও বরদা মহারাজ জয়রামবাটীতে ফিরিতেছেন। মামা বলিতেছেন, "দিদির ভক্ত বাঙ্গালোরের নারায়ণ আয়েঙ্গার সেদিন জয়রামবাটীতে এসে দিদির বাড়ির সামনে আমাদের জমিতে একটি পাতকুয়ো করে দেবে বলেছিল; তা কই আর কিছু তো বলছে না? বড় লোক —কুয়ো করে দিলে সকলের উপকার হয় ওতে। আর কটা টাকাই বা জমির

১ স্বামী সারদানন্দজী ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাহার সাফল্যের বৃত্তান্ত জানিতেন। তাই তিনি পরে যুবক জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

দাম? ইচ্ছা করলেই দিতে পারে। দিদির জন্যে খাবার জলের ব্যবস্থা—এ কি কম ভাগ্যের কথা?" অর্থাৎ এই সুযোগে জমির মূল্যস্বরূপে মামা কয়েক হাজার টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না। মামা আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ, বরদা, দিদির ভক্তেরা যেসব টাকা-কড়ি প্রণামী দেয়, তা দিদি যদি জমিয়ে রাখতেন, তাহলে অনেক টাকা হত। তা না করে রাধী আর ভাইদের জন্যেই খরচ করেন, কিছু জমিয়ে রাখলেন না। আচ্ছা কাকে সব-চেয়ে বেশী দেন বলত?" কোন উত্তর না পাইয়া মামা অন্যসুরে কথা বলিতে লাগিলেন—"দেখ, বরদা, দিদির টাকাতে কোন আসক্তি না থাকাতেই এত লোকে মানে। দিদি যদি সাধারণ লোকের মতো টাকাতে আসক্তি দেখাতেন, তাহলে এ মান্য আজ হত না। এজন্যই তিনি মানবী নন, দেবী বুঝলে বরদা? আহা, তোমরাই ধন্য! এত অল্প বয়সে ঘরবাড়ি সব ছেড়ে দিদির কাজে দিনরাত ছুটছ।" সন্ধ্যার সময় শ্রীমা বরদা মহারাজের মুখে সব শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কেলে টাকা টাকা করে অস্থির—'অন্নচিন্তা চমৎকারা, বুদ্ধিমান হয় দিশেহারা!' দিদিকে যেন টাকার গাছ ঠাউরেছে। তবে একটু ভক্তিশ্রদ্ধাও আছে। বিপদে-আপদে কালীই এসে দিদির পাশে দাঁড়ায়! বাকি সব তো দিতে পারলেই হল।"

রাধুর ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় আগত দেখিয়া শ্রীমা বরদা মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, এবার আমার হাতে টাকা-পয়সা বেশী নেই। কালীকে দিয়ে বাজার করাতে গেলে অনেক খরচ। তুমিই এবার কোতুলপুর আনুড় থেকে দেখে শুনে বড় বড় বাজারগুলি করে ফেল। বাকি সামান্য কিছু কালীকে দিয়ে পরে করাব; তা না হলে আবার চটে যাবে।" শ্রীমা তখন আত্মীয়া ও স্ত্রী-ভক্তদের লইয়া নূতন বাড়িতে থাকেন।

কালীমামা বেশ রাশভারী লোক—সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। নলিনীদিদি, মাকু, রাধু, রাধুর মা সকলেই মামাকে ভয় করেন। পাগলী মামী যখন খুব বাড়াবাড়ি করেন, তখন শুধু বলিলেই হইল, "একবার কালীকে ডাক তো" অমনি মামী নিজের ঘরে আশ্রয় লইতেন। শ্রীমাও ভাই-এর প্রকৃতি বুঝিয়া অযথা তাহাকে চটাইতেন না। তাই রাধুর ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় ঐরূপ ব্যবস্থা হইলেও মায়ের জন্মতিথির সময় কালীমামাই বাজার করার ভার পাইলেন। তিনি জন্মতিথির দিনকয়েক পূর্ব হইতেই নানা বিষয়ে খোঁজখবর করিতে লাগিলেন। একদিন বলিলেন, "দিদি, তোমার এখানে যেরকম লোকজন বেড়েছে, এতে আর মেয়েমানুষ রাঁধুনী দিয়ে কাজ চলবে না, একজন বেটাছেলে রাঁধুনী রাখা দরকার হয়েছে। আর তোমার জন্মতিথি আসছে, লোকজন অনেক হবে, বাজারহাটও সেই আন্দাজে করতে হবে। বরদা ছেলেমানুষ, সব সামলাতে পারবে না।" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "দেখ, কালী, এ বাড়িতে সব

মেয়ের পাল নিয়ে বাস করছি। এর ভেতর বেটাছেলে রাঁধুনী কি করে রাখি বল? তবে এই যে ছেলেরা আমার কাছে রয়েছে, এরা আমার ছেলে নয়; মেয়ে—জানবি। এদিকে ভক্তের ভিড় তো লেগেই আছে—তা বাজারহাট দেখে শুনে করতে হবে বই কি?" সন্ধ্যার সময় শ্রীমা বলিলেন, "দেখ এবারে কোতুলপুরের হাট কালীকে দিয়েই করাতে হবে। কদিন থেকে ঐ জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। একটু আলগা না দিলে শেষে চটে-মটে একট কাণ্ড বাধাবে।"

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই সময় রন্ধনের জন্য শ্রীমাকে অনেকটা ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিতে হইত। শ্রীমায়ের সেবায় নিরত বালকন্দর ব্রাহ্মণ না হইলেও বুড়ী রাঁধুনীরা যে সব রান্না করিতে পারে না বলিয়া ভাত প্রভৃতি ছাড়া অনেক কিছুই তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হয়। এদিকে শ্রীমায়ের ভাবনা, পাছে গ্রাম্যলোক রাধুর শ্বশুরবাড়ির সহিত এই বিষয় লইয়া জোট পাকায়। তাই তাহাদের সহিত ব্যবহারে মাকে সাবধান থাকিতে হয়। অথচ কালীমামা ও জামাই মন্মথ বিনা বাক্যব্যয়ে এ বাড়িতে অনেক সময় রাত্রে আহার করেন। অবশেষে বরদামামা একদিন নিজেই কথা তুলিয়া সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি বলিলেন, "তা, দিদি, এইসব ব্রহ্মচারীরা তোমার শিষ্য শুদ্ধসত্ত্ব; এদের হাতে ভাত পর্যন্ত কত পবিত্র। কলকাতার দোকানে খেতে মনে ঘৃণা হয়, খেয়ে তৃপ্তি হয় না।" বরদামামা ও প্রসন্নমামা এই সব বিষয়ে উদার এবং দল পাকাইবারও লোক নহেন। সুতরাং মা পূর্ব হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

১৩২৬ সালের জন্মতিথির অনুরূপ একটি ঘটনাও এখানে বলিয়া রাখিলে মন্দ হইবে না। সেদিনও ব্যবস্থাদি কালীমামার হাতে থাকায় সারাদিন তিনি প্রফুল্ল ছিলেন; শ্রীমায়েরও কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু বিকালে দেখা গেল, মা তাঁহার ঘরের বারাণ্ডায় ম্লানমুখে বসিয়া আছেন। সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য কাজকর্ম গুছাইয়া সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন; কিন্তু মায়ের তখনও বিশ্রাম নেই। গোপেশ মহারাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা বলিলেন, "বাবা, এই কেলে সর্বনেশে যত নষ্টের গোড়া, অকারণ আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই দেখ, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ওর খাবার নিয়ে আমি বসে আছি। 'আসি', 'আসি' করে এখনও আসছে না, আমিও বিশ্রাম করতে পারছি না।" কালীমামা উৎসবের সর্বময় কর্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন; কোথাও হয়তো কোন ত্রুটি হইয়াছে, তাই শ্রীমাকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন। অবস্থা বুঝিয়া গোপেশ মহারাজ মামার খোঁজে বাহির হইয়া দেখেন, মামা খামারে ধানের খড় জড় করিতেছেন। তাঁহার চোখে-মুখে ক্রোধের জ্বালা দেখিয়া আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া গোপেশ মহারাজও মামার অনুকরণে খড় জড় করিতে

লাগিয়া গেলেন। একটু পরেই মামার ক্রোধ জল হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি এখানে কেন এত কষ্ট করতে এসেছ?" গোপেশ মহারাজ সুযোগ বুঝিয়া কহিলেন, "মা ভাত নিয়ে বসে আছেন।" মামা বলিলেন, "দিদি খাবার নিয়ে বসে আছেন, তাতো জানিনি; চল।" শ্রীমা তাঁহাকে পাইয়া খুব খুশী হইলেন এবং সাদরে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।

১৩২৬ সালের জন্মতিথিরই আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সাধুভক্ত সকলেই পূজার আয়োজন, দ্বিপ্রহরে ভোগের জন্য রন্ধন, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিতে ব্যস্ত। সেই সময় গোপেশ মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়া দেখেন, শ্রীমা সেজোমামীর পথ্যের জন্য ঝোলের ব্যবস্থা করিতেছেন। মামী তখন অন্তর্বত্নী, শরীর অসুস্থ; অথচ তাঁহার দেখাশোনার জন্য ঘরে অন্য স্ত্রীলোক নাই। অতএব মাকেই সব করিতে হয়। অদ্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব চলিতেছে; কিন্তু তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে তিনি যেন কিছুই নহেন. সন্তান-সম্ভবার সেবাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তিনি স্বাভাবিক. শান্ত, ধীরভাবে মাছ কুটিয়া ঘাটে ধুইয়া আনিলেন, রান্নাঘরের বারান্ডায় স্বয়ং ঝোল রান্না করিয়া সেজোমামীর বাড়িতে গিয়া দিয়া আসিলেন। এইসব কাজের জন্য তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখে একটুও বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল না।

১৩২৪ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বে কালীমামা বলিলেন, "দিদি, তুমি এবারে এখানে উপস্থিত আছ, পরমহংস মহাশয়ের জন্মতিথি ভাল করে করতে হবে। তুমি এখানে আছ বলে লোকজন, কুটুম্ব অনেক সব সাক্ষাৎ করতে আসবে।" জন্মোৎসবের পরেই শ্রীমায়ের কলিকাতা যাইবার কথা হইতেছিল; তাই কালীমামা সাক্ষাতের জন্য অনেকের আসার উল্লেখ করিলেন। শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন, "ভাই, তোর মতন আমার ভক্তিই বা কোথায়, আর সে শক্তিই বা কই যে, ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব বাহুল্য করে মনের মতো করে করি? এই গ্রামেই যা আলু কুমড়ো পাওয়া যাবে. তাই দিয়ে কোন রকমে সেরে দিস। আমার শরীর তো দেখছিস—দিন দিন যেন ক্ষীণ হয়ে পড়ছি।" কালীমামা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িলেন এবং উৎসবের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণ ভরিয়া লোকজন খাওয়াইলেন।

কালীমামা ও বরদামামার যে ঝগড়ার কথা আমরা অধ্যায়ের প্রথমেই লিখিয়াছি, উহার ঠিক পরে কালীমামা খামারে ভাল করিয়া বেড়া দিয়া এবং উহার ভেতরটা পরিষ্কার করিয়া প্রফুল্লমনে নিকটে রোয়াকে বসিয়াছেন। সেই সময় মায়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া প্রসন্নমামার খামারে ধানের বস্তা যাইতেছে। উহা চলিয়া গেলে কালীমামা একটু ছোট-গলায় বলিতেছেন, "এই তো পাথর দুটি (সামনের বড় বড় দুইটি মাকড়া পাথর দেখাইয়া) কতদিন থেকে এখানে পড়ে আছে—দিদির জন্মস্থানে বসানো হল না। যদি শরৎ

মহারাজকে বলে ঐ জমিটুকু দিদির নামে করে নেবার পর আমরা থাকতে থাকতে দিদির একটি মন্দির হয়, তবে কত আনন্দ হবে!" ঐ পাথর মায়ের জন্মস্থান চিহ্নিত করার জন্য রাঁচির ভক্তেরা কিছুদিন পূর্বে আনিয়াছিলেন; কিন্তু মামারা একমত না হওয়ায় উহা করা হয নাই। মাতাঠাকুরানীর দিকে চাহিয়া কালীমামা বলিতেছেন, "আমার অংশটি, দিদি, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি আর সব তুমি দেখ দেখি। আমাকে শরৎ মহারাজ যা দিতে হয় দেবেন। আমার প্রাণের ইচ্ছা, এখনি ওটির একটা ব্যবস্থা হয়।" এখানে বলিয়া রাখা দরকার ঐ জমির যে অংশ কালীমামার সেস্থানটুকু তাঁহার কোন কাজেই লাগে না, অপর ভ্রাতারা উহা একযোগে ব্যবহার করেন। শ্রীমা সাধারণভাবে শুনিয়া গেলেন, একটু-আধটু উত্তর দিলেন মাত্র। সন্ধ্যার সময় তিনি বলিলেন, "দেখ, বরদা, কালী এখন যে কথা বললে, আজ শরৎকে তোমার চিঠিতে সব লিখে দাও।[১] কালীর যখন সুমতি হয়েছে, তখন মনে হয়, আর দেরী করা উচিত নয়। প্রসন্ন কলকাতায় আছে, বরদারও অমত হবে না। সব বিষয়ে বাগড়া দিত কালীই। ও যখন আপনা থেকে ওটির উল্লেখ করলে, তখন বুঝতে হবে এখন হয়ে যাবে। দেখলে না নারায়ণ আয়েংগার কুয়ো করে দেবে বলে কত সাধ্য-সাধনা করলে, তা কিছুতেই ও মত করলে না।" পরদিন শ্রীমা কালীমামাকে বলিলেন, "তোর কথামত বরদা কাল শরৎকে সব লিখেছে।" মামা তখনই বলিলেন, "তবে, দিদি, যা মূল্য ধার্য হবে তার ওপর আমাকে কিন্তু আলাদা করে কিছু দিতে হবে। আমার সংসার বেশী, আয় কম।" শ্রীমা বলিলেন, "তা ওরা টের পেলে ওরাও আবার চাইবে না তো।" বলা বাহুল্য কার্যকালে সব মামাই ন্যায্য মূল্যের উপর নিজ নিজ অংশে কিছু অধিক চাহিয়া লইলেন। স্বামী সারদানন্দজী সুযোগ না ছাড়িয়া এবং অর্থের দিকে না তাকাইয়া এক মাসের মধ্যেই দলিল রেজিস্ট্রি করাইলেন। পূর্বে কুয়া খুঁড়াইবার কথা উঠিয়াছিল। শ্রীমা ফাল্গুন মাসে কলিকাতা চলিয়া গেলে ঐ জমির এক কোণে বৈশাখ মাসে কূপ-খনন আরম্ভ হইল।

১৩২৫ সালের মহালয়ার কয়েকদিন পূর্বে প্রসন্নমামা তাঁহার যজন-যাজনের জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইবেন; তাই শ্রীমাকে বলিতেছেন, "দিদি, তুমিও দেশে এলে, আমাকেও এবারে কলকাতা যেতে হচ্ছে। ছেলে-পিলেরা সব রইল—যা হয় ব্যবস্থা করো। কি আর বলব? কালীরই এখন সুবিধা হল; দেশে জমিজমা নিয়ে ছেলেপিলের সঙ্গে ঘরে থেকেই বেশ সংসার চালাচ্ছে; তুমিও এসে পড়লে। আমাকে এই বয়স পর্যন্ত বিদেশে পড়ে থাকতে হচ্ছে!"

১ স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থানুসারে বরদা মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বিষয়ে সবিশেষ জানাইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ পত্র লিখিতেন।

কথাগুলির একটু আধটু কালীমামার কানে পেঁছিতেই তিনি আসিয়া প্রসন্ন-মামার নিন্দা আরম্ভ করিলেন, "দিদির কাছে কাঁদুনি গাইছে টাকা আদায়ের জন্য." ইত্যাদি। প্রসন্নমামা কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া বলিলেন, "দেখ্ কালী, তুই আমাকে মান্য করিস আর নাই করিস, এটা কিন্তু জেনে রাখিস, আমি দিদির পরেই এবং তুই হলি আমার পরে। দিদির ওপর তোর ভক্তি কই? আমি দিদিকে যা জানি, তুই তার কিছুই জানিসনি, কেবল দিদির টাকা চিনেছিস।" শ্রীমা এই সব কথা শুনিতেছেন আর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "ভাইগুলি আমার রত্ন বটে। ওরা গলাকাটা তপস্যা করেছিল বলেই আমি ওদের সংসারে পড়ে আছি।" শ্রীমা অবশ্য তখন অন্যত্র থাকিতেন এবং ভ্রাতারাই তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার সাহায্য পাইতেন।

বড়মামা (প্রসন্নমামা) তখন অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই থাকিতেন—যজমানিতে আয়ও মন্দ ছিল না। তথাপি বাল্যকাল অভাবের মধ্যে কাটাইয়া মামা বড় কৃপণ ও হিসাবী হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান কমলার বয়স যখন দুই বৎসর, শ্রীমা তখন দেশে আছেন, আর মামা কলিকাতায়। মেয়েটি জ্বরে ভুগিতেছে, অন্য উপসর্গও দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য চিকিৎসায় ফল হইতেছে না—আরও অর্থব্যয় প্রয়োজন; কিন্তু বড় মামা খবর পাইয়াও আসিতে পারিলেন না, টাকাও পাঠাইলেন না। হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, দিদি দেশে আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। দিদি কিন্তু এবার এই অন্যায় আবদার সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার নিকট যখন সংবাদ পেঁছিল তখন তিনি বিরক্তি-সহকারে বলিলেন, "তাঁর বছর বছর ছেলে হবে; অথচ তাদেব অসুখ করলে টাকা খরচ করতে পারবেন না কেন?" বলিয়াই এত গম্ভীর হইয়া গেলেন যে, ঐ বিষয়ে আর কেহ কথা তুলিতে সাহস পাইল না। সৌভাগ্যক্রমে কমলা সেবারে সাধারণ চিকিৎসাতেই ক্রমে সারিয়া উঠিল।

শ্রীমাকে তখন তিন স্তরের আত্মীয়বর্গের সহিত আদান-প্রদান করিতে হইত—প্রথম ভ্রাতারা, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভ্রাতৃবধূরা, তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সন্তানবৃন্দ। ভ্রাতারা তখন উপার্জনক্ষম—তথাপি দিদির টাকার প্রত্যাশা রাখেন। তিনজন ভ্রাতুষ্পুত্রী—নলিনী, মাকু ও রাধু—এবং ভ্রাতৃজায়া সুরবালা নানা কারণে শ্রীমায়ের পরিবারভুক্ত। তৃতীয় স্তরের সকলে তখনও সরল শিশু বা বালক-বালিকা। এই প্রত্যেক স্তরের সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার প্রত্যেকের বয়সের অনুরূপ ছিল। আমরা মামাদের সহিত শ্রীমায়ের সম্বন্ধের পরিচয় কতক পাইয়াছি। এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের আত্মীয়দের প্রতি ব্যবহারের সহিত পরিচিত হইব এবং দেখিতে পাইব যে বয়স্কদের প্রতি অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীমা স্নেহসিক্তচিত্তে ও

অকম্পিতহস্তে স্বীয় কর্তব্যপালন করিলেও, তাঁহার স্বভাবকোমল হৃদয়ের প্রকৃত স্ফূর্তি হইত ছোটদের সহিত আচরণে।

প্রথমা স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে প্রসন্নমামা সুবাসিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি তখন বালিকা এবং মামীদের মধ্যে বয়সে খুবই ছোট। কালীমামার গৃহিণী সুবোধবালা দেবী, বরদাপ্রসাদের পত্নী ইন্দুমতী দেবী এবং অভয়চরণের স্ত্রী সুরবালা দেবীও মাতাঠাকুরানীর তুলনায় অল্প-বয়স্কা ছিলেন। সুরবালা বা ছোটমামীর সহিত আমাদের পূর্বে বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে; এই অধ্যায়েও আবার ঘটিবে। সুরবালার কন্যা রাধারানীর কথা আপাততঃ আর তুলিবার প্রয়োজন নাই। রামপ্রিয়া দেবীর কন্যা নলিনী এবং মাকুর (সুশীলার) নাম আমরা অবগত আছি; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক। সুবাসিনী দেবীর কন্যা কমলা ও বিমলা এবং সুবোধবালা দেবীর পুত্র ভূদেবের সহিত পরিচয়ের তেমন প্রয়োজন হইবে না। তবে ইন্দুমতী দেবীর পুত্র ক্ষুদিরাম, মাকুর পুত্র ন্যাড়া ও রাধুর পুত্র বনু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রাধারানীর বিবাহের পূর্বে নলিনীদিদি ও মাকুর বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্য ও অনাদরের জন্য নলিনীদিদির সেখানে থাকা সম্ভব হইত না; তাঁহার জননীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি পিসীমার সহিত বাস করিতেছিলেন। তাজপুরের জমিদার-বংশে সমর্পিতা মাকুও নানা কারণে অধিকাংশ সময় পিসীমার সঙ্গে থাকিত—শ্বশুরালয়ে কদাচিৎ যাইত; এমনকি, তাহার স্বামী প্রমথও অনেক সময় শ্রীমায়ের কাছে থাকিতেন। রাধুর স্বামী মন্মথকেও প্রায় তাঁহার গৃহে দেখা যাইত।

শ্বশুরালয়ে স্নেহে বঞ্চিতা নলিনীদিদির প্রতি মায়ের একটা স্বাভাবিক স্নেহ ছিল; সুতরাং দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই তিনি এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে নিজ সকাশে রাখিতেন। এক রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইতেছেন, তখন নলিনীদিদির স্বামী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য নিজবাটী গোঘাট হইতে গরুর গাড়ি লইয়া জয়রামবাটীতে আসিলেন—উদ্দেশ্য, নলিনীদিদিকে লইয়া যাইবেন। দিদি শ্বশুরবাটীর আতঙ্কে দরজায় খিল দিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, আত্মহত্যা করিবেন। শ্রীমা দ্বার খুলিতে অনেক সাধাসাধি করিলেন; পরে কথা দিলেন যে, এবারে তাঁহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হইবে না; তখন দিদি বাহিরে আসিলেন। গোলমালে সারা রাত্রি কাটিয়া গেল; শ্রীমা ততক্ষণ লণ্ঠন জ্বালিয়া দিদির দরজায় বসিয়া কাটাইলেন। প্রভাত হইলে আলো নিবাইয়া তিনি ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিলেন, "গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী; ভাগবত, ভক্ত, ভগবান; ঠাকুর ঠাকুর।" পরে কথায় কথায় বলিলেন, "ওর পিসীর বাতাস লেগেছে, বাবা, তাই যেতে চায় না।"

নলিনীদিদি খুব শুচিবায়ুগ্রস্তা—ইহাতে শ্রীমাকে উত্যক্ত হইতে হয়।

দিদি অপরকে বলিতেন, "পিসীমা এ'টো পাতা মাড়িয়ে পা ধুয়েই ঘরে চলে আসেন, কাপড় কাচেন না, স্নান তো দূরের কথা। যেদিন বলেন, 'নলিনী, একটু গঙ্গাজল দাও তো', সেদিন বুঝতে পারি, তিনি বিষ্ঠা স্পর্শ করে এসেছেন"—এমনই ছিল তাঁহার সন্দেহাকুল মন। এক শীতের সন্ধ্যায় তিনি কান্না ও অভিমানের সুরে পিসীমাকে জানাইলেন, কি একটা অশুচি-স্পর্শ হইয়া গিয়াছে; এখন এই সায়াহ্নে স্নান করা চলে না, অথচ স্নান না করিয়া ঘরে গিয়া শোওয়া কিংবা খাওয়া অসম্ভব। কাজেই সারারাত্রি খালি-গায়ে বাহিরে কাটাইতে হইবে। "কেন এমন সময়ে এরকম হল?" বলিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমা অনেক প্রবোধ দিলেন, যুক্তি শুনাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিদি করুণসুরে কাঁদিতে লাগিলেন, "এ সংসারে আমার বলতে কেউ নেই। ছেলেবেলা মা মারা গেলেন; বাবা দ্বিতীয় পক্ষের সংসার করেছেন, চোখেও দেখেন না; স্বামীর সংসারেও শত্রু", ইত্যাদি। ভোজনের সময় হইল; তখনও তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। বিরক্তিভরে সকলে স্থির করিলেন, আজ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে হইবে—তিনি ওখানেই সারা রাত্রি পড়িয়া থাকুন। সকলে ঘুমাইতে গেলেন এবং যাইবার পূর্বে শ্রীমাকে অনুরোধ করিয়া রাখিলেন, তিনি যেন কোন কোমলতা না দেখান। তথাপি মধ্যরাত্রে হঠাৎ শোনা গেল শ্রীমায়ের দরজা খোলার শব্দ। তিনি বাহিরে আসিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "নলিনী, ওমা নলিনী, ওঠ্ মা, ঘরে চল্। কেন বাইরে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিস, মা?" কিন্তু দিদির কোন সাড়া-শব্দ নাই। শ্রীমা স্বগত বলিয়া যাইতেছেন, "আহা, নলিনী ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম বুঝতে পারে না, তাই রাগ করে কষ্ট পায়, আর সকলেও তার ওপর বিরক্ত হয়।" অবশেষে শ্রীমায়েরই জয় হইল; দিদি শেষ রাত্রে ঘরে গিয়া শুইলেন।

পল্লীগ্রামের সঙ্কীর্ণতায় নলিনীদিদির মন পূর্ণ ছিল। একবার ডোমেরা বিড়া লইয়া আসিলে শ্রীমা বলিলেন, "ঐখানে রাখ।" তাহারা খুব সাবধানে উহা রাখিল ; তবু নলিনীদিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ঐ ছোঁয়া গেল, ওসব ফেলে দাও", আর গালি দিতে লাগিলেন, "তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস!" তাহারা তো ভয়ে অস্থির। তখন শ্রীমা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন, "তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নেই" আবার তাহাদিগকে মুড়ি খাইবার পসয়া দিলেন।

পাগলী মামীর সহিত নলিনীদিদির অহি-নকুল-সম্বন্ধ ; অথচ উভয়েই শ্রীমায়ের গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত, উভয়কেই মানাইয়া চালানো মায়ের স্বেচ্ছাবৃত কর্তব্য। তিনি বলিতেন, "যা কিছু কর না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য করতে হয়—যাতে বেশি কিছু খারাপ না হয়। আমি এই যে রাধুর ঘরে

(তাজপুরে) তত্ত্ব পাঠাব, তা নলিনীর সঙ্গেও পরামর্শ করি। ওতে ছোট বউ-এতে সাপে-নেউলে—ও তার ভাল দেখতে পারে না, সে ওর ছায়া মাড়াতে চায় না—কিন্তু আমি যখন নলিনীকে মুরুব্বী বানিয়ে তার পরামর্শ চাই—বলি, 'দেখ নলিনী, কি তোর পছন্দ, এই সব দেখে শুনে বল'—তখন আমি যেসব জিনিসের ফর্দ দিই, তাতে সে বলে, 'ওতে কি করে হবে, পিসিমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক—আর রাধীটা তো একটা পাগল, জ্ঞানগম্য কিছুই নেই—কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে, তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, পিসিমা? তুমি তোমার মতন করে যাও'—এই বলে ফর্দ বাড়ায়। আমিও মনে মনে হাসি। ঐটুকু যদি ওকে না জানিয়ে সেখানে তত্ত্ব পাঠাই, অমনি দুজনে তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবে। দেখ, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়। আমি এই ধিঙ্গী নিয়ে তাদের হাওয়া বুঝে কত সাবধানে চলি ; তবু সময় সময় লেগে যায়—যেন ওটা হচ্ছে ওদের স্বভাব! কি করব বল? ভাবি, তাঁর সংসার, তিনিই দেখছেন।"

মাকুর দায়িত্বও শ্রীমা নিজের উপর লইয়াছিলেন। তাহার কল্যাণের জন্য তিনি তাহার শ্বশুরবাড়ির লোককে পর্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিতেন ; বলিতেন, "তাদের খুব আদর-যত্ন না করলে একটুতেই ফোঁস করে।" মাকু রাধু অপেক্ষা কিছু বড়। শ্রীমা যখন কোয়ালপাড়ায় রাধুকে লইয়া বাস করিতেছিলেন (১৯১৯ ইং) তখন নলিনীদিদির মনে এই ভাবিয়া ঈর্ষার উদয় হইল যে, শ্রীমা রাধুর জন্য অযথা অর্থব্যয় করিতেছেন, অথচ আসন্নপ্রসবা মাকুর দিকে দৃষ্টি দিতেছেন না। তিনি প্রথম বলিতে লাগিলেন, "পিসিমা, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? রাধুর কিছুই হয়নি।" পরে কারণে-অকারণে পাগলী মামীর সহিত ঝগড়া বাধাইতে লাগিলেন ; অবশেষে মাকুকে পরামর্শ দিলেন যে, এই অনাদরের মধ্যে তাহার ওখানে না থাকিয়া জয়রামবাটী চলিয়া যাওয়া উচিত। শুধু তাহাই নহে, মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি নিজেই পালকি ডাকাইয়া মাকু ও তাহার পুত্র ন্যাড়াকে লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। মা তখন দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেছিলেন ; ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন, নলিনীদিদি চিৎকার করিতেছেন, "মাকি, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস; শিগ্‌গির আয়।" দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমা দুঃখ করিয়া বরদা মহারাজকে বলিলেন, "যাবার সময় ছেলেটাকে পর্যন্ত প্রণাম করিয়ে নিয়ে গেল না। যা হবার তাই হবে, আমি আর কি করি বল? তবে তোমার আরও টানা-পোড়েন বাড়ল—রোজ গিয়ে খবর না আনলে আরও অভিমান বাড়বে।"

শ্রীমা প্রত্যহ সংবাদ লইতেন ; ন্যাড়া অসুস্থ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন ; কিন্তু ন্যাড়া তিনদিন মাত্র ডিপথিরিয়ায় ভুগিয়া দেহত্যাগ করিল—এই সব কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (২৪১ পৃঃ)। শ্রীমা জয়রামবাটী যাইতে

প্রস্তুত হইতেছিলেন ; কিন্তু সে সুযোগ আর মিলল না। ন্যাড়ার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন—সে তাঁহার এতই প্রাণের বস্তু ছিল। সে রাত্রে তাঁহার আহারে আদৌ প্রবৃত্তি হইল না ; তথাপি তিনি উপবাসী থাকায় অপরদেরও খাওয়া হইতেছে না জানিয়া একটু দুধ ও লুচি মুখে দিলেন। তাঁহার খেদ পরদিনও চলিয়াছিল; এমনকি অনেক দিন পরেও ন্যাড়ার স্মৃতিতে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত ও স্বর গদ্‌গদ হইয়া আসিত। বালকের মৃত্যুর পর তিনি বলিয়াছিলেন, "ছেলেটা কোন যোগভ্রষ্ট সাধক বা মহাপুরুষ ছিল। সামান্য একটু বাকি ছিল ; সেটুকু ভোগ হয়ে গেল—শেষ জন্ম! এই বয়সের ছেলের মধ্যে অত সৎসংস্কার দেখা যায় না। কোথা থেকে রোজ গুলঞ্চ ফুল এনে আমার পায়ে দিয়ে পূজা করত। শরৎকে 'লাল মামা' বলত। লিখতে পড়তে কিছুই শেখেনি—মাত্র আড়াই-তিন বৎসর বয়স। শরতের অনুকরণে একটা কাঠের ভাঙ্গা বাক্স সামনে নিয়ে রোজ শরৎকে চিঠি লিখতে বসত—কি কি লিখছে এখানের সংবাদ, সব মুখে বলত।" ন্যাড়ার মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যায় আরামবাগের মণীন্দ্রবাবু ও প্রভাকরবাবু বিদায় লইতে আসিলে শ্রীমা তাহার কথা তুলিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "সে বলতো, 'ফুল লাল করেছে কে?' আমি বলতুম, 'ঠাকুর করেছেন।' 'কেন?' 'তিনি পরবেন বলে'।" ন্যাড়ার মৃত্যুর আট-দশদিন পরও শ্রীমায়ের চক্ষে জল দেখিয়া জনৈক ভক্ত বলিলেন, "সংসারী লোকের ছেলে-মেয়ের মরণে তাদের কিরকম কষ্ট হয়, তা বোধ হয় এবার আপনিও বুঝতে পেরেছেন?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "তা কি আর বলতে? যে কষ্ট হচ্ছে মাকুর ছেলেকে মানুষ করে, তা ভুলতে পাচ্ছি নে!"

ইহার অনেক পূর্বের ঘটনা। ন্যাড়ার বয়স তখন এক বৎসর মাত্র। শ্রীমা সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। মর্তমান কলাগুলি ছাড়াইয়া একটি পাত্রে রাখিতেছেন। ন্যাড়া হামা দিয়া উহা লইতে অগ্রসর হইল। শ্রীমা মিষ্টস্বরে বলিলেন, "একটু রসো, বাবা; ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেলে পাবে।" সে ক্ষান্ত হইল না দেখিয়া মা তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন ; কিন্তু সেও হাত ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। তখন সেবক তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীমা বাধা দিয়া স্বহস্তে একটি কলা ন্যাড়ার মুখে দিয়া বলিলেন, "খা, গোপাল খা।" তখন শ্রীমায়ের বদন ও নয়ন যেন এক দিব্য স্নেহপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।[১]

---

১ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য আনীত কোন বস্তু তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া শ্রীমা নিজে খাইতেন না বা অপরকেও দিতেন না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে পৃথক রন্ধন করিয়া দিতেন অবুঝ শিশুরা ফলাদির জন্য কান্নাকাটি করিলে তিনি উহা ঠাকুরকে দেখাইয়া তাহাদের হাতে দিতেন।

শ্রীমায়ের মনে পড়িত, ন্যাড়া তাঁহাকে বলিত 'সীতা'। তাঁহার তখন দাঁত পড়িয়া গিয়াছে; ন্যাড়া একদিন পায়খানার সিঁড়িতে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে বলিতেছে, "আমার দুটি দাঁত নাও।"

কোয়ালপাড়ার বনে রাধুর ছেলের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া শ্রীমা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন বনবিহারী বা বনু। শ্রীমা প্রভাতে বনুর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য সুর করিয়া গাহিতেন—

"উঠ লালজী, ভোর ভয়ো
সুর-নর-মুনি-হিতকারী।
স্নান করো, দান দেহু
গো-গজ-কনক-সুপারি॥"

ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ক্ষুদিরাম। মায়ের শ্বশুরের ঐ নাম; তাই তিনি 'ক্ষুদি' না বলিয়া বলিতেন 'ফুদি'। ক্ষুদি ফল খাইতে ভালবাসে বলিয়া শ্রীমা পার্শেল করিয়া তাহার জন্য কলিকাতা হইতে ফল পাঠাইতেন। খাওয়ার পর দুধভাত মাখিয়া বসিয়া থাকিতেন; অমনি ক্ষুদিও 'পিসিমা' বলিয়া উপস্থিত হইত। শ্রীমা সস্নেহে বলিতেন, "এস, বাবা, আমি তোমাকেই ডাকছিলুম।" ক্ষুদির মা অনুযোগ করিতেন, "এত ভালমন্দ খাওয়ানো ঠিক নয়, গরিবের ছেলে বরাবর এত সব পাবে কোথায়?" শ্রীমা উত্তরে বলিতেন, "তোরা বুঝিস নি গো! 'যে খায় চিনি, তারে যোগায় চিন্তামণি'।" শ্রীমা কলিকাতায় যাইবেন; ক্ষুদি ধরিয়া বসিল, সেও যাইবে। তাহাকে ভুলাইবার জন্য তিনি শম্ভু রায়ের স্ত্রীর প্রদত্ত সোনার আংটি অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন এবং এক কুঁদা মিছরি দিয়া বলিলেন, যখনই তাঁহার কথা মনে পড়িবে, তখনই যেন সে মিছরি খায়, তাহা হইলেই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। ক্ষুদি যখন পরে তাহার জননীর সহিত কলিকাতায় আসিল, শ্রীমা তাদের সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিরূপ মল পরিবে? সে জানাইল, সে নূপুরযুক্ত মল পরিবে। শ্রীমাও বলিলেন, "বেশ তো, বাবা, গোপালের পায়ে নূপুর আছে, তোমার পায়েও থাকবে।" তিনি নূপুর গড়াইয়া দিলেন। একদিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিয়ে ভাত খেলে, বাবা?" সে দুই হাত ছড়াইয়া দেখাইয়া দিল যে, তাহার মা মস্ত বড় একটি মাগুর মাছ কিনিয়াছিলেন। মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে দিয়েছিল?" ক্ষুদি অভিযোগ করিল, "একখানি মোটে দিয়েছিল, পিসিমা—সবাইকে দিয়ে দিলে।" শ্রীমা সহাস্যে বলিলেন, "ইন্দু আসুক, তাকে বলছি আমি!" বিকালে ইন্দুমতী দেবী উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "শুনেছিস? এত বড় মাগুর মাছ কিনে রান্না করলি আর ফুদিকে মোটে একখানা দিলি আর দিলিনি?" ইন্দুমতী জানাইলেন যে, মাছ মোটে কেনাই হয়নি। শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন,

"ওলো, আমার মেজো ভাই উমেশ অমনি বলত! ফুদি আজ তাই বললে।" ভক্তেরা শ্রীমায়ের পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন দেখিয়া ক্ষুদিও মায়ের পায়ে একহাত রাখিয়া অন্য হাতে মুঠামুঠা ফুল দিতে লাগিল। তিনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা, তোরা যে আমার মুক্ত হয়ে এসেছিস! আর ফুল দিতে হবে না।"

দ্বিতীয় পুত্র বিজয়ের জন্মের পর ইন্দুমতী দেবীর কঠিন পীড়া হইল। শ্রীমা নানা স্থান হইতে ডাক্তার আনাইলেন এবং নিজেও এমন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারও অসুখ হইল। সুস্থ হইয়া তিনি ইন্দুমতীকে বলিলেন, "ছেলে হলে তোর যত না কষ্ট হয়, আমার তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় এই ভেবে যে, তোর যদি কিছু হয়, তবে আমাকেই তো দেখতে হবে, আমি তো আর ফেলতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি এক অদ্ভুত আশীর্বাদ করিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি, আর যেন তোর ছেলে না হয়।" বিজয়ের জন্মাবধি তাহার জননীকে দুঃখ পাইতে দেখিয়া শ্রীমা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দুখীরাম'। কিন্তু যোগীন-মা ও গোলাপ-মা বলিলেন, "তুমি যেমন নাম রাখবে তেমনি তো হবে? অমনিই তো কত দুঃখ পাচ্ছে!" তখন তিনি বদলাইয়া নাম রাখিলেন 'বিজয়কৃষ্ণ'।

জগদ্ধাত্রীপূজার আগের দিন সুবাসিনী দেবীর ছোট কন্যা বিমলার পা ফুলিয়া জ্বর হইল ও সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাক্তার বৈকুণ্ঠ মহারাজ (সন্ন্যাস নাম মহেশ্বরানন্দ) ঔষধ দিয়া মাকে বলিলেন, "আপনি বললেন, তাই একদাগ ওষুধ দিলাম। ধাত নেই—ওষুধ গড়িয়ে পড়ে গেল।" এই সংবাদ পাইয়া শ্রীমা তাঁহার নূতন বাড়ি হইতে সুবাসিনী দেবীর বাড়িতে আসিতেই সুবাসিনী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পদরজ লইয়া জল মিশাইয়া বিমলার মুখে দিলেন। শ্রীমা বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে বলিলেন, "কাল তোমার পুজো হবে, মা, আর বড় বউ হাউ হাউ করে কাঁদবে?" রাত্রে বিমলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

বিবাহের সময় ভূদেবের বয়স ছিল তের বৎসর; স্ত্রী তখন একেবারে বালিকা। শাশুড়ী সুবোধবালা দেবী একদিন বালিক-বধূকে শাসন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "ও মেজো বউ, চুপ কর, চুপ কর। 'এলো কি এমনি এসেছে? এলোর বিয়েতে কত বাদ্যি বেজেছে। কত বাদ্যি বেজেছে, কত বাজনা বেজেছে'!" অনন্তর গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, "তুই বকছিস কেন? কত সাধের বউ!"

হাসিবারই কথা। এইসব বধূরা যখন শ্রীমায়ের সহোদরদের গৃহে আসেন, তখন তাঁহারা নিতান্তই বালিকা। শ্রীমাই গৃহিণী হিসাবে তাঁহাদের শিক্ষাভার

স্বহস্তে লইয়াছিলেন এবং শত ভুলত্রুটি সহ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃবধূদের সহিত তিনি বরাবর এই স্নেহের সম্বন্ধই বজায় রাখিতেন।

ইন্দুমতী দেবী ও নলিনীদিদি তখন ছোট—রান্না জানেন না। তাই শ্রীমা তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমার কাছে আয়, রান্না শেখ। আমি কি তোদের সংসারে বারমাস রান্না করতে পারব?" পরবর্তী কালে ইন্দুমতী যখন পাকা গৃহিণী, তখন শ্রীমা নূতন বাড়িতে থাকেন। মা ডুমুরের ডালনা, আমরুল শাক, গিমা শাক প্রভৃতি খাইতে ভালবাসিতেন– তাই ঐসব রাঁধিয়া নূতন বাড়িতে দিয়া যাইতে ইন্দুমতীকে বলিতেন ; বলিতেন, "ডুমুরের ডালনা তুই বড় ভাল রাঁধিস।" একবার বাগবাজারে ইন্দুমতী দেবীর উদরাময় হইলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, একটু ধ্যানজপ কর, তাহলে শরীরের ব্যাধি যাবে।" অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, তোরা ছেলেমানুষ। খুব সাবধান হয়ে কাজকর্ম করবি। আমার ঠাকুর হাতপা-ওয়ালা! অসাবধান হলে তোমাদের অপরাধ হবে।"

মনসাপূজা উপলক্ষে জয়রামবাটীর শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী সকলকে খুব খাওয়াইয়াছেন ; তাই বাড়িতে ফিরিয়া কেহ রাঁধিতে চাহিলেন না। রাঁধুনী নলিনী বলিল, "এক টিন মুড়ি হলে যখন সকলের চলে যায়, তখন একবেলা রান্না নাই বা হল।" এদিকে সুবাসিনী দেবী দুই সের চাউলের ভাত রাঁধিলেন ; সকলে খাইলেনও বেশ। পরদিন তরকারী কুটিতে কুটিতে শ্রীমা বলিলেন, "নলিনী রাঁধতে বারণ করলে, বউ রাঁধলে—এক টিন মুড়ি বেঁচে গেল। তা না হলে কাল মৃগেন্দ্র বিশ্বাসের মা[১] মুড়ি ভেজে গেছে, আজ আবার তাকে ডাকতে হত। 'জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যে বোঝে সেই হৃষ্ট'।" একবার শ্রীমায়ের দশ-পনর দিন কামারপুকুরে অবস্থানকালে সুবাসিনী দেবী কিছু পদ্মফুল ও মিষ্ট পাঠাইয়া দিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "এ সংসারে কেউ আমার তত্ত্ব করে না—এই একটিই করে।" সুবাসিনী দেবী শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। একদিন বিকালে ঝুল ঝাড়ার সময় পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে ভুলক্রমে পঞ্চাশ-ষাট টাকার একতোড়া নোট বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইলে সুবাসিনী উহা দেখিতে পাইয়া শ্রীমাকে আনিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া শ্রীমা বলেন, "গৌরদাসী এইটি আমার (অর্থাৎ দীক্ষিত) করে দিয়ে গিয়েছিল—গৌরদাসী সেয়ানা কিনা।" শ্রীমা প্রথমে ভ্রাতৃজায়াকে দীক্ষা দিতে রাজি হন নাই ; বলিয়াছিলেন, "ঘরে মন্ত্র দেব না।" কিন্তু গৌরী-মা বলিলেন, "সে কি, মা? একটি তোমার বলতে থাক।" তাই মা সুবাসিনী

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দেবীকে দীক্ষা দেন। তিনি পরে মাকুকে, ভূদেব ও তাহার পত্নীকে এবং রাধু ও তাহার স্বামীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমা তাঁহার স্নেহভাজনদের প্রীতির দান শতগুণ করিয়া দেখিতেন। সুবাসিনী দেবী একবার স্বামীর হাত দিয়া শ্রীমাকে কলিকাতায় এক ডিবা গুল পাঠাইয়াছিলেন। জয়রামবাটীতে ফিরিয়া উহা স্মরণ করিয়া শ্রীমা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই যে গুল পাঠিয়েছিলি, সবাই সুখ্যাত করছিল।" সুবাসিনী নিবেদন করিলেন যে, মন্ত্র লইলেও তাঁহার সাধনভজন হইতেছে না। ইহাতে শ্রীমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই এই যে কাজ করছিস, এতেই সাধন হচ্ছে—এর চেয়ে আর কি সাধনভজন? ঠাকুরকে বল, যাতে ভক্তিলাভ হয়।"

সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদ লইয়াই সংসার। শ্রীমা চাহিলেন সকলকে আনন্দ দিতে এবং সকলকে লইয়া আনন্দ করিতে; কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি বহু স্থলে সে চেষ্টাকে প্রতিহত করিত। ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদিদির শুচিবায়ু, রাধুর বাতুলসদৃশ আবদার এবং ছোটমামীর পাগলামি—এই সকল মিলিয়া যে অবর্ণনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত, তাহাতে একমাত্র ধৈর্যময়ী শ্রীমায়ের পক্ষেই শান্তভাবে সংসারে কাজ করা সম্ভব ছিল। এই সমস্ত লইয়াই শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবন। আমরা এই দুঃখবহুল অধ্যায় প্রায় শেষ করিয়াছি—অবশিষ্ট আছে শুধু পাগলীমামীর দুই-চারিটি কথা।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের গোড়াতে একদিন সুরবালা দেবী রাধুর গহনাগুলি লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছিলেন। বাবা গহনাগুলি কাড়িয়া লওয়ায় সুরবালা আরও ক্ষেপিয়াছেন এবং জয়রামবাটীতে ফিরিয়া ৺সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে "মা, গয়না দাও ; মা, গয়না দাও" বলিয়া কাঁদিতেছেন। শ্রীমা তখন নিজ বাড়িতে বসিয়া অপরের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অপরে সে কান্না শুনিতেছেন না, অতদূরে শুনিবার কথাও নহে। মায়ের কানে কিন্তু সে রোদন পেঁৗছিয়াছে ; তিনি বলিলেন, "যাই, যাই! বাবা, ওর আমি ছাড়া কেউ নেই। পাগলী সিংহবাহিনীর কাছে গহনার জন্য কাঁদছে।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। উন্মাদিনী তাঁহার সহিত আসিলেন, কিন্তু তখন আবার সুর পালটাইয়া বলিতেছেন, "ঠাকুরঝি, তুমিই আমার গহনা আটক করে রেখেছ, তুমিই দিচ্ছ না।" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "আমার হলে আমি কাক-বিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।" আর ভক্তকে বলিলেন, "গিরিশবাবু বলতেন, এটা আমার সঙ্গের পাগলী।" পরে একদিন সকালে শ্রীমা একজন ভক্তকে বাড়ির এক পুরাতন চাকরের সহিত পাগলীর বাবার নিকট পাঠাইলেন —অলঙ্কার ফিরাইয়া আনিতে, অথবা ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিতে। ব্রাহ্মণ

আসিলেন, কিন্তু অলঙ্কার দিলেন না। শ্রীমা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিলেন, “আপনি আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন।” কিন্তু লোভী ব্রাহ্মণের মন গলিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীমা সব কথা জানাইয়া কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। কিছুদিন পরে মাস্টার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় (‘কাইজার’) আসিলেন। ললিতবাবুর সহিত কলিকাতা-পুলিসের একজন বড় কর্মচারীর পত্র ছিল। তিনি উহার সাহায্যে বদনগঞ্জ থানা হইতে পুলিস সংগ্রহ করিয়া সাহেব সাজিয়া শিবচতুর্দশীর পরদিন পালকি করিয়া পাগলীর বাবার নিকট হাজির হইলেন--যেন তিনি নিজেই পুলিসের একজন বড় কর্তা। এদিকে তিনি জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমা ভয় পাইলেন, পাছে তাঁহার কোন প্রকার হঠকারিতার ফলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপমানিত হন; তাই তিনি শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়কে পিছনে পাঠাইলেন। সায়াহ্নের পূর্বেই তাঁহারা গহনা-সমেত ব্রাহ্মণকে লইয়া শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণ অলঙ্কার প্রত্যার্পণ করিলেন। এ ঘটনার এইখানেই সমাপ্তি হইল;' কিন্তু রাত্রি দুইটায় বাড়ির ভিতর হইতে সংবাদ আসিল, শ্রীমায়ের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, মাথা ঘুরিতেছে। তৎক্ষণাৎ কেহ কেহ তাঁহার নিকট গিয়া ওরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, “ওরা তো সব চলে গেল গয়না আনতে; আমি সমস্ত দিন ভেবে অস্থির, পাছে ব্রাহ্মণের কোনরূপ অপমান হয়। এই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।”

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে শ্রীমা কলিকাতায় উদ্বোধনে আছেন। সুরবালার ধারণা শ্রীমা ঔষধাদি দ্বারা রাধুকে বশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া রাখিয়াছেন, অথচ রাধুর জন্য কিছুই না রাখিয়া সমস্ত খরচ করিয়া ফেলিতেছেন; তাই তাঁহার ভাবনা, পরে রাধুর কি হইবে? এইজন্য তিনি শ্রীমাকে অবিরাম গালাগালি করেন। এক রাত্রে আহারের পর এইরূপ গালাগালিতে উত্যক্ত হইয়া শ্রীমা বলিতেছেন, “তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি। তুই যে আমাকে অত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই না; ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়। আমি যদি তোর অপরাধ নিই, তাহলে কি তোর রক্ষা আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি, তোরই ভাল। তোর মেয়ে তোরই হবে। যে কদিন মানুষ না হয়, সে কদিনই আমি। নতুবা আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উবে যাব, টেরও পাবিনি।” পাগলীর তখন সুর বদলাইয়াছে, তিনি বলিতেছেন, “আমি তোমাকে বাপান্ত করে কবে গাল দিয়েছি? আমি বাপান্ত করিনি, অমনি বলেছি। তুমি যাকে দাও, সব যে দিয়ে ফেল।”

শ্রীমা শেষবার জয়রামবাটীতে আছেন। শরীর মোটেই ভাল নয় এবং দুর্বল;

রাধুর যন্ত্রণাও যথেষ্ট আছে। ছয় মাস পূর্বে সন্তান হওয়ার পর হইতে রাধু চলিতে পারে না। এমন সময় একদিন অপ্রকৃতিস্থা সুরবালার খেয়াল হইল যে, তাঁহার জামাতা মন্মথ হারাইয়া গিয়াছে। বহু জায়গায় খুঁজিয়াও সন্ধান পাইলেন না। শেষে পুকুরে নামিয়াও অনেকক্ষণ খুঁজিলেন। অকস্মাৎ ভাবিলেন, "এসব ঠাকুরঝির কাজ।" তখনই ভিজা-কাপড়ে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুরঝি গো, আমার জামাই বাঁড়ুজ্যেপুকুরে ডুবে গেছে গো। কি হবে গো?" শ্রীমা ব্যস্ত হইয়া সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একজন আসিয়া সব শুনিয়া বলিল, "মন্মথ বেনেদেব দোকানে তাস খেলছে, দেখে এলাম।" শ্রীমা বলিলেন, "শিগ্‌গির ছুটে খবর দিয়ে তাকে নিয়ে এস।" মন্মথ তখনই আসিল। মামী ক্রোধভরে শ্রীমাকে বকিতে বকিতে সরিয়া গেলেন।

ইহার পরবর্তী ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক। উহাতে অসীম-সহনশীলা শ্রীমায়ের ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল। অথবা আমাদেরই বুঝিবার ভুল, কারণ জগদম্বা ধৈর্যহারা হইতে পারেন না, পরন্তু লীলাসংবরণে উন্মুখ হইয়া তিনি নিজের পাগলীকে অচিবে নিজসকাশে টানিয়া লইবারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন মাত্র। ঘটনাটি এই—

পূর্বোক্ত হাস্যকরুণরসাত্মক ঘটনার দিন বিকালে শ্রীমা রাত্রের কুটনা কুটিতেছেন। হঠাৎ ছোটমামী আসিয়া বলিতেছেন, "তুমিই তো রাধুকে আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে বশ করে রেখেছ। আমার নাতিকে, আমার মেয়েকে, আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।" ভক্তগণ বিশ্বাস করিতে বা বুঝিতে না চাহিলেও শ্রীমা তখন বন্ধন কাটাইতে উদ্যত; তাই নির্বিকারচিত্তে বলিলেন, "নিয়ে যা না তোর মেয়েকে—ঐ তো পড়ে আছে; আমি লুকিয়ে রেখেছি নাকি?" মামী ঝগড়া করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন; তাই মায়ের ঐ উদাসীনতায় তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। গালাগালি হইতে আরম্ভ করিয়া দুই-এক কথার পরই তাঁহার উগ্রতা চরম সীমায় পৌঁছিল। শ্রীমাকে মারিবার জন্য তিনি একখানি জ্বালানি কাঠ লইয়া আসিলেন। সে প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া মাতাঠাকুরানী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, কে আছ পাগলী আমায় মেরে ফেললে।" বরদা মহারাজ ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, কাঠখানি প্রায় মাথায় পড়িতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি উহা দূরে ফেলিয়া দিয়া মামীকে সদর দরজা পার করাইয়া এবং রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে সে বাড়িতে আর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শ্রীমাও এই উত্তেজনার মুখে যেন অন্য লোক হইয়া গিয়াছেন; অকস্মাৎ তাঁহার শ্রীবদন হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "পাগলী কি করতে বসেছিলি? ঐ হাত তোর খসে পড়বে।" পরক্ষণেই, তিনি জিব কাটিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, "ঠাকুর, একি করলুম?

এখন উপায় কি হবে? আমার মুখ দিয়ে কোন দিন তো কারু ওপর অভিসম্পাত-বাক্য বেরোয়নি; শেষটায় তাও হল? আর কেন?" শ্রীমায়ের চোখে তখন জল ঝরিতেছে। সে করুণামূর্তি দেখিয়া বরদা মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তাঁহার নিজের ক্রোধ কোথায় মিলাইয়া গেল!

শ্রীমায়ের দেহত্যাগের কিছুদিন পরে মামীর গলিত কুষ্ঠ হইয়া হাতের আঙ্গুল খসিয়া পড়ে এবং অল্পকাল ভুগিয়াই তিনি শ্রীমায়ের পাদপদ্মে মিলিত হন।

সঙ্ঘমাতা

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে শ্রীমা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন। সেদিন একদিকে সেখানকার মঠের অতুল ঐশ্বর্য, অন্যদিকে স্বীয় ত্যাগী সন্তানদের স্থায়ী আশ্রমের অভাব, অন্নবস্ত্রের অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠপরিচালনের জন্য অসীম দৈহিক ক্লেশ ইত্যাদির বিপরীত চিত্র সঙ্ঘজননীকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিল এবং সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য তাঁহার মনে স্বতই এক করুণ প্রার্থনা জাগিয়াছিল। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সব সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রম করে একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীন-ভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক-জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায় আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।"

কথাগুলির প্রতিছত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অসীম মাতৃস্নেহ ও সঙ্ঘপ্রীতি, সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার স্থিরনিশ্চয় এবং স্থায়ী মঠস্থাপনের আকুল আগ্রহের পরিচয় পাই। এই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা শুধু তাঁহার মনোরাজ্যে উদিত হইয়াই বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই; তিনি যতদিন মর্ত্যধামে ছিলেন, ততদিন সঙ্ঘ যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হয় তদ্বিষয়েও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ভালবাসাকেই সঙ্ঘের প্রাণ মনে করিতেন। সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গ যেমন তাঁহার স্নেহের প্রত্যাশী ছিল, তিনিও তেমনি চাহিতেন যাহাতে সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী সকলের মধ্যে অটুট ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখনকার অধ্যক্ষ সহকারী ব্রহ্মচারীদের নিকট শুধু কাজেরই আশা রাখিতেন, কিন্তু বিনিময়ে তাহাদিগকে আদর-যত্ন করিতেন না, আশ্রমে আহারাদিরও সুব্যবস্থা ছিল না। ক্রমে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, কেহ কেহ ঐ আশ্রম ছাড়িয়া শ্রীমা অথবা স্বামী সারদানন্দজীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথাপি অধ্যক্ষ নিজের ত্রুটি সংশোধনে যত্নপর না হইয়া শ্রীমায়ের নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলেন, "মা, এরা সব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন চোখ ফুটেছে, আমার কথা সব সময় মেনে থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ বা আপনাদের কাছে গেলে আপনারা আদর-যত্ন করে কাছে রেখে দেন। ভাল খাবারও সুবিধা পায়। আপনারা যদি স্থান না দেন, একটু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন, তবে আমার বাধ্য থাকবে।" শ্রীমা এইরূপ কথায় অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি গো? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আর আমি মা, আমার কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়া পরার খোঁটা দিয়ে কি করে বললে?"

আশ্রমাধ্যক্ষ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয় করিতে চাহিতেন না; অথচ কঠোর পরিশ্রম ও পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে আশ্রমবাসীদের দেহ ভাঙিয়া পড়িতেছিল। ইহা জানিয়া শ্রীমা তাঁহাকে বার বার বলিয়া মাছ খাবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষের কর্তৃত্বপ্রয়োগ সম্বন্ধেও তিনি একদিন অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সে কি গো, পেঁচোয়া বুদ্ধি রেখে অত হুকুম চালালে কি করে আশ্রম চলবে? হলেই বা ছেলেরা সব ছাত্র। নিজের ছেলেকেই একটু বেশি বকলে শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।"

আশ্রমের অধ্যক্ষকে শ্রীমা খুবই স্নেহ করিতেন এবং শ্রীমায়ের প্রতি অধ্যক্ষেরও অগাধ ভক্তি ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীমা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। রাধুকে লইয়া শ্রীমা যখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে ছিলেন, তখন আশ্রমাধ্যক্ষ একদিন তাঁহাকে গিয়া জানাইলেন যে, ব্রহ্মচারী কর্মীরা সেখানে থাকিতে চায় না, অন্যত্র চলিয়া যায়; সুতরাং শ্রীমা যেন এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন যাহাতে তাহারা অন্য কোন আশ্রমে স্থান না পায় এবং এখানেই থাকিয়া শ্রীমায়ের কাজ করে। শুনিয়াই শ্রীমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাও? আমি বুঝি বলে দেব যে ওরা কোথাও থাকতে পাবে না? ওরা আমার ছেলে, ঠাকুরের কাছে এসেছে; ওরা যেখানেই যাবে সেখানেই ঠাকুর ওদের দেখবেন। আর তুমি আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও, যাতে ওরা কোথাও স্থান না পায়। একথা আমি বলতে পারব না!" শ্রীমায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বরশ্রবণে ও আরক্তিম-বদনদর্শনে সকলে তখন আতঙ্কিত। ভক্তিমান অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

প্রয়োজনস্থলে আশ্রমাধ্যক্ষকে শাসন করিলেও শ্রীমা আশ্রমবাসীদিগকে সদুপদেশ দিতেন। উক্ত ঘটনার কিছু আগে জয়রামবাটীতে থাকাকালে তথায় আগত জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, সব বনিয়ে বানিয়ে চলতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স'। সব সয়ে যাও, তিনি আছেন।" আশ্রম-জীবনে শত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি সন্তানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আশ্রমাদিতেই থাকিতে এবং কাজ করিতে বলিতেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, শান্তানন্দজী ও গিরিজানন্দজী বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের, বিশেষতঃ বিশুদ্ধানন্দজীর ইচ্ছা শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লইয়া পরিব্রাজকরূপে বাহির হইবেন এবং কোন মঠ বা আশ্রমে না থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন তীর্থদর্শন ও তপস্যাদিতে কাটাইবেন। শ্রীমা তাঁহাদিগকে সস্নেহে গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদরে খাওয়াইলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বলিলেন, "আজ তোমরা তিনজন মুণ্ডন কর ও কাপড় গেরুয়া রং কর, কাল তোমাদের সন্ন্যাস দেব।" পরদিন (২৯শে জুলাই, ১৯০৭) তিনজনের হাতে গৈরিক বস্ত্র ও কৌপীন দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" কিন্তু ইঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইবেন, ইহা মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না ; তাই বিদায়ের আগে বলিলেন, "তোমাদের এত কঠোর করে দরকার নেই—ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ। তবে তোমরা নেহাত পরিব্রাজক হয়ে হেঁটে বেড়াবে সঙ্কল্প করেছ; তাই আমি একটু করতে দিচ্ছি—তোমরা কাশী পর্যন্ত হেঁটে যাও। সেখানে আমি তারককে (স্বামী শিবানন্দকে) লিখে দিচ্ছি ; সে তোমাদের থাকতে দেবে। তার কাছ থেকে তোমাদের সন্ন্যাসজীবন গড়ে তুলো ; আর তার কাছ থেকে সন্ন্যাস নাম নিও।" তদনুসারে তাঁহারা কাশী অভিমুখে চলিলেন ; শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে তালপুকুর পর্যন্ত আসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বিদায় দিলেন। ইঁহারা কাশীতে পেঁৗছিলে শিবানন্দজী শ্রীমায়ের আদেশানুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৯১১ খৃীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের কথা। ঐ সময় জনৈক ত্যাগী সন্তান একটি গুরুতর ভুল করিবার পর উদ্বোধনে রহিয়াছেন। তাঁহাকে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ অনেকে বেলুড় মঠে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সেরূপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একদিন সারদানন্দজী শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কথা, আমাদের কথা কি মোটেই শুনতে নেই? মঠে গিয়ে অন্ততঃ দুদিন থেকে মহারাজের কথাটা মান্য করে আসুক।" উহার কয়েকদিন পরে শ্রীমা ঐ কথা

তুলিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই ঐ সন্তানকে অনেকবার মঠে গিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে মা আক্ষেপ করিলেন, "তাই তো, গুরুজনের কথা! ওর কাজ করতেই ইচ্ছা নেই। কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানচিন্তা করা যায়? তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে।" কিন্তু সর্বপ্রকারে তাঁহার মন বদলাইতে চেষ্টা করিলেও শ্রীমা তাঁহার প্রতি স্নেহপ্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই।

ইহারই এক বৎসর পরে জনৈক সন্তান শ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করিলেন যে, কেহ কেহ বলেন সেবাশ্রম হাসপাতাল চালানো, বই বেচা, হিসাবনিকাশ প্রভৃতি কাজ সাধুর পক্ষে সঙ্গত নহে ; কারণ ঠাকুর ঐ সব কিছু করেন নাই। কাজ করিতে হয় তো পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদিই করা উচিত—অপর সমস্ত কর্ম বিষয়চিন্তা আনিয়া সাধুকে ঈশ্বরবিমুখ করে। শ্রীমা সব শুনিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায়! ঠাকুরের কথা বলছ—তাঁর আলাদা কথা, আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছ বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?...ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনি ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।"

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমা একদিন স্থানীয় সেবাশ্রমের দ্বারা পরিচালিত বৃদ্ধাদের আশ্রম দেখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "এই অনাথা বুড়ীদের সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়। আহা, এই সব ছেলেরা কি কাজই করছে।" ঐ বিষয়েই অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা, মা! কোথা থেকে কি করাচ্ছেন, তিনি জানেন।"

জয়রামবাটীতে তিনি একদিন জপধ্যানের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "সব সময় জপধ্যান করতে পারে কজন? মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে, কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐ সব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।"

শ্রীমায়ের বিশ্বাস ছিল যে, সঙ্ঘের মধ্য দিয়া ঠাকুর তাঁহার নূতন ভাবধারার প্রচার অবশ্যই করিবেন। জনৈক মঠাধ্যক্ষ যখন তাঁহার নিকট একদিন দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, দেশের লোকের মতিগতি অনুকূল না হওয়ায় কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না, কারণ দেশের লোক ভাঙিতেই জানে, গড়িতে সাহায্য করে না, তখন শ্রীমা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'মলয়ের হাওয়া লাগলে যেসব গাছের সার আছে তারা চন্দন হয়।' মলয় বয়ে গেছে, এইবার সব চন্দন হবে—কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া।"

আশ্রম ও আশ্রমবাসীদের বহু সমস্যাই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত

অথবা তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইত; তিনিও প্রতিক্ষেত্রে উপযুক্ত বিধান, উপদেশ বা উৎসাহ দিতেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমের দাতব্য ঔষধালয়ে এমন অনেক চিকিৎসার্থী আসিতেন যাঁহারা অর্থব্যয়ে অন্যত্র ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহা দেখিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমায়ের নির্দেশ চাহিলেন, যাহাতে ঐরূপ প্রার্থীকে ঔষধ না দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীমা সাধারণ জাগতিক দৃষ্টির উর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহাকে বলিলেন, অর্থী হইয়া যে কেহ আসুক না কেন, তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, সুতরাং ঔষধালয়ের দ্বার সকলেরই জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

ঐ আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে আশ্রমকর্মীরা স্বদেশী আন্দোলনে খুব মাতিয়াছেন, অথচ গঠনমূলক কোন কাজ না করিয়া শুধু অন্তঃসারশূন্য আলোচনাতেই সময়ক্ষেপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমরা 'বন্দেমাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িয়ো না; তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতো কাটি। তোমরা কাজ কর।" আশ্রমকে ধর্মকেন্দ্রীয় করিবার জন্য তিনি তথায় স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা অন্যত্র বলিয়া আসিয়াছি।

ব্রহ্মচারীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা বাড়াইবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে; তোমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে নাও।" তিনি এই কার্যে প্রথম স্বামী ধর্মানন্দ এবং পরে ঢাকার কৃষ্ণভূষণ-বাবুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কার্যে উৎসাহ দিলেও তিনি কাজের মন্দ দিকটার সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সদুদ্দেশ্যে আশ্রম করিয়া কাহারও কাহারও মন আবার বিষয়-পরিচালনা-জনিত সংকীর্ণতাদিদোষে জর্জরিত হইয়া পড়ে। তাই শ্রীমা একদিন স্বামী তন্ময়ানন্দকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "'ঢেঁকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস'। কোথায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের নাম করবে, না কেবল কাজ! আশ্রম হল দ্বিতীয় সংসার। লোকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে আসে; কিন্তু এমন মোহ ধরে যায় যে, আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় না।"

শ্রীমায়ের জীবনে আর একটা লক্ষ্য করিবার জিনিস ছিল, বৈরাগ্যের সহিত মাতৃস্নেহের অপূর্ব মিলন। তিনি সর্বান্তঃকরণে সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করিতেন। জয়রামবাটীতে একবার দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিপূজাক্ষণে অনেকেই তাঁহার পায়ে অঞ্জলি ভরিয়া পদ্মফুল দিয়া চলিয়া গেলে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আরও ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ,

খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও।" পূজা গ্রহণ করিয়া তিনি জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সকলের ইহকাল-পরকালের মঙ্গল হোক।" আর একবার ১৩২৫ সালে উদ্বোধনে অবস্থানকালে শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে সকলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেলে তিনি ব্রহ্মচারী বরদাকে ডাকিয়া অর্ঘ্য দিতে বলিলেন। অর্ঘ্যপ্রদান হইয়া গেলে তিনি ব্রহ্মচারীর মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ার সকলের হয়ে সকলের নাম করে ফুল দাও—আজ বিশেষ দিন।" ঐরূপ করা হইলে শ্রীমা ঠাকুরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীমায়ের এই স্নেহ যিনি পাইয়াছেন, তিনি ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবেন না যে, উহা কত গভীর, কত দুর্লভ। জয়রামবাটীতে থাকিতে ব্রহ্মচারী জ্ঞানের (স্বামী জ্ঞানানন্দের) খুব পাঁচড়া হয়। তিনি তখন নিজ হাতে খাইতে পারিতেন না, তাই শ্রীমা ভাত মাখিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলিতেন। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী (স্বামী অরূপানন্দ) যখন জয়রামবাটীতে মায়ের নূতন বাটী নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একদিন জরুরী কাজে পাশের গ্রামে গিয়া মধ্যাহ্নে খাইবার সময় ফিরিতে পারেন নাই। তখন শীতকাল—দিন ছোট। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বে ফিরিয়া তিনি শুনিলেন, শ্রীমায়ের তখনও আহার হয় নাই—তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিস্মিত হইয়া তিনি অনুযোগ করিলেন, "মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছ?" মা শুধু বলিলেন, "বাবা, তোমার খাওয়া হয় নি, আমি কি করে খাব?" রাসবিহারী মহারাজ তাড়াতাড়ি খাইতে বসিলেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে শ্রীমা ও অপর যেসব মেয়েরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে খাইতে বসিলেন। এইরূপ ব্যবহার কয়জন জননী নিজ সন্তানের প্রতি করিয়া থাকেন?

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ মঠে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন এবং প্রাচীন সাধুদের যথেষ্ট স্নেহ পান। একসময় তাঁহার মনে হইল, "এভাবে বৃদ্ধ সাধুদের আদর পেয়ে অভিমান বাড়ানো অপেক্ষা বাইরে গিয়ে তপস্যা করা শ্রেয়।" অথচ তিনি জানেন যে, মঠকর্তৃপক্ষ ইহা অনুমোদন করিবেন না; সুতরাং শ্রীমায়ের অনুমতিলাভের জন্য কলিকাতায় গেলেন। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া নিজ মনোভাব খুলিয়া বলিলে মা জানিতে চাহিলেন, তিনি কোথায় যাইবেন এবং সঙ্গে টাকা-কড়ি আছে কি না। ব্রজেশ্বরানন্দজী বলিলেন যে, তাঁহার হাত শূন্য—গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কাশী যাইবেন। শ্রীমা শুনিয়া

স্নেহমধুরকণ্ঠে বলিলেন, "কার্তিক মাস; লোকে বলে যমের চার দোর খোলা। আমি মা; আমি কি করে বলি, বাবা, তুমি যাও? আবার বলছ, হাতে পয়সা নেই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে, বাবা?" ব্রজেশ্বরানন্দজীর আর যাওয়া হইল না।

দৈব-দুর্বিপাকে একজন সংঘ ছাড়িয়া যাইতেছেন; বিদায়কালে শ্রীমা কাঁদিতেছেন, ভক্তও কাঁদিতেছেন। খানিক পরে মা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন এবং সন্তানকে কলঘরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিতে বলিলেন; পরে স্নেহভরে বলিলেন, "আমায় ভুলো না! ভুলবে না তা জানি, তবু বলছি।" ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি?" মা বলিলেন, "মা কখনও ভুলতে পারে? জেনো, আমি সব সময় তোমার কাছে আছি কোন ভয় নেই।" সন্তান পথে নামিলে জননী জানালায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীমায়ের এই স্নেহ কত ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিত! একবার কোয়ালপাড়ার আশ্রমাধ্যক্ষ মন্তব্য করেন, "ছেলেগুলো খাবার লোভে এ আশ্রম, সে আশ্রম ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কি রকম কথা দেখেছ? আমার ছেলের, ঠাকুরের ছেলের খাবার কষ্ট কেন হবে? কখনই হবে না। আমি নিজে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, 'হে ঠাকুর, তোমার ছেলেদের যেন খাবার কষ্ট কখনও না হয়।' বলে কিনা, লোভের বশে ছুটে বেড়ায়।"

রাসবিহারী মহারাজ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে হৃদয়ে গভীর বৈরাগ্য লইয়া একবস্ত্রে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। পথে একবার অবশ্য মনে হইয়াছিল যে, বাড়িতে ফিরিয়া কাপড় লইয়া আসা ভাল। কিন্তু পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে আর দ্বিতীয় বস্ত্র লওয়া হইল না। শ্রীমা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কাপড় দিলেন এবং ফিরিবার কালে উহা লইয়া যাইতে বলিলেন। অধিকন্তু গাড়িভাড়াও দিতে চাহিলেন; প্রয়োজন না থাকায় রাসবিহারী তাহা লইলেন না। বিদায়কালে শ্রীমা বলিলেন, "গিয়ে পত্র লিখবে।" আর দুঃখ করিয়া কহিলেন, "আমার ছেলেটিকে কিছুই খাওয়াতে পারলুম না, মাছ ধরাতে পারিনি।"

অথচ এই মা-ই কত জনকে সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দিয়া গৃহত্যাগী করাইয়াছেন! অবশ্য তিনি নির্বিচারে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন না; বিবাহ করা বা না করা সম্বন্ধে অধিকারী বুঝিয়া বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। দিব্যচক্ষে জিজ্ঞাসুর ভবিষ্যৎ দেখিয়া কখনও বলিতেন, "সংসারীদের কত কষ্ট। তোমরা হাঁফ ছেড়ে ঘুমিয়ে বাঁচবে।" কখনও বলিতেন, "আমি ও সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে পারব না। বিয়ে করে যদি অশান্তি হয়, তখন বলবে, 'মা, আপনি বিয়ে করতে মত দিয়েছিলেন'।" কোন ভক্ত হয়তো

বলিলেন, "মা, আমি বে করব না।" শ্রীমা অমনি হাসিয়া বলিলেন, "সে কি গো? সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি।" সে ভক্ত পরে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার কেহ হয়তো লিখিলেন, "মা, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই, বাড়িতে বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিতে চায়।" শ্রীমা শুনিয়াই বলিলেন, "দেখ, দেখ, কি অত্যাচার।" একবার জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে বলিলেন, "মা, আমি এতকাল বিয়ে না করে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম; এখন দেখছি, পেরে উঠব না।" শ্রীমা অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? ঠাকুরের কত গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তোমার কোন ভয় নেই—তুমি বিয়ে করবে।"

শ্রীমায়ের মনোভাব সকলের বোধগম্য হইত না; তাই প্রশ্ন উঠিত বহুরূপ। নবাসনের বউ একদিন অনুযোগ করিলেন, "মা, আপনার সব ছেলেরা সমান। তবে যে বিয়ে করার মতামত চেয়েছে, তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন আর যে সংসার ত্যাগ করতে চায়, তাকে সেইমত ত্যাগের প্রশংসা করে উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত, যেটি ভাল সেই পথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া।" মা বলিলেন, "যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলে কি সে শুনবে? আর যে বহু সুকৃতিবলে এই সব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে, তাকে একটু সাহায্য করব না? সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে, মা?"

ত্যাগীকে ত্যাগের পথে সাহায্য করা অবশ্যকর্তব্য হইলেও সে ত্যাগীকে চিনিবে কে এবং চিনিয়া অনুরূপ সহায়তা করিবে কে? ত্যাগী ও গৃহীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না—ইহা শ্রীমায়ের জানাই ছিল। আমরা নবাসনের বউ-এর নিজের বৈধব্য ও শ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি হইতে সঞ্জাত ত্যাগীর প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলিতেছি না—সংসারে থাকিয়াও যথার্থ অধিকারীকে ত্যাগের পথে আগাইয়া দেওয়ারই কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহা কয়জন পারেন? মাতাঠাকুরানীর শেষবার জয়রামবাটীতে থাকার সময় পৌষ মাসে এক এম. এ. পাস যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন যে, তিনি এক দ্বিধায় পড়িয়াছেন। তাঁহার সাধু হইবার ইচ্ছা আছে জানিয়া বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দজী তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিলেও তাঁহার মায়ের মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া প্রতিবেশী মাস্টার মহাশয় আরও বিলম্ব করিতে বলিতেছেন। শ্রীমা সব শুনিয়া গেলেন মাত্র—তখনই কোন নির্দেশ দিলেন না। পরে বরদা মহারাজকে বলিলেন, "মাস্টারের বাড়ির কাছে ওদের বাড়ি; ঘরে মা-ভাই আছে। সাধু হবে শুনে মাস্টার একটু গড়ি-মসি করছে, বলছে, 'এত তড়াহুড়া করে নাই বা সাধু হলে।' মঠে তারক (শিবানন্দজী) কিন্তু খুব উৎসাহ দিচ্ছে। মাস্টার হাজার হোক সংসারী

কিনা![১] আর তারক সাদা, সাধু লোক। ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করা আহা, কত ভাগ্যে হয়! তারক ঠিকই বলেছে। সংসারে পড়লে আর উঠতে পারে কয়জন? ছেলেটির মনে খুব জোর আছে।" পরদিন ঐ যুবক শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আবার মনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, বাবা। তারক যা বলেছে, খাঁটি কথাই বলেছে।"

রামময়ের বয়স তখন অধিক নহে। আই. এ. পরীক্ষা দিয়া বি. এ. পড়িতেছেন। তাঁহার সাধু হইবার ইচ্ছা জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির সকলে জানেন। একদিন দুপুরে শ্রীমা গুল দিয়া দাঁত মাজিতেছেন; রামময় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। নলিনীদিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দিকি, পিসীমা, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে। দুটো পাস করে তিনটে পাসের পড়া পড়ছে। বাপ-মা কত কষ্ট করে মানুষ করেছে, পড়ার খরচ যোগাচ্ছে। ছেলে কিনা সাধু হবেন! কোথায় রোজগার করে মা-বাপকে খাওয়াবে, তা নয়।" মা বলিলেন, "তুই তার কি বুঝবি? ওরা তো কাকের বাচ্চা নয়, কোকিলের বাচ্চা। বড় হলেই আসল মাকে বুঝতে পারে, লালন-পালন করা মাকে ছেড়ে আসল মায়ের কাছে উড়ে যায়।" ইনি পরে সাধু হইয়াছিলেন।

শ্রীমা শেষবারে জয়রামবাটীতে আছেন। মনসা নামক এক যুবক তাঁহার নিকট গৈরিকবস্ত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় খুব আনন্দিতমনে কালীমামার বৈঠকখানায় বসিয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেছেন। মাতাঠাকুরানীর উহা খুব ভাল লাগিল। তাঁহার কাছে বসিয়া রাধু, মাকু প্রভৃতি এবং মামীদের দুই-একজনও গান শুনিতেছিলেন। মামীদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু করে দিলেন।" মাকুও তাহাতে যোগ দিয়া বলিল, "ঐ ছেলের বাপ-মা কত আশা করে তাকে মানুষ করেছিলেন, এখন সেসব চুরমার হয়ে গেল। বিয়ে করাও তো একটা সংসারধর্ম! পিসীমা এভাবে সাধু করতে থাকলে মহামায়া তাঁর উপর চটে যাবেন। সাধু তারা হতে চায়, নিজেই হোক, পিসীমার ঐজন্য নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন?" সব শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, "মাকু, ওরা সব দেবশিশু। সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ তা তো দেখছিস। তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।"

সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকিলেও শ্রীমা গৈরিক-ধারণের অনুমতি দেওয়া সম্বন্ধে অতি সাবধান ছিলেন। স্বামী কেশবানন্দ মাতার

১ এই ক্ষেত্রে শিবানন্দজীর সহিত মাস্টার মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গির একটু পার্থক্য থাকিলেও তিনি অনেককে উৎসাহ দিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন।

একমাত্র পুত্র বলিয়া শ্রীমা প্রথমে তাঁহার সন্ন্যাসে সম্মত হন নাই; পরে যখন জানিলেন যে, তিনি মাতার অনুমতি পাইয়াছেন, তখন সানন্দে অনুমোদন করিলেন। কেশবানন্দ স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; হাঁপানিতে ভুগিতেন। তাই তাঁহার জননী ছেলের সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে পুত্রশোক পাইতে না হয়। শ্রীমা সে বর দিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধা পুত্রের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্র কাশীধাম হইতে জয়রামবাটী আসিয়া শ্রীমায়ের নিকট সন্ন্যাস-প্রার্থী হইলে তিনি প্রথমে তাঁহার বাড়ির অবস্থাদি জানিয়া লইলেন। যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, দেবেন্দ্র গৃহত্যাগ করিলে বাড়ির কাহারও ভরণ-পোষণের অভাব হইবে না, তখন তাঁহাকে কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে নূতন কাপড় গেরুয়া করিয়া আনিতে বলিলেন এবং পরদিন তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন।

শেষ অসুখের সময় শ্রীমা যখন উদ্বোধনে ছিলেন, তখন একজন ত্যাগী যুবকের পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি তাহাকে তাহার বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যুবককে বলিলেন, "আজ যে তোমার বাড়ির কথা, মার কথা, এত জিজ্ঞাসা করলুম, কেন জান? প্রথম গ—র মুখে তোমার বাপ মরার খবর শুনলুম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার মার আর কে আছে, খাবার সংস্থান আছে কি-না, তুমি না থাকলে তাঁর চলবে কিনা। যখন শুনলুম তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে, তখন মনে হল, 'যাক, ছেলেটার যদি একটু সদ্‌বুদ্ধি হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তার সৎপথে থাকবার বিশেষ বাধা পড়বে না'।"

সব দেখিয়া শুনিয়া সন্ন্যাসদানের পর শ্রীমা অপরের সমালোচনায়, এমন কি ক্রন্দনেও বিচলিত হইতেন না; কারণ তিনি জানিতেন, ঈশ্বরলাভের জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করে সে ধন্য। একসময় একজন জয়রামবাটীতে আসিয়া সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া যাইবার কিছু পরেই তাঁহার মাতা ও পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে ভানু-পিসী বলিয়াছিলেন, "সেদিন একজন এসেছিল। তার ছেলে ঘর থেকে পালিয়ে মার কাছে এসে সন্ন্যাস নিয়েছে। খবর পেয়ে মা পাগলের মতো ছুটে এসে বলছে, 'আমার ছেলে কই, ছেলে কই?' ছেলে কিন্তু আগেই গেরুয়া নিয়ে চলে গেছে। তাই মা ও স্ত্রীর শ্রীমার উপর ভারী আক্রোশ। অনুযোগ দিয়ে শ্রীমাকে বলছে, 'উপার্জনশীল ছেলের অভাবে সংসারে বিপর্যয় ঘটেছে—দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই।' শ্রীমা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন, 'সে তো কোন অন্যায় করে নি, ভাল পথেই গেছে; আর শুনেছি, সে তোমাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে।' শ্রীমায়ের স্নেহ

ও আদরে তাদের প্রাণ ক্রমে ঠান্ডা হয়েছিল এবং শান্ত মন নিয়েই তারা বাড়ি ফিরেছিল।”

ক্ষেত্র বিশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে সন্ন্যাসে অসম্মতিও জানাইতেন। একবার তাঁহার শিষ্যা এক ভক্তিমতী স্ত্রীলোক তাঁহাকে পত্রে জানাইলেন যে, স্বামী তাঁহাকে বারংবার বলিতেছেন, 'তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের ঘরে গিয়ে থাক। আমি আর সংসারে থাকব না—সন্ন্যাসী হব।” নিরুপায় নারীর পত্রের প্রতিচ্ছত্র শ্রীমায়ের প্রতি কাতর অনুনয়ে পূর্ণ। পত্র শুনিয়া তিনি উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন, “দেখ দিকিন, কি অন্যায়। সে বেচারী এই কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে যায় কোথায়? তিনি সন্ন্যাসী হবেন! কেন সংসার করেছিলেন? যদি সংসারত্যাগই করতে চাও, আগে এদের খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা কর।”

একবার আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন দুই জন ভক্তিমান যুবক আসিয়া পদ্মফুল দিয়া তাঁহার পাদপূজা করিল এবং সন্ন্যাস চাহিল। তাহাদের চালচলন ও কথাবার্তায় এমন একটা ভাবপ্রবণ অস্বাভাবিকতা ছিল, যাহা দেখিয়া শ্রীমা শুধু স্নেহভরে হাসিতেছিলেন এবং তাহারা বার বার সন্ন্যাসের জন্য আগ্রহ জানাইলেও “হবে, বাবা, হবে” বলিয়া এড়াইয়া যাইতে-ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে সন্ন্যাস না লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল।

তাঁহার দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। একসময় তিনি বলিয়াছিলেন, “অসুস্থ হয়েছে বলে গৃহস্থ বাড়িতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে! সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের স্ত্রীমূর্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনও পায়ে করেও উলটে দর্শন করবে না। আর সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। চাকি (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিস নেই—প্রাণ সংশয় পর্যন্ত।” কালবিশেষে শ্রীমা নিজ সন্তানদের প্রতি এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা করিতেন। ১৩১৮ সালে তিনি রামেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া জনৈক সাধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সাধুর মন মাতাঠাকুরানীর জন্য তিন-চারি মাস যাবৎ খুব ব্যাকুল হইয়াছে। ইহাতে আনন্দিত না হইয়া তিনি বরং বিরক্তির সহিত বলিলেন, “সেকি! সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকলও বন্ধন। ...সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই। কি কেবল 'মাতৃস্নেহ' করে—'মায়ের ভালবাসা পেলুম না।' ওসব কি? বেটাছেলে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরা—আমি ওসব ভালবাসি না। মানুষের আকৃতিটা তো? ভগবান তো পরের কথা। আমাকে কুলের ঝি বউ নিয়ে থাকতে হয়। আশু উপরে আনাগোনা করত, চন্দন-ঘষা, এটি, সেটি—আমি ধমকে দিলুম।”

গৃহত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানকে ডাকাই সাধুর কর্তব্য। হৃষীকেশ হইতে জনৈক সাধু লিখিয়াছিলেন, “মা, তুমি বলেছিলে, 'সময়ে ঠাকুরের

দর্শন পাবে।' কই তা হল?" শ্রীমা পত্র পাইয়া বলিলেন, "দাও তো, দাও ওকে লিখে, 'তুমি হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্য সেখানে এগিয়ে থাকেন নি! সাধু হয়েছ, ভগবানকে ডাকবে না তো কি করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন'।"

সাধুকে তাঁহার আচার ও মর্যাদা ঠিক রাখিয়া চলিতে হয়। গিরিজানন্দ মহারাজ জয়রামবাটী গিয়াছেন; তিনি তখনও সম্ভবতঃ (১৯০৬ খৃীঃ) ব্রহ্মচারী—কাছা দিয়া সাদা কাপড় পরেন। প্রসন্নমামা প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে যাত্রা করিবেন। তাই গিরিজা মহারাজকে বলিলেন, "চল বাবু, বরযাত্রী হবে।" মা শুনিয়া বলিলেন, "ও সাধু, ওর গিয়ে কাজ নেই।" পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় মা বলিলেন, "বাবা, দই দেব কি?" গিরিজা মহারাজ স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ বলিলেন, "না, দরকার নেই।" মাও অমনি সমর্থন করিয়া বলিলেন, "এটা বিয়ের দই- কাজ নেই খেয়ে।"

একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ের জনৈক বিশিষ্ট ভক্তের সহিত স্বামী শান্তানন্দের কাশী যাইবার কথা উঠিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "তুমি সাধু, তোমার কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না? ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে? এক গাড়িতে যাচ্ছ; হয়তো বললে, 'এটা কর, ওটা কর।' তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কেন সেসব করতে যাবে?" শ্রীমায়ের দীক্ষিত জনৈক ব্রহ্মচারী গেরুয়া ছাড়িয়া সাদা কাপড় পরিতেছেন শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, "মাটির ভাঁড়ে সিংহের দুধ টেঁকে না। গেরস্তর অন্ন খেয়ে খেয়ে ওর বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে।"

নিজে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মান দেখাইয়া শ্রীমা ঐ বিষয়ে অপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রায় সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও অল্পবয়স্ক সেবক ব্রহ্মচারী বরদাকে তিনি গেরুয়া দেন নাই। তাঁহাকে শ্রীমা ও রাধু প্রভৃতির অনেক কাজ করিতে হইত। এই সব কাজের আদেশ দিয়া শ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, "বাবা, গেরুয়া পরলে এইগুলি সব বলতে পারতুম কি? পায়ে হাত দিলেও সঙ্কোচ হত।" ইহাতে সন্ন্যাসের বিলম্ব হওয়ায় শ্রীমা সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, "তোমাদের আর কি? পরে যখন ইচ্ছা হবে, শরতের (স্বামী সারদানন্দের) কাছে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে" ঠিক এই কারণেই শ্রীমা বালক ভক্ত ব্রহ্মচারী হরিকেও (হরিপ্রেমানন্দকে) সন্ন্যাস দেন নাই।

একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের পর ব্রহ্মচারী রাসবিহারী আঁচাইবার জন্য তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। আঁচাইবার পর শ্রীমা পা ধুইয়া থাকেন, অথচ হাঁটুর বাতের

জন্য তাঁহার নিচু হইতে কষ্ট হয়, ইহা জানিয়া ব্রহ্মচারীজী পায়ে জল ঢালিয়া নিজ হাতে পায়ের পাতা মুছিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীমা অমনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "না, না বাবা, তুমি! তোমরা দেবের আরাধ্য ধন।" এই বলিয়া নিজেই হাত দিয়া পা মুছিলেন। রাসবিহারী মহারাজ তখনও কাছা দিয়া সাদা কাপড় পরেন।

শ্রীমা তখন উদ্বোধনে আছেন, রাধুও আছে। রাধু পায়ে মল পরে। সে একদিন দ্রুত তেতলা হইতে নামিতেছে এবং পায়ের মল জোরে বাজিতেছে শুনিয়া শ্রীমা বিরক্তিসহকারে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং রাধু দোতলায় আসিতেই বলিলেন, "রাধী, তোর লজ্জা নেই? নীচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পরে দৌড়ে নাবছিস। ছেলেরা কি ভাববে বল তো? তুই মল এখনই খুলে ফেল। এখানে ছেলে মেয়ে যারাই আছে তারা তামাসা করার জন্য আসে নি, সকলেই ভজন-সাধন করছে। এদের ভজনের ব্যাঘাত ঘটলে কি হবে জানিস?" রাধু সক্রোধে মল খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। আর একদিন স্নানের পর রাধু মাথা আঁচড়াইয়া একখানা গামছায় চাপ দিয়া চুলের পাতা বাহির করিয়া কেশবিন্যাস করিতেছে দেখিয়া শ্রীমা খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ জাতীয় ব্যবহার সম্বন্ধে সাধুরা উদাসীন থাকিলেও শ্রীমা তাঁহাদের প্রয়োজনে সবদিকে একটা সংযমের ভাবসংরক্ষণের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন।

এই সাধুভক্তি ও সংযমাদির প্রতি তিনি অন্যত্রও লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি যখন রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় ছিলেন, তখন ব্রহ্মচারী বরদা একদিন বসিয়া বাজারের ফর্দ লিখিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া যাইবার পথে জনৈক স্ত্রীভক্তের আঁচল ব্রহ্মচারীর পিঠে একটু লাগিয়া যায়। ব্রহ্মচারী কিছুই টের পান নাই; কিন্তু শ্রীমা লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "কি গো, ছেলে আমার সামনে বসে লিখছে, বেটাছেলে, তোমার একটু হুঁশ নেই? ওর পিঠে আঁচল লাগিয়ে যাচ্ছ? ওরা ব্রহ্মচারী, তোমরা মেয়েমানুষ, ওদের সমীহ করে চলতে হয়। আঁচলটি মাটিতে ঠেকাও, প্রণাম কর।"

ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তেরা তাঁহার নিকট তুল্যরূপ আদর পাইলেও ত্যাগীরা তাঁহার অধিকতর আত্মীয় ছিলেন—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি বলিতেন, "বাবা, ত্যাগীরা না হলে কাদের নিয়ে থাকব?" একবার উদ্বোধনের বাড়িতে কোন প্রাচীন স্ত্রীভক্ত জনৈক সাধুর সহিত কথা কাটাকাটির ফলে এই বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, "ও এখানে থাকলে আমি কিছুতেই আসব না।" তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইতে চাহিলেও তিনি কিছুতেই থামিলেন না। এই সকল কথা শ্রীমায়ের কানে উঠিলে তিনি উত্তেজিত

কণ্ঠে বলিলেন, "ও কে? গৃহস্থ! যায় এখান থেকে, যাক না! সাধু আমার জন্য সব ত্যাগ করে এখানে রয়েছে।"

জনৈক ত্যাগী ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, সন্ন্যাসীই হোক, আর গৃহস্থই হোক, ঠাকুরের যারা আশ্রয় নিয়েছে, তারা সবই তো সমান—কারণ সকলেই মুক্ত হবে?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "সে কি? ত্যাগী আর গৃহস্থ কি সমান? ওদের কামনা-বাসনা কত কি রয়েছে, আর এরা তাঁর জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছে। এদের আর তিনি ভিন্ন কে আছে? সাধুদের সঙ্গে কি ওদের তুলনা হয়?"

তিনি একদিকে যেমন অপরকে সাধুর প্রতি সম্মান দেখাইতে বলিতেন, অপরদিকে তেমনি সাধুকে অভিমানবিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। স্বামী অরূপানন্দ যখন তাঁহাকে বলিলেন, "মা, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে", শ্রীমা তখন সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বড় অভিমান—আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না। তার চেয়ে বরং (নিজের সাদা কাপড়ের দিকে চাহিয়া) এই আছি বেশ (অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ)।"

বস্তুতঃ বাহিরের বেশ অপেক্ষা অন্তরের বৈরাগ্যকে তিনি উচ্চতর আসন দিতেন। সাধন মহারাজ তাঁহার নিকট গৈরিক বাস পাইয়া সন্ন্যাসগ্রহণের অন্যান্য বিধি কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীমা ধীর-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশ্বাস-নিষ্ঠাই মূল, বিশ্বাস-নিষ্ঠা থাকলেই হল।" মাতাঠাকুরানীর এই কথায় তাঁহার অন্তর পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তিনি পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানাদির কথা তুলিতে লাগিলেন। তাই শ্রীমা বলিলেন, "মঠে ছেলেদের দিয়ে ওসব করিয়ে নিও।"

সাধনার অঙ্গ ও সংস্কার হিসাবে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করা ও বিরজা-হোমান্তে চিরকালের মতো সর্বস্ব ত্যাগ করার মধ্যে শ্রীমা একটা পার্থক্য করিতেন বলিয়া মনে হয়। এক ব্রাহ্মণ যুবক বিহার মন্ত্রিদপ্তরে কাজ করিতে করিতে বৈরাগ্য হওয়ায় চাকরি ছাড়িয়া মায়ের নিকট গেরুয়া লইতে আসেন। শ্রীমা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করেন। সেখানে অপর সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে বিরজা-হোম করিতে বলিলে তিনি এই বিষয়ে শ্রীমায়ের মতামতের জন্য পত্র লিখিলেন। শ্রীমা উত্তরে জানাইলেন, "বিরজা-হোম অতি কঠিন ব্যাপার বলে আমি তোমাকে উহা করতে আদেশ দেই নাই।" দীর্ঘকাল তপস্যার পর এই ভক্ত সংসারে ফিরিয়া যান। শ্রীমা সম্ভবতঃ ইঁহার অন্তর দেখিয়াছিলেন বলিয়াই চরম ত্যাগের অনুমতি দেন নাই।

অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবার নিজে গেরুয়া না দিয়া সন্ন্যাসীদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রবিজয় নামক এক যুবককে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দজী উদ্বোধনে শ্রীমায়ের নিকট আনিয়া বলিলেন, "মা, এ ছেলেটি

আমার সঙ্গে মাদ্রাজ যাচ্ছে, একে সন্ন্যাস দিয়ে দেবেন কি?" মা বলিলেন, "শরৎকে বল, সে দিক।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "আমি কার কি মনের ভাব বুঝি না, আর সন্ন্যাস-টন্ন্যাস মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) দেন।" তখন মা বলিলেন, "তাহলে পুরীতে রাখালের (ব্রহ্মানন্দজী) কাছে নেয় যেন।"

স্বামী জগদানন্দ সন্ন্যাসপ্রার্থী হইলে শ্রীমা গেরুয়া কাপড় লইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে ছোঁয়াইয়া ও নিজের মাথায় ঠেকাইয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি গেরুয়া দিলুম; কিন্তু মঠে গিয়ে রাখালের কাছে বিরজা করিয়ে নাম নেবে।"

ব্রহ্মচর্যব্রত সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন কাহাকেও কাহাকেও তিনি ব্রহ্মচর্য-পালনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে আনুষ্ঠানিক কিছুই ছিল না ছিল শুধু গুরুর শুভেচ্ছাসম্ভূত অনুমতি এবং শিষ্যের অশেষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা-জনিত দৃঢ়সঙ্কল্প। অবশ্য এই ভাবে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত অনেকে পরে সন্ন্যাসী হইয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গোপেশ মহারাজের সহিত জয়রামবাটীতে ও পরে কামারপুকুরে গমন করেন। গোপেশ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমায়ের নিকট হইতে তাঁহার ব্রহ্মচর্যগ্রহণের কথা সুরেন্দ্রবাবুকে জানাইলেন। সুরেন্দ্রবাবু তখনো চাকরি করেন; কিন্তু হৃদয়ে অশেষ বৈরাগ্য। তাই তাঁহারও মনে ব্রহ্মচর্যের জন্য আগ্রহ হওয়ায় তিনি কামারপুকুরে নূতন কাপড় কিনিয়া পুনর্বার মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্যের একান্ত বাসনা জানিয়া শ্রীমা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের খবর লইলেন এবং পরে ঠাকুরকে কাপড়খানি দেখাইয়া জ্ঞান মহারাজের হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি ডোর-কৌপীন ও বহির্বাস করে দাও।" সুরেন্দ্রবাবু চাকরি ছাড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা তাঁহাকে আরও কিছুকাল কাজ করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, রোজগারের টাকা হইতে ভক্তদিগকে ধর্মকর্মে সহায়তা করা ভাল। সুরেন্দ্রবাবু এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। তিনি পরে আরও একবার সংসারত্যাগের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন; মা তখনও অনুমতি দেন নাই। অবশেষে শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর সংসারের কর্তব্যভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

ত্যাগী পুরুষদের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন ত্যাগী স্ত্রীলোকদেরও শরীরপালন ও রক্ষণাবেক্ষণাদির সুব্যবস্থা থাকিলে তাঁহারাও আকুমার ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারেন—এ বিষয়ে শ্রীমায়ের পূর্ণ সম্মতি ছিল। মহীশূরের শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গারের কন্যা ঐরূপ ব্রত গ্রহণ করিতে চাহিলে শ্রীমা স্বামী সারদানন্দজীর

দ্বারা আয়েঙ্গার মহাশয়কে ঐ মর্মে একখানি পত্র লিখাইয়াছিলেন। আর একবার জনৈক ভক্তের কন্যা বিবাহে অসম্মত হওয়ায় কন্যার মাতা শ্রীমাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যাহাতে তাহাকে বিবাহের আদেশ দেন। শ্রীমা তদুত্তরে বলিলেন, "সারাজীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগানো, একি কম কষ্টের কথা!" তারপর বুঝাইয়া বলিলেন যে, অবিবাহিত জীবনে বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও যাহার বিবাহে ইচ্ছা নাই, তাহাকে বিবাহ দিয়া ভোগে লিপ্ত করানো অন্যায়।

কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যের আলোচনা শেষ করিয়া আমরা পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কথায় ফিরিয়া যাই। শ্রীমা প্রত্যক্ষতঃ উহার পরিচালনায় নিরত না থাকিলেও দূর হইতে পরামর্শ দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং স্নেহের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া সঙ্ঘের গতি নিয়মিত করিতেন। এইরূপ স্থলে বিভিন্ন অঙ্গের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অনুধাবনযোগ্য। ইঁহারা অবশ্য অনেকেই তাঁহার বা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, অথবা ঐ সন্তানদের শিষ্য। তথাপি কার্যক্ষেত্রে মাতাপুত্রের এই সম্বন্ধ যে ভাবে রূপায়িত হইত, তাহা আমাদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মনে তপস্যার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু ইহাতে সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি লইবার প্রয়োজন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দজীর অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া শ্রীযুক্ত বলরামবাবুকে লিখিলেন, "শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত অন্তে ফাল্গুন মাস নাগাত গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব?" সে অনুমতিলাভে ব্রহ্মানন্দজী কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগ্রহায়ণের শেষে (ডিসেম্বরে) যাত্রা করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মনে আমেরিকা যাওয়ার সংকল্প প্রায় স্থির হইয়া গেলেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হইবার জন্য তিনি ভাবিলেন, "আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশস্বরূপিণী; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেইরূপই করব।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ চাহিয়া পত্র লিখিলেন! দীর্ঘকাল পরে স্নেহাস্পদের সংবাদ পাইয়া মাতাঠাকুরানী বিশেষ আনন্দিত হইলেও এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন —তিনি নরেন্দ্রের এই অভিপ্রায় অনুমোদন করিবেন কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পর তিনি যে সকল দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি নরেন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকিলেও এই ক্ষেত্রে মাতৃস্নেহ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল—নরেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অতি

সমুজ্জ্বল হইলেও মা হইয়া তিনি কিরূপে তাঁহাকে সাগরপারে যাইতে বলিবেন? এইরূপ চিন্তাকুলহৃদয়ে শয়ন করিয়া তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, "ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন।" ইহার পরে মায়ের মনে আর ভয়-ভাবনা রহিল না; তিনি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিয়া স্বামীজীকে পত্র লিখিলেন। স্বামীজীও উহা পাইয়া সোল্লাসে বলিলেন, "আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মারও ইচ্ছা আমি যাই।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দজী আমেরিকা যাত্রার (মার্চ, ১৮৯৬) পূর্বে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমায়ের আশীর্বাদ কামনা করিলেন। শ্রীমা এবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন, বাবা, কোন ভয় নেই।"

আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের একদিন ব্রহ্মানন্দজী মায়ের বাড়ীতে আসিয়া যোগানন্দজীর পরামর্শক্রমে শ্রীমায়ের নামে আমেরিকাস্থ স্বামী অ—কে পাঠাইবার জন্য আধ্যাত্মিক জীবন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র রচনান্তে মায়ের অনুমোদনের জন্য উপরে পাঠাইলেন। মা সব শুনিয়া বলিলেন, "রাখাল, যোগেনকে বলো, চিঠি সুন্দর হয়েছে; আমার মত এতে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে।"

১৯১৪-এর মে মাসে স্বামী প্রেমানন্দজীকে মালদহে লইয়া যাইবার জন্য জনৈক ভক্ত বেলুড় মঠে আসেন। তাঁহার আগ্রহে তিনি ব্যক্তিগত সম্মতি জনাইয়া বলিলেন যে, যাত্রার পূর্বে শ্রীমায়ের অনুমতি লইতে হইবে। সুতরাং ভক্তসহ তিনি মঠ হইতে উদ্বোধনে আসিলেন। মা অনুমতি দিলেন না; কারণ তখন প্রেমানন্দ মহারাজের শরীর ভাল নহে, অধিকন্তু মালদহ অনেক দূরে, পথও দুর্গম এবং উৎসবে অনিয়ম অনিবার্য। প্রেমানন্দজী সে নির্দেশ অবনতমস্তকে মানিয়া লইলেন; কিন্তু ভক্ত প্রমাদ গণিলেন। সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন কি হইবে? সুতরাং তিনিও মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। মা তখন প্রেমানন্দজীকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "হাঁ, বাবুরাম, এরা এত করে বলছে; তবে কি তুমি যাবে?" মাতৃভক্ত উত্তর দিলেন, "আমি কি জানি, মা? যা আদেশ করবেন, তাই হবে।" অবশেষে মা বলিলেন, "যাও, একবার এস গে, তবে বেশীদিন থেকো না।" অমনি আবার যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

স্বামী শিবানন্দজী তখন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধান করেন। একদিন ব্রহ্মচারী ছোট নগেন (অক্ষয়চৈতন্য) কি একটা অন্যায় করায় সমবয়সীরা তাঁহাকে ভয় দেখাইলেন যে, শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে মঠ হইতে বিদায় করিয়া দিবেন। ভীত ব্রহ্মচারী কাহাকেও কিছু না বলিয়া তখনই একবস্ত্রে পায়ে

হাঁটিয়া জয়রামবাটী চলিলেন। মায়ের বাটীতে যখন তিনি উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার জীর্ণ বস্ত্র ও রুক্ষ চেহারা দেখিয়া প্রথমে কেহ বুঝিতেই পারেন নাই যে, তিনি বেলুড় হইতে আসিয়াছেন। পরে পরিচয় পাইয়া শ্রীমা তাঁহাকে দুইখানি সাদা কাপড় ও একখানি চাদর দেওয়াইলেন এবং মঠে শিবানন্দজীকে পত্র লিখাইলেন, "বাবাজীবন তারক, ছোট নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে আমার কাছে চলে এসেছে। তা, বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? তুমি, বাবা, তাকে কিছু বলো না।" উত্তর না আসা পর্যন্ত তিনি নগেনকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন। ফেরত ডাকেই উত্তর আসিল, "ছোট নগেন আপনার নিকট গিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরাও খোঁজাখুঁজি করিতেছিলাম - কোথায় গেল? তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন। এখানে পূজার জন্য লোকের অভাব। আমি তাহাকে কিছুই বলিব না।" পত্র আসিতেই মায়ের অনুমতি অনুসারে প্রবোধবাবু ব্রহ্মচারীকে বদনগঞ্জে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং দুই-একটি পাঞ্জাবি ও পাথেয় দিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী মঠে পেঁৗছিলে শিবানন্দজী তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?"

শ্রীমা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে আছেন। জনৈকা স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিজ দুঃখদারিদ্র্যের কথা বলিয়া ধরিয়া বসিলেন, যাহাতে তিনি সেবাশ্রমের অধ্যক্ষকে বলিয়া তাহার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মা উত্তর দিলেন, "আমি বলে দেখতে পারি। ওরা তো মা ভিক্ষে করে আনে। কত লোককে দিচ্ছে, তার ঠিক আছে কি? ওরা যেমন বুঝবে তেমনি দেবে তো?"

একদিকে এই স্বাধীনতাপ্রদান, অপরদিকে আবার তেমনই শাসন। একবার উদ্বোধনের পাচক ব্রাহ্মণকে ছাড়াইয়া দিবার কথা হয়, কিন্তু শ্রীমায়ের সেবার অসুবিধা হইবে, এই অজুহাতে কার্যপরিচালক তাহা করেন নাই। মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের ত্যাগই লক্ষ্য; একটা চাকরকে তোমরা ত্যাগ করতে পার না?" আবার বেলুড় মঠের কোন ভৃত্য অবাধ্য হওয়ায় জনৈক সাধু তাহাকে চাপড় মারিয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরা তো সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকবে। তাদের আবার মঠ, বাড়ি, চাকর -আবার সে চাকরকে মার!"

এইরূপ একান্ত প্রয়োজনস্থলে তিনি কঠোর হইলেও স্নেহই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং উহাই তাঁহার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইত— উহাতে যাহার যতই আপত্তি থাকুক না কেন! জনৈক ব্রহ্মচারী বেলুড় হইতে কলিকাতায় বড়বাজারে বাজার করিতে যান এবং সময়মত জোয়ারের নৌকা

পাইলে তখনই মঠে ফিরেন, নতুবা দ্বিপ্রহরে উদ্বোধনে প্রসাদ পান। যাতায়াতের অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার জন্য যথাসময়ে সংবাদ না দিয়াই তিনি আহারের জন্য উদ্বোধনে উপস্থিত হন। এইরূপ ঘটিতে থাকিলে গোলাপ-মার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে একদিন একটু উঁচু গলায় তিনি ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমা ঘর হইতে বারান্ডায় আসিয়া গোলাপ-মাকে বলিলেন, "এখন দিন দিন ঠাকুরের সংসার বাড়ছে, এরকম দু-এক জন তো আসবেই। তার কি করবে?" গোলাপ-মা তবু বলিলেন, "ও তো হামেশাই আসে, একদিনও তো বলে যায় না।" শ্রীমা নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "তা হোক গে, এখন তুমি ওকে শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেতে দাও অনেক বেলা হয়ে গেছে, বাছা আমার ঘুরে ঘুরে আসছে।" গোলাপ-মা খোঁটা দিলেন, "ওর ওপর এত দরদ কেন, তোমার শ্বশুর নাকি?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই তো। ওরা আমার শ্বশুর, আমার সব।"

১৩২৬ সালের দুর্গাপূজার দিন-পনর পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে চারিজন ব্রহ্মচারী পদব্রজে জয়রামবাটীতে আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলে তিনি মঠের সকলের কুশল এবং আসিবার সময় তাঁহারা সারদানন্দজীর সহিত দেখা করিয়াছেন কিনা ইত্যাদি জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "না, মা পরশু বিকালে মঠ থেকে বেরিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড দেখে আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'এই রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে কাশী যাওয়া যায়।' এই কথা বলামাত্র সকলের মনে সঙ্কল্প হল, 'তবে চল, আর মঠে না ফিরে এখনই এই রাস্তা ধরে কাশী রওনা হওয়া যাক।' তাই আমরা আর মঠে না ফিরে কোন খবর না দিয়ে, হাঁটতে আরম্ভ করে কিছুদূর এসে স্থির করলাম, যখন হেঁটে কাশী যাচ্ছি, তখন জয়রামবাটীতে এসে আপনার নিকট গেরুয়া নিয়ে কাশীতে গিয়ে কিছুদিন মাধুকরী করে তপস্যা করব। তাই আপনার কাছে এসেছি।" শ্রীমা সব শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ, বাবা, আমার ইচ্ছা তোমরা এখন মঠে ফিরে যাও। সামনে আর কদিন পরে দুর্গাপূজা। মঠে কাজকর্মের খুব অসুবিধা হবে।...তোমরা তারককে (স্বামী শিবানন্দকে) না বলে চলে এসে ভাল করনি। আর এ (ম্যালেরিয়ার) সময় এখানে এলে, শরৎকে (স্বামী সারদানন্দকে) পর্যন্ত জানিয়ে এলে না। তাকে জানালে এসময় শরৎও আসতে দিত না। যাই হোক, আমি তারককে চিঠি লিখে দিচ্ছি, সে এর জন্য তোমাদের কিছু বলবে না।...মঠে বাস করা কি কম তপস্যা? এই অল্পদিন সব মঠে এসেছ; কিছুদিন মঠে থেকে ওদের সব সঙ্গ কর· তারপর সব ধীরে ধীরে সময়মত হবে।" ব্রহ্মচারীরা তবু সন্ন্যাসের জন্য আবদার করিতে লাগিলেন এবং দলপতি বলিলেন যে, তাঁহারা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন"—এইভাবে কাশীতে যাইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিবেন। শ্রীমা

ইহাতে দুঃখিত হইলেও কঠোর হইতে পারিলেন না। তাই তাঁহাদের একজনকে গৈরিক বস্ত্র দিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভোলানাথকে শ্রীমাই পত্র দিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়াছিলেন; তাই অন্ততঃ তিনি যাহাতে মঠে ফিরিয়া যান, সে বিষয়ে মা চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দলের অনুরোধে ভোলানাথও কাশী চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে স্বামী শিবানন্দজী অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারীরা জয়রামবাটী গিয়াছেন; তাই শ্রীমাকে পত্র লিখিয়া সব জানাইলেন। শ্রীমা উত্তরে জয়রামবাটীর সব ঘটনা মঠে জানাইয়া দিলেন। তখন শিবানন্দজী কাশী অদ্বৈতাশ্রমে লিখিয়া পাঠাইলেন, যাহাতে এই অবাধ্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা সেখানে স্থান না পান। শিবানন্দজীর ব্যবস্থা সকলেই মানিয়া লইলেন। শুধু ভোলানাথ প্রমাদ গণিয়া শ্রীমায়ের শরণাপন্ন হইলেন এবং অদ্বৈতাশ্রমে থাকিবার অনুমতি চাহিলেন। চিঠি পাইয়া শ্রীমা বলিলেন, "আহা, এদের দলে প'ড়ে গেছে! এখন বুঝেছে কত কষ্ট! যাক, চন্দ্রকে (অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ) লিখে দাও, যেন আশ্রমেই থাকতে দেয়।" এদিকে ভোলানাথের নামেও পত্র পাঠাইলেন, "চন্দ্রকে লিখে দিয়েছি তোমার কথা, আর তোমাকে জানাচ্ছি, কাশীতে যখন উপস্থিত হয়েছ, ঠাকুরের আশ্রমে থেকে আজীবন চন্দ্রের সেবা ও সাধুদের সেবা নিয়ে যদি থাকতে পার, সকল দিকে কল্যাণ হবে।" স্বামী শিবানন্দজীকেও এই সংবাদ পাঠানো হইল। শিবানন্দজী এই বিধান নির্বিচারে মানিয়া লইলেন। ভোলানাথ শ্রীমায়ের আদেশে আজীবন অদ্বৈতাশ্রমে থাকিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুআরি তথায় দেহত্যাগ করেন।

সর্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার উপর মন্দির-নির্মাণ এবং অন্যান্য বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থার কথা। লীলাসংবরণের পূর্বে শ্রীমা যখন উদ্বোধনে ছিলেন, ঐ সময়ে কলিকাতার ইটালিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দেখিতে যাইবার পথে রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদার কন্যা দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীমায়ের নিকট আসিয়াছেন। গল্পপ্রসঙ্গে ঠাকুরের জন্মস্থান, মন্দির ও অপর আনুষঙ্গিক বিষয়ে কথা উঠিল। তখন লক্ষ্মীদিদি জানিতে চাহিলেন, "ও (মন্দির) হলে সেটি আমাদের হেপাজতে থাকবে তো? এদের (রামলালদাদা ও শিবুদাদার) ছেলেপিলেরাই সব পুজো-টুজো করবে, থাকবে?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "তা কি করে হবে? এরা সাধু-ভক্ত: এদের কি জাতের বিচার আছে? কত দেশের লোক, সাহেব-সুবো যাবে, ওখানে থাকবে, প্রসাদ পাবে। আমাদের তো সব ভক্ত নিয়েই কারবার। তোরা হলি সংসারী। তোদের সমাজ আছে, ছেলে-মেয়েদের বে-থা আছে। তোদের কি ওদের সঙ্গে থাকা চলবে?" এইরূপ কিছু কথাবার্তার পর শ্রীমা আরও বলিলেন যে, বেলুড় মঠের সাধুরা ঐ জন্মস্থান ও ভাবী মন্দিরের তত্ত্বাবধানের

দায়িত্ব লইয়া রামলালদাদা প্রভৃতির জন্য আলাদা করগেটের বাড়ী করিয়া দিবেন এবং ৺রঘুবীর ও ৺শীতলার মন্দির পাকা করিয়া দিবেন। কিন্তু ঐ গৃহ-দেবতাদের পূজার্চনাদির ভার রামলালদাদার উপরই থাকিবে। তবে লক্ষ্মী-দিদি, রামলালদাদা বা শিবুদাদা যখনই কামারপুকুরে যাইবেন, তাঁহারা সাধুদেরই সঙ্গে থাকিবেন ও মন্দির হইতে প্রসাদ পাইবেন। আগত সকলে মাতাঠাকুরানীর এই প্রস্তাবগুলি সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইলেন এবং স্বামী সারদানন্দজীও ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।[১]

শ্রীমায়ের নিজের জন্মস্থানের ব্যবস্থার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি; শ্রীমায়ের জয়রামবাটীর বাড়ী ও ৺জগদ্ধাত্রীর জমির অর্পণনামার কথাও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার বিধানানুসারে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিরাই এই সকল সম্পত্তির সংরক্ষক।

১ এই ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ১৩২৫ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৭-৭-১৮) বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হস্তে অর্পিত হয় এবং দলিলে শ্রীমা প্রভৃতি সকলে স্বাক্ষর করেন। ইহার কিছু আগে (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৪; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৭) ঠাকুরের জন্মস্থানের সংলগ্ন এক টুকরা জমি কেনা হয়। পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই কিছু জমি সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ী কিনিয়া লইয়া মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ১৯৫১-এর ১১ই মে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা হয়। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ গৃহদেবতাদের জন্য পাকা মন্দির করিয়া দিয়াছেন, রামলালদাদা ও শিবুদাদার বংশধর-দিগকে বাটী-নির্মাণের জন্য উপযুক্ত অর্থও দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তজননী

শ্রীমাকে একদিন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে দেখিয়া নলিনীদিদি বলিয়াছিলেন, "মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!" মা তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?" যিনি সকলকে আপনার সন্তানরূপে দেখেন, তাঁহার নিকট জাগতিক ভেদ স্থান পাইবে কিরূপে? সে স্নেহের প্লাবনে উচ্চনীচ সমস্ত ভূমি ডুবিয়া গিয়া একাকার হইয়া যায়।

এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা শ্রীমায়ের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল বলিলেই চলে। ভক্তকে তিনি ইহা করিতে দিতেন না; বলিতেন, ওসব করার জন্য লোক আছে। তারপর নিজেই ঐ সকল কাজ করিতেন। জয়রামবাটীতে একদিন আহারান্তে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ উচ্ছিষ্ট তুলিতে গেলে শ্রীমা তাঁহাকে হাত ধরিয়া বাধা দিয়া থালাখানি নিজেই লইলেন। সাধু বলিলেন, "আপনি কেন? আমিই নিচ্ছি।" শ্রীমা তাহাতে বলিলেন, "আমি তোমার আর কি করেছি? মার কোলে ছেলে বাহ্যে করে, কত কি করে? তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।" শ্রীমায়ের সঙ্গে অপর যে-সকল স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাঁহারা নিজেরা তো এইরূপ কাজ করিতেনই না, উপরন্তু অনুযোগ দিয়া মাকে বলিতেন, "তুমি বামুনের মেয়ে; আবার গুরু—এরা তোমার শিষ্য। তুমি এদের এঁটো নাও কেন? এতে যে এদেরই অমঙ্গল হবে।" মা সহজভাবে উত্তর দিতেন, "আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?"

একজন ভক্ত জাতে যুগী; তাই চলা-ফেরায় বড়ই সঙ্কোচ। শ্রীমা একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ করছ? তাতে কি, বাবা? তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।" শ্রীমা তাঁহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, দীক্ষাদানকালে তিনি জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, ইহা হইতেই বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, তিনি মায়েরই ঘরের ছেলে; পাড়াগাঁয়ে সামাজিক বাধা থাকিলেও জয়রামবাটীতে ঐ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিবে না, আর তাঁহারও গায়ে পড়িয়া পরিচয় দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এক বৎসর মহাষ্টমীর দিনে ভক্তগণ শ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। এক ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহার বাড়ি তাজপুরে। সে জাতিতে বাগদী হইলেও অপর সকলেরই ন্যায় তিনি তাহাকেও ভিতরে আসিয়া পায়ে ফুল দিতে বলিলেন। সে চরণপূজা করিয়া প্রফুল্লবদনে চলিয়া গেল।

ভক্ত মায়ের নিকট আসিলে এক মুহূর্তেই তিনি তাহার সমস্ত সঙ্কোচ

দূর করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতেন—এমনই ছিল তাঁহার মাতৃত্বের অদ্ভুত প্রভাব। রাসবিহারী মহারাজ অল্পবয়সে মাতৃহারা হইয়াছিলেন; তাই মা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। একদিন শ্রীমা তাঁহাকে দিয়া এক জ্ঞাতি-ভাইকে সংবাদ পাঠাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলবে বল দেখি?" রাসবিহারী বলিলেন, "তিনি আপনাকে এই এই বলতে বললেন।" শুনিয়া মা সংশোধন করিয়া দিলেন, "বলবে, মা বললেন"—'মা' শব্দটি বেশ জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন।

মা তখন কোয়ালপাড়ায় অসুস্থ ও জনৈক ব্রহ্মচারী জয়রামবাটীতে থাকেন। মা তাঁহাকে আহারাদি বিষয়ে বড়ই উদাসীন জানিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ভাল করিয়া আহার করিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী তখন অল্পবয়স্ক হইলেও শ্রীমায়ের সহিত মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং তাঁহার নিজের শরীরও তেমন ভাল না থাকায় মনে ভয় ছিল, পাছে ঐ অসুস্থতা শ্রীমায়ের দেহে সংক্রামিত হয়। তাই তিনি একটু দূরে দাঁড়াইয়া মায়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন। মা তাঁহাকে কাছে আসিতে বলিলেন। কাছে আসিয়াও তিনি আলগাভাবে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া বলিলেন, "ওকি! গায়ে হাত দিয়ে দেখ, কেমন আছি।" ব্রহ্মচারী তখন পাশে বসিয়া মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীমাও স্নেহসিক্তস্বরে নানা কথা কহিতে থাকিলেন। তখন জয়রামবাটী হইতে কোয়ালপাড়ায় দুধ পাঠানো হইত। মা বলিলেন, "এখানে অনেক দুধ আসে; দুধ আর পাঠিয়ো না, তোমরাই ভাল করে খেও।"

বস্তুতঃ আগত ভক্তদের সহিত শ্রীমায়ের সম্বন্ধ এক দৈব দৃষ্টি ও অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় উহার প্রকাশও ছিল অপূর্ব। তাহাতে সংসারসুলভ আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা থাকিলেও মায়িক বন্ধন বা আকর্ষণ ছিল না। উহাতে যেমন অশ্রু ও হাসির তরঙ্গ ছিল, তেমনি ছিল বিক্ষেপহীন প্রশান্তি। দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় জয়রামবাটীতে দীক্ষা লইয়া কোয়ালপাড়ায় যাইয়া কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হন এবং উহাতে ভুগিয়াই তিনি করজোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। কয়েক দিন পরে শ্রীমা ঐ সংবাদ পাইয়া পুত্রশোকাতুরা মাতার ন্যায় অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আমার সোনার চাঁদ ছেলে একটি চলে গেল। আহা, বাছার আমার শেষ জন্ম!" সন্ন্যাসীদিগকে তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।" তাঁহার এই জাতীয় মানুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তথ্য জানিবার জন্য স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন প্রশ্ন করিলেন, "আপনি আমাদের কি ভাবে দেখেন?" মা উত্তর দিলেন, "নারায়ণভাবে দেখি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল, "আমরা আপনার সন্তান; নারায়ণভাবে দেখলে তো সন্তানভাবে দেখা

হয় না।” উত্তরে মা বলিলেন, “নারায়ণভাবেও দেখি, সন্তানভাবেও দেখি।” সন্তানের দিক হইতে এখানে যেমন পাই সান্ত ও অনন্তের এক অপূর্ব সমাবেশ, জননীর দিক হইতেও তেমনি অপর এক ক্ষেত্রে পাই বিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড-মাতৃত্বের সমন্বয়। জনৈক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি জানতে চাই তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কিনা?” মা উত্তর দিলেন, “আপনার মা নয় তো কি? আপনারই মা।” ভক্ত আবার বলিলেন, “তুমি তো বললে, আমি যে ভাল বুঝতে পাচ্ছি না। গর্ভধারিণী মাকে যেমন আপনা হতেই মা বলে জানি, এমন তোমাকে মনে হয় কই?” মা প্রথমে আক্ষেপের সহিত বলিলেন, “আহা, তাই তো?” পরক্ষণেই বলিলেন, “তিনিই মা-বাপ, বাছা, তিনিই মা-বাপ হয়েছেন।” ভক্ত বুঝিতেছেন না ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও শ্রীমায়ের নিকট নিজ জগজ্জননীত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য। তাঁহার ভিতর যে অসীম শাশ্বত মাতৃত্ব রহিয়াছে, “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” (চণ্ডী), উহারই আংশিক স্ফুরণ জগতের জননীদের মধ্যে পাইয়া সন্তানগণ পরিতুষ্ট হয়! মায়ের এই মাতৃত্ব প্রতিকথা, প্রতিভঙ্গি ও প্রতিকার্যে এমন পরিস্ফুটভাবে নিঃসৃত হইত যে, সে স্নেহস্পর্শে পাষাণও বিগলিত হইত।

রাধারানী একটি বিড়াল পুষিয়াছিল; তাহার জন্য মা এক পোয়া দুধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সে নির্ভয়ে মায়ের পায়ের কাছে শুইয়া থাকিত। অপরের সন্তোষবিধানার্থে মা কখনো লাঠি লইয়া ভয় দেখাইলে সে তাঁহারই চরণে আশ্রয় লইত। মা অমনি লাঠি ফেলিয়া দিতেন, অপরেরাও হাসিয়া ফেলিতেন। বিড়ালের স্বভাব চুরি করিয়া খাওয়া। ইহাতে মা বিরক্ত হইতেন না, বলিতেন, “চুরি করা তো ওদের ধর্ম, বাবা, কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে?” কিন্তু জ্ঞান মহারাজ ঐ বিড়ালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি একদিন উহাকে তুলিয়া আছাড় দিলেন; দেখিয়া মায়ের মুখ বেদনায় কাল হইয়া গেল। অন্যভাবে মার-ধর তো লাগিয়াই ছিল! জ্ঞান মহারাজের অযত্ন সত্ত্বেও রাধু ও মায়ের স্নেহে বিড়ালের বেশ বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, এমন সময় মায়ের কলিকাতা যাওয়ার দিন আসিল। মা জ্ঞান মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, “জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা।” ইহা লৌকিক যুক্তি; শ্রীমা জানিতেন, শুধু এইটুকুতেই বিড়ালের ভাগ্য ফিরিবে না। তাই তিনি আবার বলিলেন, “দেখ, জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।” ইহা শুনিবার পর হইতেই আর জ্ঞান মহারাজের হাত বা লাঠি চলে না। তিনি নিজে নিরামিষ খাইলেও সেই অবধি রোজ চুনা মাছ ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে মাখিয়া তাহাদিগকে দেন।

একরূপে তিনি ভক্তদের মা, আবার অন্যরূপে তিনি সর্বস্বরূপিণী। তাঁহার বিশ্বব্যাপী মাতৃত্ব কাহাকেও বাদ দিত না। রাসবিহারী মহারাজ একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সকলের মা?" মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ!" পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এই সব ইতর জীবজন্তুরও?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, ওদেরও।"

এত সন্তান পাইয়াও মায়ের তৃপ্তি ছিল না। মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "ছেলেরা তোরা আয়।" স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ জয়রামবাটী পৌঁছিলে শ্রীমা সাগ্রহে বলিলেন, "এসেছ, বেশ করেছ। আমি কদিন ধরে তোমাকে ডাকছি—রাজেনকে ডাকতে গিয়ে তোমার নাম ধরে ডাকছি।" মায়ের ভাব চাপিবার অশেষ ক্ষমতা থাকায় সন্তানের জন্য এই উৎকণ্ঠার অতি সামান্যই বাহিরে প্রকাশ পাইত। কিন্তু যেটুকু প্রকাশ পাইত তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ উদ্বোধন হইতে বেলুড়ে ফিরিবার সময় শ্রীমা পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দকে) দিবার জন্য তাঁহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের পুজো দেবে, আর শরতের নামে তুলসী দেবে।" পূজনীয় শরৎ মহারাজ তখন উদ্বোধনে জ্বরে শয্যাগত।

আরামবাগের শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীমা শুনিলেন যে, তাঁহার ছেলের হাম হইয়াছে; তাই তিনি জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার সময় মা হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "কামারপুকুরে শীতলার পুজো দিয়ে যেও।"

বিভূতিবাবুকে মায়ের কাছে তৃপ্তিসহকারে খাইতে দেখিয়া তাঁহার জননী শ্রীমতী রোহিণীবালা ঘোষ বলিলেন, "বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়।" শ্রীমা অমনি বলিলেন, "আমার ছেলেকে তুমি খুড়ো (দৃষ্টি দিও) না। আমি ভিখারী রমণী; আমার ছেলেদের আমি যা খেতে দিই, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।"

বস্তুতঃ কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার এমন একটা স্বচ্ছন্দ, সরস ভাব ছিল যে, সমাগত ব্যক্তিকে তিনি এক মুহূর্তে আপনার করিয়া লইতেন। জনৈক স্ত্রীভক্ত কলিকাতায় মায়ের বাটিতে উপস্থিত হইলে (৩০শে মাঘ, ১৩১৭) মা বলিলেন, "ভাল আছ? বউমা ভাল আছে? এতদিন আসনি—ভাবছিলুম অসুখ করল নাকি!" মহিলাটি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন একদিনের পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে এতটা ঘনিষ্ঠতা হয় কিরূপে? এখানেই শেষ নহে। মা আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের পাশে তক্তপোশের উপর বসাইয়া বলিলেন, "তোমাকে যেন, মা, আরও কত দেখেছি—যেন কত দিনের জানাশোনা।" ক্রমে স্ত্রীভক্তের বাসায় ফিরিবার সময় হইলে শ্রীমা প্রসাদ আনিয়া একেবারে মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "খাও, খাও।" অত লোকের সম্মুখে তাঁহার লজ্জা

হইতেছে দেখিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি, নাও।" তখন ভক্ত হাত পাতিয়া লইলেন। বিদায়কালে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একলা নেমে যেতে পারবে তো? আমি আসব?" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত গেলেন। এই ভক্তই এক গ্রীষ্মের দিনে (জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩১৮) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মা তাঁহাকে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "শিগ্‌গির গায়ের জামা খুলে ফেল, গায়ে হাওয়া লাগুক", আর সঙ্গে সঙ্গে মশারির উপর হইতে পাখাখানি লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। মহিলা যত বলেন, "পাখা আমাকে দিন, আমি বাতাস খাচ্ছি"—মা ততই সস্নেহে বলেন, "তা হোক, হোক; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।"

ঐ স্ত্রীভক্ত আর একদিন (আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ, ১৩১৯) উদ্বোধনে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া শ্রীমাকে বাতাস করিতেছিলেন। মা তাহাতে বলিলেন, "ঐখান থেকে একটা বালিশ নিয়ে আমার এখানে শোও; আর বাতাস লাগবে না।" মায়ের বালিশে শোওয়া অন্যায় মনে করিয়া রাধুর ঘর হইতে একটা বালিশ আনিতেই শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন, "ওটা পাগলের (রাধুর মার) বালিশ গো; তুমি এই বালিশটাই আন না, তাতে দোষ নেই।" রাধুকে ডাকিলেন, "রাধু ও আয়, তোর দিদির পাশে শো।"

একটি বৈদ্যবংশীয়া ভক্তমহিলা শ্রীমাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে চাহেন; তাই শ্রীমা তাঁহাকে কিছু আনিতে অনুমতি দিয়াছেন। পরদিন (২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৫) তিনি কিছু খাবার লইয়া উদ্বোধনে আসিতেই মা বলিলেন, "এই দেখ গো, আবার কত কষ্ট করে এসব নিয়ে এসেছে।" নলিনীদিদি বলিলেন, "তুমি চাও কেন? তাই তো নিয়ে আসে।" মা উত্তর দিলেন, "তা, ওদের কাছে চাইব না?—আমার মেয়ে।" সে রাত্রে খাবারগুলি খাইয়া শ্রীমা খুব আনন্দ করিয়াছিলেন; এমন কি, নলিনীদিদির যে এত শুচিবায়ু, তিনিও বলিয়াছিলেন, "আমার তো কারু রান্না রোচে না; কিন্তু এর হাতে খেতে তো ঘেন্না হচ্ছে না!" শুনিয়া শ্রীমা সগর্বে বলিয়াছিলেন, "কেন হবে? ও যে আমার মেয়ে!"

জনৈক গৃহস্থ যুবক ভক্ত উদ্বোধনে মায়ের ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় বসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "মা, আমি সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি; তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আছি।" মা স্নেহভরে সন্তানের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।" সেই স্নেহস্পর্শে বিগলিতহৃদয় ভক্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, মা; কিন্তু এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখনও মনে না আসে যে তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।"

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কয়েকজন ভক্ত সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া পৌঁছিয়া স্থির করিলেন যে, সেই রাত্রেই জয়রামবাটী যাইবেন। পথে বিষম দুর্যোগ—অবিরাম বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার। তাঁহারা জয়রামবাটী পৌঁছিলে রাত্রে শ্রীমাকে সংবাদ দেওয়া হইল না। পরদিন সকালে তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি-জল-কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ। এইভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়। গোঁ-ভরে চলা ভাল নয়।" ভক্তেরা বুঝাইতে চাহিলেন যে, ছুটি অল্প এবং মাকে দেখিবার আগ্রহ প্রবল—তাই তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। শ্রীমা তথাপি বলিলেন, "তোমাদের তো এরকম ইচ্ছা হবেই; কিন্তু এতে আমার কষ্ট হয়।" ঘটনাটি তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। আড়াই বৎসর পর (১৯১৫-এর ২৫শে ডিসেম্বর) এই ভক্তদেরই একজনের স্ত্রী উদ্বোধনে উপস্থিত হইলেন। বেলা নয়টা-দশটার সময় মা কিছু মুড়ি ও কড়াই ভাজা আঁচলে লইয়া মেজেয় বসিয়া দুই-চারিটি করিয়া নিজে মুখে দিতেছিলেন ও এক এক মুঠা ভক্তপত্নীকে দিয়া বলিতেছিলেন, "বউমা, খাও।" ঐ দিন বিকালে পূর্বোক্ত ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিতেই মা জয়রামবাটীর সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "গোঁ-ভরে চলা ভাল নয়।" ভক্ত উত্তর দিলেন, "না, আর যাব না।" মা বোধ হয় বুঝিলেন যে, ভক্ত আর জয়রামবাটী যাইবেন না; অমনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "যাবে বই কি? বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে।" ভক্তপত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বউমা, তুমি ওকে দেখো, এভাবে যেন না চলে।"

উদ্বোধনে এক ছোট মেয়ে শ্রীমায়ের কাছে কম্বলে শুইয়া উহা নোংরা করিয়াছিল। মেয়ের মা পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমা কম্বল কাড়িয়া লইয়া নিজেই ধুইয়া আনিলেন। মেয়ের মা যখন আপত্তি করিলেন, "মা, তুমি কেন ধোবে?" তখন শ্রীমা সংক্ষেপে অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় উত্তর দিলেন, "কেন ধোব না? ও কি আমার পর?"

দিনের পর দিন ভক্তবৃদ্ধি হইতেছে; তাঁহারা যখন তখন উদ্বোধনে আসেন। তাঁহাদের রুচি বিচিত্র, প্রয়োজন বিবিধ। মায়ের বিশ্রাম নাই, অসুবিধাও বহু। সব দেখিয়া একদিন শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা অনুযোগ করিলেন, "তোমার যেমন হয়েছে—যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে।" মা ইহার উত্তরে বলিলেন, "কি করব, গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারি নে।"

শ্রীমায়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহপীযূষধারা শুধু ভক্তদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; উহা সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধাদির বাঁধ অতিক্রমপূর্বক শতধা প্রবাহিত হইয়া সকলের হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইত। রাধুর খুড়শ্বশুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখাইতে বসিয়া শ্রীমা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া যাইতেছেন, "লেখ,

'বাবাজীবন'।" রাধুর মা অমনি বাধা দিলেন, "সে কি গো? সে যে তোমার বেয়াই!" মা তেমনি অবিচলিতচিত্তে বলিলেন, "তা হোক, সে আমাকে 'মা' বলে আনন্দ পায়। আমিও তার কাছে তাই।" শ্রীমায়ের ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী দেবী ও সুবাসিনী দেবীও তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শুধু ভক্ত বা আত্মীয়বর্গ নহেন, অপরেও এই স্নেহবারিপানে পরিতৃপ্ত হইতেন। একবার শ্রীমা অসুখ হইতে উঠিলে সকলে ৺সিংহবাহিনীর মন্দিরে পাঁঠা বলি দিতে চাহিলেন; কিন্তু শ্রীমা কয়েক টাকার রসগোল্লা ভোগ দেওয়াইলেন। বিকালে গ্রামের সকলকে প্রসাদ দিবার জন্য চারিটার সময় দুইবার ঘণ্টা বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গ্রামবাসী আসিয়া মায়ের নূতন বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তার দুই দিকে সারি দিয়া বসিয়া গেল। সাধুরা পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমা একদৃষ্টে দেখিতে থাকিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে তখন এক অলৌকিক প্রসন্নতা।

শুধু বড় বড় ব্যাপারে নহে, খুঁটিনাটি প্রত্যেক ব্যবহারেও ভক্তগণ শ্রীমায়ের অনুপম মাতৃত্বের পরিচয় পাইতেন—যেন সত্যসত্য আপনারই মা। তিনি অচিরে প্রত্যেক সন্তানের রুচির সহিত পরিচিত হইয়া ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। নলিনবাবু জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রায় পনর জন ভক্তের সহিত আহারে বসিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, যেন শ্রীমা তাঁহারই প্রতি সমধিক স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইতেছিলেন। কিন্তু ভোজনের পর ভক্তদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন যে, সকলেরই ঐরূপ অনুভূতি হইয়াছে।

প্রসাদবিতরণকালে দেখা যাইত যে, শ্রীমা সন্তানদের রুচি অনুযায়ী সর্বোত্তম দ্রব্যটি প্রত্যেকের হাতে তুলিয়া দিতেন। প্রথম যিনি আসিলেন, তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট তাহা পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাঁহার বিবেচনানুরূপ সর্বোত্তম দ্রব্যটি পাইলেন—এইরূপ সকলের পক্ষে। সকলেই জানিলেন যে, মা তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করেন।

আবার মুখ খুলিয়া প্রয়োজন জানাইবার আগেই মা তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেন। জনৈক সাধু যখন জয়রামবাটী পৌঁছিলেন, তখন মা খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার সাধ ছিল, একদিন তিনি মায়ের পাতে প্রসাদ পাইবেন। মা ছেলেদের খাওয়াইয়া নিজে খাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে দুধভাত প্রসাদ করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; সুতরাং তাঁহার পাতে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার ভাগ্য ছেলেদের ঘটিত না। সেদিন সাধুটি উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীমা তাঁহার জন্য জলখাবার ও তামাক পাঠাইয়া দিলেন—তিনি তামাক খান, মা ইহা জানিয়া রাখিয়াছেন। পরে নিজের খাওয়া শেষ হইলে তাঁহাকে ডাকিয়া একখানি পাত দেখাইয়া বলিলেন, "বসে পড়, বাবা, এ পাতে আমি খেয়েছি।" মা শাল-

পাতায় খাইয়াছিলেন এবং প্রসাদী সমস্ত জিনিসই চারিদিকে সাজানো ছিল।

মানুষ কেহই নির্দোষ নহে জানিয়া তিনি সকল সন্তানকেই সমভাবে গ্রহণ করিতেন। একবার জনৈক ভক্তের কোন আচরণের জন্য ঠাকুরের এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাহাকে নিকটে আসিতে না দেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে?"

পাপতাপের বোঝা লইয়া শত শত ভক্ত আসিতেন। তাঁহাদের অনেকের স্পর্শে মায়ের চরণে অসহ্য জ্বালা হইত; কিন্তু তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। দর্শনার্থীদের প্রণামের পর একদিন বৈকালে রাসবিহারী মহারাজ দেখিলেন, শ্রীমা বারাণ্ডায় আসিয়া হাঁটু অবধি কেবল ধুইতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যত পাপ এসে ঢোকে, আর পা জ্বলে যায়; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এই জন্যই তো ব্যাধি। দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।" বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "এসব কথা শরৎকে বলো না। তাহলে প্রণাম করা বন্ধ করে দেবে।"

অসতের স্পর্শে দুঃখ হয় ইহা তাঁহার জানাই ছিল; কিন্তু জানা থাকিলেও মা হইয়া তিনি সন্তানকে ফিরাইবেন কিরূপে? তাহা ছাড়া তিনি কাহারও দোষ দেখিতেই পারিতেন না। এক সন্ধ্যায় তিনি ব্রহ্মচারী বরদাকে বলিয়াছিলেন, "গ-রা আজ সকালে আমাকে প্রণাম করতে এসে—র সম্বন্ধে নানান কটাক্ষ করে বললে সে হৃষীকেশে নাকি সাধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। আরও নিন্দার কথা তার নামে বলে আবার বলছে, 'আপনাদের এত সঙ্গ ও সেবা করে তার এই সব কুমতি হচ্ছে কেন?' আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পারি নে, বাবা। প্রারব্ধ কর্ম যার যা আছে—যেখানে ফালটি যেত, সেখানে ছুঁচটি তো যাবে! আমার কাছে—র দোষের কথা বললে। তখন এরা সব কোথায় ছিল? সে আমার কত সেবা করেছে। আমি তখন ভাইদের ঘরে ধান সিদ্ধ করি, সংসারের সব কাজ করি —বউরা সব ছোট। সে শীত বর্ষা গ্রাহ্য না করে সকাল থেকে গায়ে কালি মেখে আমার সঙ্গে বড় বড় ধানের হাঁড়ি নামাত। এখন তো অনেকে ভক্ত হয়ে আসে; তখন আমার কে ছিল? আমরা কি সেগুলো সব ভুলে যাব? তা দেখ, লোকেরই বা দোষ কি? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে, 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি নে', বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে। বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, 'তোমার রূপটি বাঁকা, মনটি সোজা— আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও।' দেখ, মানুষের হাজার উপকার করে

একটু দোষ কর, অমনি তার মুখটি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি কজন দেখে? গুণটি দেখা চাই।”

নিকটবর্তী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও বর্ধিষ্ণু বংশের উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত হন। যুবক তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিতেন। তাঁহারই সাহায্যে সেই গ্রামে এক আশ্রম স্থাপিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নিকটসম্পর্কীয়া এক বালবিধবার মোহে পতিত হন। কথা কানে হাঁটে। ক্রমে জয়রামবাটীতেও এই কলঙ্ক রটিল, এবং ক্রুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীমাকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে ঐ যুবককে অতঃপর জয়রামবাটিতে আসিতে নিষেধ করা হয়। মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া অতীব দুঃখপ্রকাশ করিলেন সত্য, কিন্তু বলিলেন, “মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।” যুবক পূর্বেরই ন্যায় যাতায়াত করিতে থাকিলেন; এমন কি, একদিন সেই মেয়েটিকেও লইয়া আসিলেন। শ্রীমা তাঁহার ছেলেকে বিপথগামী করার জন্য মেয়েটিকে ভর্ৎসনা করিলেও এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলেও, আপন কন্যার ন্যায় আদরযত্নই করিলেন।

ইহার অনেক পূর্বের কথা। শ্রীমা তখন ১০/২ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে থাকেন। চুরি করার অপরাধে মঠের এক উড়িয়া চাকরকে স্বামীজী (বিবেকানন্দজী) তাড়াইয়া দিয়াছেন। সে গরীব; তাহারই আয়ে সংসার চলে। নিরুপায় চাকর কাঁদিয়া শ্রীমায়ের আশ্রয় লইলে কৃপাময়ী মা তাহাকে বাড়িতে রাখিয়া স্নানাহার করাইলেন। সেই দিনই বিকালে স্বামী প্রেমানন্দজী শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা বলিলেন, “দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” প্রেমানন্দজী বুঝাইতে চাহিলেন যে, ইহাতে স্বামীজী রুষ্ট হইবেন। মা তখন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “আমি বলছি, নিয়ে যাও।” সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাহাকে লইয়া প্রেমানন্দজী মঠে ঢুকিবামাত্র স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, “বাবুরামের কাণ্ড দেখ—ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে!” প্রেমানন্দজী তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলে স্বামীজী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

শ্রীমায়ের অপরাজেয় মাতৃত্বশক্তির সম্মুখে বিদ্রোহী মনও অবনত হয় জানিয়া সংসারের বাদ-বিসংবাদে বিপর্যস্ত হীনবল বহু ব্যক্তি তাঁহার শরণ লইত, এবং দেখা যাইত যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সবল পক্ষও নির্বিবাদে মানিয়া লইত। একদিন মা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুলতলায় চৌকির উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে আসিয়া কাঁদিয়া নালিশ করিল, তাহার উপপতি তাহাকে অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার জন্য

সে সব ছাড়িয়াছিল; কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ নিরুপায়। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনিয়া শ্রীমা ডোমকে ডাকাইলেন এবং স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান পাবে না।" শ্রীমায়ের কথায় লোকটির মন গলিল এবং সে মেয়েটিকে বাড়ি লইয়া গেল।

শ্রীমায়ের অপার স্নেহ জাতি-বর্ণ, দোষ-গুণ, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়মিত হইত না। যে তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িত, তিনি তাহার দোষ বা দুর্বলতাদি জানিয়াও তাহাকে অকাতরে স্নেহ করিতেন, ঔষধ-পথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তাহার শোকে দুঃখে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাইতেন এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে শিখাইতেন। তাঁহার সে অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হইত, দস্যুও ভক্তে পরিণত হইত।

জয়রামবাটীর নিকটে, শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তাহারা একসময়ে তুঁতের অর্থাৎ রেশমকীটের চাষ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। কিন্তু বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় ঐ ব্যবসায় ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় নিরুপায় মুসলমানগণ চুরি-ডাকাতি আরম্ভ করিল এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সকলে বিভীষিকা উৎপাদনপূর্বক তুঁতে ডাকাত বলিয়া কুখ্যাতি অর্জন করিল। জয়রামবাটীতে যখন মাতাঠাকুরানীর জন্য পৃথক বাটী নির্মিত হয়, তখন ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সাধুরা শিরোমণিপুরের অনেক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুসলমানকে বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামবাসীরা প্রথমে ভয় পাইলেও পরে তাহাদের নিরীহ ব্যবহার দেখিয়া বলিত, "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে!" ইহাদের সহিত শ্রীমা কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা বুঝাইবার পক্ষে দুই-একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা আনিয়া বলিল, "মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি?" মা লইবার জন্য হাত পাতিয়া বলিলেন, "খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি?" মায়ের জনৈক স্ত্রীভক্ত সেখানে ছিলেন; তিনি নিকটবর্তী গ্রামের লোক। শ্রীমাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?" মা নিরুত্তর থাকিয়া কলাগুলি তুলিয়া রাখিলেন এবং মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্ট দিতে বলিলেন। সে চলিয়া গেলে শ্রীমা স্ত্রী-ভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।" তিনি মন্দকে উন্নত করিতেই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।"

আমজদ নামক এক তুঁতে মুসলমান মায়ের বাড়ির দেওয়াল প্রস্তুত

করিয়াছিল। একদিন মা তাহাকে বাড়ির ভিতরে নিজের ঘরের বারান্ডায় খাইতে দিয়াছেন; আর নলিনীদিদি উঠানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরিবেশন করিতেছেন। মা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি।" খাওয়ার পর আমজদ এঁটো পাতা তুলিয়া লইয়া গেলে মা উচ্ছিষ্ট স্থানটিতে জল ঢালিয়া ধুইয়া দিলেন। নলিনীদিদি মাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, "ও পিসীমা, তোমার জাত গেল," ইত্যাদি বলিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে ধমক দিলেন "আমার শরৎ (সারদানন্দজী) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।"

ইহারই পরের কথা। শ্রীমা জয়রামবাটীতে জ্বরে শয্যাগত, অনেকেই আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছেন। একদিন সকালে নয়টা-দশটার সময় তাঁহার সেবাদিতে রত ব্রহ্মচারী দেখিলেন, একটি কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায়, ছিন্নবসন, বিষন্নবদন লোক লাঠি ভর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও লোকটি যেরূপ নিঃসঙ্কোচে ভিতরে চলিয়া গেল তাহাতে ব্রহ্মচারীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এখানে তাহার যাতায়াত আছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া পিছনে পিছনে গেলেন। শ্রীমা ঘরের মধ্যে চৌকিতে শুইয়া আছেন; বারান্ডার দরজার সম্মুখে খানিকটা অংশ চাটাই ঘেরা—উঠান হইতে মাকে দেখা যায় না। লোকটি ডিঙ্গি মারিয়া চাটাই-এর উপর দিয়া দিখিতেছিল। হঠাৎ মায়ের দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ক্ষীণকণ্ঠে সস্নেহে ডাকিলেন, "কে বাবা, আমজদ? এস।" আমজদ প্রফুল্ল-চিত্তে বারান্ডায় উঠিল এবং দরজার কাছে গিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া শ্রীমায়ের সহিত কথা কহিতে লাগিল। মাতাপুত্রে সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারী স্বকার্যে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য ব্রহ্মচারীর ডাক পড়িল। মা সুস্থ থাকিলে নিজেই পূজাদি করেন। আজ তিনি অসুস্থ; তাই ব্রহ্মচারীকে ভোগ নিবেদন করিতে হইবে। পূজা, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অতি সংক্ষেপে ও অনাড়ম্বর—সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ। মাতা-ঠাকুরানীর ঘরে ঠাকুরের সিংহসনের নিচে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল থাকে। উহা লইয়া গিয়া রান্নাঘরে নিবেদন করা হয়। ব্রহ্মচারী পঞ্চপাত্র লইতে আসিয়া বিপদে পড়িলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ, আর ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিতে যাইতেছেন। আমজদকে বারান্ডায় রাখিয়া পঞ্চপাত্র লইয়া যাওয়া চলে না, আবার তাহাকে সরিয়া যাইতেই বা বলেন কিরূপে? অতঃপর তিনি স্থির করিলেন, কিছু না বলিয়া মায়ের সামনে দিয়াই পঞ্চপাত্র লইয়া যাইবেন। প্রয়োজন হইলে মা নিজেই বারণ করিবেন। ঐ ভাবেই তিনি গেলেন এবং ভোগ নিবেদনান্তে ফিরিয়া আসিয়া পাত্রটি যথাস্থানে রাখিলেন। মা সব দেখিলেন,

কিন্তু কিছুই বলিলেন না। অপরাহ্ণে আমজদ যখন ঘরে ফিরিতেছে, তখন ব্রহ্মচারী দেখিলেন, তাহার মুখে হাসি, চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সে স্নান করিয়াছে, গায়ে মাথায় তেল মাখিয়াছে, পেট ভরিয়া খাইয়াছে এবং পান চিবাইতে চিবাইতে চলিয়াছে। তাহার হাতে এক শিশিতে কবিরাজী তেল এবং পুঁটুলিতে নানা জিনিস। শ্রীমা পরে ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, "গরম ওষুধ খেয়ে আমজদের মাথা গরম হয়েছে, রাত্রে ঘুম হয় না। অনেক দিন থেকে ঘরে এক শিশি নারায়ণ তেল পড়েছিল, তাকে দিয়েছি—মাখলে মাথা ঠান্ডা হবে, খুব ভাল তেল।" আমজদ শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিল। কোন প্রয়োজনে সংবাদ পাঠাইলেই সে মায়ের বাড়িতে আসিয়া বিশ্বস্তভাবে সমস্ত করিয়া দিত। জ্বরের সময় শ্রীমায়ের আহারে অরুচি হইলে চিকিৎসক আনারস খাওয়াইবার বিধান দিলেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে আনারস কোথায়? আমজদকে খবর পাঠানো হইল। সে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া আনারস আনিয়া দিল।

আমজদ শ্রীমায়ের স্নেহ পাইলেও চুরি-ডাকাতি ছাড়ে নাই। তাই জয়রামবাটীর লোক তাহাকে খুব ভয় করিত। কিন্তু অন্য গ্রামে ডাকাতি হইলেও আমজদের প্রভাবে জয়রামবাটী উহা হইতে মুক্ত ছিল। একবার জেল হইতে মুক্তি পাইয়াই আমজদ বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, গাছে লাউ হইয়াছে। অমনি এক ঝুড়ি লাউ লইয়া সে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের নিকট আসিল। মা বলিলেন, "অনেক দিন ভাবছিলুম তুমি আসনি কেন? কোথায় ছিলে?" আমজদ জানাইল যে, সে গরু চুরির দায়ে ধরা পড়িয়াছিল, তাই আসিতে পারে নাই। শ্রীমা সেসব কথায় তেমন কান না দিয়া সহানুভূতির সহিত বলিলেন, "তাই তো ভাবছিলুম, আমজদ আসে না কেন!" তিনি যখন শেষ অসুখের সময় কলিকাতায় ছিলেন, তখন একদিন পত্র আসিল যে, আমজদ ডাকাতির দায়ে দিনকতক ফেরার থাকিয়া ধরা পড়িয়াছে। মা শুনিয়া বলিতেছেন, "ও বাবা, দেখলে! আমি জানতুম তার ডাকাতিটা জানা আছে।" শোনা যায়, শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর ডাকাতি করিতে গিয়া আমজদের গায়ে তলোয়ারের চোট লাগে। উহাই পরে ঘা হইয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

শুধু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনী ভক্তদের প্রতি মায়ের স্নেহের দৃষ্টান্ত দিলে কেহ কেহ হয়তো ভাবিবেন, "উহা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপাব নয়।" আমরা তাই দস্যু আমজদের বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবেই লিখিলাম। শ্রীমা তাহার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং এইরূপ দস্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও আশ্রিতজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক জানিতেন। অথচ সে ব্যবস্থার জন্য তিনি লোকবল বা অস্ত্রবল ইত্যাদির উপর নির্ভর না করিয়া, নির্ভর করিয়াছিলেন একমাত্র অসীম স্নেহের উপর। আমরা দেখিয়াছি, সে

স্নেহ দস্যুর হৃদয় জয় করিয়াছিল। এখন আমরা সাধারণ জীবন হইতেই আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব।

জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের নূতন গৃহ নির্মাণের পর জনৈক সেবকের আগ্রহ ও পরামর্শে এক ভক্ত মায়ের জন্য দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়া দেন এবং উহার জন্য সমস্ত ব্যয়েরও ব্যবস্থা করেন। ভক্তেরই ব্যয়ে গরুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গোবিন্দ (বা গোবে) নামক এগার-বার বৎসরের এক বালককে রাখা হয়। তাহার স্বভাব বেশ ভাল এবং সে সদানন্দময় ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার সারা গায়ে ভীষণ খোস দেখা দিল—কিছুতেই সারে না। এক রাত্রে সে যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারিল না, সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। শ্রীমা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পরদিন সকালেই নিজের ঘরের বারান্ডায় বসিয়া একখানা প্রকান্ড শিলে নিমপাতা ও হলুদ বাটিলেন এবং বালককে সামনে দাঁড় করাইয়া কোথায় কি ভাবে লাগাইতে হইবে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; গোবিন্দও নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ করিতে থাকিল—তাহার মাতৃহীন হৃদয় তখন স্নেহরসপানে বিভোর।

দেশড়া-নিবাসী বৃদ্ধ হরিদাস বৈরাগী বেহালা বাজাইয়া সুমধুর স্বরে হরিনাম, ব্রজলীলা, আগমনী ইত্যাদি গান করে। তাহার মুখে "কি আনন্দের কথা উমে!" ইত্যাদি গীত শুনিয়া গিরিশবাবু প্রভৃতি মাতৃভক্ত অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের শেষবয়সে উদরপালন এক মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। একদিন সকালে দশটার সময় সে মায়ের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিলে শ্রীমা তাহাকে তেল মাখিয়া স্নান করিতে বলিলেন এবং পরে বারান্ডায় বসাইয়া পরম আদরে মুড়ি, গুড় ও প্রসাদ দিলেন। বৃদ্ধ মুড়ি খাইতেছে, আর শ্রীমা পাশে বসিয়া গল্প করিতে করিতে পান সাজিতেছেন। তখন প্রথম মহাসমর (১৯১৪-১৮ খৃঃ) চলিতেছে। সর্বত্র বস্ত্রাভাব। বৃদ্ধ জানাইল যে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই। শ্রীমা সকালে স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি উঠানে শুকাইতে দিয়াছিলেন। উহা একেবারে নূতন; দুই-একদিন মাত্র পরিয়াছেন। বৃদ্ধের কথা শুনিয়াই তিনি উহা তুলিয়া আনিয়া তাহাকে দিলেন। হরিদাস মমতায় বিহ্বল হইয়া অশ্রুসিক্ত-নয়নে সেই স্নেহের দান মাথায় ঠেকাইয়া বিদায় লইল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মাতাঠাকুরানীর এই মমতা ইতরজীবেও প্রসারিত হইত। একদিন একটি ছোট বাছুর অস্থিরভাবে ডাকিতেছিল; সকলের অনুমান, উহার পেটে ব্যথা হইয়াছে। অল্পে সন্তুষ্টা শ্রীমা গরু কিনিয়া অযথা সংসারের ঝামেলা বাড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন না; তাই তাঁহারই জন্য গরু কেনার প্রস্তাব উঠিলে তিনি প্রস্তাবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়া গগন মহারাজকে বলিয়াছিলেন "দেখেছ,

কি বাসনা!” যেন কে কাহার জন্য গরু কিনিতেছে—তিনি শুধু দ্রষ্টা হিসাবে মনোরাজ্যের খেলা দেখিয়া যাইতেছেন। আর গরু আসার পর বলিয়াছিলেন, “ও গরু কিনে হাঙ্গামা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।” তথাপি গো-সেবার প্রতি অঙ্গ যথাযথ পালিত হইতেছে কিনা সেদিকে তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। বাছুরের চীৎকারে সেদিন সকলেই চিন্তিত হইলেন এবং প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শ্রীমাও ডাক শুনিয়া বাছুরের কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার কষ্ট দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বাঁহাতে তাহার নাভি ও পেট টিপিতে লাগিলেন—যেন নিজেরই সন্তান! এইরূপ করায় একটু পরেই বাছুর শান্ত হইল এবং সকলে নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরিলেন।

মায়ের বাড়ীতে গঙ্গারাম নামে এক পোষা চন্দনা ছিল। মা তাহাকে স্বহস্তে নিত্য স্নান করাইতেন, জল ও খাবার দিতেন, তাহার খাঁচা পরিষ্কার করিতেন, তাহাকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতেন এবং স্নেহ-ভরে তাহার সহিত কথা কহিতেন। সকাল-সন্ধ্যায় তাহার কাছে আসিয়া মা বলিতেন, “বাবা, গঙ্গারাম, পড় তো।” পাখী বলিত, “হরে কৃষ্ণ, হরে রাম; কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম, রাম।” শ্রীমায়ের মুখে শুনিয়া ব্রহ্মচারীদের নামগুলিও সে বেশ শিখিয়া লইয়াছিল। আবার মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিত, “মা, ওমা।” অমনি মা উত্তর দিতেন, “যাই, বাবা যাই”—এই বলিয়া ছোলা-জল দিয়া আসিতেন। পাখীর ‘মা’ বলিয়া ডাকার অর্থই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। বিড়ালের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা ভক্তদের কথায় ফিরিয়া আসি। শ্রীমায়ের অঙ্গে এবং প্রতি কথা ও প্রতি আচরণে পূর্ণ মাতৃত্বের ছাপ এমন সুপ্রকটিত ছিল যে, যে-কেহ উহার প্রভাবমধ্যে আসিয়া পড়িত তাহারই জীবনের একটা বড় অভাব পূর্ণ হইত, হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইত। রাসবিহারী মহারাজের শৈশবে মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় জীবনে একটা অপূরণীয় অতৃপ্তিবোধ ছিল। অপর ছেলে-মেয়েরা তাহাদের মাকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিত এবং অপূর্ব স্নেহের আস্বাদ পাইত; কিন্তু তিনি উহাতে বঞ্চিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাঠাকুরানীর নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, মা যেন তাঁহার শৈশবের পিপাসা মিটাইবার জন্য স্নেহকুম্ভ পূর্ণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সে স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদনে তিনি মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন।

বাল্যাবস্থায় মায়ের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অবিকল নিজ জননীরূপে দেখিয়াছে এইরূপ লোকের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অবশ্য এরূপ অনুভূতি যে সর্বদা হইত তাহা নহে, কিন্তু এই দৃষ্টির প্রভাব তাঁহাদের সারাজীবনের সম্বন্ধ ও গতিকে নিয়মিত করিত। স্বামী মহাদেবানন্দ যখন জয়রামবাটীতে

শ্রীমাকে দেখেন, তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার জননীই সম্মুখে উপস্থিত। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ বাল্যকালে শ্রীমাকে দর্শন করিতে যায়। প্রণাম করিবার জন্য ঘরের ভিতর ঢুকিতেছেন, এমন সময় মায়ের পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—এ যে হুবহু তাঁহার জননীরই মতো; আর কোলের উপর হোগলা-পাকের বালা-পরা যে হাত দুখানি রহিয়াছে, উহাও তো তাঁহার সদ্যোবিধবা মায়েরই অনুরূপ! অতীতের স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিল। তিনি মায়ের আকর্ষণে অজ্ঞাতসারে এক-পা, এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া মায়ের সম্মুখে আসিলেন—চরণ হইতে ক্রমে মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীমা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "অমন করছ কেন, বাবা? কি হয়েছে, বাবা? এস, বাবা, এস!" পঞ্চানন একেবারে মায়ের কোলের কাছে আগাইয়া গেলেন এবং মা তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পঞ্চানন সে আনন্দস্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন- তাঁহার মনে হইল, বহু বৎসর পরে আবার জননীর সহিত মিলন হইয়াছে।

কোন ভক্ত আসিয়া শ্রীমাকে স্বীয় গর্ভধারিণীর মতো দেখিয়া ঠিক সেই-ভাবেই আবদার করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি মায়ের পার্শ্বে বসিয়া খাইবেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমা নিজ হস্তে না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না। মাও অমনি তাঁহার আবদার পূর্ণ করিলেন। ভক্ত আবার বলিলেন, মা ঘোমটা না খুলিলে তিনি খাইবেন না। মা অগত্যা তাহাই করিলেন এবং আদর করিয়া তাঁহার বাড়ির সমস্ত খবর লইতে লাগিলেন। এই জাতীয় ঘটনা একাধিকবার হইয়াছে। নাগ মহাশয়কে খাওয়াইয়া দিবার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বামী প্রশান্তানন্দ মাতৃবিয়োগের পর যখন মাতাঠাকুরানীর ছবি দেখেন তখন তাঁহার সত্য সত্য ধারণা হয় যে, তাঁহার জননী ও শ্রীমা অভিন্ন। পরে জয়রামবাটীতে যাইয়া তিনি মায়ের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে থাকেন। তখন তিনি ছেলেমানুষ। ঐ সময় জিবটা হইতে রোজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডাক্তার আসেন। প্রশান্তানন্দ শ্রীমাকে ধরিয়া বসিলেন, ঘোড়ায় চড়িবেন। ঘোড়াটা দুষ্ট; তাই মায়ের ভয় হইল। কিন্তু প্রশান্তানন্দ বীরের মতো কথা কহিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। তখন বাধ্য হইয়া শ্রীমা ডাক্তারের অনুমতি লইলেন; প্রশান্তানন্দও ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলেন। কিন্তু অশান্ত ঘোড়াকে বাগ মানানো বালকের কর্ম নহে—সে জিবটার দিকে ছুটিল। অবশেষে তাহাকে কোন প্রকারে সামলাইয়া যখন তিনি মায়ের কাছে ফিরিলেন, তখন ঝোড়-জঙ্গল ও বাঁশবনে লাগিয়া তাঁহার দেহ রক্তাক্ত ও বস্ত্র ছিন্নভিন্ন। শ্রীমা এতক্ষণ সভয়ে পথের দিকেই চাহিয়া ছিলেন; এখন ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়া নিষেধ না শোনার জন্য তাঁহাকে বকিতে লাগিলেন এবং একখানি নূতন কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন।

শ্রীমা ও ভক্তদের সম্বন্ধ একমাত্র স্নেহের দ্বারা নিয়মিত হইলেও বহু ক্ষেত্রে ভক্তদের অবিবেচনাবশতঃ তাঁহাদের ব্যবহার শ্রীমায়ের পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত, এমনকি অত্যাচাররূপেও প্রকাশ পাইত। শ্রীমা তথাপি মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতেন, তাঁহার স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহার পায়ে বাত, আবার সবে অসুখ হইতে সারিয়া উঠিয়াছেন। সেই সময় জনৈক ব্রহ্মচারী দেখিলেন, জয়রামবাটীতে আগত দুইজন ভক্ত জল, ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি লইয়া শ্রীমাকে পূজা করিতে চলিয়াছেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে মায়ের পায়ে জল ঢালিতে ও বেলপাতা দিতে নিষেধ করিলেন; কারণ পায়ে তুলসী বা বেলপাতা দেওয়া তাঁহার রুচিসম্মত নহে। ভক্তদের ইহা পছন্দ হইল না; সুতরাং নিষেধ না মানিয়াই তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী পূজা করিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী অগত্যা রূঢ়ভাবে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাদিগকে থামাইলেন। তখন তাঁহার ভয় হইল, শ্রীমা হয়তো বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু মা পরে বলিয়াছিলেন, "কাছে কাছে থেকে সব লক্ষ্য রাখবে। তাই তো ওরা সব উদ্বোধনে কত করে আমায় রক্ষা করে।"

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দজী যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন, তখনকার কথা। একদিন এক যুবক অকস্মাৎ আসিয়া শ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে চাহিল। সারদানন্দজীর সহিত আগত ব্রহ্মচারী তাহাকে শ্রীমায়ের নিকট লইয়া গেলে সে প্রণামান্তে মায়ের পদযুগল ধরিয়া টানিতে লাগিল—ভাব এই যে, চরণকমল সে বক্ষে ধারণ করিবে। সৌভাগ্যক্রমে মা তখন ঘরের একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাই পড়িয়া যান নাই। ব্রহ্মচারী ক্ষিপ্রহস্তে যুবকের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। পরে ব্রহ্মচারীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, "যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) কখনও মাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতেন না; তিনি চলে গেলে সে জায়গা থেকে পদরজ তুলে মাথায় দিতেন।"

এ প্রকার পাগলামি সেই আদিকালেই শেষ হয় নাই। পরেও দেখা যাইত, দূর দেশের ভক্ত অসময়ে মায়ের বাড়িতে আসিয়া জিদ ধরিলেন, তিনি ধূলা পায়ে শ্রীমায়ের পাদপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। মা অমনি হাতের কাজ ফেলিয়া কাষ্ঠবিগ্রহের ন্যায় পিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভক্ত সাধ মিটাইয়া ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ করিলেন। আবার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াই শ্রীমাকে রান্নাঘরে ছুটিতে হইল ভক্তেরই আহারের ব্যবস্থা করিতে।

ভক্ত বলিলেন যে, তিন-চারদিন পরেই তিনি দেশে ফিরিবেন; তাঁহার ইচ্ছা, শ্রীমায়ের অন্নপ্রসাদ শুকাইয়া লইয়া যান। যথাসময়ে শ্রীমা প্রসাদী অন্ন দেখাইয়া দিয়া ভক্তকে বলিলেন, "ঐ গো, তোমার সেই জিনিস।" একখানি

রেকাবিতে অন্নপ্রসাদ ছিল। ভক্ত উহা লইয়া শ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখে ঝুলানো একখানি টিনের উপর শুকাইতে দিলেন। মা সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখো, যেন কাকে না মুখ দেয়।" ভক্ত তখনই সেখানে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া তামাক খাইতে খাইতে প্রসাদের কথা ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; প্রায় তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে যখন ঐ কথা মনে পড়িল, তখন ত্রস্তভাবে ভিতরে যাইয়া দেখেন, মা ঠিক একই জায়গায় একইভাবে বসিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ আপনার বিশ্রাম হয়নি?" মা বলিলেন, "না, বাবা, তোমার ওটিতে পাছে কাকে মুখ দেয়, তাই বসে আছি।"

একবার একটি মেয়ে শ্রীমায়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কামড়াইয়া ধরে। মা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওমা, একি ভক্তি গো! পেন্নাম করবি কর; তা না, আবার আঙ্গুল কামড়ে ধরেছে।" সেই মেয়েটি কহিল, "মনে রাখবেন বলে।" মা কহিলেন, "মনে রাখবার এমন উপায় তো কখনও দেখিনি!"

কোন কোন ভক্ত মায়ের পা ধরিয়া বলিতেন, "মা, আপনি বলুন, অন্ততঃ আমার মরবার সময় আপনি আমায় দেখা দেবেন।" মা বলিতেন, "আচ্ছা, ঠাকুরকে বলব, তিনি যেন দর্শন দেন।" ভক্ত তবু ছাড়িতেন না; শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া মা বলিতেন, "আচ্ছা, বাবা তাই হবে।" তখন তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন।

ব্রহ্মচারী বরদা গ্রামান্তরে কাঠ কিনিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় জয়রামবাটীতে ফিরিয়া দেখেন, শ্রীমা বারান্ডায় একখানি মাদুরের উপর শুইয়া আছেন। ব্রহ্মচারী কাছে যাইতেই তিনি খেদ করিয়া বলিলেন, "তোমরা সব থাক; কিন্তু কাজকর্মে বাইরেও যেতে হয়। আজ একটা লোক এসেছিল—বুড়ো গোছের। তাকে দূর থেকে দেখেই আমি ঘরের ভিতর চৌকিতে বসে রইলুম। সে বাইরে থেকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত। আমি যত সঙ্কোচ করে 'না, না' করি, সে কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে এক রকম জোর করেই পায়ের ধুলো নিলে। সেই থেকে পায়ের জ্বালা আর পেটের ব্যথায় মরছি। তিন-চারবার পা ধুলুম, তবু সে ব্যথা ও জ্বালা যাচ্ছে না। তোমরা কাছে থাকলে আমার ইচ্ছে বুঝে নিষেধ করতে পারতে। কলকাতায় ওরা ভক্তদের সঙ্গে যে কড়াকড় করে, সেটি না করলেও চলে না। কত রকমের লোক যে আসে, তোমরা ছেলেমানুষ বুঝতে পার না।"

কলিকাতায়ও এইরূপ অত্যাচার যে একেবারেই হইত না, তাহা নহে। একদিন উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীমা পূজা সারিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় এক ভক্ত কিছু ফুল লইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিতে আসিলেন। অপরিচিত

লোক দেখিয়া শ্রীমা চাদর মুড়ি দিয়া পা ঝুলাইয়া তক্তপোশে বসিয়া রহিলেন; এদিকে অঞ্জলিপ্রদান ও প্রণামান্তে ভক্তের দীর্ঘ ন্যাস ও প্রাণায়াম চলিতে লাগিল। ততক্ষণে মায়ের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গিয়াছে, অথচ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ভক্তেরা শ্রীপদে ফুল দেন—ইহা নিত্যকার ঘটনা; তাই পুজা আরম্ভ হইতে দেখিয়াই সেবিকা শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা অন্যত্র গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যখন ভক্তের ঐরূপ কান্ড দেখিলেন, তখন তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া স্বাভাবিক উচ্চ গলায় বলিলেন, "একি কাঠের ঠাকুর পেয়েছ যে, ন্যাস প্রাণায়াম করে তাঁকে চেতন করবে? মা যে ঘেমে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন!"

উদ্বোধনেই এক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর এমন জোরে মাথা ঠুকিয়া দেন যে, ব্যথা পাইয়া মা 'উঃ' করিয়া উঠেন। উপস্থিত সকলে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি করলে?" ভক্ত উত্তর দিলেন, "মার পায়ে প্রণাম করে ব্যথা রেখে গেলুম। যতদিন ব্যথা থাকবে, মা ততদিন আমাকে মনে রাখবেন।" শ্রীমায়ের পায়ে সেবক যখন তেল মালিশ করিতেন তখন তিনি হাসিতে হাসিতে ভক্তদের এইসব পাগলামির কথা বলিতেন।

সময়ে সময়ে ধৈর্যশীলা শ্রীমাকেও এমন অবস্থায় পড়িতে হইত যে, তিনি নিরুপায় হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বা বিশ্বস্ত সেবকদের নিকট দুঃখ জানাইতেন। একদিন সকালে কলিকাতা হইতে কয়েকজন ভক্ত জয়রামবাটীতে আসিলেন—বেশ ফিটফাট। কিন্তু সঙ্গে তাঁহারা যেসব ফল আনিয়াছেন, অযত্নে তাহার অর্ধেক পচিয়া গিয়াছে। শ্রীমায়ের তখন সমস্যা, ঐগুলি ফেলেন কোথায়? তাঁহারা গামছা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই সব বাবুদের উপযুক্ত গামছা বাহির করিতে মাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। আবার মশারির দড়ি নাই; তাই সেবক হরি দড়ি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মা বিরত হইয়া আপন-মনেই বলিয়া যাইতেছেন, "সব জ্বালিয়ে খেলে, আর পারি নে। এক একটি ছেলে আসে, আমার সংসার যেন শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়, আমাকে কোন ভাবনা চিন্তা করতে হয় না। যা হল মুখটি বুজে খেয়ে পাতাটি গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেল। আর এই দেখ না, সকাল থেকে যেন অস্থির হয়ে উঠেছি। এখন ভাবনা, রাত্রে কি যে তরকারি হবে। ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গে; আমি তো আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাধী, আর এদিকে এই সব।"

পাঠক? এই ঘটনাগুলি কি স্নেহপূর্ণ বিরক্তির পরিচায়ক, অথবা সেবকের নিকট তমোমিশ্রিত রাজসিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভক্তির পার্থক্য-প্রদর্শক? কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমরা মায়ের জীবনের ঐরূপ আর গুটিকতক ঘটনার আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে ভক্তের মানসিক অবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারেও বিভিন্ন প্রকারের

প্রতিক্রিয়া দেখা যাইত। অধিকন্তু শ্রীমায়ের জয়রামবাটী-জীবনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন নাই, তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না যে, জগদম্বারূপে বহুজন-পূজিতা এবং বহু ভক্তের অদৃষ্টনিয়ন্ত্রী হইয়াও শ্রীমাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যহ সকলের তুষ্টির জন্য কিরূপ কায়িক শ্রম করিতে হইত এবং কতটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইতে হইত! বিশেষতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিয়াছি, তাহার কিছুকাল পরেই শ্রীমা মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব হইতেই নানা কথায় ভক্তদিগকে উহার আভাস দিতেছিলেন। বুদ্ধিমান পাঠক দেখিয়া থাকিবেন যে, বিরক্তিরূপে প্রতীয়মান তাঁহার এই কালের কথার মধ্যে চকিতে সেই বিদায়ের ইঙ্গিতই ফুটিয়া উঠিতেছে। 'রাধু', 'গৃহিণী' প্রভৃতি অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মর্ত্যলীলা হইতে অব্যাহতি চাহিতেছেন। আলোচ্য স্থলেও সেই ভাবেরই ছাপ রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় সমকালে শীতের মুখে একদিন সকালে জনৈক ভক্ত তাঁহার স্ত্রী ও চারিটি কন্যাসহ জয়রামবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা পূর্বদিন অপরাহ্ণে গরুর গাড়িতে গড়বেতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতে জিবটা গ্রামে পৌঁছিয়া তথা হইতে একটি লোক সঙ্গে লইয়া দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সন্তানগুলি সবই ছোট; একটি আবার দুগ্ধপোষ্য এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। এই অবস্থায় নূতন জায়গায় আসিয়া ভক্তটি খুবই ঘাবড়াইয়া গেলেন; বিশেষতঃ তাঁহার কেবলই ভাবনা হইতে লাগিল যে, তিনি শ্রীমায়ের অসুবিধা ঘটাইতেছেন না তো? শ্রীমা কিন্তু তাঁহাদিগকে এরূপ স্নেহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন যে, এক মুহূর্তে তাঁহাদের সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল এবং স্ত্রীভক্ত যেন পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমা ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র বাড়ির মধ্যে তাঁহাদের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এমন কি রুগ্না মেয়েটির শয়নের স্থান ও ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া গেল। স্নানের সময় স্ত্রীভক্ত বাড়ির মেয়েরই মতো কক্ষে কলসী লইয়া বাঁড়ুজ্যেপুকুরে স্নান করিয়া আসিলেন। পূজাশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দীক্ষা হইল। ভক্তদিগকে বর্ধমানে তালিত গ্রামে যাইতে হইবে—গড়বেতা হইতে তিন রাত্রির রাস্তা; সুতরাং দ্বিপ্রহরের আহারের পর একটু গল্পগুজব করিয়াই তাঁহারা শ্রীমায়ের পাদবন্দনান্তে অশ্রুপূর্ণলোচনে যাত্রা করিলেন। শ্রীমাও বিষণ্ণবদনে সদর দরজা পর্যন্ত আসিয়া "দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া মঙ্গল-কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বাড়ির ভিতরে ফিরিয়া তিনি নলিনীদির ঘরের বারাণ্ডায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া, তাঁহার বাছারা বহু দূরে হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছিল, তথাপি একটু বিশ্রাম

করিতে বা ভাল করিয়া কথা বলিতে কিংবা খাইতে পাইল না, ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চোখে পড়িল, তাঁহারা একখানি গামছা ভুলক্রমে ফেলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমা অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভুল তো হবারই কথা! একরাত্রি থাকতে পেলে না, ভাল করে দুটো কথা বলতে পারলে না— মন কি যেতে চায়? কাজেই ভুল তো হবেই!" মায়ের দুঃখ দেখিয়া গোপেশ মহারাজ বলিলেন যে, ভক্তেরা তখনও বেশি দূর যান নাই; তিনি একটু দ্রুত চলিয়া গামছা দিয়া আসিতে পারেন। তিনি গামছা দিয়া ফিরিয়া আসিতে না আসিতে দেখা গেল, স্ত্রীভক্তের ভিজা শাড়ি তখনও পুণ্যপুকুরের পাড়ে শুকাইতেছে। বাটীর জনৈক মহিলা উহা তুলিয়া আনিয়া নানা ভাবে ঠাট্টা করিতেছেন। এক নিঃসন্তান মহিলা উহাতে যোগ দিয়া বলিতেছেন, "কোন্ দিক সামলায়? এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা!" শ্রীমা সব দেখিয়া ও শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, বাছা আমার কালকে স্নান করে পরতে পাবে না; যখন কাপড় খুঁজতে যাবে, তখন মনে হবে, 'মায়ের বাড়িতে ফেলে এসেছি'।" গোপেশ মহারাজ আবার কাপড় লইয়া যাইতে চাহিলে নলিনীদিদি বারণ করিলেন; কিন্তু শ্রীমাকে এই প্রস্তাবে প্রসন্ন দেখা গেল। কাজেই তিনি জিবটা পর্যন্ত গিয়া প্রায় গরুর গাড়ি ছাড়িবার সময় কাপড় পোঁছাইয়া দিলেন।

ময়মনসিংহ হইতে একদল ভক্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নেতা পূর্বেই শ্রীমায়ের কৃপা পাইয়াছিলেন। এবারে তাঁহার শরীর তত ভাল ছিল না; অধিকন্তু বেশি দিন জয়রামবাটীতে থাকিলে মায়ের অসুবিধা হইবে—ইত্যাদি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে শীঘ্রই কামারপুকুর দেখিয়া আসিয়া দেশে ফিরিবেন। কিন্তু কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী ফিরিয়া তিনি জ্বরে পড়িলেন। মায়ের সেবকগণ ইহা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে পালকি করিয়া কোয়াল-পাড়ায় পাঠাইয়া দিবেন—সেখানে চিকিৎসাদি অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে, মায়ের বাড়িতেও ঝামেলা কমিবে। ব্যবস্থা সব ঠিক হইয়া গেলে শ্রীমাকে জানানো হইল। তিনি শুধু শুনিয়া গেলেন, কোন কথা বলিলেন না। স্পষ্টই মনে হইল যে, ইহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই, তথাপি তিনি বাধা দিতে চাহেন না। তিনি অল্প কিছুদিন পূর্বে রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছেন; ডাক্তারদের পরামর্শে তখনও পথ্যাদি সম্বন্ধে খুব কড়া নিয়ম চলিতেছে। তাঁহাকে প্রত্যহ একটি বেদানার রস দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অব্যবস্থার মধ্যে বেদানা সুপ্রাপ্য নহে বলিয়া অনেক কষ্টে কলিকাতা হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া সেবকদের জিম্মায় রাখা হইয়াছে; কারণ মায়ের স্বভাবই এই যে, হাতের কাছে কিছু থাকিলে বিলাইয়া দেন। আজ তাঁহারই ইচ্ছা হইল, এই অসুস্থ সন্তানকে বেদানা খাওয়াইতে হইবে। সেবকের আপত্তি টিকিল না। ভক্ত বেদানা পাইলেন

এবং এই ভাবে মায়ের অপূর্ব মমতা পাইয়া জীবন ধন্য মনে করিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর, বিদ্যানন্দজী রোগীকে লইয়া যাইবেন, এইরূপ কথা ছিল; কিন্তু পালকি আসিল সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে। তখন আকাশের কোণে কাল মেঘ দেখা দিয়াছে; তথাপি ব্যবস্থাপকগণ রোগীকে তাড়াতাড়ি সরাইবার আগ্রহে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। একটু পরেই চারিদিক অন্ধকার করিয়া প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রধ্বনি আরম্ভ হইল। সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রীমা একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি আলুথালু বেশে বারাণ্ডায় আসিয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, "আমার বাছার কি হবে গো?" সেবক তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া ঘরের ভিতরে আনিলেন। সেখানে চৌকির উপর বসিয়া তিনি করুণস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমার ছেলেকে রক্ষা কর।" মধ্যে ঝড়ের বেগ একটু কমিলে মাও একটু শান্ত হইলেন; কিন্তু অচিরে দ্বিগুণ বেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং শ্রীমাও দ্রুত বাহিরে আসিয়া সাশ্রুলোচনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "দোহাই ঠাকুর, একটু মুখ তুলে চাও আমার বাছাকে রক্ষা কর।" সমস্ত রাত্রিই উদ্বেগে কাটিল। পরদিন বিদ্যানন্দজী আসিয়া যখন জানাইলেন যে, তাঁহারা ঝড়ের সময় দেশড়ায় একজনের বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, সুতরাং কোন অসুবিধা হয় নাই, তখন মায়ের প্রাণ শীতল হইল।

বিভিন্ন রুচির ভক্ত আসিতেন শত আবদার লইয়া, আর কল্পতরুসদৃশ বাঞ্ছাপূর্ণকারিণী শ্রীমা সেই অবোধ শিশুদের সমস্ত ইচ্ছা অম্লানবদনে পূরণ করিতেন। এইসব ছেলেমানুষীর অধিকাংশ হইত জয়রামবাটীতে। কারণ উদ্বোধনে সাধুদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইয়া যে-সে যখন-তখন তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না। জয়রামবাটীতে ততটা কড়াকড়ি ছিল না; শ্রীমা সেখানে যেমন পল্লীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ উপভোগ করিতেন, ভক্তেরাও তেমনি তাঁহাকে পাইতেন নগরসুলভ কৃত্রিম ভব্যতার বাহিরে। তাই তাঁহারা খবর রাখিতেন, শ্রীমা কবে দেশে যাইবেন এবং সুযোগ বুঝিয়া পথের সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন।

কলিকাতা ও জয়রামবাটীর মধ্যে শ্রীমায়ের দিক হইতে একটা বিশেষ পার্থক্য এই ছিল যে, কলিকাতায় ভক্তদের তত্ত্বাবধান ও গৃহস্থালির কর্তব্য নির্বাহের ভার সাধুদের ও গোলাপ-মা প্রভৃতির উপর ন্যস্ত থাকায় শ্রীমাকে প্রত্যক্ষতঃ ঐ সব ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। জয়রামবাটীতে কিন্তু তিনিই গৃহকর্ত্রী; সুতরাং সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার। ভক্ত আসিতেন দর্শন করিতে বা দীক্ষা লইতে; কিন্তু মাকে তাঁহাদের থাকা, খাওয়া, সুখ-সুবিধা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে আয়োজন করিতে এবং দৃষ্টি রাখিতে হইত। এই ভক্তসেবা তাঁহার জীবনে স্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হওয়ায় তাঁহার নিকট হয়তো

তেমন অস্বাভাবিক ঠেকিত না; কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে ভাবি, যিনি জগজ্জননী, যিনি সহস্রভক্তবন্দিতা, যাঁহার দেহমন-অবলম্বনে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক মহাশক্তি উম্বোধিত হইয়া বিভিন্নরূপে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহার নিজের জীবন কতই না অনাড়ম্বর ও কর্মবহুল—পল্লীর সরলতার সহিত জননীর সন্তানবাৎসল্য মিলিত হইয়া সে জীবনের প্রতিমুহূর্ত কত চিত্তাকর্ষক! ধর্মজীবনে ইহা অদ্ভুত ব্যাপার। বাস্তবের নিকট এখানে কল্পনাও পরাজিত হয়।

সময়ে অসময়ে ভক্ত আসিতেছেন; তাঁহাদের নাম, ধাম, পদবী কিছুই তেমন জানা নাই; কিন্তু প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও পদমর্যাদা-সম্পন্ন, তাহা তাঁহাদের কথাবার্তা ও চালচলনেই সুস্পষ্ট। গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিতেছে বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পাশে পাশে ঘুরিতেছে। কিন্তু যাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে এই কল্পনাতীত লীলা চলিতেছে, তিনি সেসব দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আগত সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই ব্যস্ত। আগন্তুকদের কেহ হয়তো শয্যাত্যাগ করিয়াই চা-পানে অভ্যস্ত; শ্রীমা পাত্রহস্তে বাতগ্রস্ত পা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন—কাহার ঘরে গাই দোহানো হইয়াছে, একটু দুধ লইয়া আসিবেন ছেলের চায়ের জন্য। ক্ষুদ্র পল্লীতে তরিতরকারির একান্তই অভাব। দূরের গ্রাম হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, অকস্মাৎ বহু ভক্তের আগমনে তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। শ্রীমা প্রতিবেশীদের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় কিছু তরকারি পাওয়া যায়। শহর হইতে বহু দূরবর্তী এই গ্রামে মুড়ি, গুড় প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জলখাবার সহসা পাওয়া যায় না। তাই শ্রীমা বহু যত্নে সুজি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং ঠাকুরের পূজান্তে প্রসাদী ফল ও হালুয়া আদি ভক্তদিগকে খাইতে দেন। কিন্তু এমনও দিন উপস্থিত হয় যখন ঐ সব জোটানো সম্ভব হয় না; তখন শ্রীমা ভক্তের হাতে মুড়ি, ফুটি ও গুড় তুলিয়া দেন। ভক্ত বলিয়া উঠেন, "এ কি খেতে দিয়েছ, মা! এসব আমি খাই না।" মা বুঝাইয়া বলেন, "এখানে তো আর কিছু পাওয়া যায় না, বাবা—এই পাওয়া যায়। এতে অপকার হবে না, খাও। যখন কলকাতা যাব, তখন ভাল করে খাওয়াব।" পূর্ববঙ্গের ভক্তেরা মাছ খাইতে অভ্যস্ত; অথচ জয়রামবাটীতে মাছ দুষ্প্রাপ্য। ইহা জানিয়াও মায়ের চেষ্টার বিরাম নাই। না পাইলে দুঃখ করিয়া বলেন, "আমার বাছাকে ভাল করে খাওয়াতে পারলুম না।" আবার এইভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও একটু বিরক্তি নাই; বরং ভ্রাতৃজায়াদিগকে সগর্বে বলেন, "ওলো, আমার ছেলেপিলের কোন জ্বালা নেই; আমার একশ ছেলেও যদি আসে, আমি তাদের সকলকেই আঁটতে পারি।"

শ্রীমায়ের এই অপত্যস্নেহ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডি স্বীকার করিত

না। একবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের কর্তৃপক্ষ শ্রীমাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও তাঁহাদের আগ্রহে সম্মত হন। কিন্তু তাঁহার যাওয়া পছন্দ না হওয়ায় কেহ কেহ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। শ্রীমা ইহাতে বলেন, "তোমাদের ঝগড়া, বাপু, আমি কি ওদের মা নই?" জনৈক ডাক্তারের স্ত্রী প্রণামান্তে প্রার্থনা করিলেন, "মা, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যাতে উপায় হয়।" শ্রীমা তাঁহার দিকে তাকাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বউমা, এমন আশীর্বাদ করব আমি—লোকের অসুখ হোক, কষ্ট পাক? তা তো আমি পারব না, মা! সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক।" স্নানের পর জগদম্বাকে প্রণামান্তে শ্রীমাকে বলিতে শোনা যাইত, "মা জগদম্বে, জগতের কল্যাণ কর।" পাগলী মামীর মুখে শ্রীমায়ের প্রতি গালাগালি লাগিয়াই ছিল; কিন্তু মা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। একদিন মামী বলিয়া বসিলেন, 'সর্বনাশী!' শ্রীমা অমনি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, "আর যা বলিস, আমায় সর্বনাশী বলিস নে; জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।"

ইহার পর বিদেশীদের কথা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়রামবাটীতে আগত এক বালক ভক্তকে (স্বামী গিরিজানন্দকে) বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হত। একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ্গলে বললেন, 'দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি!' তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম এই ওলি বুলরা[১] সব ভক্ত হবে? আমি তো ভেবে অবাক, সাদা সাদা মানুষ আবার কি?" দুর্গম পল্লীতে লালিতা ব্রাহ্মণকন্যার নিকট সেই আদিম কালে ইহা কল্পনাতীত হইলেও তাঁহার সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব, উদার দৃষ্টি ও সপ্রেম মনোভাব তাঁহাকে অচিরে এমন স্তরে উপস্থিত করিয়াছিল, যেখানে দেশের দূরত্ব ও অঙ্গের বর্ণ মুছিয়া গিয়া বিরাজিত ছিল শুধু এক অতৃপ্ত সন্তানবাৎসল্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকের হৃদয়ে যখন ইংরেজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত, তখনও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত, "তারাও তো আমার ছেলে।"

বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীমা আপন কন্যার ন্যায় আদরযত্ন করিতেন এবং তিনি আসিলে পার্শ্বে বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদি করিতেন। উভয়ে উভয়ের ভাষা জানিতেন না; কিন্তু তবু ভাবের আদান-প্রদানের কোন অসুবিধা হইত না; কারণ স্নেহের প্রকাশ শুধু মুখের কথার উপর নির্ভর করে না। একদিন শ্রীশ্রীমা কুশলপ্রশ্নের পর একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।" নিবেদিতা উহা

১ মিসেস ওলি বুল স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা এবং তাঁহার কার্যের অন্যতম প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন।

পাইয়া একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন, আর বলেন, "কি সুন্দর, কি চমৎকার!" শ্রীমা দেখিয়া বলেন, "কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ? আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কি ভক্তিই করে! নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!" ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমাকে জার্মান সিলভারের একটি কৌটা দিয়াছিলেন; শ্রীমা উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখতেন। তিনি বলিতেন, "পুজোর সময় কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে।" আর বলিতেন, "নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি'।" শ্রীমা তাঁহার সন্তানদের আদরের দানগুলিকে অতি যত্নে রক্ষা করিতেন; বলিতেন, "জিনিসের আর কি দাম, স্মৃতিরই দাম!" অনেক পরের কথা। তাঁহার বাক্স হইতে কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া রৌদ্রে দিবার সময় রামময় (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) একখানি জীর্ণ এণ্ডির চাদর দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "মা, এখানি রেখে কি হবে? ওতে কিছু নেই, ফেলে দিই।" মা বলিলেন, "না, বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল; ওখানি থাক।" তিনি সেই ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালজিরা দিয়া তুলিয়া রাখিলেন, আর বলিলেন, "কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিলে। আমার মাকে খুব ভালবাসত।" নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সিস্টার কৃষ্টিন একদিন সন্ধ্যার সময় মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মা নিবেদিতার সহিত কৃষ্টিনের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া শ্রীমতী সুধীরাকে বলিলেন, "আহা, দুটিতে একসঙ্গে ছিল, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে। আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার তো আরও বেশি হবে, মা! কি লোকই ছিল! তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে!" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃষ্টিনকে নিবেদিতা স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মায়ের স্নেহ অপরকে কিরূপ আত্মহারা করিত, তাহা শ্রীমতী ম্যাকলাউড[২] ও নিবেদিতার ব্যবহার ও পত্রে বুঝিতে পারা যায়। স্বামী নির্ভয়ানন্দ একদিন ম্যাকলাউডকে নৌকা করিয়া বেলুড় হইতে উদ্বোধনে লইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় বেলুড় মাঠে ফিরিয়া ম্যাকলাউড যখন ঠাকুর-ঘরে প্রণাম ও একটু ধ্যান

২ ইনি স্বামীজীর শিষ্যা। আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া ইনি নানাভাবে দেশ-বিদেশে স্বামীজীর মত প্রচার করেন। ইঁহার ভগিনী মিসেস লেগেট ও ইঁহাকে স্বামীজী যথাক্রমে জয়া ও বিজয়া নাম দিয়াছিলেন।

করিয়া অতিথিভবনে যাইবেন, তখন স্বামী ধীরানন্দ জনৈক ব্রহ্মচারীকে আলো লইয়া পথ দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ম্যাকলাউড একটু আগাইয়া গিয়াছিলেন; ব্রহ্মচারী আসিয়া শুনিলেন, তিনি আপনমনে থামিয়া থামিয়া অস্ফুটস্বরে ভাবের ঘোরে ইংরেজীতে বলিতেছেন, "আমি তাঁকে দেখেছি।" অকস্মাৎ ব্রহ্মচারীকে নিকটে পাইয়া তিনি তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন. "পবিত্রতা-স্বরূপিণী মা! আমি তাঁকে দেখেছি!" দুই শত গজ পথ তিনি ভাবের উল্লাসেই চলিলেন—কোথায় পা পড়িতেছে হুঁশ নাই, আর মাঝে মাঝে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুই-একটি স্বগতোক্তি করিতেছেন।

কেম্ব্রিজ (ম্যাস) হইতে লিখিত নিবেদিতার পত্রে (১১।১২।১০) আছে—"সাধের মা! আজ সকালে, খুব সকালে, আমি গির্জায় গিয়েছিলাম...। যখন সেখানকার সবাই যীশুমাতা মেরীর কথা ভাবছিল, তখন হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে হল। তোমার মন ভোলানো মুখখানি। তোমার স্নেহদৃষ্টি, তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—আমি সবই প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। ...ভালবাসায় ভরা মা আমার! তোমার সেই ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস আর উগ্রতা নেই; এ জগতের ভালবাসাও তা নয়; স্নিগ্ধ শান্তির মতো তা সকলের কল্যাণ নিয়ে নেমে আসে; এতে কারুর কোন অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে না—লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর আভা যেন।"

শ্রীমা অনেক ক্ষেত্রে এই বিদেশিনীদের আদবকায়দাও অনুকরণ করিতেন। একদিন (১৩২৬ সালের চৈত্র মাস) বিকালে এক অপরিচিতা মেম মায়ের নিকট আসিলে মা "এস" বলিয়া সাদরে করমর্দন করার মতো হাত বাড়াইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। তারপর মেয়েটির চিবুকে হাত দিয়া ভারতীয় রীতিতে চুমা খাইলেন। মেয়েটির কন্যা অসুস্থ; তাই তিনি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ চাহিতে আসিয়াছেন। মা প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি প্রসাদী বিল্বপত্র ও পদ্মফুল দিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।" মেমটি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দিতে দিতে বিদায় লইলেন। বালিকা পরে সারিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পরও তিনি শ্রীমায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষাও পাইয়াছিলেন। মা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন।

জ্ঞানদায়িনী

জীবনালোচনার সুবিধার জন্য যদিও আমরা শ্রীমায়ের চরিত্র বিভিন্ন দিক বিবিধভাবে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক অধ্যায় রচনা করিয়াছি, তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এগুলি তাঁহার দেহমন অবলম্বনে প্রকাশিত একই অখণ্ড মহাশক্তির বিচিত্ররূপ। এই অখণ্ড শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করা চলে না; তাই আমাদের সসীম বুদ্ধি অসীমকে ধরিতে পারে না। আমাদের ধারণা-শক্তির অক্ষমতাবশতঃ আমরা শ্রীমাকে জননী, গুরু, দেবী ইত্যাদির অন্যতমরূপে ভাবিতে চেষ্টা করি; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা—এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। যখনই আমরা তাঁহাকে জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাঁহার অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি; যখনই তাঁহাকে দেখিতে চাই গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন; আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁহাকে ধরিতে গিয়া দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ শ্রীমায়ের পরস্পরাপেক্ষ এই ত্রিবিধশক্তিবিকাশের মধ্যে কোন্‌টির কোথায় শেষ এবং কোন্‌টির কোথায় আরম্ভ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তথাপি মানববুদ্ধি অবলম্বনে আমাদিগকে বিশ্লেষণের অবাঞ্ছনীয় পথেই চলিতে হইবে। আমাদের নিকট তিনি স্নেহময়ী মাতা-ঠাকুরানী, জ্ঞানদাত্রী শ্রীসারদা এবং অলৌকিক শক্তি ও ঐশ্বর্যাদিভূষিতা, শুদ্ধ-সত্ত্বা, মোক্ষদাত্রী দেবী। তাঁহার ভিতরে গুরুভাবের ক্রমবিকাশের আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে উহার পূর্ণবিকাশের দিগ্‌দর্শনে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা যে গুরুশক্তির অনুধ্যানে অগ্রসর হইয়াছি, মনে রাখিতে হইবে, উহা কৃপায় অবতীর্ণা আদ্যাশক্তিরই স্নেহঘনমূর্তি। জাগতিক গুরুশিষ্যের দৃষ্টিতে ইহাকে বুঝিতে গেলে আমরা বঞ্চিত হইব মাত্র। প্রকৃত গুরু কপাল-মোচন; তিনি করুণাবশে শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। শুধু কি তাহাই? তাহার রোগ বা পাপরাশিও নিজ দেহে লইয়া স্বয়ং যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং দুর্বল শিষ্যকে উহা হইতে অব্যহতি দেন। তিনি জানিয়া শুনিয়াই ইহা করেন, নিজের কষ্ট হয় বুঝিয়াও নিবৃত্ত হন না। শ্রীমায়ের জীবনে এইরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য দুই-চারিটি মাত্র দিব। উদ্বোধনে শেষ অসুখের সময় শ্রীমা জনৈক ভক্তকে[১] তাঁহার

১ ইনি তখন ব্রহ্মচারী। মঠে যোগদানের কয়েক বৎসর পরে ইনি আবার সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মনের ভাব খুলিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তাহলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে—তাদের ভালমন্দের ভার যে নিতে হয়েছে। মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা! কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়, তাদের জন্য কত চিন্তা করতে হয়! এই দেখ না, তোমার বাপ মারা গেলেন, আমারও মনটা খারাপ হল। মনে হল—ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার একটা পরীক্ষায় ফেললেন? কিসে ঠেলে-ঠুলে বেঁচে উঠবে-এই চিন্তা। সেই-জন্যই তো এত কথা বললুম। তোমরা কি সব বুঝতে পার? যদি তোমরা সব বুঝতে পারতে, আমার চিন্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর নানাভাবে নানা জনকে খেলাচ্ছেন—টাল সামলাতে হয় আমাকে! যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারি নে।" গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধ কোন অনুষ্ঠান-অবলম্বনে শুধু ইহলোকের জন্য স্থাপিত হয় নাই, ইহা গুরুশক্তির দ্বারা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত চিরকালের সম্বন্ধ।

শ্রীমায়ের সর্বদাই মনে মনে জপ চলিত। শেষ বয়সে শরীর যখন দুর্বল, তখন অনেকক্ষণই শুইয়া কাটাইতে হইত; কিন্তু সেবক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ অবস্থায়ও জপের বিরাম নাই। রাত্রে ঘুম খুব কমই হইত—প্রয়োজনস্থলে এক ডাকেই সাড়া পাওয়া যাইত। সেবক বিস্মিত হইয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনি কি ঘুমান নাই, বা ঘুম হচ্ছে না?" মা বলিতেন, "কি করি, বাবা, ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে তখন দীক্ষা নিয়ে যায়; কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত, নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি, আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো। এ সংসারে বড় দুঃখ কষ্ট! আর যেন তাদের না আসতে হয়'।"

জনৈক ভক্তকে অভয় ও আশ্বাস দিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "তোমার চিন্তা কি, বাবা, তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়। তোমার কিছু করতে হবে না—তোমার জন্য আমিই করছি।" ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "তোমার যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্যেই তোমার করতে হয়?" মা উত্তর দিলেন, "সকলের জন্যেই আমার করতে হয়।" ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত ছেলে রয়েছে, সকলকে তোমার মনে পড়ে?" শ্রীমা প্রথমে উত্তর দিলেন যে, সকলের কথা মনে পড়ে না; পরে বুঝাইয়া বলিলেন, "যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি, 'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের

নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো'।"

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন আবদার করিয়া শ্রীমাকে বলিলেন যে, এত ভক্তের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মঙ্গলচিন্তা করা যখন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, তখন দীক্ষিত ভক্তের সংখ্যা কম হওয়াই ভাল। শ্রীমা তাহাতে বলিলেন, "তা ঠাকুর আমাকে তো নিষেধ করেননি। তিনি আমাকে এত সব বুঝিয়েছেন, আর এটা তাহলে কি কিছু বলতেন না? আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি, 'যে যেখানে আছে, দেখো।' আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—সিদ্ধমন্ত্র।" অর্থাৎ শিষ্যের কল্যাণ শুধু গুরুর মনে রাখার উপরই নির্ভর করে না, মন্ত্রেরও একটা শক্তি আছে।

মন্ত্রশক্তি ও পাপগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীমা অন্য সময়ে (ফেব্রুআরি, ১৯১৩) রাসবিহারী মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীমা বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিন বহু ব্যক্তি তাঁহার চরণ ছুঁইয়া প্রণাম করিয়াছে। তারপর যোগীন-মা দেখেন, মা বারবার গঙ্গাজলে পা ধুইতেছেন। তিনি সাবধান করিয়া দিলেন, "মা, ওকি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে!" মা বলিলেন, "যোগেন, কি বলব, এক একজন প্রণাম করে, যেন গা ঠাণ্ডা হয়; আবার এক একজন প্রণাম করে, যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়—গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচি নে।"

শ্রীমা কষ্ট পাইতেন, কষ্টের কারণও জানিতেন—তবু ভক্তের কল্যাণার্থে আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেন। ক্বচিৎ কখনও বলিয়া ফেলিতেন, "বাবা সারাদিন যেন কুস্তি করছি—এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না! ঠাকুরকে বলে 'রাধু, রাধু' করে মনটা রেখেছি।" কিন্তু বহুজনহিতায় যিনি বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার মনে ইহা একটা ক্ষণিক চিন্তা মাত্র; ইহাতে তাঁহার কষ্টের আভাস থাকিলেও বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না। পরমুহূর্তেই হয়তো মায়ের পায়ে বাতের ব্যথার কথা উল্লেখ করিয়া ভক্ত বলিলেন, "মা, শুনতে পাই, ভক্তদের পাপ গ্রহণ করেই তোমার এই ব্যাধি। আমার একটি আন্তরিক নিবেদন—তুমি আমার জন্যে ভুগো না; আমার কর্মের ভোগ আমার দ্বারাই ভোগ করিয়ে নাও।" করুণাময়ী মা অমনি উত্তর দিলেন, "সে কি, বাবা; সে কি, বাবা, তোমরা ভাল থাক, আমিই ভুগি।"

শিষ্যের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজের যন্ত্রণা হইলেও পাপী সম্বন্ধে মায়ের

দৃষ্টি ছিল অপূর্ব। পাপীকে তিনি ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া কৃপার চক্ষেই দেখিতেন। ভক্ত হয়তো দুঃখ করিয়া বলিলেন, তাঁহার ভয় হয় যে, মায়ের মতো মা পাইয়াও বুঝি কিছু হইল না। শ্রীমা অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা খুশী কর না কেন, যেভাবে খুশী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন; তারা তো...তাদের খেলা খেলবেই!"

এক সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্মবিপাকে দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া একদিন উদ্বোধনে শ্রীমাকে তাঁহার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই।" শ্রীমা অগ্রসর হইয়া নিজের পাবন বাহুদ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "এস, মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?" পতিতোদ্ধারিণী মা একদিন এই অবাধ কৃপাবিতরণের কারণ স্বমুখে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?"

পাপগ্রহণের সঙ্গে ছিল তাঁহার কল্যাণসাধনের অসীম আকাঙ্ক্ষা। জয়রামবাটীতে কোন দিন ভক্ত না আসিলে বলিতেন, "ভক্তেরা কেউ এল না।" নেপাল মহারাজ (স্বামী গৌরীশানন্দ) যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন, তখন শ্রীমায়ের পায়ের বাতের ব্যথা বাড়ায় চলিতে কষ্ট হইত। একদিন তিনি শুনিলেন, ঐ অবস্থায়ও শ্রীমা ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আজও দিনটা বৃথাই গেল। একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 'তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে'?" এই বলিয়া তিনি ঘর-বাহির করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া বলিতেছেন, "কই, ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?" পরদিন তিনজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে মায়ের মুখে হাসি ফুটিল।

তিনি বলিতেন, "দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।" জনৈক ভক্ত একদিন (জানুআরি, ১৯১২) এক আশ্চর্য স্বপ্নের কথা শ্রীমাকে জানাইলেন। স্বপ্নে এক ব্যক্তি শ্রীমাকে ধরিয়া বসিয়াছে দীক্ষার জন্য; আর শ্রীমা বলিতেছেন, "একে যদি আমি এখনি কিছু করে দিই তাহলে আর আমি বাঁচব না, আমার

দেহ থাকবে না।" স্বপ্নদ্রষ্টাও মাকে বারণ করিলেন; তবু মা ঐ প্রার্থীর বুক ও ঘাড় ছুঁইয়া যেন কি করিয়া দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। শ্রীমা স্বপ্ন শুনিয়া বলিলেন, "এক একটা লোকের জ্বালায় ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় মনে হয়, 'আর এ দেহ তো যাবেই, তা যাক না এক্ষুণি, দিয়ে দি'।" কাশীধামে শ্রীমা আর একদিন (নভেম্বর, ১৯১২) বলিয়াছিলেন, "আমি তো জন্মাবধি কোন পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। পাঁচ বছরের সময় তাঁকে ছুঁয়েছি। আমি না হয় তখন না বুঝি, তিনিও তো ছুঁয়েছেন। আমার কেন এত জ্বালা? তাঁকে ছুঁয়ে অন্য সকলে মায়ামুক্ত হচ্ছে, আর আমারই কি এত মায়া? আমার যে মন রাত দিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি—দয়ায়, এদের জন্য।" কোয়ালপাড়ার মঠে জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে পরামর্শ দিলেন, "ভক্তদের স্পর্শে যখন কষ্ট হয়, তখন স্পর্শ না করাই উচিত।" ইহাতে শ্রীমা বলিলেন, "না, বাবা, আমরা তো ঐ জন্যেই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব তবে কে করবে? পাপী-তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?" শ্রীমা সেদিন ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সব ভক্তের স্পর্শই মন্দ নহে, শুদ্ধসত্ত্ব অনেকের স্পর্শে আনন্দ হয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে অন্য প্রসঙ্গের অনুসরণ করিতেছি। অহেতুক-কৃপাময়ীর অনুকম্পাই এখন আমাদের অনুধ্যানের বস্তু।

একদিন সকালে সাতটা-আটটার সময় তিনজন ভক্ত মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) একখানি পত্র লইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মা পত্র শুনিলেন, ভক্তদিগকেও ডাকিলেন; কিন্তু পা গুটাইয়া বসিলেন, যদিও বাতের দরুন তিনি ভক্তদের সম্মুখে সাধারণতঃ পা ছড়াইয়া বসিতেন। ভক্তদের প্রণামের পর শ্রীমায়ের খেদোক্তি শোনা গেল, "শেষে কিনা রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) আমার জন্যে এই পাঠালে? ছেলে বিদেশে গিয়ে কত ভাল জিনিস পাঠায়, আর রাখাল কিনা আমার জন্যে এই পাঠালে?" তিনি ইহাদিগকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না, বেলুড় মঠে যাইতে বলিলেন। ভক্তেরা মায়ের আদেশে তখনকার মতো বাহিরে গেলেও তাঁহাদের প্রাণ শান্ত হইল না; সুতরাং আবার অনুমতির জন্য মায়ের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন। মা এবারেও অসম্মতি জানাইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে স্বগতোক্তি করিলেন, "ঠাকুর, কালও তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, দিন যেন বৃথা না যায়। শেষে তুমিও কিনা এই আনলে?" পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া দীক্ষাদানে সম্মত হইলেন ও বলিলেন, "যতক্ষণ শরীর থাকে, ঠাকুর, তোমার কাজ করে যাই।" দীক্ষা হইয়া গেল। কিছুদিন বাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, প্রেমানন্দজী, শিবানন্দজী ও সারদানন্দজী বেলুড় মঠের দোতলায় গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া এই বিবরণ আনুপূর্বিক শুনিলেন। ব্রহ্মানন্দজী শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

প্রেমানন্দজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যুক্তকরে বলিলেন, "কৃপা, কৃপা! এই মহিমময় কৃপা দ্বারাই মা আমাদের রক্ষা করছেন সর্বক্ষণ! কি বিষ তিনি নিজে গ্রহণ করলেন, তা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যদি এ বিষ আমরা গ্রহণ করতুম তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম।"

কৃপাবশে শ্রীমা নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেন না। একবার জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর দুর্বল হওয়ায় স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থানুযায়ী কিছুদিন দর্শনাদি বন্ধ আছে, এমন সময় বরিশাল হইতে এক দীক্ষার্থী উপস্থিত হইলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে কর্তব্যনির্ণয়ের জন্য বাহিরে জোর বিচার চলিতেছে শুনিয়া শ্রীমা আলুথালু-ভাবে দরজায় আসিয়া স্বামী পরমেশ্বরানন্দকে বলিলেন, "কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন।" মা বলিলেন, "শরৎ কী বলবে? আমাদের ঐজন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" সত্যই তিনি ভক্তটিকে পরদিন দীক্ষা দিলেন।

ভক্ত, সে যত দুর্বলই হউক না কেন, মায়ের নিকট আসিলে সাহস ও অভয় পাইত, আর তাহার হৃদয়ে বিশ্বাস জাগিত। জনৈক ভক্ত জপ করিয়াও মনে শান্তি পান না। মা, তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে, অভ্যাসের ফলে মন শান্ত হইবে। কিন্তু ভক্তের তাহাতেও স্বস্তি হইল না। তিনি শুনিয়া-ছিলেন, শিষ্য মন্ত্র জপ না করিলে গুরুর ক্ষতি হয়। সুতরাং তিনি শ্রীমাকে মন্ত্র ফেরত দিতে চাহিলেন। শুনিয়া মা বলিলেন, "দেখ, একি কথা! তোমাদের জন্যে যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোমাদের যে কবে (পূর্বেই) দয়া করেছেন!" বলিতে বলিতে মায়ের চোখে জল দেখা দিল। তিনি আবেগভরে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।" ততক্ষণে ভক্তের চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। আতঙ্কে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "মা, আমার সব কেড়ে নিলেন! এখন আমি কি করি? তবে কি, মা, আমি রসাতলে গেলুম?" শ্রীমা অমনি জোরের সহিত সন্তানকে অভয়বাণী শুনাইলেন, "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।" আর একজনকে তিনি অনুরূপস্থলে ভরসা দিয়াছিলেন, "এখন যাই হোক (অর্থাৎ জপতপ নিয়মিত না হইলেও), শেষটায় ঠাকুরকে আসতেই হবে (তোমাদের নিতে)। তিনি নিজে বলে গেছেন, তাঁর মুখের কথা কি ব্যর্থ হতে পারে? যা প্রাণে আসে করে যাও।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে এক সন্ন্যাসী ভক্তের নৈরাশ্যপূর্ণ পত্র পাইয়া মা বলিয়াছিলেন, "সে কি গো! ঠাকুরের নাম কি চারটিখানি কথা যে, অমনি যাবে? ও নাম কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। যারা ঠাকুরকে মনে করে এখানে এসেছে, তাদের ইষ্টদর্শন হতেই হবে। যদি আর কোন সময়ে না হয় তো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হবেই হবে।"

পূর্বের কথাগুলিতে শ্রীমা শুধু ইষ্টের অথবা গুরু ও ইষ্ট উভয়ের উপর অধিক বিশ্বাস-উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী দুইটি স্থলে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসই প্রাধান্য পাইয়াছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত জয়রামবাটীতে আসিয়া ভাবিলেন যে, এই পুণ্যক্ষেত্রে ধ্যানজপ করিলে বেশী ফললাভ হইবে। তাই একদিন খুব উহা চালাইলেন। ঐ দিন প্রণাম করিতে গেলে মাতাঠাকুরানী ভক্তকে বলিলেন, "মায়ের কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যানজপের কী দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্য সব করছি। এখন খাও দাও, নিশ্চিন্তমনে আনন্দ কর।"

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে আগত গিরিজা মহারাজকে (তখন তিনি বালক ও ব্রহ্মচারী) শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "বাবা, গুরুগৃহে জপ করতে নেই।" অথচ একটু আগেই মা তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "গুরুর আদিষ্ট একশত-আট জপ নিত্য অবশ্য করবে। তারপর তোমরা সাধু—তোমরা সব সময় জপ করবে। তোমাদের তো যথেষ্ট সময় রয়েছে।" তাই উপদেশদ্বয়ের মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়া গিরিজা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "একশত-আট বার জপও কি তাহলে করব না?" মা অমনি সংশোধন করিয়া দিলেন, "গুরুর আদিষ্ট একশত-আট বার জপ করবে, তার বেশী করো না।"

এই অমূল্য উক্তিগুলি একদিকে যেমন অভয়দান ও বিশ্বাসোৎপাদনের জ্বলন্ত নিদর্শন, অপরদিকে তেমনি উহাতে রহিয়াছে শিষ্যের ভারগ্রহণের ইঙ্গিত এবং গুরুর প্রতি প্রেমবৃদ্ধির আকুল আহ্বান। এই প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনা আমাদের মনে পড়ে—শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশবাবুকে সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়িয়া বকলমা দিতে বলিয়াছিলেন; আর যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন যে, বরযাত্রীরা যেমন বরের সঙ্গে আনন্দ করিয়া দিন কাটায় যীশুর সহগামীরাও তেমনি বৈধী ভক্তির উপর জোর না দিয়া তাঁহাকেই অধিকতর আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে শুধু ঐ প্রেমের বলেই মুক্তিপদ লাভ করিবে। উপনিষদেও তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য গুরু ও ইষ্টের প্রতি ভক্তিকে অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে।[১]

---

১ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

—"যাঁহার দেবতার প্রতি পরা ভক্তি আছে, এবং দেবতার প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই পূর্বোক্ত বিষয়সকল প্রতিভাত হয়" (শ্বেতাশ্বতর উপ., ৬।২৩)।

বস্তুতঃ ধ্যান করিব কাহার, যদি ধ্যেয় ব্যক্তির প্রতি প্রীতি উৎপন্ন না হয়? আর বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আসিবে কিরূপে, যদি আচার্যের প্রতি ভালবাসা না জন্মে? শ্রীমা তাই তাঁহার সন্তানদের ভার লইতেন, তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, আর আশা রাখিতেন যে, তাহারাও তাঁহাকে তেমনি জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিবে।

সম্পূর্ণ ভার তিনি লইলেও কিন্তু ইহা মনে করা ঠিক নহে যে, তিনি ধ্যানজপ করিতে নিষেধ করিতেন। যদি তাহাই হইবে, তবে শত শত ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিলেন কেন এবং সাধনপদ্ধতিই বা শিখাইলেন কেন? বস্তুতঃ পূর্বে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসাধারণ স্থল। অনন্যসাধারণ ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে লোকাতীত চরিত্রের বিশেষত্ব সহজে উপলব্ধ হয় বলিয়াই আমরা ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু শুধু ইহারই মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে আমরা এই অসামান্য চরিত্রের অতি অল্প অংশই বুঝিতে পারিব। তিনি আসিয়াছিলেন সর্বসাধারণের জন্য, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিবার জন্য আমরা এই সাধারণ ক্ষেত্রেই নামিয়া আসিব। আমরা দেখিব, তিনি সর্বসাধারণের জন্য ভক্তি-বিশ্বাস-মিশ্রিত বৈধ অনুষ্ঠানের পথ বাছিয়া লইয়া উহাতে এক অসাধারণ প্রাণ সঞ্চারপূর্বক কঠিন ও রসহীন সাধনাকে সহজ ও সরস করিয়া তুলিয়াছেন।

দীক্ষান্তে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাকে কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে?" মা বলিলেন, "সে কি? তুমি নিরামিষ খাবে কেন? আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খুব খাবে-দাবে, আর ফূর্তি করবে!...বাকিটা আমি দেখব।" কিন্তু নরেশবাবু আবার যখন প্রশ্ন করিলেন, "যদি আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে না পারি?" মা অমনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে কি? ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না—সে কি কথা? ইষ্টমন্ত্র জপ না করলে তোমারই যাবে—আমার কি হবে?"

জনৈক ভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "জপধ্যান না করলে কি হয়? সে সব করতে হবে।" উহাতে মনের ময়লা কাটিতেছে না, এই অভিযোগ করায় মা বলিলেন, "মন্ত্রজপ করতে করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন?" মন্ত্রদীক্ষা সম্বন্ধে অপর একজন ভক্ত একদিন (১৯০৭ খৃঃ) মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, মা, মন্ত্র নেবার কি দরকার? মন্ত্রজপ না করে কেউ যদি 'মা কালী মা কালী' বলে ডাকে, তাতে হয় না?" মা উত্তর দিলেন, "মন্ত্রের দ্বারা দেহ-শুদ্ধি হয়। ভগবানের মন্ত্রজপ করে মানুষ পবিত্র হয়।...অন্ততঃ দেহশুদ্ধির জন্যও মন্ত্র দরকার।" অন্য সময়ে (ফেব্রুআরি, ১৯১৩) একজন যখন শ্রীমাকে বটগাছের অতি ক্ষুদ্র বীজ দেখাইয়া বলিলেন, "মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের

চেয়েও ছোট। এ থেকে অত প্রকান্ড গাছ।” তখন মা বলিলেন, “তা হবে না? এই দেখ না ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়।”

• জনৈক ভক্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীমাকে জপের মালা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রও ফেরত দিয়াছিলেন কিনা, এক ত্যাগী ভক্ত জানিতে চাহিলে শ্রীমা উত্তর দিয়াছিলেন, “তা কি কখনও হয়? এ সজীব মন্ত্র। ও কি ফেরত হয়—যে মন্ত্র একবার পেয়েছে—মহামন্ত্র! যাঁর (যে গুরুর) উপর একবার ভালবাসা হয়েছে, তা কি কখনও যায়?”

জপের কার্যকারিতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একদিন জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “জপ-টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।” আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, “জপধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়।” অন্যান্য সময়ে বলিয়াছিলেন, “রোজ পনর, বিশ হাজার জপ করতে পারে, তাহলে হয়। আগে করুক, না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা তো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলে— কেন হয় না?” “কাজকর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপ, ধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার; অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম, তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়।...কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে?” “ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার।” আবার বিশেষ অধিকারীকে তিনি সর্বদা স্মরণমনন করিতে বলিতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীমা যখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন, তখন জনৈক ভক্ত দীক্ষার পর বাড়ি ফিরিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, উপায় কি?” ঘরের কুলজিতে ছোট একটি ঘড়ি ছিল; মা উহা দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ ঘড়ি যেমন টিক টিক করছে, ঠিক তেমনি নাম করে যাও, তাতেই সব হবে, আর কিছু করতে হবে না।”

ফলতঃ শ্রীমায়ের দৃষ্টিতে জপের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বিশেষ অধিকারীকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া হয়তো বলিতেন, “ও জপ বিড়বিড় করা মেয়েদের কর্ম, তোমাদের জ্ঞান আছে।” এইসব অসাধারণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিব যে, শ্রীমা তাঁহার দীক্ষিত ভক্তদিগকে পুনঃ পুনঃ জপ করিতে উপদেশ দিতেন; এমন কি, ভক্তের কল্যাণার্থে স্বয়ং অবিরাম জপ করিতেন। তবে ইহাও ঠিক যে, তিনি জপধ্যানকে অনুষ্ঠানমাত্ররূপে গ্রহণ করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, “মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়, মা, ভক্তিই সব।

ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে! উনিই সব।" আর কৃপার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেন, "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবে তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।" অপর এক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "জপ-তপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়; কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। রাখালেরা কৃষ্ণকে জপ-ধ্যান করে পেয়েছিল, না তারা 'আয়রে, নেরে, খারে' করে পেয়েছিল?"

এই আত্মসমর্পণের, এই রাগভক্তির ভাব না আসা পর্যন্ত কোন সাধনই হেয় নহে; মুমুক্ষুকে নিজ ক্ষমতানুযায়ী ঐসকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাধনের বিবিধ অঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমায়ের বিভিন্ন উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সম্যক উপলব্ধ হইবে। রেঙ্গুনের শ্রীযুত শ্যামাচরণ চক্রবর্তী স্বামীজীর 'রাজযোগ' পড়িয়া প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার কানের কাছে একটা সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে—উহা কিছুতেই সারে না। সুতরাং তিনি দীর্ঘকাল অবকাশ লইতে বাধ্য হইলেন। ছুটিতে বেলুড় মঠে আসিয়া শ্রীমায়ের নাম শুনিতে পাইলেন এবং পরে জয়রামবাটী যাইলেন। গ্রামে পৌঁছিবামাত্র সে উপসর্গ থামিয়া গেল। পরে যখন তিনি শ্রীমায়ের নিকট যোগসাধনের অভিপ্রায় জানাইলেন, তখন মা বলিলেন, "তোমার শরীরে কি রেখেছ, বাবা, আর মনেই বা কি আছে যে, যোগ করবে?" ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি আমার উপায় নেই?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "কি করতে হবে, আমি বলে দেব।" পরে তিনি তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া দুইবেলা জপ করিতে বলিলেন। শ্যামাচরণবাবু তিনবেলা জপ করিতে চাহিলেন এবং আরও কিছু করিতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা শুধু দুইবেলা জপ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "এতেই সব হবে।" শ্যামাচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাস্তায় ঘাটে কি করব?" মা বলিলেন, "স্মরণ করলেই চলবে।"

কাশীধামে (জানুআরি, ১৯১৩) জনৈক সন্ন্যাসী-ভক্ত শ্রীমাকে প্রশ্ন করিলেন, "একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করছি—করব কি?" মা উত্তর দিলেন, "একটু একটু করতে পার, বেশী করে মাথা গরম করা ভাল নয়। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?" ঐ সন্ন্যাসীই আবার কোয়ালপাড়ায় (জুন, ১৯১৯) মাকে বলিলেন, "কিছুদিন হল আসন অভ্যাস করছি—শরীর ভাল থাকবার জন্যে। এই আসন অভ্যাস করলে হজম হয় ও ব্রহ্মচর্যের সহায়তা করে।" মা বলিলেন, "শরীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে শরীর খারাপ হয়, এই বুঝে করবে।" স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আসন অভ্যাস করা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিলেও দীর্ঘকাল

জপের সুবিধার জন্য তিনি উহা করিতে কখনও কখনও উপদেশ দিতেন—"কোন একটা আসন অভ্যাস করে নেবে—যাতে বেশীক্ষণ, দু-তিন ঘণ্টা, বসতে পার। যখন পা ঝিন-ঝিন করবে তখন পা বদলে নেবে; পরে আর কষ্ট হবে না।" তিনি ভক্তদিগকে পূজাদির উপকারিতাও বুঝাইতেন। পূর্বোক্ত ভক্ত কাশীধামে শ্রীবিশ্বনাথের প্রসঙ্গে যখন বলিলেন, "মা, আমাদের আর পাথরের শিবলিঙ্গ ভাল লাগে না।" মা তখন সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, "সে কি, বাবা? কত মহা মহা পাপী কাশীতে আসছে, আর 'বিশ্বনাথকে স্পর্শ করে উদ্ধার হচ্ছে। তিনি সকলের পাপ নির্বিকারভাবে গ্রহণ করছেন।" কাহাকেও কাহাকেও শ্রীমা স্বাধ্যায়ে উৎসাহ দিতেন; যেমন গীতা হইতে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই-চারিটি শ্লোক পড়িতে বলিতেন।

তবে ইহাও ঠিক যে, ভাবপ্রবণ ভক্তেরা পাছে মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া অনুষ্ঠানাদিকে চরম লক্ষ্য করিয়া ফেলেন, এইজন্য শ্রীমা অনেক সময় তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার দত্তকে একখানি পত্রে (১১।১১।১৯১৬) তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার পৈতা নেওয়ার সম্বন্ধে আমি আর কি লিখব? ইহা কোন মন্দ কাজ নয়—সামাজিক ব্যাপার। এসব বিষয় তোমরা যেরূপ ভাল বিবেচনা কর করবে। পৈতা নিলে যাতে তার সদ্ব্যবহার হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। যা ঠিক ঠিক মতো চালাতে না পারবে, তা হুজুগে পড়ে করো না। প্রথম নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করে পরে অন্য যা ইচ্ছা তা জপ করতে পার। জপের সময় কোন বিধিনিষেধ নাই বটে, তবে সকাল-সন্ধ্যাই হচ্ছে প্রশস্ত সময়। যে সময়ই হোক, প্রত্যেক দিনই জপ করবে—বাদ দেওয়া ভাল নয়।" অপরে শিবপূজা করে দেখিয়া জনৈক স্ত্রীভক্তের শিবপূজায় আগ্রহ জন্মিলে এবং শ্রীমায়ের নিকট অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমি যে মন্ত্র দিয়েছি, তাতেই সব—দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব ঐ মন্ত্রে হয়। তবে কারু ইচ্ছা হলে শিখে নিয়ে করতে পারে। তোমাদের ওসবের দরকার নেই, ওসব করলেই হাঙ্গামা বাড়ানো।" পূজা-পদ্ধতি মতে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিবার কথা উঠিলে মা বলিয়াছিলেন, "পূজা-পদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্টমন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।"

দীক্ষাদানের বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের ইহাই দৃঢ় ধারণা হয় যে, শ্রীমায়ের দৃষ্টি সর্বদা জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভের প্রতিই নিবদ্ধ থাকায় তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ঘটনাবলীকে মুখ্য স্থান দিতে পারিতেন না। যে কোন বৈধ বা আন্তরিক আগ্রহজনিত সদুপায় মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিপোষক বলিয়া তাঁহার মনে প্রতিভাত হইত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন এবং দীক্ষিতের দৃষ্টিও ঐ দিকে আকৃষ্ট করিতেন। সাধারণ আচার-

বিচার সম্বন্ধে তিনি শিষ্যগণকে যেরূপ উপদেশ দিতেন, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

শৌর্যেন্দ্র মজুমদার মহাশয় চা-পান না করিয়া ধ্যানজপাদি কিছুই করিতে পারিতেন না; সুতরাং মন্ত্রগ্রহণের পর শ্রীমাকে ইহা জানাইয়া তাঁহার নির্দেশ চাহিলে মা বলিলেন, "বাবা, মা কি আবার সৎমা হয়? তোমার যেমন খুশী, আগে খেয়ে নিয়ে পরে জপধ্যান করবে।" নলিনবাবুকে শ্রীমা পুলিপিঠা খাইতে দিলেন। তাঁহার জননী দেহত্যাগ করায় তখন তাঁহার অশৌচ চলিতেছে; সুতরাং এই অবস্থায় উহা খাওয়া সম্বন্ধে মায়ের নির্দেশ চাহিলেন। মা বলিলেন, "তাতে দোষ কি, বাবা? আমিও তো মা! আমি দিচ্ছি—এখানে কোন দোষ নেই।" শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্তীকে আহার সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার মাছ-মাংস যা খেতে মন চায়, খাবে। তবে ঠাকুর আদ্যশ্রাদ্ধের, সংস্কার-বিবাহের আর প্রায়শ্চিত্তের অন্ন খেতে নেই, বলতেন।"

জনৈক স্ত্রীভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, স্ত্রীলোকদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পুজো করা চলে কি?" শ্রীমা এই বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, চলে, যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে।...তুমি পুজো করো, কিন্তু মনে কোন দ্বিধা এলে করো না।" অপর এক স্ত্রীভক্তকে কিন্তু অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "এই অবস্থায় কি ঠাকুর-দেবতার কাজ করতে হয়? তা করো না।"

বিধিকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়া এবং অযথা উহার নিন্দা না করিয়া, ভক্তকে রাগমার্গে উন্নীত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালীও এই মধ্যপন্থা অবলম্বনেই পরিচালিত হইত। একজন দীক্ষাভিলাষীকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "কুলগুরু তো আছেন, সেখানে নিলেই হয়।" আবার এরূপ দৃষ্টান্তও আছে যেখানে তিনি কুলগুরুর দীক্ষামন্ত্র ঠিক রাখিয়া নিজে নূতন মন্ত্র দিয়া পূর্বের মন্ত্র প্রথমে দশবার জপ করিয়া পরে তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছেন। অর্থীর মানসিক অবস্থানুসারে এইরূপ বিবিধ ব্যবস্থা হইত। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর পার্থক্য স্বীকার করিয়া তিনি একদিন (জানুআরি, ১৯১১) জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, যোগশিক্ষাদির জন্য শিক্ষাগুরু করা চলে; কিন্তু দীক্ষাগুরু-পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। এক দীক্ষাপ্রার্থীর আবেদন (মার্চ, ১৯১৪) শুনিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য সরলভাবে সাধন-ভজন করে ভগবান লাভ করতে চেষ্টা করা; কুলগুরুর বৃত্তি নষ্ট করা নয়। আমি ঐ ছেলেকে দীক্ষা দিলে সে যেভাবে আমাকে ভক্তি করবে, ঐভাবে যদি তার কুলগুরুকেও শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর বার্ষিক বৃত্তি যথাশক্তি বাড়িয়ে দিতে রাজী থাকে, তাহলে হতে পারে।" প্রার্থী উহাতেই সম্মত হওয়ায় তিনি শ্রীমায়ের কৃপা পাইয়াছিলেন। দীক্ষাদাতা গুরু

সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি খুবই উদার ছিল। স্বয়ং অকৃতার্থ ব্যক্তি মন্ত্র দিতেছেন শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এসব অনেকটা ব্যবসাদার সাধু। তবে কি জান? এতেও উপকার হবে। মানুষ তো কিছু করে না, এদের কথাতেও কিছু কিছু ভগবানের নাম করবে!" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন অযৌক্তিক দাবি-দাওয়ার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় চৌধুরীকে একখানি পত্রে (মার্চ, ১৯১৩) তিনি লিখিয়াছিলেন, "কুলগুরুকে যথারীতি বার্ষিক দিবে, অন্য কিছু দিতে সমর্থ হইলে দিবে—অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে তুমি এত টাকা কোথায় পাইবে?" জনৈক স্ত্রীভক্ত মায়ের নিকট দীক্ষা লইলে কুলগুরু অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই কথা মায়ের নিকট পত্রে নিবেদিত হইলে তিনি উত্তর লিখাইলেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই।"

মন্ত্রগ্রহণে আগ্রহ থাকা আবশ্যক; আগ্রহ থাকিলে শত বাধা সত্ত্বেও উপায় আবিষ্কৃত হয়। জনৈক স্ত্রীলোক শ্রীমাকে লিখিয়াছিলেন যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর অমতে তিনি আসিয়া দীক্ষা লইতে পারিতেছেন না। শ্রীমা তাঁহাকে উত্তরে জানাইলেন যে, ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন; তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি কৃপা করিবেন। অপর এক দরিদ্রসন্তান উদ্বোধনে আসিয়াও শ্রীমায়ের অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার দর্শন পায় নাই; তাই পত্রে জানিতে চায়, এবার আসিলে কৃপালাভ হইবে কিনা। শ্রীমা তদুত্তরে বলিলেন, "কথা এই, যার ভবপারে যাবার সময় হবে, সে দড়ি ছিঁড়ে আসবে ; তাকে বেঁধেও কেউ রাখতে পারে না। অর্থাভাব, চিঠির অপেক্ষা, এসে ফিরে যাওয়ার ভয়—এসব কিছুই কিছু নয়।" শ্রীমা তাহাকে আসিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সধবা দীক্ষার্থিনীদের দীক্ষার পূর্বে শ্রীমা জানিয়া লইতেন তাঁহাদের স্বামীর সম্মতি আছে কিনা। সম্মতি থাকিলে স্বামী স্বয়ং দীক্ষিত না হইলেও তিনি ভক্তিমতী স্ত্রীকে মন্ত্র দিতেন।

যাঁহারা মায়ের কৃপালাভের জন্য আসিতেন, শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকিলে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও বড় একটা ফিরাইতেন না। আধার ভাল হইলে অনেকস্থলে নিজেই যাচিয়া মন্ত্র দিতেন, অথবা প্রার্থনামাত্র তখনই কৃপা করিতেন। কটকের বৈকুণ্ঠবাবু ১৩১৭ সালের মাঘ মাসে কোঠারে যাইয়া শ্রীমাকে দর্শন করেন; তখন দীক্ষাগ্রহণের কোন ইচ্ছা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি সেবার শ্রীমায়ের চরণবন্দনান্তে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু দুই-চারি দিন পরে আবার প্রবল আকর্ষণে তাঁহাকে কোঠারে আসিতে হইল। এবারে বাড়ী ফিরিবার পূর্বদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকো, পরশু যেয়ো।" পরে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মা তাঁহাকে কৃপা করিবেন ; ঐজন্য তাঁহাকে পরদিন সকালে স্নান করিয়া প্রস্তুত

থাকিতে হইবে। ইহার অর্থ কিছুই না বুঝিলেও তিনি পরদিন যথাসময়ে শ্রীমায়ের আহবানে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মন্ত্র নেবে?" বৈকুণ্ঠ বলিলেন, "আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দিন। আমি কিছু জানি না।" তারপর মা বলিলেন, "তুমি কোন্ দেবতার মন্ত্র নেবে?" বৈকুণ্ঠ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, যেহেতু তিনি কিছুই ভাবেন নাই। তখন শ্রীমা নিজেই ইচ্ছানুরূপ মন্ত্র দিলেন।

একবার শ্রীমা জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। জ্বর থামিলেও তখনও শরীর খুব দুর্বল; সুতরাং ভক্তগণ দর্শনে বঞ্চিত আছেন। এই সময়ে বোম্বাই হইতে এক পারসী যুবক দর্শনার্থী হইয়া আসিল। সে স্বামীজীর বই কিছু পড়িয়াছে এবং ঐ বিষয়ে তাহার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সারদানন্দজীর কৃপা হওয়ায় তিনি তাহাকে উপরে যাইতে দিয়াছেন। সে শ্রীমায়ের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হইয়া প্রার্থনা করিল, "মাঈজী, কুছ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিসসে খুদা পহচানা যায়।" শুনিয়াই মা রাসবিহারী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব? দিই দিয়েঁ।" তিনি উত্তর দিলেন, "সে কি! কাউকে দর্শন পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছ, শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন। এখন নয়, এর পরে হবে।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি শরৎকে জিজ্ঞাসা করে এস।" শরৎ মহারাজের নির্বিচারে প্রদত্ত অনুমোদন সহ ফিরিয়া আসিয়া রাসবিহারী মহারাজ দেখেন, শ্রীমা দুইখানি আসন পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। দীক্ষা হইয়া গেলে তিনি বলিলেন, "বেশ ছেলেটি, যা বললুম, ঠিক বুঝে নিলে।"

বস্তুতঃ ভিতর হইতে প্রেরণা আসিত বলিয়াই শ্রীমা ঐরূপ করিতেন। তিনি বলিতেন, "এসব ঠাকুরই পাঠাচ্ছেন।" এই জাতীয় দীক্ষাকালে ভাষার ব্যবধান কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিত না। দীক্ষার সময় শ্রীমা যাহা বলিবার বাংলাতেই বলিয়া যাইতেন; কিন্তু দীক্ষার্থীরা উহার মর্ম বুঝিতে পারিত। শ্রীমা যখন দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন, তখন ঐ অঞ্চলের লোক আসিয়া বলিত, "মন্ত্রম্"; "উপদেশম্"। সেখানেও দীক্ষা দিবার সময় মনের অন্তস্তল হইতে যে মন্ত্র উঠিত, তাহাই দীক্ষার্থীর যথার্থ মন্ত্র জানিয়া তিনি উহাই তাহাকে দিতেন। তিনি বলিতেন, "কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়েই মন থেকে ওঠে, 'এই দাও, এই দাও।' আবার কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয় যেন কিছুই জানি নে, কিছুই মনে আসে না। বসেই আছি। পরে অনেক ভাবতে ভাবতে তবে মন্ত্র দেখতে পাই।...যে ভাল আধার, তার বেলায় তক্ষুণি মন থেকে ওঠে।"

অনেক সময় শ্রীমা অল্পবয়স্ক বালকদিগকেও দীক্ষা দিয়াছেন। একটি বার বৎসরের বালক উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল, "মায়ের

কৃপা চাই।" ইহাকে ছেলেমানুষী বা অপরের কাছে শোনা কথা মনে করিয়া তখনকার মতো তাহার এই আকাঙ্ক্ষাকে উড়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন মায়ের জনৈক সেবক দেখিলেন, সে একাকী উদ্বোধনের রোয়াকে বসিয়া আছে। সেখানে অনেকেই ঐরূপ বসে; সুতরাং ঐ বিষয়ে কোন মনোযোগ না দিয়াই তিনি বাজারে চলিয়া গেলেন। ফিরিবার সময় তিনি দেখেন বালক হাসিমুখে চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, তাহার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৌতূহল বৃদ্ধি পাওয়ায় সেবক আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, শ্রীমা রাধুকে নীচে পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখবি রোয়াকে একটি ছেলে বসে আছে, তাকে নিয়ে আয়।" এইরূপে তাহাকে ডাকাইয়া দীক্ষা দিয়াছেন; এখন সে শ্রীমায়ের জন্য ফলমিষ্ট কিনিতে বাজারে যাইতেছে। সেবক শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অতটুকু ছেলেকে আবার কি দীক্ষা দিলে? ও কি বোঝে?" মা উত্তর দিলেন, "তা যা হোক, বাপু, ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে ধরে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি কজনের হয়?"

রামেশ্বর তীর্থ হইতে শ্রীমায়ের কলিকাতায় ফিরিবার পর জন্মাষ্টমীর দুই-এক দিন পূর্বে কোয়ালপাড়ার একটি ব্রহ্মচারী বালক দীক্ষাপ্রার্থী হইল। তাহার বয়স তখন তের বৎসর। শ্রীমা তাহাকে বিশেষ স্নেহ করেন। কিন্তু দীক্ষার কথা শুনিয়াই গোলাপ-মা প্রবল বাধা দিয়া বলিলেন, "এইটুকু ছেলে, দুদিন পরে মন্ত্র ভুলে যাবে, এখন থেকেই দীক্ষা! মা তো তোমাদের দেশেরই। তিনি যখন সেখানে যাবেন, তখন দেখে শুনে পরে দীক্ষা নিও।" বলিয়াই গোলাপ-মা চলিয়া গেলেন। তখন মা বলিতেছেন, "গোলাপের কথা দেখ না। বালককালে যা ভাল করে শেখে, তা কি ভোলে কখনও? এখন থেকে যা পারে করুক না। পরে তো আমি আছিই।" জন্মাষ্টমীর দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। মা যেমন দেখাইয়া দিয়াছিলেন, দীক্ষার পরে বালককে সেইরূপ জপ করিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "এই তো; এটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে। পরে যেমন আবশ্যক, সব সময়মত আবার দেখিয়ে দেব।" দীক্ষা শেষ হইলে তাহাকে দুইটি প্রসাদী পান্তুয়া খাইতে দিয়া মা বলিলেন, "লজ্জা করো না, দীক্ষার পর প্রসাদ খেতে হয়"—বলিয়া এক গ্লাস জলও দিলেন।

আবার সব সময়েই যে ঐরূপ করিতেন তাহাও নহে। একদিন সাত-আট বৎসরের একটি ছেলের দীক্ষার কথা উঠিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "এখন ছেলে-মানুষ, এখন কি দীক্ষা হয়? ছেলেটি ভক্ত, বেঁচে থাক। ভক্তদাস হোক।"

অধিকারী উপযুক্ত হইলে এবং ভিতর হইতে দীক্ষাদানের প্রেরণা জাগিলে তিনি স্থান-কাল সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতেন না। শিলং-এর এক ভক্ত শ্রীমায়ের অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পণ করেন, স্বপ্নে সাতবার মায়ের

সাক্ষাৎ না পাইলে তাঁহার দর্শনে যাইবেন না। মায়ের কৃপায় সাতবার ঐরূপ হইলে তিনি জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীমাকে দর্শন করেন। ফিরিবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "দীক্ষাটা নিয়েই যেয়ো।" ভক্ত বলিলেন যে, কলিকাতায় উহা হইতে পারে। মা কিন্তু কহিলেন, "না, বাবা, ওটা হয়েই যাক, আজই না হয় হবে।" ভক্ত বলিলেন, "প্রসাদ পেলুম যে।" শ্রীমা প্রসাদগ্রহণকে দূষণীয় মনে না করিয়াই দীক্ষা দিলেন। বস্তুতঃ সদ্‌-গুরুর কৃপা কোন নিয়মের অধীন নহে।

পুলিসের নজরবন্দি হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন বালক এক সন্ধ্যায় কোয়াল-পাড়ায় শ্রীমায়ের নিকট যাইয়া দীক্ষা চাহিল। তাহার উপর শ্রীমায়ের স্বভাবতই স্নেহ হইল, তিনি পরদিন দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কোয়ালপাড়া আশ্রমের উপর তখন পুলিসের কড়া নজর ; আগন্তুককে আশ্রয় দিলে বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাকে বাহিরে এক বাড়িতে রাখা হইল। পরদিন খুব সকালে শ্রীমা ব্রহ্মচারী বরদার সহিত জগদম্বা আশ্রম হইতে রাধুর বাড়ীতে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ বালক স্নান করিয়া মাঝপথে মাঠে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা একটু জল আনিতে বলিলে ব্রহ্মচারী একটি গেলাসে জল আনিয়া দিলেন। পরে যেন মনে হইল, তিনি আসন খুঁজিতেছেন; তাই ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসন এনে দেব কি?" মা বলিলেন, "থাক, আর যেতে হবে না, দুটো খড় দাও, আমরা দুজনে বসি।" ঐভাবে বসিয়াই আচমনান্তে শ্রীমা মন্ত্র দিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পথে শ্রীমা বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক পশ্চিমা কুলি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতি ব্যগ্রভাবে নিকটে আসিয়া নিজের ভাষায় বলিতে লাগিল, "তুমি আমার জানকী-মাঈ, তোমাকে আমি কত দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কৃপাময়ী শ্রীমা তাহাকে শান্ত করিয়া একটি ফুল লইয়া আসিতে বলিলেন এবং সে ঐ ফুল তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলে তাহাকে দীক্ষা দিলেন।

জয়রামবাটীতে একদিন ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া শ্রীমা ভক্তদের প্রণাম লইতে-ছিলেন। সর্বশেষে একজন মায়ের চরণ ধরিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল ; জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর দিল না। তাহার ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীমা সকলকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া দীক্ষা দিলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে রাঁচির একটি বালক জয়রামবাটী গিয়াছিল ; কিন্তু পূজার ভিড়ে সে শ্রীমায়ের নিকট নিজের দীক্ষাগ্রহণের অভিলাষ নিবেদন করিতে পারে নাই ; বালকবোধে অপর কেহও সে সুযোগ করিয়া দেন নাই। সে যেদিন বিদায় লইবে, সেদিন শ্রীমায়ের শরীর ভাল ছিল না বলিয়া অপর

সকলের সহিত সে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য শয়নগৃহের বারান্ডায় উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। একে একে সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে ছেলেটি ভিতরে যাইয়া মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া এমন কাঁদিতে আরম্ভ করিল যে, চক্ষের জলে মায়ের পা ভিজিয়া গেল। অমনি করুণাময়ী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন, বাবা? কি চাও—মন্ত্র নেবে?" পরে দরজা বন্ধ করিয়া ঐ অবস্থাতেই মা তাহাকে দীক্ষা দিলেন।

দেশের এক বালিকার সহিত শ্রীমায়ের বাল্যে সই সম্পর্ক ছিল। ভানুপিসি বলেন যে, একদিন পাশাপাশি শায়িতাবস্থায় শ্রীমা সখীকে মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন।

ভক্তের আগ্রহ ও শুভ সংস্কার এবং শ্রীমায়ের অন্তরের প্রেরণায় স্থান-কাল ভুল হইয়া গেলেও সব সময়েই যে ঐরূপ হইত তাহা নহে। কাশীতে তিনি দীক্ষা দিতেন না—বলিতেন, "এখানে শিবগুরু।" শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিনে তিনি দীক্ষা দিতে চাহিতেন না ; তবে ইহার ব্যতিক্রম হইত। মাদ্রাজে অবস্থানকালে ঐ দিনে তিনি দুই জনকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আর একবার জয়রামবাটীতে জনৈক রুগ্ন যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে দীক্ষা লইতে উপস্থিত হইল। সে শিক্ষিত বা সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীমা ঐ সব না দেখিয়া অন্তর দেখিতেছিলেন। তাই সে যখন ধরিয়া বসিল যে, ঐদিন দীক্ষা না হইলে সে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করিবে, কেননা হয়তো সে আর আসিতে পারিবে না, তখন ঐদিনে দীক্ষাদানের ইচ্ছা না থাকিলেও এবং সেবক নিষেধ করিলেও তিনি যুবককে দীক্ষা দিলেন।

শ্রীমায়ের মন্ত্র নির্বাচন যে দীক্ষিতের সংস্কারানুযায়ী হইত, এই বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কোন অল্পবয়স্কা ভদ্রকুলবধূ শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লইয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। সেখানে তিনি নিত্য ধ্যানজপ করিলেও মন্ত্র ঠিক উচ্চারিত হইতেছে কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিন বৎসর পরে সৌভাগ্যক্রমে গুরুদর্শন হইলে তিনি নিজের সন্দেহ মিটাইতে চাহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, "সে কত দিনের কথা, বাছা! আমার কি আর মনে আছে! তুমি কিছু বলো না, মা, একটু অপেক্ষা কর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" এই বলিয়া ঠাকুর-ঘরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমাকে কি এই মন্ত্র দিয়েছিলুম?" বধূ স্বীকার করিলেন যে, উহাই তাঁহার মন্ত্র। তখন শ্রীমা বলিলেন, "তবে ঐটিই জপ কর, ওতে কোন ভুল নেই।"

শ্রীযুত রসিকলাল রায় দীক্ষার্থে উপস্থিত হইলে শ্রীমা তাঁহার বংশের মন্ত্র জানিতে চাহিলেন। রসিকলালের তাহা জানা ছিল না। শ্রীমা তখন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের বংশের এই মন্ত্র" এবং

ঐ মন্ত্রেই দীক্ষা দিলেন। পরে অনুসন্ধানের ফলে শ্রীমায়ের দর্শনের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

বাগদার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় শক্তিমন্ত্রের প্রার্থী হইলে মা বলিলেন, "বাবা, তোমার ভেতর তো রামকে দেখছি। তোমাদের বংশের সকলে কি রামমন্ত্রের উপাসক? রাম আর শক্তি তো অভিন্ন ; তবে আর রামমন্ত্র নিতে ক্ষতি কি?" বস্তুতঃ ঐ বংশের সকলে রামমন্ত্রের উপাসক ছিলেন।

ব্যক্তিগত সংস্কার এবং কুলগত সংস্কার প্রায়শঃ একরূপ হইলেও স্থল-বিশেষে কেহ হয়তো উহা স্বীকার না করিয়া স্বেচ্ছায় ইষ্টনির্বাচন করিয়া বসিত ; অনেক ক্ষেত্রে কুলপরম্পরাগত ইষ্টদেবতা অজ্ঞাত থাকিতেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির ও কুলের সংস্কার বিভিন্ন হইত। তাই শ্রীমায়ের স্ফটিকস্বচ্ছ চিত্তে যে সত্য উদ্ভাসিত হইত, তাহাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। শ্রীযুক্ত সারদাকিংকর রায়ের পূর্বপুরুষ শাক্ত হইলেও তিনি বৈষ্ণবপ্রভাবে পড়িয়া ঐ ধারায় চলিতেছিলেন; সুতরাং শ্রীমা শক্তিমন্ত্র দিলে তিনি বাহিরে প্রকাশ না করিলেও সন্দেহাকুল হইয়া রহিলেন। মা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই বিকালে দেখা হইলে স্বতই বলিলেন, "আমি তোমাকে ঠিকই দিয়েছি।"

শ্রীমা মন্ত্রদানের পূর্বে ক্ষেত্রবিশেষে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মনোভাব বুঝিয়া লইতেন। পরে উহা তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষীকৃত ইষ্টরূপের সহিত মিলিলে তদনুরূপ মন্ত্র দিতেন, নতুবা শিষ্যের ভুল বুঝাইয়া দিয়া নিজের দৃষ্ট মন্ত্রেই দীক্ষাপ্রদান করিতেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীমায়ের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, শিবের ক্রোড়ে উপবিষ্টা কালীমূর্তি তাঁহার খুব ভাল লাগে। মা বলিলেন, "শক্তি কি, বাবা, কখনও শিবকে ছেড়ে থাকেন? তোমার শক্তিমন্ত্র।" শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালাভান্তে সুরেন্দ্র-বাবুর বোধ হইল যেন তাঁহার দেহমধ্যে এক তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে, আর শরীর কাঁপিতেছে। তাঁহার আর মন্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র রহিল না।

পূর্বোক্ত অনেকগুলি বিষয়ের সমর্থক একটি চমৎকার ঘটনা আমরা শ্রীযুক্ত কর্ণাটকুমার চৌধুরীর নিকট শুনিয়াছি। তাঁহার যথাবিহিত গুরুকরণ হইলেও তিনি প্রাণে শান্তি পাইতেছিলেন না। এই অবস্থায় তিনি ১৩২১ সালে বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা-দর্শনে যাইবার পথে উদ্বোধনে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলেন। শ্রীমা তখন পূজাসনে উপবিষ্টা ছিলেন ; কর্ণাটবাবু বারান্ডাতে প্রণাম করিলে তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "পা ছুঁয়ে প্রণাম কর।" অগত্যা কর্ণাটবাবু ভিতরে গিয়া আবার প্রণাম করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মা বলিলেন, "গোবিন্দ কৃপা করবেন।" মায়ের আশীর্বাদে নববল পাইয়া তিনি তীর্থদর্শনে গেলেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় পূর্বেরই ন্যায় অশান্ত রহিল। অতঃপর প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগান্তে তিনি

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। এই স্ত্রীর ভূতাবেশ হইত বলিয়া নিজের গুরুর দ্বারা ইঁহাকে একই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়াইলেন। কিন্তু রোগ সারিল না ; তিনি নিজেও শান্তি পাইলেন না। অতএব শ্রীমায়ের নিকট পুনর্দীক্ষার জন্য ১৩২৩ সালে সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু নিজে প্রস্তাব করিতে সাহস না পাইয়া স্ত্রীর দ্বারা শ্রীমাকে অনুরোধ করাইলে মা স্বীকৃত হইয়া দীক্ষার দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ইতোমধ্যে গোলাপ-মা এই সকল কথা শুনিয়া আপত্তি করায় কর্ণাটবাবু দীক্ষার পূর্বদিন মায়ের নিকট আসিয়া প্রণামান্তে ঐ বিষয়ে আবার প্রশ্ন করিলেন। শ্রীমা অভয় হস্ত তুলিয়া আশ্বাস দিলেন, "বলেইছি তো!" দীক্ষার দিনে কর্ণাটবাবুর স্ত্রীর ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। ঐ অবস্থায়ই তাঁহারা গঙ্গাস্নানান্তে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে যথাকালে কর্ণাটবাবুর দীক্ষা হইয়া গেল। স্ত্রী তখন পাশের ঘরে জ্বরে কাঁপিতেছেন। সেখানে গোলাপ-মা ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুধীরা দেবী প্রভৃতি আছেন ; আর গোলাপ-মা জোর গলায় শাসাইতেছেন, "গুরুত্যাগ করতে এসেছ, মন্ত্র ভুলে গেছ, তার উপর আবার জ্বর! দীক্ষা কিছুতেই হবে না।" শ্রীমা আসনে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং গোলাপ-মার কথা সবই শুনিতেছিলেন। দীক্ষার্থিনীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি অবশেষে সুস্পষ্ট আদেশ করিলেন, "সুধীরা, নিয়ে এস।" স্ত্রীরও দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার পর তাঁহার আর ভূতাবেশ হয় নাই।

কেহ কেহ স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়া শ্রীমায়ের নিকট উহা নিবেদন করিতে বা পুনর্দীক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতেন। ঐরূপ একজন ভক্ত দীক্ষার জন্য আসিলে শ্রীমা তাঁহার মুখে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র শুনিয়া উহার অর্থ বলিয়া দিলেন এবং উহা প্রথম জপ করিতে বলিলেন। পরে অপর এক মন্ত্র দিয়া বলিলেন, "শেষে এইটি জপ ও ধ্যান করবে।" স্বপ্নমন্ত্রের অর্থ বলিবার পূর্বে শ্রীমাকে কয়েক মিনিট ধ্যানস্থ থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

আর একজন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তুমি করবে। আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি"—এই বলিয়া মহামন্ত্র দিলেন।

একটি বালক স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মন্ত্র দিয়াছিলেন। শ্রীমা আর নূতন মন্ত্র দিলেন না ; বলিলেন, "তুমি কৃপা-সিদ্ধ। তুমি এই মন্ত্র জপ করেই সিদ্ধ হবে।"

জনৈক স্ত্রীভক্ত স্বপ্নে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা পাইয়া তাঁহাকে উহা শুনাইবার জন্য বীজটি বলিবামাত্র মা বলিলেন, "হ্যাঁ, এই তোমার ঘর ; বেশ বেশ, তুমি ভাগ্যবতী।" তিনি আর কোন মন্ত্র দিলেন না, উহাই জপ করিতে বলিলেন।

শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে কিংবা শ্রীমায়ের সত্যদৃষ্টির সহিত না মিলিলে

তিনি স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রমাত্রকেই স্বীকার করিয়া লইতেন না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় একটি স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতেন। শ্রীমা মন্ত্রটি শুনিয়াই বলিলেন, "বীজ ছাড়াই কি মন্ত্র হয় গা?" পরে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী আইচ শ্রীমায়ের নিকট মন্ত্র লইতে চাহিয়াছিলেন : কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব হইতে থাকে। ইতোমধ্যে তিনি স্বপ্নে দীক্ষা পাইলেন। কিন্তু উহাতে মনে শান্তি আসিল না। সুতরাং দীক্ষার জন্য পুনরায় শ্রীমায়ের নিকট যাইয়া সব বলিলে তিনি বলিলেন, "একজন তোমার পেছনে শত্রুতা করছে এবং তোমার অনিষ্ট সাধনের জন্য ঐ তিন নামের মন্ত্র দিয়েছে। এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। ঐ কয়টি শব্দ যত শীঘ্র পার ভুলে যাও।" পরে তিনি অন্য মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

তিনি সর্বদা সকলকে কৃপা করিতে উন্মুখ থাকিলেও শিষ্যের কল্যাণার্থে স্থলবিশেষে একটু বিলম্ব করিতেন বা প্রথমে অস্বীকার করিতেন, যাহাতে শিষ্যের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, অথবা শিষ্য নিজের দোষ ধরিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন। নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ১৩২৬ সালের পৌষ-সংক্রান্তির সময় স্বামী ধীরানন্দজীর আদেশে একজন দীক্ষার্থীকে এবং স্বয়মাগত অপর আর এক-জনকে লইয়া জয়রামবাটী যান। পথিমধ্যে তাঁহার মনে মায়ের বাটিতে পিঠা খাইবার সাধ হইয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও বলেন নাই। জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়া স্নানান্তে কিশোরী মহারাজের দ্বারা শ্রীমাকে দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে মা সম্মত হইলেন না ; এমন কি, ধীরানন্দজী পাঠাইয়াছেন শুনিয়াও বলিলেন, "তাতে হয়েছে কি? আমার শরীর ভয়ানক অসুস্থ, তা সত্ত্বেও দীক্ষা দিতে হবে নাকি?" এই অস্বীকৃতির ফলে দীক্ষার্থিদ্বয়ের চক্ষে অশ্রু ঝরিতে থাকিল : কিন্তু অনুরুদ্ধ হইয়াও কিশোরী মহারাজ দ্বিতীয়বার যাইতে সাহস পাইলেন না। যাহা হউক, দুপুরে আহারে বসিয়া নরেশবাবু দেখিলেন, পাতে পিঠা পড়িয়াছে; কিন্তু তিনি যাই ভাবিলেন, "মা কতকগুলো শুকনো পিঠে পাঠালেন কেন? একটু দুধ কি সঙ্গে জুটল না?" অমনি শুনিলেন, মা বলিতেছেন, "কিশোরী, ছেলেদের শুকনো পিঠে দিয়েছ কেন? শিগগির দুধ পাঠিয়ে দাও।" শ্রীমায়ের স্নেহদর্শনে নরেশবাবুর সাহস বাড়িল : তাই বিশ্রামের পর বন্ধুদের আগ্রহে তিনি নিজেই মাকে দীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "তাহলে তুমিও বলছ তাদের দীক্ষা দিতে?" নরেশবাবু বলিলেন, "হাঁ, মা, নিশ্চয় বলছি!" মা বলিলেন, "কিন্তু এদের দেহ যে বড় অশুদ্ধ। আচ্ছা, এদের বল এখানে ত্রিরাত্রি বাস করতে ; ত্রিরাত্রি বাস করলে দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে—এটা শিবপুরী কিনা!" বলার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া দেখাইয়া দিলেন।

উদ্বোধনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের দীক্ষার পর তাঁহার পত্নী

দীক্ষা চাহিলে মা দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে বেলুড় মঠে কোন সাধুর নিকট দীক্ষা লইতে বলিলেন। মহিলাটি তথাপি জেদ করিতে থাকিলে তিনি বিরক্তিসহকারে অস্বীকার করিয়া পূজায় বসিলেন। মহিলাটি তখন শোকে মুহ্যমান হইয়া তীরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া প্রাণের আবেগে গান ধরিলেন—

> যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে?
> দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে?

সুমিষ্ট গানে আকৃষ্টা শ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ হইল না; তিনি তাঁহার নিকট আরও কয়েকখানি গান শুনিয়া লইয়া অবশেষে তাঁহাকে থামিতে বলিলেন কেননা তাহা না হইলে তাঁহার পূজায় মন বসিতেছে না। পূজার পরে মহিলাটি আবার দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে শ্রীমা দীক্ষার দিন স্থির করিয়া দিলেন এবং সাদরে তাঁহার মুখে প্রসাদী পান গুঁজিয়া দিলেন।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শ্রীমা করুণায় পরিপূর্ণ থাকিলেও তাঁহার অতি প্রবল গুরুশক্তির সম্মুখে সর্বপ্রকার বাচালতা বা অসংগত প্রার্থনা নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্মণ তাঁহার পরিচিত দুইটি বালকের দীক্ষার অনুমতি পাইয়া তাহাদিগকে উদ্বোধনে শ্রীমায়ের সমীপে লইয়া যান। যথাকালে বড়টির দীক্ষা হইয়া গেলে ছোটটির ডাক পড়িল কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, "হতভাগার কপালে নাই।" পরে পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছোটটি জানাইল যে তাহার মনে কেমন একটা ভয় আসিয়াছিল।

উদ্বোধনের কর্মচারী শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত শ্রীমায়ের বাজার করা প্রভৃতি অনেক কাজ করেন এবং এজন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতে হয়। একদিন প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার কালে স্বামী শুদ্ধানন্দজী চন্দ্রবাবুকে সকৌতুকে বলিলেন, "চন্দ্র, তুমি তো মার কাছে সর্বদা গিয়ে প্রসাদ খাও; আমি একটি কথা বলি—তুমি মাকে বলতে পার?" চন্দ্র উত্তর দিলেন, "কেন পারব না?" শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "তুমি মাকে বলতে পার—'মা, আমি মুক্তি চাই'?" চন্দ্র বলিলেন "আপনারা একটু দাঁড়ান আমি এক্ষণি বলে আসছি।" তিনি উপরে গিয়া দেখেন, শ্রীমা পূজায় বসিয়াছেন। তিনি আস্তে আস্তে ঢুকিলেন; কিন্তু কেন যেন শরীর কাঁপিতে লাগিল। একটু পরে মা তাঁহার দিকে চাহিয়া আসার কারণ জানিতে চাহিলেন। চন্দ্রবাবুর বুক তখনও কাঁপিতেছে, আর কে যেন গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। তিনি অভ্যাসবশে বলিয়া ফেলিলেন, "প্রসাদ চাই।" মা ইঙ্গিতে তক্তপোশের নীচে ঢাকা প্রসাদ দেখাইয়া দিয়া আবার পূজায় মন দিলেন। চন্দ্রবাবুর সে কম্প থামিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দেবী

শ্রীভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহাকে চিনিবার উপায়-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

"বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আপনি নিজেও আমাকে এইরূপ বলিতেছেন" (১০।১৩)। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি বিবিধ প্রকারে অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভক্তগণের নিকট তাঁহার দেবীত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মুখেও ইহা বহুধা বিঘোষিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় বিষয়ে একটি ঘটনা বিবৃত করিয়া আমরা শ্রীমায়ের উক্তি ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে এই বিষয়ক স্বীকৃতিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষা লইতে গেলে তিনি দীক্ষাসনে বসিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে জানিতে পারিয়াছেন, সুরেন্দ্রবাবু অপর এক অধিক শক্তিসম্পন্ন গুরুর নিকট দীক্ষা পাইবেন। ইহার কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রবাবু স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্কে উপবিষ্ট এবং এক মাতৃমূর্তি তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। দীর্ঘকাল অতীত হইলে ১৩১৮ সালের দুর্গাপূজার পরে সুরেন্দ্রবাবু জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। এবং সেখানে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীক্ষার মন্ত্র স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের সহিত মিলিয়াছে এবং শ্রীমায়ের গুরুমূর্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেবীরই অনুরূপ দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবু দীক্ষাকালে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। পরে তিনি শ্রীমায়ের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

ভক্তদের নিকট শ্রীমায়ের পরিচয়প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তিনি জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু উহা শ্রীমায়ের বিশেষত্বের পরিচায়ক হইলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব উহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সাধারণতঃ অতি সঙ্কোচশীলা ও কোমল-স্বভাবা হইলেও স্থলবিশেষে তাঁহার ব্যবহারে একটা অদৃষ্টপূর্ব দৃঢ়তা প্রকাশ পাইত। ইহাকে রুদ্রভাব বলা চলে না, বরং মহাকবি লেখনীমুখে "কুসুম

অপেক্ষা মৃদু বজ্র হইতেও কঠোর" বলিয়া মহাপুরুষদের হৃদয়ের যে লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্তমাত্র। আমরা উন্মাদ হরিশের শাস্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

১৩২১ সালের গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীমা উদ্বোধনের দোতলায় রাস্তার দিকে বারাণ্ডায় বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। তখন রাস্তার অপর পাশে মাঠের উপর কুলিমজুররা চালা বাঁধিয়া সপরিবারে বাস করিত। ঐ বাড়ীগুলির একটিতে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল—প্রথমে কিল, চড়; পরে এমন এক লাথি মারিল যে, অবলা স্ত্রী কোলের ছেলের সহিত গড়াইয়া উঠানে আসিয়া পড়িল। তাহার উপর আবার কয়েক ঘা লাথি! শ্রীমায়ের জপ বন্ধ হইয়া গেল। যাঁহার গলার স্বর একতলা হইতেও কেহ শুনিতে পাইত না, তিনি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি? আঃ মলো যা!" লোকটা তখন ক্রোধোন্মত্ত হইলেও একবার মাতৃমূর্তি দর্শনমাত্র, সাপের মাথায় ধুলোপড়া দিলে যেমন হয়, সেই ভাবে, মাথা নীচু করিয়া নির্যাতিতাকে তখনই ছাড়িয়া দিল! মায়ের সহানুভূতি পাইয়া মেয়েটি তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহার অপরাধ, সে সময়মত ভাত রান্না করে নাই। একটু পরেই পুরুষটির রাগ পড়িল এবং সাধাসাধির পালা আরম্ভ হইল দেখিয়া সকলে নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেলেন।

একসময়ে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা ও শিবুদাদা কামারপুকুরে অনুপস্থিত আছেন। এই সুযোগে শিবুদাদার স্ত্রী গ্রামের জমিদার লাহা-বাবুদের সাহায্যে কন্যা পাঁচীকে একরাত্রে নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া সন্দিগ্ধ এক ঘরে বিবাহ দিতে উদ্যত হন। পরে অবশ্য স্থির হয় যে, পাত্র কন্যাগ্রহণের উপযুক্ত এবং তাহারই সহিত পাঁচীর বিবাহ হয়। কিন্তু প্রথমাবস্থায় রামলালদাদাকে বিপন্ন দেখিয়া আরামবাগের শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু ও জয়রামবাটীর জনৈক ভক্ত কৌশলে পাঁচীকে উদ্ধার করিয়া জয়রামবাটীতে লইয়া আসেন। এই কার্যে ব্যাপৃত ভক্তদ্বয়ের মনে অবশ্য সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, মা ইহা অনুমোদন করিবেন কিনা। কিন্তু মায়ের আহ্বানে আগত রামলালদাদা যখন বিবাহে অসম্মতি জানাইলেন, তখন মা ভক্তদ্বয়কে আশ্বাস দিলেন। ঘটনার পরে কথাপ্রসঙ্গে প্রবোধবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, এই ব্যাপারে লাহাবাবুরা বিরক্ত হইবেন এবং ভবিষ্যতে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরনির্মাণে হয়তো বাধা দিবেন। অবশ্য প্রবোধবাবুর মতে তাহাতেও ক্ষতি ছিল না; কারণ ঠাকুর মঠ-মন্দিরের জন্য বসিয়া নাই, আর এমন মঠ-মন্দির পূর্বেই বহু জায়গায় হইয়া গিয়াছে। মা ইহা শুনিয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, "ও কি কথা গো? ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান, মহা-

পীঠস্থান, তীর্থভূমি। ও রকম বলতে আছে?" তারপর প্রবোধবাবুর আবার আশংকা হইল, শিবুদাদার স্ত্রী ক্ষেপিয়া গিয়া হয়তো ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবেন। শ্রীমা অমনি এক অশ্রুতপূর্ব তীব্রকণ্ঠে প্রতি শব্দ একটু টানিয়া বলিতে লাগিলেন, "তা হলে বে-শ হয়, তা হলে বে-শ হয়! ঠাকুর যেমনটি ভালবাসতেন, তেমনটি হয়। তিনি শ্মশান ভালবাসতেন, সব শ্মশান হয়ে যাবে।" বলিয়াই তিনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উহা অট্টহাস্যে পরিণত হইল। অপরেরা প্রথমে সে হাস্যে যোগ দিয়াছিলেন ; কিন্তু মায়ের হাস্য তীব্রতর ও গম্ভীরতর হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল। সুতরাং তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। পরক্ষণেই মা প্রকৃতিস্থ হইয়া কোমলকণ্ঠে অন্য কথা পাড়িয়া সব ভুলাইয়া দিলেন।

শ্রীমায়ের মানবলীলার মধ্যে চকিতে দেবীভাবের স্ফূর্তি অনেক ভক্তকেই চমৎকৃত করিয়াছে। উহা বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় এতই দ্রুত আসিত এবং শ্রীমা এতই শীঘ্র আত্মসংবরণ করিতেন যে, ভক্তগণ ধরিয়াও ধরিতে পারিতেন না। তবু তাঁহাদের চিত্তে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া যাইত যে, এই দেবীত্বই তাঁহার মৌলিক ভাব। গগন মহারাজ (স্বামী ঋতানন্দ) বহুবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, যখনই দেবীভাবের প্রাধান্য ঘটিত তখনই তাঁহার গলার স্বর ও ব্যবহার একটা অতিপ্রাকৃতিক আবহাওয়া সৃজন করিয়া ভক্তের মন ক্ষণিকের জন্য অন্য রাজ্যে লইয়া যাইত। তিনি একদিন জয়রমাবাটীতে মায়ের ঘরের বারান্ডায় বসিয়া সকালে আন্দাজ নয়টার সময় মুড়ি খাইতেছিলেন, আর মা ঝাড়ু লইয়া বারান্ডা ঝাঁট দিতেছিলেন। এমন সময় বাহিরের দরজা হইতে ভিখারীর ডাক শোনা গেল, "মা, ভিক্ষে পাই গো!" শ্রীমা আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, "আমি আর অনন্ত হাতেও কাজ শেষ করতে পারছি না।" এক অতি কোমল সুমিষ্ট স্বরে আকৃষ্ট হইয়া গগন মহারাজ শ্রীমায়ের দিকে তাকাইবামাত্র তিনি কাজ বন্ধ করিয়া এক হাত হাঁটুতে রাখিয়া ন্যুব্জভাবে দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিলেন, "দেখ, আমার দুটো হাত, আমি কিনা আবার বলছি, আমার অনন্ত হাত।"

শ্রীমায়ের মাতৃভাব ও গুরুভাবকে এক হিসাবে এই দেবীভাবেরই দ্বিবিধ বিকাশ বলা যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে অবশ্য মাতা ও গুরুকে দেবীজ্ঞানে পূজাদির বিধান আছে ; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের আশ্রিত ভক্তগণ তাঁহার মধ্যে এমন এক অলৌকিক করুণা, পবিত্রতা, আশ্রিত-বাৎসল্যাদির পরিচয় পাইতেন, যাহার ফলে তাঁহারা কেবল শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ দেবীজ্ঞানে শ্রীমাকে হৃদয়ের অকপট ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করিতেন। সে ভক্তিপ্রকাশের মধ্যে বা আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোন সুচিন্তিত বিধিবন্ধ ধারা ছিল না, ছিল শুধু স্বতঃস্ফূর্ত পূজার আগ্রহ অথবা হৃদয়ে উপলব্ধ সত্য সম্বন্ধে মাতাঠাকুরানীর অনুমোদন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

কেহ কেহ দীক্ষার সময় বা স্বপ্নে শ্রীমাকে দেবীরূপে দেখিতে পাইতেন এবং সে অনুভূতি জীবনের সম্বল হইয়া নানা ভাবে তাঁহাদের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিত। সুমতী নাম্নী জনৈকা ভক্তমহিলা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীমাকে লালপেড়ে শাড়ি দিয়া চণ্ডীরূপে পূজা করিতেছেন। তাই চওড়া লাল পাড়যুক্ত শাড়ি লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন, কিন্তু লজ্জায় নিজে না বলিতে পারিয়া অপরের দ্বারা স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। মা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কি বল, মা? তা দাও, শাড়িখানি তো পরতে হবে।" তিনি উহা পরিলেন। ঐ দিনই (২রা কার্তিক, ১৩২৫) রাত্রে লক্ষ্মীপূজা। বিকালে একজন স্ত্রীলোক লক্ষ্মীপূজার তাবৎ উপকরণ লইয়া আসিয়া মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিলেন। পরে চারিটি পয়সা পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। মা উপস্থিত অপর সকলকে বলিলেন, "আহা! ওর বড় দুঃখ, মা, বড় গরীব।" স্ত্রীলোকটির একমাত্র পুত্র বি. এ. পাসের পর পাগল ও নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এবং স্বামীও পুত্রশোকে উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন। মা স্ত্রীলোকটিকে আশীর্বাদ করিলেন।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, "উপরের দৃষ্টান্তদ্বয়ে শ্রীমা কার্যতঃ নিজের দেবীত্ব স্বীকার করিলেও আশ্রিত বা আর্তের মনে দুঃখ না দিবার আগ্রহ সে স্বীকৃতির সহিত এমন ভাবে মিশ্রিত যে, ইহাকে দেবীত্বাঙ্গীকারের প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করা চলে না।" কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এই গ্রন্থে শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ চরিত্রাঙ্কনে ব্রতী হইয়াছি। তাই ভক্তিমান পাঠককে সহসা কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া ধৈর্যধারণপূর্বক স্তরে স্তরে আমাদের সহিত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। আমরা এক লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে উপস্থিত; এখানে হঠকারিতা অপেক্ষা শ্রদ্ধা, নিজের বুদ্ধিমত্তাপ্রকাশের চেষ্টা অপেক্ষা আস্তিক্যবুদ্ধিই আমাদের অধিক সহায়ক হইবে। এই হিসাবেই আমরা বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে পশ্চাৎপদ না হইয়া অনুরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একবার মা কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী আসিতেছিলেন। শিবুদাদা তখন ছেলেমানুষ; তিনিও কাপড়ের বোঁচকা লইয়া সঙ্গে চলিয়াছেন। জয়রামবাটীর কাছে মাঠের মধ্যে আসিয়া শিবুদাদার হঠাৎ কি মনে হওয়ায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মা কিছুদূর চলিয়া পিছনে কাহারও শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া দেখেন, শিবুদাদা দাঁড়াইয়া আছেন। তাই সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও কিরে, শিবু, এগিয়ে আয়।" শিবুদাদা বলিলেন, "একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" শিবুদাদা বলিলেন, "তুমি কে বলতে পার?" মা উত্তর দিলেন, "আমি কে? আমি তোর খুড়ী।" শিবুদাদা বলিলেন, "তবে যাও, এই তো

বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।” তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিরক্তস্বরে মা বলিলেন, “দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।” শিবুদাদা উত্তর দিলেন, “বেশ তো, তুমি যাও না।” শিবু-দাদাকে নিশ্চল দেখিয়া মা শেষে বলিলেন, “লোকে বলে কালী।” শিবুদাদা বলিলেন, “কালী তো? ঠিক?” মা কহিলেন, “হ্যাঁ!” শিবুদাদা খুশি হইয়া বলিলেন, “তবে চল”—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটী আসিলেন।

১৩২৬ সালের ফাল্গুনে শ্রীমায়ের জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছে জানিয়া শিবুদাদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেলা প্রায় এগারটার সময় জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামান্তে জানাইলেন যে, তিনি সেদিন আর কামারপুকুরে যাইবেন না ; কারণ রঘুবীরের পূজা, ভোগ, শীতল, সন্ধ্যারতি ও শয়নাদি সেদিনকার মতো সারিয়া আসিয়াছেন। মা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সেদিনই তাঁহাকে কামারপুকুরে ফিরিয়া গিয়া বৈকালিক ক্রিয়াদি যথাবিধি করিতে বলিলেন এবং কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মচারী বরদাকে একটি পুঁটুলিতে কিছু ফল ও শাক-সবজী বাঁধিয়া নিতে বলিলেন। বেলা তিনটার সময় আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি যেন পুঁটুলি লইয়া আমোদর নদ পর্যন্ত শিবুদাদাকে আগাইয়া দিয়া আসেন। বরদা তাহাই করিলেন ; কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, শিবু-দাদা পুনরায় মায়ের বাড়িতে উপস্থিত। তিনি মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, “মা, আমার কি হবে বল, তোমার কাছে শুনিতে চাই।” মা বলিতেছেন, “শিবু, ওঠ, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করলি। তিনি তোকে কত ভালবেসেছেন, তোর আবার চিন্তা কি? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস!” শিবুদাদা তখন বলিতেছেন, “না, তুমি আমার ভার নাও, আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই কিনা, বল।” মা তাঁহার মাথায় ও চিবুকে হাত দিয়া যতই আদর করেন ও সান্ত্বনা দেন, শিবুদাদা ততই অশ্রুবিসর্জন করিয়া বলেন, “বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা।” শ্রীমা এতক্ষণ এই ব্যাপারে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এখন শিবুদাদার এই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা-দর্শনে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পার্শ্বস্থ বরদা মহারাজের স্পষ্টই মনে হইল, শ্রীমা তখন আর সামান্য মানবী নহেন। তিনি শিবুদাদার মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “হাঁ, তাই।” শিবুদাদা তখন উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিলেন, “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে” ইত্যাদি। শ্রীমা তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। শিবুদাদাও চক্ষু মুছিয়া ও গাঁটরি বগলে লইয়া সানন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মায়ের আদেশে বরদা আবার পুঁটুলিটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া সঙ্গে চলিলেন। গ্রামের বাহিরে আসিয়া

শিবুদাদা প্রফুল্লবদনে বরদাকে বলিলেন, "ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী। উনিই সাক্ষাৎ কপালমোচন ; ওঁর কৃপাতেই মুক্তি। বুঝলে?"

এই স্তরে শ্রীমা শুধু কার্যে নহে, নিজ মুখেই দেবীত্ব অঙ্গীকার করিতেছেন। এই দৃষ্টান্তদ্বয়ের দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও যদি আপত্তি হয় যে, ইহাও স্বতঃস্ফূর্ত নহে, ইহার পিছনেও শিবুদাদার জেদ রহিয়াছে, তবে আমরা বলিতে পারি, এখানে সাক্ষিরূপে যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তিনি কিন্তু উহা শিবুদাদাকে শান্ত করিবার জন্য নিছক স্তোকবাক্যরূপে না বুঝিয়া সত্য বলিয়াই জানিয়াছিলেন; অধিকন্তু দ্বিতীয় স্থলে শ্রীমা অসহায় ছিলেন না। তিনি অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারিতেন। আর তিনি যে ঐরূপ অস্বীকার করিতেন না, তাহাও নহে। জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন যেখানে শূন্যগর্ভ ঔৎসুক্যজনিত অথবা চাটুবাদাদি-প্রসূত মনে হইত, সেখানে অজ্ঞের অজ্ঞতাবৃদ্ধি অবাঞ্ছিত জানিয়া তিনি দ্বিধাশূন্যভাবে অস্বীকার করিতেন। ঐ সব ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধাবান ও বুদ্ধিমান বিরল, কেহ কেহ বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীমায়ের দেহাবলম্বনে দৈবশক্তি অবতীর্ণ হইলেও তিনি অপূর্ব বিনয় ও সংযমসহকারে উহা সাধারণ্যে ব্যক্ত না করিয়া সরলা পল্লীবালার ন্যায় আচরণ করিতেছেন।

নম্রতার প্রতিমূর্তি শ্রীমা আপনাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদাশ্রিতা বলিয়াই জানিতেন এবং সকলের মনে ঐ ভাবই দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন। দীক্ষা প্রদানের পর তিনি ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিতেন, "ঐ উনিই গুরু।" খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলিতে বলিতে দৈবাৎ যদিও তাঁহার দেবীভাব কখনও কখনও বাহির হইয়া পড়িত, তথাপি লোকব্যবহার-কালে সজ্ঞানে উহা প্রকাশ পাইত না। জনৈক প্রাচীন স্ত্রীভক্ত মায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন তাঁহাকে "তুমি জগদম্বা, তুমিই সব" ইত্যাদি বলিয়া যেমন প্রশংসা করিতেছেন, অমনি মা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, যাও, 'জগদম্বা'! তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি! 'তুমি জগদম্বা! তুমি হেন!' বেরোও এখান থেকে।" ফলতঃ তিনি কোন ভক্তের আন্তরিক-বিশ্বাসে আঘাত না দিলেও এই প্রকার প্রশংসাবাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না।

একদিন সকালে জয়রামবাটীতে মায়ের ঘরের বারান্ডায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' হইতে বিবাহের অংশটি পাঠ হইতেছিল। মায়ের সহিত বসিয়া আরও দুই-একজন শুনিতেছিলেন। ঐ অংশে মাকে জগন্মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া খুব প্রশংসা ছিল; মা উহার খানিকটা শুনিয়াই উঠিয়া গেলেন।

দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্বে কোঠারে অবস্থানকালে এক দ্বিপ্রহরে মা আপনমনে বসিয়া জগতের দুঃখ ও সে দুঃখ-নিবারণার্থে ঠাকুরের আগমনের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক সেবক সেখানে আসিলে মা তাঁহাকে বলিলেন, "এই ঠাকুর বার বার আসেন—একই চাঁদ রোজ রোজ। নিস্তার নেই—

ধরা পড়ে আছেন। বলে—'বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সহিবে ক দিন'—একি খালি জীবের, এ যে ঠাকুরের (ও)। তাই বসে ভাবছিলুম। দেখলুম শেষ নেই। কি কষ্ট ঠাকুরের—কে বুঝবে?" ভক্ত বলিলেন, "খালি ঠাকুরের কেন মা, আপনারও তো? ঠাকুর আর আপনি তো এক।" মা বলিলেন, "ছিঃ, ওকথা বলতে আছে, বোকা ছেলে! আমি যে তাঁর দাসী। পড়নি?—'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরনী, আমি ঘর; যেমনি করাও তেমনি করি।' সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই।"

কোন কোন পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। শ্রীমা নিজেকে অবতার মনে করিতেন না, বা ঐরূপে ঘোষণাও করেন না। ঠাকুরই অবতার। তবে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সাধনজগতে শত শত মানবের পথপ্রদর্শিকা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকৃষ্ট কেন্দ্ররূপে তাঁহার স্থান ধর্মেতিহাসে অতি উচ্চ।" আমরা তাদৃশ পাঠককে আর একটু ধৈর্য ধরিতে বলি। কারণ ঘটনাপরম্পরা আমাদের বিশ্বাসকে জোর করিয়াই আরও দূরে লইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরী একদিন যখন প্রশ্ন করিলেন, "মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি বলে করব?" তখন মা বলিলেন, "রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু বলে পার, যা বলে তোমার সুবিধা হয়, তাই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।" অন্য ক্ষেত্রে এক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।"

ঘটনাপরম্পরার মধ্যে অথবা কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ অস্পষ্ট স্বীকৃতির বহু দৃষ্টান্ত আছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোয়ালপাড়ার নবাসনের বউ-এর বৃদ্ধা মাতার চিকিৎসার জন্য শ্রীমায়ের আদেশে আরামবাগ হইতে ডাক্তার প্রভাকরবাবুকে লইয়া ব্রহ্মচারী বরদা সেখানে আসিতেছেন। আরামবাগের মণীন্দ্রবাবুও ইঁহাদের সঙ্গে গরুর গাড়িতে চলিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সকলেরই পিপাসা পাইল; তাই মণীন্দ্রবাবু ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করিলেন, গ্রাম হইতে কিছু শাঁখ-আলু ও শসা সংগ্রহ করিতে। অনেক ঘুরিয়াও তিনি ঐ সব না পাইয়া পথের ধারের এক গাছ হইতে প্রচুর কাঁচা আম পাড়িয়া আনিলেন। সেগুলি এত টক যে, পল্লীগ্রামের লোক ভিন্ন অপরে খাইতে পারে না। মণীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাঁখ-আলু কই?" ব্রহ্মচারী রহস্য করিয়া বলিলেন, "গ্রামে অনেক ঘুরেও যখন শসা বা শাঁখ-আলু পাওয়া গেল না, তখন হঠাৎ ত্রেতাযুগের কথা মনে পড়ে গেল, আর ঢিল মেরে আম পেড়ে আনলুম। এখন সকলে খুশিমত পিপাসা মিটাতে পারেন।" বলা বাহুল্য, বিনা লবণে ঐ ফল তাঁহাদের ভোগে আসিল না। তাঁহারা যথাসময়ে কোয়াল-

পাড়ায় পৌঁছিয়া সব ঘটনাটি শ্রীমায়ের নিকট বিবৃত করিলে মা স্মিতমুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।' ওরা না হলে আমার এসব কাজ চলে কই? এদের ভরসাতেই রাধুর এই অবস্থায় জঙ্গলে বিপদের মধ্যে পড়ে আছি।"

একদিন (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষে) জয়রামবাটীতে জনৈক ত্যাগী ভক্ত শ্রীমায়ের নিকট খেদ করিতেছিলেন যে, এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে আপনার মা বলিয়া জানিতে পারেন নাই। মা আশ্বাস দিলেন, "বাবা, আপনার না হলে এত আসবে কেন? 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।' আপন মা, সময়ে চিনবে।"

পারিবারিক আচরণে বা সাধারণ লোকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমায়ের এই আত্মপরিচয় হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িত। শেষবারে জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি নয়টার সময় পাচিকা ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিল, "কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।" মা বলিলেন, "এত রাত্রে স্নান করো না; হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়।" সে উত্তর দিল, "তাতে কি হয়?" মা বলিলেন, "তবে গঙ্গাজল নাও।" ইহাতেও পাচিকার মন উঠিল না দেখিয়া পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীমা বলিলেন, "তবে আমাকে স্পর্শ কর।" এতক্ষণে পাচিকার চোখ খুলিল এবং সে অন্ততঃ তখনকার মতো শুচিবায়ু হইতে মুক্তি পাইল।

উদ্বোধনে ঠাকুর-পূজার সময় পাগলী মামী বিড় বিড় করিয়া কটু কথা কহিতেছেন। মা পূজা শেষ করিয়া পাগলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কত মুনি ঋষি তপস্যা করেও আমায় পায় না; তোরা আমায় পেয়েও হারালি!" কাশীতে পাগলী সারারাত্রি শ্রীমাকে গালি দিয়াছেন, "ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।" প্রভাতে সে কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ছোট-বউ জানে না যে, আমি মৃত্যুঞ্জয়।"

এই পরিচয় দেওয়া ও না দেওয়া লইয়াই তাঁহার জীবন। গ্রামে দূর-দূরান্তরের লোক আসিয়া শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া যায়, অথচ গ্রামবাসীরা কিছুই বুঝিতে পারে না শ্রীমা তাহাদের নিকট পিসী, মাসী, দিদি হইয়াই আছেন। একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূর দেশ থেকে আসছে; অথচ আমরা তোমাকে বুঝতে পারছি না কেন?" মা উত্তর দিলেন, "তা নাই বা বুঝলে, তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী।" চৌকিদার অম্বিকা বাগদী বলিল, "লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না।" শ্রীমা বলিলেন, "তোমার বুঝে দরকার কি? তুমি আমার অম্বিকা দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।"

গ্রামবাসীদের সুখদুঃখের সংবাদ তিনি রাখিতেন এবং সর্ববিষয়ে

আত্মীয়তা বোধ করিতেন। এক বৎসর বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য হইতে আসিয়া জনৈক সাধু শ্রীমাকে লোকের দুর্গতির কথা শুনাইতেছিলেন। শ্রীমা সব শুনিয়া চারিদিকে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন, "দেখ, বাবা, মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এইটুকুর মধ্যে (জয়রামবাটী গ্রামে) ওসব কিছু নেই।" সাধু বলিলেন, "মা সিংহবাহিনী তো বুঝি না ; আপনি আছেন বলেই এখানে কিছু নেই।" শ্রীমা ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

জয়রামবাটীতে তিনি একদিন আত্মীয়দের দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিসনে। এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।" আর একবার কোয়ালপাড়ায় রাধুর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেবশরীর জেনো। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?...দেখ, মা, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।"

দেবী হইয়াও মানবীরূপে অবতীর্ণা শ্রীমাকে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে কেন—যদি তিনি স্বয়ং না বুঝাইয়া দেন? ভগবতী নরলোকে আসেন মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য; কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্প বলিয়া তাহারই কল্যাণার্থে দেবতাকে তাঁহার পূর্ণ ভগবত্তা আবৃত রাখিতে হয়। এই বিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয়ের সংঘর্ষ-নিবন্ধন সাধারণ মানবের নিকট তিনি অজ্ঞাত থাকিয়া যান; সৌভাগ্যবান দুই-চারিজনের নিকটই কেবল তিনি ধরা দেন। নলিনীদিদি একদিন (৩রা আশ্বিন, ১৩২৫) দুইজন স্ত্রীভক্তের সম্মুখে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, পিসীমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যই কি তুমি অন্তর্যামী?" মা একটু হাসিলেন মাত্র। কিন্তু নলিনীদিদি আবার শক্ত করিয়া ধরিলে মা বলিলেন, "ওরা বলে ভক্তিতে। আমি কী মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—আমার আমিত্ব যেন না আসে।" শ্রীমায়ের এই বিনয় ও আত্মগোপনের চেষ্টা দেখিয়া একটি মহিলা হাসিয়া ফেলিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "অনেকেই তো মাকে জগদম্বা বলে, কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন। অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্থ করা কথার মতো শোনায়।" মাও হাসিয়া বলিলেন, "তা ঠিক, মা।" মহিলাটি আরও বলিলেন যে, শ্রীমা দয়া করিয়া নিজ স্বরূপ বুঝাইয়া না দিলে অপরের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তারপর বলিলেন, "তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এইখানেই যে, মায়ের ভিতর আদৌ অহঙ্কার নেই। জীবমাত্রেই অহং-এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে-ফুলে উঠতেন। অত

মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!" মা প্রসন্নমুখে একবার ভক্তের দিকে চাহিলেন মাত্র।

দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের কথা। যোগীন-মা তখন শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ-রূপে সুপরিচিতা। একদিন শ্রীমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন, তুমি শুকনো বেলপাতায় পুজো কর কি?" যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বর হইতে পূজার জন্য বিল্বপত্র লইয়া যাইতেন এবং উহা শুকাইয়া গেলেও তাহা দ্বারাই পূজা করিতেন। সুতরাং তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মা, কিন্তু তুমি তা কি করে জানলে?" স্মিতমুখে মা বলিলেন, "আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম, তুমি শুকনো বেলপাতা দিয়ে আ—।" কথাটা শেষ না করিয়া তাড়াতাড়ি মা বলিলেন, "পুজো করছিলে।" বুদ্ধিমতী যোগীন-মা স্তম্ভিত হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া যোগীন-মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। যোগীন-মার হঠাৎ মনে হইল, যেন তাঁহার কন্যা গনু তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছে; তিনিও অমনি আবিষ্টার ন্যায় শ্রীমাকে বুকে ধরিয়া চুমা খাইলেন। পরে হুঁশ হইলে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধুলা মাথায় লইলেন; মাও উঠিয়া নহবতের বারান্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

উপযুক্ত আধার পাইলে শ্রীমা নিজ দেবীত্ব স্পষ্টই স্বীকার করিতেন। স্বামী তন্ময়ানন্দ একবার জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীমায়ের পাদপূজা করিলেন। তাঁহার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিলে মা বাধা দিয়া বলিলেন যে, মাথার উপর পা রাখিতে নাই, কারণ ঠাকুর সেখানে থাকেন—তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মে বসিয়া আছেন। অমনি তন্ময়ানন্দ প্রশ্ন করিলেন, "মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?" বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মা উত্তর দিলেন, "আমি আর কে, আমিও ভগবতী।"

এই সঙ্গে মনে পড়ে শ্রীমায়ের কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুর-ঘরের বেদীর উপর ঠাকুরের ছবির পার্শ্বে নিজের ছবি স্বহস্তে বসাইয়া পূজা করার কথা। আমরা ইহা অন্যত্র বলিয়াছি।

ব্রহ্মচারী বিমল (পরে স্বামী দয়ানন্দ) উদ্বোধনে শ্রীমায়ের বাড়ীতে ঠাকুরের নিত্য পূজা সেবা করিতেন। একদিন সম্ভবতঃ পূজার পরেই তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। মা-কালী ও ঠাকুরের ছবি এবং নিজেকে দেখাইয়া শ্রীমা বলিলেন—"এঁরা এক।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের ছুটিতে জনৈক দীক্ষার্থী কোঠারে মন্ত্র-গ্রহণান্তে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া একখানি কাপড় ও টাকা দিলেন। মা বলিলেন, "তোমার টানাটানি অভাব, আবার টাকা কেন?" ভক্ত জানাইলেন যে, এ টাকা মায়েরই; পুত্রের অর্জিত অর্থের কিছুও যদি মায়ের সেবায় লাগে, তবে পুত্র ধন্য হয়। মা শুনিয়া বলিলেন, "আহা! কি

টান গো, কি টান!" ভক্ত অপরের মুখে শুনিয়াছেন, "মা সাক্ষাৎ কালী, আদ্যা-শক্তি, ভগবতী।" সে কথা তিনি মায়ের নিজমুখে শুনিতে চাহেন; কারণ গীতায় এরূপ স্বীকৃতির উল্লেখ আছে। তাই তিনি মাকে বলিলেন, "তোমার কথা যা শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তাহলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই, ওকথা সত্য কি না।" শ্রীমা কহিলেন, "হ্যাঁ, সত্য।"

১৯১৩ অব্দে জয়রামবাটীতে ভূদেবের বিবাহের পর রাধু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। মা পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছেন, এমন সময় পাগলী মামী আসিয়া সেখানে বসিলেন। রাধুর ইচ্ছা নয় যে, 'নেড়ী-মা' সেখানে থাকেন; তাই তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিতেই মায়ের হাত পাগলীর পায়ে ঠেকিয়া গেল। পাগলী অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে? আমার কি হবে গো?" মা তাঁহার রকম দেখিয়া হাসিয়া আকুল। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী বলিলেন, "পাগলী মাকে গালাগাল, অপমান করলেও পায়ে হাত লাগার ভয় আছে।" মা বলিলেন, "বাবা, রাবণ কি জানত না যে, রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ করতে এসেছিল। ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে!"

ভক্তের প্রতি কৃপাবশে শ্রীমা কখনও কখনও অজ্ঞাতসারেই যেন নিজের স্বরূপ বলিয়া ফেলিতেন। বৈকুণ্ঠ নামক জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে কামারপুকুরে দর্শন করিতে যান। রামলালদাদা এবং লক্ষ্মীদিদিও তখন সেখানে ছিলেন। ভক্ত যখন বিদায় লইতেছেন, তখন শ্রীমা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস।" পরমুহূর্তেই যেন আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।" লক্ষ্মীদিদি সব শুনিয়াছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, মা, একি কথা? এ তো বড় তোমার অন্যায়। ছেলেদের এমন করে ভোলালে তারা কি করবে?" মা বলিলেন, "কই, আমি কি করলুম?" দিদি উত্তর দিলেন, "মা, তুমি এই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠকে বললে, 'আমায় ডাকিস', আবার বলছ, 'ঠাকুরকে ডেকো'।" মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাকলেই তো সব হল।" লক্ষ্মীদিদি ইহাতে নিবৃত্ত না হইয়া বৈকুণ্ঠকে বুঝাইয়া দিলেন, শ্রীমায়ের মুখে আজ যে নূতন বাণী বাহির হইল, উহা অতি মূল্যবান। ইহা মায়ের নিজের মুখের স্বীকৃতি ও আদেশ; সুতরাং বৈকুণ্ঠ যেন মাকেই ডাকেন। মা সব শুনিয়া গেলেন; আর প্রতিবাদ করিলেন না।

এক ভক্ত মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আপনি যে ভগবতী, তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?" মা কহিলেন, "সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে,

সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।" শ্রীমায়ের নিকট এইরূপ জহুরী আসিত কয়জন? সুতরাং তিনি আত্মপরিচয় দিবেন কাহার নিকট, আর দিলেই বা বিশ্বাস করিবে কে? তাই তাঁহার এই ভাবের উক্তি অস্পষ্ট ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। অথচ স্থলবিশেষে তাঁহার উক্তিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। শ্রীযুক্ত কেদার (স্বামী কেশবানন্দ) ঐ দিনই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "মা, আপনা-দের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।" মা বলিলেন, "মানবে না কেন? তারা তো আমারই অংশ।" একদিন জগদম্বা আশ্রমে বসিয়া শ্রীযুক্ত কেদার কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় অদূরে বটতলায় ঢাক বাজাইয়া ষষ্ঠীপূজা দিতে লোক আসিল। কথাবার্তার অসুবিধা হওয়ায় কেদারনাথ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আঃ, থাম না রে, বাপু।" অমনি মা বাধা দিয়া বলিলেন, "ওকি কেদার, সবই তো আমি! তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন?"

ইহার পর আমরা শ্রীমায়ের জীবনের এমন কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে চাই, যাহা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ভক্তের বিবেচনায় শুধু সত্য এবং শ্রীমায়ের দৈবী শক্তির পরিচায়ক নহে, উহা অপরের শ্রদ্ধাভক্তিরও উৎপাদক এবং ঐরূপে আধ্যাত্মিক জীবনেরও সহায়ক। প্রয়োজনমাত্র-পরিচালিত আধুনিক যুক্তিবাদীর নিকট এইগুলি হয়তো রুচিসম্মত নহে; নীতিমাত্র-অবলম্বনে সমাজপরি-চালনে কৃতসঙ্কল্প ধুরন্ধরদের দৃষ্টিতে এইগুলি উপভোগ্য হইলেও হয়তো বর্জনীয়; তথাপি নিরপেক্ষ জীবনীলেখক হিসাবে আমরা ইহা লিখিয়া যাইতে বাধ্য; পাঠক নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এইগুলির মূল্য বা মর্ম নির্ধারণ করিবেন। লোকোত্তর চরিত্রে এই জাতীয় ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের সম্বন্ধে লোকের মনে এবংবিধ ভাবের উদয় হয়, তাঁহাদের নিশ্চয়ই কোন বৈশিষ্ট্য আছে, নতুবা সকলের সম্বন্ধে ইহা শোনা যায় না কেন? এক্ষেত্রে সত্যনির্ণয়ের ক্ষমতা আমাদের নাই—ইহা আমরা অম্লানবদনে বলিতেছি। ফলতঃ নির্বিচারে কিছু উড়াইয়া দেওয়া জীবনী লেখকের পক্ষে অনুচিত—বর্তমান স্থলে ইহাই আমাদের কৈফিয়ত।

অধ্যাপক গোকুলদাস দে তখন বি. এ. পড়িতে পড়িতে অসুস্থ হইয়া কিছুদিন পড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আছেন। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় এই সুযোগে তাঁহাকে সুললিতস্বরে চণ্ডীপাঠ শিখাইতেন; গোকুলবাবু ইহা বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক সকালে বাগবাজারে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে আসিয়া তিনি দেখিলেন, শ্রীমা ঘাটের সর্বনিম্ন সোপানে জপে বসিয়া আছেন। গোকুলবাবু কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন; সেখানে থাকিয়াই তিনি গুনগুন করিয়া মাস্টার মহাশয়ের সুরে চণ্ডীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—এত নিম্নস্বরে যে, অপর কাহারও শুনিবার কথা নহে। তিনি যখন পাঠ করিতেছেন, "সৌম্যা সৌম্যতরা শেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী", (১।৮১) তখন শ্রীমা পিছন ফিরিয়া

স্তবকারীকে দেখিলেন এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া আবার জপে মগ্ন হইলেন।

আর একদিনের কথা স্মরণ করিয়া অধ্যাপক লিখিতেছেন, "যে কয় বৎসর তাঁহার (মায়ের) দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে আমার বাটী কোথা, আমি কি কর্ম করি, আমরা কয় সহোদর বা পিতার নাম কি ইত্যাদি প্রশ্ন কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। আশ্চর্যের বিষয়, একবার প্রণাম করিবার সময় আমার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম করিয়া তাঁহারা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে একজনের নাম 'ললিত' না বলিয়া 'নলিন' বলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার উচ্চারণ-দোষ মনে করিয়া আমি হাস্য করিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া আমার মাকে ঐ কথা বলায় তিনি বলিলেন, "জগজ্জননী ঠিকই বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় 'নলিন'ই নাম ছিল, পরে 'ললিত' হইয়াছে" ('উদ্বোধন', পৌষ, ১৩৪৪)।

রা—এক সন্ধ্যাবেলায় মায়ের পায়ে বাতের জন্য তেল মালিশ করিতে করিতে ভাবিতেছেন, যাহাতে মায়ের ব্যাধি তাঁহার দেহে আসে এবং মা নিরাময় হন। মা একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি কি চিন্তা করছ? তোমরা বেঁচে থাক। আমি বুড়ো হয়েছি, আর ক-দিন বাঁচব? ও রকম চিন্তা করতে আছে? ঠাকুর তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন"—এই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের একসময়ে শ্রীললিতমোহন সাহার মন বিশেষ অস্থির হওয়ায় তিনি শ্রীমা ও ঠাকুরের উপর অভিমানবশতঃ সঙ্কল্প করেন, আর মাকে দেখিতে যাইবেন না। কিন্তু বন্ধুগণের নির্বন্ধে তাঁহাকে উদ্বোধনে যাইতেই হইল। সেদিন বিস্তর ভক্ত মাকে প্রণাম করিতেছিলেন, মা কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। সর্বশেষে বিষণ্ণচিত্ত ভক্তকে দেখিয়া শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো আছ তো?" অভিমানভরে ভক্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, খুব ভাল আছি।" প্রত্যুত্তরে মা কৃপাদৃষ্টি করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "সেকি, বাবা! মনের স্বভাবই এই। তার জন্য কি এমনটি করতে আছে?"

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ইচ্ছা হইল, ফুলচন্দন দিয়া শ্রীমায়ের পাদপূজা করিবেন; কিন্তু এই বিদেশে ঐ সকল সংগ্রহ করিবেন কিরূপে? এমন সময় শ্রীমা মামাদের একটি ছোট মেয়ের হাতে ফুলচন্দন দিয়া ভক্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "ছেলে যদি অঞ্জলি দিতে চায়, তাহলে এখন এসে দিতে পারে।"

স্বামী তন্ময়ানন্দ কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলেন যে, মায়ের একটু সেবা করিতে পারেন তো বেশ হয়। গিয়া দেখেন, মা তেলের বাটি কাছে রাখিয়া পা দুইখানি ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত তেল লইয়া পায়ে মাখাইতে লাগিলেন এবং মা কোন্ পায়ে কিরূপ মাখাইতে

হইবে বলিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে সাধ মিটাইয়া প্রায় পঁচিশ মিনিট তেল মাখানো হইলে মা বলিলেন, "এবার হয়েছে তো? এখন নাইতে যাই, ঠাকুরের পূজো করতে হবে।"

এক বিকালে শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী বসু উদ্বোধনে আসিয়া দেখিলেন, মায়ের সেবিকা নবাসনের বউ ছাদ হইতে লেপ তোশক ইত্যাদি আনিয়া ওয়াড় পরাইয়া বিছানা করিতেছেন। দেখিয়া তিনি ভাবিতেছেন, "যদি এ কাজটি করতে পেতুম!" নবাসনের বউ চলিয়া যাইতেই মা ঘরে আসিয়া বিছানার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখেছ, মা, সব ভুল করে রেখেছে; ওয়াড়গুলো ওলট-পালট করে ফেলেছে। তুমি, মা, ওয়াড়গুলো বদলে ঠিক করে পরিয়ে বিছানা করে দাও তো!" প্রফুল্লমুখীর বাসনা পূর্ণ হইল।

স্বামী মহাদেবানন্দ মায়ের আদেশে শ্রাবণ মাসের একদিন হলদিপুকুর গ্রামে কেরোসিন, আটা ইত্যাদি প্রায় এক মণ মাল কিনিয়া আনিতে গিয়াছিলেন। মা কুলির কথা বলেন নাই; তাই নিজের মাথায় মাল বহিয়া চলিয়াছেন। রাস্তায় জল ও কাদা; আর বোঝাও যেন ক্রমে ভারী হইয়া বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, মায়ের একাজ তিনি করিবেনই। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া একটু দুর্গম স্থান অতিক্রমের পর তাঁহার মনে হইল যেন বোঝা হঠাৎ হালকা হইয়া গিয়াছে, তিনি অক্লেশে চলিতে লাগিলেন। কেন এমন হইল, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখেন, মা অস্থিরভাবে নিজের ঘরের বারান্ডায় দ্রুত পদচারণ করিতেছেন—মুখখানি লাল, চক্ষু দুটি যেন কপালে উঠিয়াছে, আর আপনমনে বলিতেছেন, "একটা কুলি নিতে কেন বললুম না?" মহাদেবানন্দ বোঝা নামাইলে মা বলিলেন, "একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলিনি, তাতে কী হয়েছে? এ রকম করে কি চলতে হয়!"

কয়েকটি ঘটনায় শ্রীমায়ের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠ নামক জনৈক ভক্ত জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে দেখিয়া ফিরিতেছেন। মা বলিয়া দিলেন, "তুমি এখান থেকে একেবারে ঘরে যেও, এখন মঠে বা এখানে-ওখানে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ঘরে গিয়ে বাপমায়ের সেবা কর; এখন বাবার সেবা করা উচিত।" বৈকুণ্ঠ আসিবার সময় পিতাকে সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু বাড়ি আসিয়া দেখেন, তিনি রোগশয্যায় শায়িত। ছয়-সাত দিন পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

স্বামী মহাদেবানন্দ একদিন কোয়ালপাড়া হইতে তরকারির ঝুড়ি লইয়া জয়রামবাটী গিয়া সেখানে রাখিয়া ফিরিবেন, এমন সময় শ্রীমা বারণ করিলেন, "যেও না, এখুনি বৃষ্টি হবে।" মহাদেবানন্দ নিষেধ শুনিলেন না, জলখাবার খাইয়াই যাত্রা করিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে আকাশে মেঘ দেখাইবেন বলিয়া সঙ্গে

সঙ্গে বাহিরে আসিলেন; কিন্তু কোথাও কিছু নাই। মহাদেবানন্দ প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন। এদিকে আমোদর পার হইয়া দেশড়ার মাঠে একটু অগ্রসর হইতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তিনি দৌড়িতে দৌড়িতে দেশড়ার এক ডোমের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন—কাপড়-চোপড় একেবারে ভিজিয়া গেল।

১৯১২ অব্দের দুর্গাপূজার পরেই শ্রীমা কাশীতে যাইবেন বলিয়া জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন; উদ্বোধনের দিন দ্বিপ্রহরে নাট্যকার গিরিশবাবুর ভগিনী দেখা করিতে আসিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি বলিলেন, **"তবে** আসি, মা।" শ্রীমা অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিলেন "হ্যাঁ যাও।" গিরিশবাবুর ভগিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেই মায়ের মনে হইল "বললুম কি? 'যাও' বললুম? এমন তো আমি কাউকে বলি নে!" সে [illegible]। সেই রাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন। মা শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কেনই বা অমন মুখ দিয়ে বেরুল!"

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্তকে জয়রামবাটীতে দীক্ষাদানের পর শ্রীমা করজপ শিখাইয়া দিলেও তিনি পদ্ধতি ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না দেখিয়া শ্রীমা বলিলেন, "তুমি সুরেনের কাছে শিখে নেবে।" সুরেনবাবু থাকেন রাঁচিতে, আর হেমবাবু যাইবেন চট্টগ্রামে কর্মস্থলে। সুতরাং তিনি মাকে বলিলেন, "এ কেমন করে হবে?" মা শুধু বলিলেন, "তা হয়ে যাবে।" পরে গোয়ালন্দের স্টীমারে হঠাৎ পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল—সুরেনবাবু রাঁচি হইতে ঢাকা যাইতেছেন!

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখন একদিন তাঁহার জননীকে উদ্বোধনে আসিতে দেখিয়া শ্রীমা অপরকে বলিলেন, "ঐ আসছে, কি রোজ রোজ এসে আমাকে বিরক্ত করে, 'মা, আশীর্বাদ কর, পূর্ণকে ভাল করে দাও'। জানি তো পূর্ণ বাঁচবে না, তবু ওদের ভোলাবার জন্য বলতে হয়, ভাল হবে।" পূর্ণবাবুর জননী আজও প্রণামান্তে ঐরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীমা ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিয়া ও যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওর বিয়ে দিলে, বেশী দিন বাঁচবে না।' সে তখন শুনলে না; তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিলে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে বলে।" কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীমা, যোগীন-মা প্রভৃতি শুইয়া আছেন; মা একটু তন্দ্রাভিভূতা হইয়াছেন, হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পূর্ণ মারা গেল নাকি, যোগেন?" যোগীন-মা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কে বললে, মা?" মা বলিলেন, "আমি ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলুম কে বললে, পূর্ণ মারা গেছে।" যোগীন-মা তখন জানাইলেন যে, ঐদিন বিকালে ঐ সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে (কার্তিক

সংক্রান্তি, ১৩২০), শ্রীমাকে জানানো হয় নাই। সে রাত্রে শ্রীমা কেবলই পূর্ণ-বাবুর কথা কহিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

ভক্তের জন্য মায়ের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা অব্যর্থ ছিল। একবার পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের কর্মস্থলে বিপাক, এমন কি, জেল হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে তিনি সকাতরে শ্রীমায়ের নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। সকল কথা অবগত হইয়া মা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, কোন চিন্তা করো না।" ভৌমিক মহাশয়ের সে বিপদ অচিন্তনীয়রূপে কাটিয়া গেল।

বরিশালের সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় একসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। রোগ যক্ষ্মা বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং সুরেন্দ্রবাবু জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে একবার শ্রীমাকে দেখিবার সাধ হওয়ায় তাঁহাকে বরিশালে আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। শ্রীমা তাঁহাকে নিজের একখানি ফটো ও এক বৎসরের বাঁধানো 'উদ্বোধন' পাঠাইয়া দিয়া পত্রোত্তরে জানান যে, তাঁহার পক্ষে অতদূর যাওয়া সম্ভব নহে। তবে ভয় নাই, অসুখ সারিয়া যাইবে; সুরেন্দ্রবাবু যেন ফটোখানা দেখেন ও 'উদ্বোধন' পাঠ করেন। আসন্নমৃত্যু রোগী ফটোর মধ্যেই শ্রীমাকে পাইলেন; তিনি উহা শিয়রে রাখিয়া দিলেন। রোগ ক্রমে সারিয়া গেল।

এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে জয়রামবাটী প্রভৃতি গ্রামের শস্য জ্বলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে নিরুপায় চাষীরা শ্রীমাকে বলিল, "এবার, মা, আমাদের ছেলে-পিলের বাঁচবার আশা নেই—সকলকে না খেয়ে মরতে হবে।" তাহাদের কাতরতাদর্শনে মায়ের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি চাষীদের সহিত ক্ষেত দেখিতে গিয়া খুবই বিচলিত হইলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া আকুলস্বরে বলিলেন, "হায়, ঠাকুর, একি করলে! শেষটায় কি সব না খেয়ে মরবে?" সেই রাত্রেই প্রচুর বারিপাত হইল এবং সেবারে এমন ফসল হইল যে, বহু বৎসর তেমন হয় নাই।

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কোয়ালপাড়ার জনৈক ব্রহ্মচারী রাত্রি প্রায় দশটার সময় কলিকাতায় উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দজীর আহ্বানে নীচে নামিয়া দেখিলেন, ঐ গ্রামের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কোলে মহাশয় উপস্থিত—শ্রীমাকে দর্শন করিবেন। সারদানন্দজীর নির্দেশানুসারে শ্রীমাকে সংবাদ দিয়া নফরবাবুকে দ্বিতলের মাঝখানের ঘরে লইয়া গেলে তিনি মায়ের চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, আমি মহা বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আমার কয়েকটি নাতনী ও একটি নাতি মারা গেছে। উপস্থিত আরও কয়েকটি নাতনীর ও একমাত্র নাতিটির খুব সঙ্কট অবস্থা। মা, আপনাকে আশীর্বাদ করতে হবে, আমার বংশ যাতে রক্ষা পায়।" মা বলিলেন, "সে কি! আপনি এরূপ আশঙ্কা

করছেন কেন? আপনি লক্ষ্মীমন্ত, ভাগ্যবান লোক।" নফরবাবু বলিলেন, "না, মা, আমি কিছু শুনতে চাই না; আমার এই শেষ বয়সে একমাত্র নাতির শোক যেন না পাই।" এইরূপ বলিতেছেন আর চরণযুগল ধরিয়া কাঁদিতেছেন। মা কহিলেন, "আপনি উতলা হবেন না, উঠুন। আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে জানাচ্ছি।" নফরবাবু তথাপি নাছোড়বান্দা। অবশেষে শ্রীমা অতি গম্ভীরভাবে অভয়বাণী শুনাইলেন, "না, আপনার সে ভয় নেই।" কোলে মহাশয় চোখের জল মুছিয়া প্রফুল্লচিত্তে নীচে নামিলেন। শ্রীমা দুটি প্রসাদী মিষ্টি তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদে বৃদ্ধের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় বালবিধবা। বৈধব্যের এক বৎসর পূর্বে নখ কাটানোর পরে একদিন পেঁপে কাটিতে গিয়া উহার কষ লাগিয়া আঙুলগুলি ফুলিয়া উঠে এবং ক্রমে উহা ঘায়ে পরিণত হয়।

সেই ঘা বার বৎসর ছিল—কখনও কমিত কখনও বাড়িত; বিশেষতঃ জল লাগিলে মাংস পর্যন্ত পচিয়া যাইত। মাতাঠাকুরানীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর একবার ঘা খুব বাড়িয়াছে, তাই মাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল যে, সেদিন আর মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু অপর এক স্ত্রীভক্তকে অঞ্চলে হাত ঢাকিয়া সন্তর্পণে পদধূলি লইতে দেখিয়া তাঁহারও ঐরূপ করিতে সাধ হইল। ঐভাবে তিনি কখনও প্রণাম করেন না; সুতরাং এইটুকু অস্বাভাবিকতা শ্রীমায়ের দৃষ্টি এড়াইল না; তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিয়া তথ্য আবিষ্কার করিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন, "বাছা, আমি এখন এমনই হয়েছি, আমাতেই আমি ডুবে থাকি—তোমাদের দিকে বড় তাকাই না। এই হাত দিয়ে ঠাকুরপুজো কর, এতেই রোগ ধরে রয়েছে। যাক, আমার সঙ্গে এস। ঠাকুরপুজোর নির্মাল্য ও চরণামৃত গঙ্গায় ফেলবার জন্য এখনি নিয়ে যাবে; তাড়াতাড়ি এস।" অন্য ঘরে গিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ দেখ, কমন্ডলুতে ঐ সব রয়েছে; সবটা হাত এতে ডুবিয়ে দাও।" হাত ডুবানো হইলে বলিলেন, "আর হাতে অসুখ থাকবে না। তবে মাছ, মাংস, রসুন, পেঁয়াজে হাত না দিয়ে যতদূর পার থেকো—ওসব একেবারে না ধরেও তো পারবে না। এসব ঘাঁটাঘাটি করলেই একটু ফুটতে প্যারে। ঠাকুরপুজো তো রোজ করবে—একটু ফুটলেই ঠাকুরের চরণামৃত দিও।" এই বিধান মানিয়াই ইনি নীরোগ হন। পরে কোন কারণে একটু আধটু গুটি বাহির হইলে ঠাকুরের চরণামৃত লাগাই-বার ঘণ্টাখানেক পরেই সারিয়া যাইত।

শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী যখন জয়রামবাটিতে দীক্ষা লইতে যান, তখন তাঁহার হাতে হিষ্টিরিয়া রোগের প্রতিকারকল্পে একগাছি রূপার তাগা ছিল। কেহ পীড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে উহার পুনরাবৃত্তি হইত এবং পাঁচ-সাত দিন নিত্য সন্ধ্যায় শুরু হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত। তাগা

দেখিবামাত্র পাগলী মামীর অনুসন্ধিৎসা জাগিল। শ্রীমা বলিলেন যে, কোন রোগের জন্যই ব্রজেশ্বরী তাগা পরিয়া থাকিবেন, তাই বৃথা প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করা অনুচিত। পরে ব্রজেশ্বরীকে বলিলেন, "তোমার আর তাগা পরে দরকার নাই, মা; এ রোগ অমনি সেরে যাবে।" বাস্তবিকই তাঁহার আর কখনও সে রোগ হয় নাই, এমন কি হিষ্টিরিয়া রোগীর সেবা করিতে গিয়াও নহে।

শ্রীমা ও ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীমা ঠাকুরকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই ক্ষেত্রে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে ফিরিয়া যাইবার তেমন প্রয়োজন হইবে না; আমরা মাতাঠাকুরানীর পরিণত বয়সের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিব; শুধু অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিবার জন্য দুই-একবার অতীতের দিকে তাকাইব।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন নিজের ঘরে ছোট চৌকিখানিতে বসিয়া আছেন এবং শ্রীমা ঝাঁট দিতেছেন, অপর কেহ কাছে নাই; এমন সময়ে শ্রীমা হঠাৎ ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "আমি তোমার কে?" ঠাকুর চিন্তামাত্র না করিয়া উত্তর দিলেন, "তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" আবার হৃদয় যেদিন কৌতূহল-বশে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন "মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাক না? —সেদিন শ্রীমায়ের সপ্রতিভ ঝটিতি উত্তর আসিল, "উনি বাবা কি বলছ? মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—সবই উনি।" ঠাকুরের দৃষ্টিতে মা যেমন ছিলেন 'জগদম্বা, শ্রীমায়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি ছিলেন সর্বদেব-দেবীস্বরূপ; তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, "উনিই মনসা, গঙ্গা, সব।"

১৩২০ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও ডাক্তার দুর্গা-পদ ঘোষ জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে শ্রীমায়ের সহিত কথা কহিতেছেন। সুরেন্দ্রবাবু নিবেদন করিলেন যে, ঠাকুরকে পূজা করিতে গিয়া তাঁহার একটু খটকা বাধে; কারণ ইষ্টদেবী ও ঠাকুরের অভেদ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা থাকিলেও ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া জপ-বিসর্জনের সময় "ত্বৎ প্রসাদাম্মহেশ্বরি" বলিতে যেন কেমন একটা অসামঞ্জস্য বোধ হয়। মা সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তা, বাবা, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী; তিনিই সর্বদেবময়, তিনিই সর্বজীবময়। তাঁতে সব দেবদেবীর পূজা হয়। ও মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী বললেও হবে।" আর একদিন (১৭ই চৈত্র, ১৩২৬) জনৈক স্ত্রীভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "উনিই সব। উনিই পুরুষ, উনিই প্রকৃতি। ওঁ (ঠাকুর) হতেই সব হবে।" জয়রামবাটীতে শ্রীমা জনৈক দীক্ষার্থীকে ঠাকুরের পাদপদ্মে সমস্ত কর্ম, পাপপুণ্য ও ধর্মাধর্ম সমর্পণ করিতে বলিয়া এবং ঠাকুরকেই গুরুরূপে দেখাইয়া দিয়া ইষ্টমন্ত্র শুনাইলেন। কিন্তু কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানের পরে মনে হইল, ঠাকুরই যদি গুরু, তবে মা কে? তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, মা ও ঠাকুর অভিন্ন; তাই মাকে প্রশ্ন

করিলেন, "ঠাকুরকে কি ভাবে চিন্তা করব?" মা গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ইনিই সব—পুরুষ, প্রকৃতি; এঁকে ভাবলেই সব হবে।" জনৈক স্ত্রীভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ভিতর সব দেবদেবী আছেন—এমন কি, শীতলা, মনসা পর্যন্ত।"

একসময়ে বাগবাজারের ৺সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির হইতে শ্রীমায়ের জন্য স্নান-জল লইয়া আসা হইত। একদিন ঠাকুরের পূজার পর স্বামী বাসুদেবানন্দ বিভিন্ন পাত্রে সিদ্ধেশ্বরীর ও ঠাকুরের স্নানজল মাকে দিতে গেলে তিনি বলিলেন, "দুটো কিসের?" উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইলে মা বলিলেন, "ও একই।" বাসুদেবানন্দ তথাপি পাত্র দুইটি আগাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, "মিশিয়ে দাও।" বাসুদেবানন্দ বলিলেন, "কাল থেকে দেব।" কিন্তু মা তাঁহার সামনেই মিশাইতে আদেশ করিলেন এবং ঐ মিশ্রিত স্নানজলই পান করিলেন।

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' পুস্তকে (২৭৮ পৃঃ) উল্লেখ আছে যে, শ্রীমা অতীব লজ্জাশীলা হইলেও এবং সাধারণতঃ ভক্তদের সম্মুখে ঠাকুরের ঘরে না আসিলেও ঠাকুরের লীলা-সংবরণের পর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কাশীপুরের ঐ ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং "মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।[১]

এই সকল বিবরণ হইতে প্রতীত হয় যে, শ্রীমা ঠাকুরকে শুধু পতি বা মানুষ, এমন কি সাধারণ দেবতা হিসাবে দেখিতেন না; তাঁহার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্বব্যাপী স্বয়ং ভগবান। তাই ভক্তকে তিনি বলিতেন, "ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।" আর নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে সুধীরা দেবীকে বলিয়াছিলেন, "আমার একবার এমন অবস্থা হল যে, নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়ে-টাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারি নে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।"

তাঁহার ঠাকুর সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ; আবার তিনি সর্বরূপেরও অতীত। হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম অদ্বৈত-প্রচারার্থে পরি-কল্পিত হইলেও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের পূজা চলিতেছে। ইহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেও অপরের মনে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া ঠাকুর ঘর তুলিয়া দেন নাই। তবু তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আশ্রমবাসীরা উহা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু একজনের মনে দ্বিধা থাকায় তিনি বিষয়টি শ্রীমাকে জানাইলে মা এই উত্তর দেন, "ঠাকুর পূর্ণ অদ্বৈত ছিলেন এবং অদ্বৈত প্রচার করতেন। তুমিও অদ্বৈতের অনুসরণ করবে না কেন? তাঁর সব ছেলেরাই অদ্বৈতী।"

---

১ "কথামৃতলেখক শ্রীম-র কাছে শুনিয়াছি, ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হইলে, 'আমার মা-কালী, কোথা গেলে গো?' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন" ('শ্রীশ্রীসারদা দেবী', ৫৬ পৃঃ)। শ্রীআশুতোষ মিত্র-প্রণীত 'শ্রীমা', ৮১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

তবু ঠাকুর যেমন সর্বভাবময় ছিলেন, শ্রীমাও ছিলেন তেমনি সর্বভাবময়ী। ঠাকুরকে তাই তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম জানিয়াও সগুণ-ভগবদ্রূপে স্মরণ-মনন ও পূজাদি করিতেন। তিনি স্বমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারম্ভের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ঠাকুরের ধ্যানাবস্থার যে ফটো আজকাল পূজিত হয়, তাহার প্রথম একখানি বেশী কাল হইয়া যাওয়ায় এক ব্রাহ্মণ উহা নিজের জন্য চাহিয়া লন। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইবার সময় উহা মায়ের নিকট রাখিয়া দেন। মা ঐ ফটোখানিকে অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার সহিত বসাইয়া পূজা করিতে থাকেন। একদিন ঠাকুর নহবতের ঘরে গিয়া ঐ ছবি দেখিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?" তখন শ্রীমা বাহিরের সিঁড়ির নীচে রাঁধিতেছিলেন। ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ভিতরে আসিয়া দেখেন, সেখানে পূজার জন্য যে বিল্বপত্রাদি ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া ঠাকুর একবার কি দুইবার ঐ ছবিতে দিলেন—অর্থাৎ পূজা করিলেন। শোনা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই নিম্বকাষ্ঠের গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার পূজার প্রবর্তন করেন। আলোচ্য স্থলেও কি শ্রীমা তাহাই করিয়াছিলেন? যাহাই হউক, সেই ব্রাহ্মণ আর ফিরিয়া আসেন নাই; সুতরাং ফটোখানি শ্রীমায়ের চিরসাথী হইয়া রহিল। উহা প্রথমে খুব কাল ছিল, পরে ক্রমশঃ ফিকা হইয়া যায়।

ঠাকুর তাঁহার পূজা নিত্যই পাইতেন। এমন কি দূরদূরান্তরে যাইবার সময়ও ঠাকুরের ফটোখানি তাঁহার সহিত থাকিত এবং তিনি সময় করিয়া লইয়া উহা পূজা করিতেন। পূজাতে আড়ম্বর কিছুই ছিল না, কিন্তু ছিল আন্তরিকতা ও আত্মীয়তাবোধ। পূজাকালে মায়ের প্রত্যেক আচরণে মনে হইত, তিনি যেন ঠাকুরকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তদনুরূপে সপ্রেম ব্যবহার করিতেছেন। এই প্রেমই তাঁহার পূজাকে রূপ প্রদান করিত। বৈধী ভক্তির সেখানে কিছুই ছিল না। জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা জয়রামবাটীতে মায়ের পূজার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের বাঁধানো ফটো দেয়ালের মধ্যে এক সাধারণ কাঠের আসনে বসানো; তাহার কাছে ছোট বাল-গোপাল এবং আরও দুই-একখানি ঠাকুর-দেবতার ছোট ছোট ছবি। ভোরে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শ্রীমা ঠাকুরকে জাগাইতেন—উঠাইয়া বসাইতেন। ঠাকুরের আসনের নীচে ছোট পিতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল থাকিত, তাঁহার আশেপাশে চন্দনকাষ্ঠ ও চন্দনপিঁড়ি, একটি পঞ্চপাত্র এবং দুই একটি পূজার উপকরণ থাকিত। শ্রীমা সকালে গৃহকর্ম সারিয়া আন্দাজ নয়টার সময় পূজায় বসিতেন; ঘরের মধ্যভাগে পূর্বমুখে ঠাকুরকে বসাইয়া পূজা করিতেন। তাঁহাকে স্নান করাইয়া, ফুল-চন্দন দিয়া ও ফল, মিষ্ট, মিছরির শরবত, হালুয়া প্রভৃতি নিবেদন করিয়া মা হস্তদ্বয়

ক্রোড়ের উপর রাখিয়া উন্নতদেহে স্থিরভাবে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিতেন। কোন বিশেষ কার্য না থাকিলে তিনি পূজায় একটু বেশী সময় কাটাইতেন ; কিন্তু কোন দিনই খুব বেশী সময় লাগিত না। ধ্যানকালে বোধ হইত যেন তাঁহার মন এ রাজ্যে নাই। ধ্যানের পর প্রণাম করিয়া তিনি ঠাকুরকে যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতেন। পূজা-শেষে একটু চরণামৃত, তুলসী ও বিল্বপত্র থাকিলে তাহার কণিকা মুখে দিতেন। জয়রামবাটীতে ফুল অনেক সময় পাওয়া যাইত না; যখন যেমন জুটিত, তাহাতেই পূজা সম্পন্ন হইত। ফুলের অভাবে শুধু তুলসীপাতা ও জল দিয়া পূজা হইত। তুলসী সম্বন্ধে তাঁহার একটু আগ্রহ ছিল : বলিতেন, 'তুলসী অতি পবিত্র, তুলসী থাকলে সব শুদ্ধ হয়।' পূজা-কালে মা ফুল হাতে লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে ধরিয়া পরে হাত ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরের মস্তকের উপর লইয়া গিয়া ফুলটির মুখ সামনের দিকে করিয়া ছবিব উপরিভাগে স্থাপন করিতেন। দেখিলে মনে হইত, এ যেন প্রাচীন নারীগণের শুভদিনে প্রিয়জনের মস্তকে মাঙ্গলিক ধান্যদূর্বাদি প্রদানেরই অনুকল্প। দ্বিপ্রহরে রন্ধনগৃহে ভাত, ডাল, মাছ ও তরকারি ঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদিত হইত। সন্ধ্যার পরে তিনি আবার লুচি, রুটি, তরকারি, দুধ, গুড় ইত্যাদি ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। শীতল দেওয়া সম্বন্ধে তেমন কিছু নিয়ম ছিল না। বিশেষ কোন উপকরণ থাকিলে অপরাহ্ণ চারিটা নাগাদ উহা নিবেদন করিতেন।"

ইহাই ছিল পূজাবিধি। তারপর তাঁহার আত্মীয়তাবোধ। শেষবার কলিকাতা যাইবার পথে শ্রীমা জগদম্বা আশ্রমে রাত্রিতে বিশ্রাম করেন। পরদিন প্রাতে পাঁচটার সময় বরদা মহারাজ গিয়া দেখেন তিনি ফলমিষ্ট দিয়া ঠাকুরপূজা সারিয়া ঠাকুরের ফটোখানি কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সের মধ্যে লইতেছেন এবং ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ওঠ, যাত্রার সময় হল।" আর একবারের কথা। মা তখন জয়রামবাটীতে ; সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা হইবে ; ঠাকুরের নিত্যপূজা মা সেদিন সকাল সকাল করিতেছেন। জনৈক ভক্ত শুনিতেছেন, মা ভোগনিবেদনের সময় ঠাকুরকে বলিতেছেন, "দেখ, আজ মার পূজা, শিগ্‌গির করে খেয়ে নাও, আমায় সেখানে যেতে হবে।" কলিকাতা হইতে শ্রীমায়ের দেশে যাইবার কথা হইয়াছে; কিন্তু একের পর অপরের অসুখ হওয়ায় ক্রমেই দেরি হইতেছে। তখন শ্রীমা ঠাকুরকে বলিতেছেন, "জয়রামবাটী চল। ওখানকার বড় পুকুরের জল আর তুলসী কি তোমার মনে লাগে না?"

ভোগনিবেদনের পর মা দেখিতেন ঠাকুর সত্য সত্যই উহা গ্রহণ করিতেছেন। ১৩১৮ সালে ডাক্তার লালবিহারী সেন যখন জয়রামবাটী গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অসুখ হয়। সে সময় মা তাঁহাকে একটু খিচুড়ি খাইতে দিয়া বলেন যে, উহা খাইলে অপকার হইবে না ; কারণ ঠাকুর স্বয়ং খাইয়াছেন। ডাক্তার

প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়?" মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিচুড়ি আর ছানা খেতে চান।" একজন জগদম্বা আশ্রমে খেদ করিয়া শ্রীমাকে বলেন যে, ভোগ নিবেদন করিলেও ঠাকুর উহা গ্রহণ করেন কিনা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তখন শ্রীমা বেশ জোর দিয়া বলিলেন, "খান বই কি, বাবা—প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন করলে নিশ্চয়ই খান।" তিনি আরও বলিলেন যে, গোপালকেও খাইবার জন্য আদর করিয়া ডাকিলে গোপাল নূপুর পায়ে ঝুম-ঝুম করিয়া আসিয়া হাজির হয়, আর আবদার করিয়া খায়। জনৈক স্ত্রীভক্ত এক দুপুরে (কার্তিক, ১৩২১) ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া দেখেন শ্রীমা সলজ্জ বধূটির মতো ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "এস, খেতে এস।" আবার গোপাল-বিগ্রহের কাছে গিয়া বলিতেছেন, "এস, গোপাল, খেতে এস।" হঠাৎ স্ত্রীভক্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মা হাসিয়া বলিলেন, "সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া মা ভোগের ঘরের দিকে চলিলে মায়ের ভাব দেখিয়া স্ত্রীভক্তের "মনে হল, যেন সব ঠাকুররা তাঁর পেছনে চলেছেন।"

বস্তুতঃ ঠাকুরের ফটোতে তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরের দর্শন পাইতেন ; এমন কি নিদ্রাকালেও ঐ বোধ অব্যাহত থাকিত। জয়রামবাটীতে একদিন দুপুরে অপরে পূজা করিয়াছেন। মা আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন ; অকস্মাৎ তিনি স্বপ্নে দেখেন ঠাকুর মেজেতে রহিয়াছেন আর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি এখানে কেন শুয়ে?" সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুরের সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া শ্রীমা দেখেন যে, পূজিত ফুলগুলি ফটোর গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে এবং উহাতে পিঁপড়া ধরিয়া ঠাকুরের দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি উঠিয়া ফুল সরাইয়া দিলেন এবং পূজককে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন।

রাধুর অসুখের জন্য শ্রীমা যখন কলিকাতার বোসপাড়ায় নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং বাড়ীতে ছিলেন, তখন সরলা দেবী ভোগনিবেদনের জন্য আদিষ্ট হইয়া বিধি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদর-যত্ন করতে হয়, সেরকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমন ভাবেই নেবেন।" অবশ্য ভক্তের আগ্রহ দেখিলে তিনি মন্ত্র বা সামান্য আচারবিচারও শিখাইয়া দিতেন। সরলা দেবীকে ঐ সকল বলার পর ভোগনিবেদনের মন্ত্র বলিয়া দিয়াছিলেন। আর একজনকে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) তিনি বলিয়াছিলেন, "সেবাপরাধ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই।...চন্দনে যেন খিঁচ না থাকে, ফুল-

বিল্বপত্র যেন পোকা-কাটা না হয়। পূজো বা পূজোর কাজের সময় যেন নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐ সব করা চাই। আর ভোগরাগ সব ঠিক সময় দিতে হয়।" অবশ্য এই সব কথার সঙ্গে মা ইহাও বলিয়াছিলেন, "তবে কি জান? মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।"

ভক্তের মনে তিনি ইহা দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, ঠাকুরই সব। স্বামী কপিলেশ্বরানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি তো তোমায় মন্ত্র দিইনি, ঠাকুর দিয়েছেন।" এই জাতীয় কথা শুনিয়া ভক্তদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগিত, "ঠাকুর ও মার মধ্যে সম্বন্ধটি কিরূপ?" বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রীমা নিজেই বলিয়া দিতেন যে, তাঁহারা অভিন্ন। শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে তিনি ১৩২৩ সালের ৫ই চৈত্র তারিখের পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, যদি শ্রীমায়ের ধ্যান করিতেই তাঁহার বেশী ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই করিতে পারেন ; কারণ তাঁহার ও ঠাকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, শুধু রূপের পার্থক্য—যিনি ঠাকুব তিনিই শ্রীমায়ের দেহে বিদ্যমান। তাঁহার ১৩২৩ সালেব ৩০শে চৈত্রের পত্রেও আছে "যেই ঠাকুর সেই আমি।" মানদাবাবু কথাটাকে আরও পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, উপাসনার সময়ে ঠাকুরের নাম জপ করা কি দরকার?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তা করবে।" ভক্ত আবার বলিলেন, "কেন, তার কী দরকার? তুমি আর ঠাকুর তো এক।" এই কথায় মা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, এক হলেও আমি কখনও ঠাকুরকে ছাড়তে বলতে পারি না।" একদিন জনৈক ত্যাগী ভক্তের সহিত শ্রীমায়ের আলাপ হইতেছিল। ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুর কি সদা সর্বদা আপনাকে দেখা দেন, আপনার হাতে খান এখনও?" মা বলিলেন, "আমরা কি আলাদা?" সঙ্গে সঙ্গে জিব কাটিয়া বলিলেন, "কি বলে ফেললুম!"

স্বামী কেশবানন্দ শ্রীমায়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে যেমন আক্ষেপ করিলেন যে, ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁহার দর্শন পাইলেন না, অমনি শ্রীমা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, "এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, 'আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব'।"

শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্তী দুইজন দীক্ষার্থী বন্ধুকে লইয়া যে-বারে জয়রাম-বাটী যান, সে-বারে শ্রীমা তাঁহার হস্তে পূজাগ্রহণের জন্য ফুল আনিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "আমি হলদে ফুল ভালবাসি, আর ঠাকুর সাদা ফুল। কিশোরীকে দুরকম ফুলই আনতে বলো।" কিশোরী মহারাজের নিকট হইতে ফুল আনিয়া নরেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, মা আগের জায়গায়ই দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমায়ের নিকট হইতে বামপদে পীত ও দক্ষিণপদে শ্বেত পুষ্প দিবার অস্ফুট

ইঙ্গিত পাইবামাত্র নরেশবাবু আকুলহৃদয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বলিলেন, "মা, আমার ইহ-পরকালের সমস্ত ফল আমি তোমায় সমর্পণ করলুম।" স্বেচ্ছায় পূজাগ্রহণ করিয়া সেদিন শ্রীমা আভাসে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার একই দেহে শিবশক্তি সম্মিলিত—তাই ঠাকুরের শ্বেত ও মায়ের পীত পুষ্প।

শ্রীমা স্থলবিশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আপনার অভেদ স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দিলেও জোর করিয়া কাহাকেও ঐ মত গ্রহণ করাইতে চাহিতেন না; ভাগ্যবান কেহ কেহ উহা সহজে ধরিতে পারিলেও অপরের সময় লাগিত—শ্রীমা তজ্জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জয়রামবাটীতে স্বামী সাধনানন্দকে দীক্ষাদানের পর শ্রীমা ঠাকুরের ফটো দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই গুরু।" শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "মা, আপনি তো বললেন, ঠাকুর গুরু; তাহলে আপনি কে?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "বাবা, আমি কিছুই না—ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট।"

আবার অন্য ক্ষেত্রে দীক্ষাদানকালে শ্রীমা ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া যাই বলিলেন, "এই তোমার গুরু," অমনি দীক্ষিত সন্তান বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, ইনি তো জগদ্‌গুরু।" পরে ভবতারিণীর মূর্তি দেখাইয়া মা যখন বলিলেন, "এই তোমার ইষ্ট," তখন শিষ্য বলিলেন, "মা, সাক্ষাতে থাকতে অসাক্ষাতে যাব কেন?" অর্থাৎ শ্রীমারূপে অবতীর্ণা জগদম্বাকে ছাড়িয়া প্রতিমাতে উপাসনা করার প্রয়োজন কি? ভক্তের আন্তরিকতায় সন্তুষ্টা শ্রীমা সহাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, তা-ই হবে।" তাই কথাটা একটু সজোরে উচ্চারণ করিলেন।

ভক্তের নিকট এইভাবে অভেদ প্রকাশ করিলেও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাদ দিয়া শুধু তাঁহাকে গ্রহণ করা পছন্দ তো করিতেনই না, বরং উহার অজস্র নিন্দা করিতেন। জনৈক ভক্তকে কুশলপ্রশ্ন করিলে তিনি যেই বলিলেন, "মা আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি," অমনি মা তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ঐ এক বড় দোষ। সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন? ঠাকুরের নাম করতে পার না? যা কিছু দেখছ, সব ঠাকুরের।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর মধ্যে ভেদদৃষ্টিস্থলেই এইরূপ ভর্ৎসনাদির কথা উঠিত। এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দজী একদিন আবেগভরে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা ঠাকুর ও মাকে পৃথক্ করিয়া ভাবিবে তাহাদের কোনও কালে কিছু হইবে না। কারণ উভয়ে মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

একবার দুইজন ভক্ত উদ্বোধনে শ্রীমাকে প্রণাম করিলে তিনি ঠাকুরের প্রসাদ ঠোঙায় সাজাইয়া জিহ্বাগ্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে ও উপস্থিত অপর এক ব্যক্তিকে দিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি

যে ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া খাই না।" মা বলিলেন, "তবে খেও না।" একটু পরেই ভক্তের হৃদয়ে তথ্য উদ্ভাসিত হওয়ায় তিনি উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "মা, এবার বুঝেছি ; ঠাকুর যা আপনিও তাই—অভিন্ন।" মা কহিলেন, "তবে খাও।"

অন্নপূর্ণার মা বলিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন আমাকে বলছ—আমার প্রসাদ খা, তবে তোর অসুখ সেরে যাবে। আমি বলছি—'ঠাকুর নিষেধ করেছেন আমাকে, কারও এঁটো খেতে।' তা মা, আমাকে এখন তোমার একটু প্রসাদ দাও।" মা বলিলেন, "ঠাকুর য নিষেধ করেছেন, তাই করবে?" অন্নপূর্ণার মা উত্তর দিলেন, "মা, তাঁতে ও তোমাতে যতদিন তফাত বোধ ছিল, ততদিন ও কথা ছিল। এখন দাও।" মা শেষে প্রসাদ দিলেন।

ঠাকুর বার বার জীবকল্যাণার্থে অবতীর্ণ হন, শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমাও আসেন সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুরের সহিত আপনার এই চিরন্তন সম্বন্ধও তিনি উপযুক্ত স্থলে প্রকাশ করিতেন। তাই মেদিনীপুরের নলিনবাবু যখন একবার প্রশ্ন করিলেন, "মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছেন?" তখন মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাবা।"

ঠাকুর যখন পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে সঙ্গে আসিতে হইবে ; তাঁহার শক্তি শ্রীমাকেও শরীর ধারণ করিতে হইবে, যদিও ইহা মোটেই সুখবর নহে। একদিন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১২) উদ্বোধনে গৌরী-মা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে।" মা অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার হুঁকো কলকে হাতে থাকবে।' ভাঙ্গা একটু পাথরের বাসন ঠাকুরের হাতে থাকবে। হয়তো ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।"

রাঁচির ভক্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন। ঠাকুরের ডাকে রাত্রে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় তিনি দরজা খুলিয়া দেখেন ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়াইয়া—গেরুয়া পরা, পায়ে খড়ম, হাতে চিমটা। ঘটনাটি জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে শুনাইয়া (২৯শে বৈশাখ, ১৩২০) বিবরণদাতা প্রশ্ন করিলেন, "মা খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে কেন দেখলাম?" মা বলিলেন, "সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল-বেশে আসবেন বলেছেন। বাউল-বেশে—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি। বললেন, 'বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্যে করবে, ভাঙ্গা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।' যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন—কোন দিক-বিদিক খেয়াল নেই।" প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ধমানের রাস্তা কেন?" মা বলিলেন, "এই দিকে দেশ।" আবার প্রশ্ন হইল, "তবে কি বাঙালী?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাঙালী। আমি

শুনে বললুম, 'ও কিগো, তোমার এ কি সাধ?' তিনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার হাতে হুঁকো কলকে থাকবে'।"

ঠাকুর আবার আসিবেন এবং পার্ষদাদি সকলকেও আসিতে হইবে শুনিয়া লক্ষ্মীদিদি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসছি না।" ঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, আমি যদি আসি তো থাকবে কোথা?—প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।" মায়ের এ প্রস্তাব মনঃপূত হয় নাই। বৃন্দাবনে ভক্ত সন্তানগণ রেলগাড়ি হইতে নামিয়াছেন, শ্রীমাও নামিয়াছেন গোলাপ-মা গাড়ি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া দিতেছেন। লাটু মহারাজের হুঁকো-কলিকা গাড়িতে পড়িয়াছিল, গোলাপ-মা ঐগুলি মায়ের হাতে দিলেন। অমনি লক্ষ্মীদিদি বলিয়া উঠিলেন, "এই তোমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল। শ্রীমাও 'ঠাকুর, ঠাকুর এই আমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল" বলিয়া ঐগুলি ধূপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "তিনি (ঠাকুর) শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলেছেন।" শ্রীমায়ের মতে ঠাকুরের বর্তমান আবির্ভাব হইতে সত্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। যেমন ঠাকুরই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামীজী সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি এবং অর্জুন যোগানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধারণ লোক জন্মে ও মরে, কিন্তু এই সকল আধিকারিক পুরুষ ভগবানের কার্যসাধনের জন্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আসেন। শ্রীমা ইঁহাদের আধ্যাত্মিক উচ্চাধিকার সম্বন্ধে বলিতেন, "যারা সব (পূর্বে) এসেছিল, তারাই এসেছে।" অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা ভক্তদের নিকট সগর্বে বলিতেন, "দেখছ না রাখালের কেমন বালক স্বভাব এখনও যেন ছোট ছেলেটি। শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গামা পোহায়—মুখটি বুজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিনরাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যে এদের নেমে থাকা। এদের চরিত্র চোখের সামনে রাখবে, এদের সেবা করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণকে শ্রীমা আপনার সন্তান বলিয়াই নির্দেশ করিতেন, "রাখাল শরৎ-টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েছে।"

শ্রীমায়ের একদিনের একটি সারগর্ভ কথা হইতে মনে হয় যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাভাবে লীলা, সাধনভজন এবং সাধনান্তে যুগধর্মপ্রবর্তন, এই তিনের মধ্যে ভক্তের নিকট প্রথমটিই মৌলিক বস্তু এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অধিক অনুধাবনযোগ্য। লীলার পর সাধন এবং তাঁহারও পরে যুগপ্রবর্তনের কার্য-ধারা অনুধ্যেয়। তিনি স্বামী কেশবানন্দকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, বাবা, তিনি

যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যে-ভাবে তাঁকে ভজনা করে বস্তুলাভ করে. সেই সেই-ভাবে সাধন করে নানা লীলা আস্বাদন করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ওরকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে? সর্ব-ধর্মসমন্বয়ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্যবারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।" অর্থাৎ অনুভূতির দৃষ্টি আগে, প্রয়োগ বা কার্যের দৃষ্টি পরে। আর একদিন আর একজনকে তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।" বস্তুতঃ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত না হইলে জনসেবাও ঠিক ঠিক হয় না, ভগবানলাভ তো সুদূরপরাহত।

মানবী

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুতে শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় আকুলভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত ভক্তদের মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাই পরদিন সকালে প্রণাম করিতে গিয়া মহীশূরের ভক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রশ্ন করিলেন, "মা, আপনি আবার ন্যাড়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মতো এরকম কাঁদলেন কেন?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "আমি সংসারে আছি সংসারবৃক্ষের ফলভোগ করতে হবে। তাই আমার কান্না।"

ভগবদ্‌রচিত এই সংসারযন্ত্রের একটি নিজস্ব ধারা আছে যাহা দেহধারী সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, কখনও বা ভয় ঠিক মানুষের মতো।" আরও বলিতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে" ('কথামৃত', ৪।৫৬, ৩।১৯২)।

এই দেবীত্ব-মানবীত্বের যুগ্মভাব শ্রীমায়ের নিজমুখের অনেক কথায় প্রকাশ পাইত। উদ্বোধনে একদিন (১৮ই ভাদ্র, ১৩২৫) কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি সত্যিই বা তাই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে! এই গোলাপ, যোগীন এরা তার অনেক কথা জানে। আমি যদি ভাবি—এইটি হোক, কি এইটি খাব, তা ভগবান কোথা হতে সব জুটিয়ে এনে দেন।" আর একদিনের কথা—১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীমা রাধুকে লইয়া জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। অনন্তর দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার পর মা ভক্তদের পত্র শুনিতেছেন। এক স্ত্রীভক্তের পত্র মায়ের স্তবস্তুতিতে পূর্ণ ছিল। পত্রের মর্ম শুনিয়া মা বলিতেছেন, "দেখ, অনেক সময় ভাবি যে, আমি তো সেই রাম মুখুজ্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন আসে কেন?" মা সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নীরব হইলেন। কিন্তু পত্রপাঠক ব্রহ্মচারীর তাৎপর্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সে চিন্তাধারাকে আর এক ধাপ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের কি সব সময়ে নিজের স্বরূপ মনে থাকে না?" মা বলিলেন, "তা কি সব সময়ে থাকে? তাহলে এসব কাজকর্ম করা চলে? তবে কাজকর্মের ভেতর যখনই

ইচ্ছা হয় সামান্য চিন্তাতে দপ করে উদ্দীপনা হয়ে মহামায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।"

আরও আগের কথা—১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি। শ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন। ভক্ত জানিতে চাহিলেন যে, ঠাকুর সনাতন পূর্ণব্রহ্ম কিনা। মা তাহা সমর্থন করিলে ভক্ত আবার বলিলেন, "তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।" মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন -স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।" ভক্ত তখন ভাবিতেছেন, সীতারাম বা রাধাকৃষ্ণ যেমন অভিন্ন, ঠাকুর এবং মাও তেমনি অভিন্ন, অথচ সম্মুখে দেখিতেছেন মায়ের লোকোচিত ব্যবহার। মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য তিনি বলিতেছেন, "তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া, না কি?" মা বলিলেন, "মায়া বই কি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম। ভগবান নরলীলা করতে ভালবাসেন কিনা!" আবার প্রশ্ন হইল, "তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?" তদুত্তরে মা বলিলেন, "হ্যাঁ, এক একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি, এ কি করছি! এ কি করছি! আবার এইসব বাড়ী-ঘর ছেলেপিলে (সামনের সব দেখাইয়া) মনে আসে ও ভুলে যাই।" আবার তিনি যে স্বেচ্ছায় মায়াবরণ স্বীকার করিয়াছেন ইহা তাঁহার জানাই ছিল; তাই এক এক সময় বলিতেন, "এতো একটা মোহ নিয়ে আছি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বই তো নয়।"

অবতারলীলা মানবসদৃশ হইলেও, উহা ঠিক মানবের দৈনন্দিন কার্যাবলীর সহিত তুলিত হইতে পারে না; কেননা অনেকাংশেই উহা অন্যরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতেন, তথাপি ব্যুত্থিতাবস্থায় তাঁহার প্রতিকার্যে একটা সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা ছিল। জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষার্থে ধৃতবিগ্রহ পুরুষোত্তমের জীবনের সর্বক্ষেত্রই অপরের পক্ষে আদর্শস্থানীয় ছিল—বর্তমান কালে যুগাবতারের ইহা এক মহা অবদান। শ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিলেও আমাদের মনে পুনঃ পুনঃ এই কথাই উদিত হয়। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ইহাও মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে যেমন দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত অসাধারণ আদর্শের অভাব না থাকিলেও আধ্যাত্মিক ভাব, মহাভাব ইত্যাদি অবিরাম প্রকটিত হইয়া আধুনিক জড়বাদসর্বস্ব মানবকে সবলে ভগবদভিমুখ করিয়াছে, শ্রীমায়ের জীবনে তেমনি চরম সমাধি, ত্যাগবৈরাগ্য ও ভাবগাম্ভীর্যের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা না থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে স্নেহ, সেবা, ঔদার্য, লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি গুণরাজি অপূর্বভাবে প্রকাশ পাইয়া ভোগলোলুপ ব্যক্তিতন্ত্র লোক-

সমাজে এক নবীন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে। ফলতঃ একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ মানব আপনাকে লইয়াই বিব্রত; কিন্তু দেব-মানবের সবটুকু জীবন পরার্থে।

এইসব লক্ষ্য করিয়াই স্বামী কেশবানন্দ প্রমুখ ভক্তদিগকে স্বামী প্রেমানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তোমরা দেখেই তো এলে, রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙগালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!" এক পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মার? তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা! জয় শক্তিময়ী মা! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস? স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত 'বাজিয়ে, বাছাই করে' লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাদ্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা! মনে রেখো, সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে সর্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় মা!"

শ্রীমাও একদিন ঠিক এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। ভক্ত অনুযোগ করিলেন, "ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাব, সমাধি এসব হত। আপনি তো আমাদের সে রকম কিছুই করছেন না।" মা উত্তর দিলেন, "সে আর কটিকে করেছিলেন? তাও কত বেছে। তাতেই তাঁর শরীর এত শিগ্গির গেল। আমার কাছে পিঁপড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন। আমি যদি অমনটি করি, তবে কদিন এ শরীর থাকবে? আমার কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে।"

অধ্যাত্মশক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্র এইরূপ বিভিন্ন হওয়ায় শ্রীমা ও ঠাকুরের আচরণে কিছু কিছু পার্থক্য সহজেই চোখে পড়িবে; কিন্তু মায়ের কার্যাবলী মনোযোগের সহিত দেখিলে অচিরে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই প্রভেদ মৌলিক নহে, ইহা বিকাশের ক্ষেত্রানুযায়ী তারতম্য মাত্র। পারিবারিক আবেষ্টন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেবমন্দির-নিবাসী, ভক্ত-পরিবেষ্টিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যে ত্যাগ বৈরাগ্য অনাবৃত সৌন্দর্যে প্রকটিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিত, শ্রীমায়ের জীবনে উহাই পারিবারিক পটভূমিকায় প্রতিমুহূর্তে শতধা প্রতিফলিত হইয়া গার্হস্থ্যজীবনের অন্ধকার পথে আলোক বিকিরণ করিত। ঊর্ধ্বগামী মনকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিবার জন্য ঠাকুর 'তামাক খাব',

'জল খাব' ইত্যাদি ক্ষুদ্র বাসনা অবলম্বন করিতেন; ভগবদ্ধ্যানে লীয়মান মনকে সংসারে ধরিয়া রাখিবার জন্য শ্রীমা রাধুকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই স্বার্থহীন ও স্বাচ্ছন্দ্যঘাতী উদ্যম আপাততঃ বন্ধনরূপে প্রতীত হইলেও আমরা উহাকে মায়ের অসীম শক্তির পরিচায়করূপেই পাই। ঠাকুর কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধাতুস্পর্শে তাঁহার অংগ বিকৃত হইত; শ্রীমা অর্থকে লক্ষ্মীজ্ঞানে মাথায় ঠেকাইতেন। বস্তুকে বস্তুরূপে ত্যাগ ও ব্রহ্মভাবে গ্রহণ, উভয়ই মূলতঃ জ্ঞানবৈরাগ্যেরই দ্যোতক। এই সকল তত্ত্বকথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা শ্রীমায়ের মানবীয় চরিত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি এবং পাঠককে পুনশ্চ সাবধান করিয়া দিতেছি যে, এই অখণ্ড অলৌকিক চরিত্রকে খণ্ডশঃ বুঝিতে গেলেও তিনি যেন মায়ের দেবীত্বকে ছাড়িয়া কখনও নিছক নারীত্বকে পরিমাপকরূপে গ্রহণপূর্বক বিভ্রান্ত না হন।

আমরা এই অধ্যায়ে যে-সকল ঘটনার আলোচনা করিব, তাহা দুই শ্রেণীর—কতকগুলির সহিত শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, আর কতকগুলিতে তিনি শুধু সাক্ষী। তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন এবং নিজেই সময়বিশেষে যাহার তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি আমাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। কিন্তু দূরে থাকিয়া তিনি যেসব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট কম আদরণীয় নহে; কারণ ভারতের একজন অতি বুদ্ধিমতী, অতি পবিত্রা, অতি উচ্চ শিক্ষাদীক্ষাশালিনী নারীর অভিমতের একটা স্বকীয় গুরুত্ব আছে। আর যখন মনে রাখি যে, তিনি আদর্শস্থাপনের জন্যই আধুনিক যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সেসব কথা আরও প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে।

ক্ষুদ্র গ্রাম জয়রামবাটীর প্রতি শ্রীমায়ের একটা প্রাণের টান ছিল। একবার তিনি কলিকাতা যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার খুড়ী বলিলেন "সারদা আবার এসো।" শ্রীমা সাগ্রহে বলিলেন, "আসব বই কি" এবং সেই কথাতেই আরও জোর দিবার জন্য বারবার ঘরের মেজেয় হাত ছোঁয়াইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

গ্রামের সকলের সংগেই তাঁহার একটা না একটা সম্পর্ক ছিল—সে যত ছোট বা বড় এবং সমাজের যে কোন স্তরের লোকই হউক না কেন। ভিন্ন গ্রামবাসীও এই আদরে বঞ্চিত হইত না। বিজয়াদশমীর দিন সকলে যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া ফিরিত, তখন তিনি ভিন্নগ্রামীয় প্রতিমাশিল্পী 'কুঞ্জ-কাকা'র খবর লইতে এবং তাহাকে ডাকিয়া আদরযত্ন করিতে ভুলিতেন না। এইসব স্থলে তাঁহার নিজের উচ্চ সামাজিক স্থিতি বাধা দিতে পারিত না।

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্রে সকলকে জয় করিয়াছেন। শ্রীমায়ের জীবনেও এই "তৃণাদপি

[illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শেষ বয়সে তিনি যখন অধিক পরিশ্রম [illegible] সেবাপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়ীতে [illegible] শ্রীমা তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিতেন। বিজয়াদশমীতে [illegible] বলিলেন, "সে কি মা? [illegible] প্রণাম [illegible] আমি সামান্য মেয়েমানুষ, [illegible] পারব না।" মা তবু ছাড়িলেন না। তাঁহাকে প্রণাম করিলেন [illegible] তুমি আমার মাসীমা যে।

এইসব সম্বন্ধের [illegible] কোনরূপ ব্যতিক্রম হইত না। একবার শ্রীমায়ের [illegible] হইতে তাঁহার সঙ্গে দেশে যাইবার সময় [illegible] এমন একটা জিনিস ফেলিয়া আসিয়াছেন [illegible] অর্থাৎ [illegible] ব্যবস্থা করা হইল যাহাতে [illegible] গাড়ীতে আসে। উহা না আসা পর্যন্ত তাঁহাকে একাকী রাখিবা[illegible] অসম্মত হইয়া শ্রীমা বলিলেন, "সে কি আমার পর?"

জাতিবিচার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। [illegible] ভক্তের জাত নাই—তিনি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে ধর্মজগতে এই সাম্য মানিয়া লইলেও তিনি সমাজবিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না, লৌকিক ব্যবহারে সমাজব্যবস্থাই মানিয়া চলিতেন। [illegible] দীক্ষার্থীর কুলগুরু আছেন জানিয়া তিনি দীক্ষাদানে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কুলধর্মানুযায়ী চলা উচিত [illegible] সংসারে থাকলে মেনে চলতে হয়।" শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় [illegible] পাউরুটি দিবার ব্যবস্থা হয় তখন তিনি বলেন, "বাবা [illegible] এই [illegible] আর আমাকে মুসলমানের ছোঁয়া-টোঁয়া খাইও না।" কাজেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের প্রস্তুত রুটি দেওয়া হইত। পরে [illegible] বলিয়া বুঝাইয়া মিল্ক রোল পাউরুটি দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার অরুচি [illegible] অল্প দুইটি ভাত খান। একদিন খাইবার সময় ডাক্তার কাঞ্জিলাল আসিয়া দেখিলেন ভাতের পরিমাণ একটু বেশী হইয়াছে। অমনি সেবিকাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার দ্বারা ঠিক সেবা হইবে না। সুতরাং পরদিন হইতে দুইজন নার্সের ব্যবস্থা করা হইবে। ডাক্তার চলিয়া গেলে মা সেবিকাকে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেই জুতো-পরা মেয়েগুলোর সেবা নেব ও মনে করেছে? তা আমি পারব না। তুমি কাজকর্ম যেমন করছ করবে।" বস্তুতঃ নার্স আর আসিল না।

একদিকে এইরূপ জাতিবিচার এবং অপর দিকে আমজদ প্রভৃতির প্রতি সর্বপ্রকার আত্মীয়তা-প্রদর্শনের মধ্যে অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে ঐ বিষয়ক আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে হইবে। শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ এবং অন্য সর্বপ্রকারে প্রণম্য অব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান-

প্রদর্শনে শ্রীমা দ্বিধা বোধ করিতেন না। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় উদ্বোধনে রাধুকে দেখিতে আসিলে (১১ই আশ্বিন, ১৩২৫) মায়ের আদেশে রাধু তাঁহাকে প্রণাম করিল। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলিলেন, "উনি কি ব্রাহ্মণ?" মা বলিলেন, "না, বৈদ্য।" প্রশ্ন হইল, "তবে যে প্রণাম করতে বললেন?" মা উত্তর দিলেন, "তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ, ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য। ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে?" একজন কায়স্থ ভক্ত অপর চারিজন ভক্তসহ জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন; তখন মায়ের নূতন বাটী প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীমা কায়স্থ ভক্তকে দেখাইয়া রাধুকে বলিলেন, "রাধু তোর দাদা এসেছে, প্রণাম কর।" ভক্ত তখন ভাবিতেছেন, "সে কি? আমি যে কায়স্থ!" সঙ্গে সঙ্গে মনে সিদ্ধান্ত উদিত হইল, "মা তো আর আমার অমঙ্গল করবেন না।" পরে উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিলেন। এক ভক্তিমতী মহিলা উদ্বোধনে আসিয়া শ্রীমাকে জানাইলেন যে, তিনি স্বপ্নে দীক্ষা পাইয়াছেন। শ্রীমা সব শুনিয়া ঐ মন্ত্রেরই অনুমোদন করিলেন। পরে তাঁহার পরিচয় লইয়া যখন জানিলেন যে, তিনি মায়েরই দীক্ষিত ভক্তের পত্নী, তখন কহিলেন, "এতক্ষণ বলনি কেন? ও রাধু, ও মাকু, ম্যানেজারবাবুর স্ত্রীকে এসে প্রণাম কর।" স্তম্ভিতা হইয়া মহিলা তখন বলিলেন, "মা, এ বলেন কি? আমি যে কায়স্থ-সন্তান, এরা ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে কি করে আমাকে প্রণাম করবে?" মা কহিলেন, "ওসব বলতে নেই। তুমি ভক্তমানুষ, ভক্তের জাত নেই; তোমাকে প্রণাম করলে ওদের কল্যাণ হবে।" রাধু ও মাকু আসিলে ভক্ত স্ত্রীলোকটি তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিতেই মা বলিলেন, "থাক, থাক, দেবে না। ওরা ভক্ত কিনা, তাই সর্বভূতে ঠাকুরকে দেখছে।" ঐ উচ্চ ভিত্তিতেই তিনি মানবীয় সম্বন্ধকে স্থাপন করিতে চাহিতেন; কিন্তু মানুষ তাহা না বুঝিয়া প্রতি কথাকে সামাজিক অর্থেই গ্রহণ করিত।

১৩১৯ সালের বড়দিনের সময় শ্রীমা কাশীতে ছিলেন; সঙ্গে ভানুপিসীও ছিলেন; শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে দুইজন ব্রাহ্মণকন্যা ভানুপিসীকে প্রণাম করিয়াছেন শুনিয়াই গোলাপ-মা চটিয়া গেলেন, যেহেতু তাঁহার মতে ব্রাহ্মণরা গোয়ালার মেয়েকে প্রণাম করিলে ছোটজাতের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, তাহারা ধরাকে সরা মনে করে। মা কিন্তু সব শুনিয়া গোলাপ-মাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন, "গোলাপের কাণ্ড দেখ। উৎসবের দিনে সকলে আনন্দ করবে, আর ও কিনা এদের মনে কষ্ট দিচ্ছে! তোমরা কিছু মনে করো না, মা! ভক্তভাবে সকলকেই প্রণাম করা চলে।"

শুচিবায়ুর সমাধানকল্পেও মা এই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য লইতেন। নলিনী-দিদি ভিজা-কাপড়ে আসিয়া বলিলেন (৩০শে আষাঢ়, ১৩২০), কাকে তাঁহার কাপড়ে প্রস্রাব করিয়াছে, তাই আবার স্নান করিয়া আসিয়াছেন। মা বলিলেন,

"বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে কখনও শুনিনি। বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।...আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে। সবই যত বাড়াবে তত বাড়বে।" আর একবার (জুলাই, ১৯১২) তিনি নলিনীদিদিকে বলিয়াছিলেন "আমি তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' বললুম, ;, সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব—মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।"

এইরূপ বহু সমস্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। সচল সমাজে বহু অটল প্রাচীন দেশাচার পদে পদে জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে; ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অথচ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিযুক্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রগতিশীল মনই সব সঙ্কট-মুহূর্তে পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমা বলিতেন, "দেশাচার মানতে হয়"; কিন্তু তাঁহার মতে তাই বলিয়া দেশাচারের নামে মানুষকে পিষিয়া মারা চলে না। বঙ্গের কোন কোন অংশে বিধবা মেয়েরা আহারাদি সম্বন্ধে খুব কঠোরতা করেন। এক বিধবার ঐরূপ কঠোরতার সংবাদ পাইয়া মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাত্রে রুটি, পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও।" অর্থাৎ দেশাচার মানিয়া অন্ন গ্রহণ না করিলেও শরীররক্ষার অনুরূপ যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা করা উচিত।

এই বিষয়ে শ্রীমায়ের স্বাভাবিক বিচারশক্তি ও সহানুভূতি শ্রীশ্রীঠাকুরের একদিনের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেদিন একাদশী; শ্রীযুক্ত যোগীন-মা তাঁহার বিধবা খুড়ীমাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। খুড়ীমা নির্জলা উপবাস করিয়াছেন; আগের দিনেও বাড়ির কি একটা কার্যবশতঃ তিনি অন্নগ্রহণ করেন নাই। একে তো বার্ধক্যের জন্য তিনি সোজা হইয়া চলিতে পারিতেন না তাহার উপর দুইদিন উপবাসে খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি প্রথমে নহবতের দিকে গেলে মা দেখিলেন, বৃদ্ধা হাঁপাইতেছেন; সুতরাং তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া হাত ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে ঘরে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু শরবত দেব?" বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। খুড়ীমা একটু সুস্থ হইলে যোগীন-মা তাঁহাকে ঠাকুরের ঘরে লইয়া চলিলেন; শ্রীমাও সঙ্গে গেলেন। ঘরের সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া বৃদ্ধা একেবারে মাটিতে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া ঠাকুর একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং যোগীন-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন হাঁপাচ্ছে কেন?" যোগীন-মা কারণ বলিলেন। অমনি উদ্বেগভরে মায়ের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তুমি একে একটু শরবত খাইয়ে দিতে পারলে না?" মা উত্তর দিলেন, আমি বলেছিলুম; ইনি রাজী হননি।" ঠাকুর তখনি শিকা হইতে চিনি নামাইয়া গঙ্গাজলে শরবত করিয়া বৃদ্ধার মুখে ধরিয়া বলিলেন, "খাও।" বৃদ্ধা একবার অর্থপূর্ণ

দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিলেন; পরে বিনা বাক্যব্যয়ে শরবতটুকু পান করিয়া বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বুকটা ঠান্ডা হল, বাবা।"

উত্তরকালে বালবিধবা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় মায়ের নিকট দীক্ষা লইতে গেলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি একাদশীতে কি খাও?" ক্ষীরোদবালা আগে সাগু খাইতেন, কিন্তু পরে উহাতে বিধবার অগ্রহণীয় বস্তু ভেজাল দেওয়া আছে ভাবিয়া কিছুই খাইতেন না। এইরূপ কঠোরতার ফলে তাঁহার শরীর অতি শীর্ণ হইয়াছে। মা দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "না, না, আমি বলছি, তুমি সাগু খেও, এতে শরীর ঠান্ডা থাকে।" একটু থামিয়া বলিলেন "বাছা, অনেক কঠোর করেছ; আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?" ক্ষীরোদবালার মাথার চুল দেশাচার অনুযায়ী ছোট করিয়া কাটা ছিল বলিয়া গোলাপ-মা ও যোগীন-মা উহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মা বাধা দিয়া বলিলেন, 'বেশ তো করেছে; চুল থাকলে একটু বিলাসিতার ভাব আসে, চুলের যত্ন করতে হয়। যাই হোক, মা কেশর সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ। যার জন্যে এত কঠোরতা, তোমার সে কাজ হয়ে গেছে। এখন আমি বলছি, আর কঠোরতা করো না।" মায়ের কথাগুলিতে করুণা ও ভাগবতী দৃষ্টির বিলাসিতা-পরিহারের সহিত ঈশ্বর-লাভের উপায়ভূত দেহরক্ষার জন্য আগ্রহের—কি অপূর্ব সমাবেশ! পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলি এই ভাবেরই দ্যোতক।

শ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিতা চন্দ্র[illegible] ব্রাহ্মণ-বিধবা একসময় কিছুদিন জয়রামবাটীতে [illegible]। তিনি প্রাচীন বিধবাদের মতো সাদা থান কাপড় পরিতেন মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিতেন অলংকার পরা তো দূরের কথা, পানও খাইতেন না এবং নীরবে প্রসন্নচিত্তে মায়ের সমস্ত কাজ করিতেন। তাঁর এই ত্যাগ সেবা ও সংযমের জন্য মা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং অপর ভক্তদের নিকট উচ্চ প্রশংসা করিতেন।

বালবিধবা শরাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।" সুরবালা দেবী পতিবিয়োগের পর অবশিষ্ট জীবন হবিষ্য করিয়া কাটাইবার প্রস্তাব করিলে মা বলিয়াছিলেন, "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়, সে কাঁদে, 'আমাকে দিলে না' বলে।"

শ্রীমা নিজে একাদশীর দিনে ভাত না খাইলেও সামান্য লুচি খাইতেন। তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "খেয়ে দেয়ে দেহটা ঠান্ডা করে নিয়ে ভগবানকে ডাক।" তাঁহার সহচরী যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও নির্জলা উপবাস করিতেন না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুর বস্তুতঃ লীলাসংবরণ

করেন নাই জানিয়া শ্রীমা তাঁহার সধবা-চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নাই; তথাপি স্বাভাবিক বিলাসশূন্যতা ও দেশাচারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের মিশ্রণে তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদাদিতে একটা সংযমের ভাব সকলেরই চোখে পড়িত। মাছ তিনি কখনও খাইতেন না, জামা পরা তাঁহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, আর শাড়ি না পরিয়া তিনি সরু লাল পাড় ধুতি ব্যবহার করিতেন।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে শ্রীমায়ের মত সুস্পষ্ট। মাদ্রাজের দুইটি কুমারী নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ছিল — তাদের বয়স বিশ-বাইশ বছর। তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া মা বলিয়াছিলেন, "আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!' আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত তাহলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হত?"

কালীমামা তাহার পুত্রদ্বয় ভূদেব ও রাধারমণের অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেন। ভূদেবের বিবাহ তের বৎসরে (৫ই মে, ১৯১৩) এবং রাধারমণের এগার বৎসরে। শেষোক্ত বিবাহের সময় কলিকাতায় মায়ের নিকট যে পত্র যায় তাহা পাইয়া তিনি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্ছে—আমার কাছে আদায় করে নিচ্ছে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না।"

বহু বিবাহিত-জীবনে সংযমের অভাব আছে জানিয়া তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন, সংসারী লোকেরা যেন বংশবৃদ্ধিই একমাত্র কর্তব্য মনে করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলতেন দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযমে থাকতে। ইন্দ্রিয়সংযম চাই। এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা সব ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যে।"

তিনি পুরুষ ভক্তদিগকে যেমন স্ত্রীলোক হইতে সাবধান থাকিতে বলিতেন, তেমনি নারীদিগকেও পুরুষ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে বলিতেন। এক মহিলাকে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন "পুরুষ জাতকে কখনও বিশ্বাস করো না; এমনকি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস করো না।" অবশ্য ইহা একটি অসাধারণ স্থলের দৃষ্টান্ত। এই উপদেশ যাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন রূপবতী, অল্পবয়সে বিধবা ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। আর এক স্থলেও শ্রীমা অনেক স্ত্রী ভক্তকে মঠ বা সাধুদের আবাসস্থলে অধিক যাইতে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, মা, তোমরা তো ভালমনে ভক্তি করেই যাবে; কিন্তু তাতে তাদের মনের ক্ষতি হলে সেই সঙ্গে তোমারও পাপ হবে।" ইহাও অসাধারণ স্থল; কিন্তু উভয় উদাহরণের মর্মকথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমা অধিক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও অপর মেয়েদের ঐ বিষয়ে

উৎসাহ দিতেন। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকু ও রাধুকে তিনি সাধারণভাবে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করাইয়া শুনিতেন ও পত্রাদি লিখাইতেন। রাধুকে তের-চৌদ্দ বছর বয়সেও বিদ্যালয়ে যাইতে দেখিয়া উদ্বোধনে গোলাপ-মা আপত্তি করিলে, মা বলিলেন যে উহাতে ক্ষতি নাই; বরং রাধু লেখাপড়া শিখিলে যে অঞ্চলে তাহার বিবাহ হইয়াছে সে অঞ্চলের উপকার হইবে; কেননা সেখানকার মেয়েরা তখনও অশিক্ষিত ছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার বেশ একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। নিবেদিতার কর্মশক্তির তিনি প্রশংসা করিতেন এবং সুধীরা দেবী প্রভৃতি নিবেদিতার আদর্শে স্বাধীনভাবে নারীশিক্ষায় ব্রতী রহিয়াছিন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এক স্ত্রীভক্তের অবিবাহিতা পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" সূচীকর্মাদি শিল্পকার্য তিনি নিজে জানিতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ নিজেই করিতেন; অপর কেহ পশমের দ্বারা কার্পেটের আসন, দেবতার প্রতিকৃতি, মন্দির ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিলে শতমুখে প্রশংসা করিতেন। সর্ববিষয়ে শ্রীমায়ের গুণগ্রাহিতা সত্য সত্যই একটা দেখিবার জিনিস ছিল। নিজের যাহা ভাল লাগিত, তাহা তিনি দশজনকে দেখাইয়া শিল্পীর মর্যাদা বাড়াইতেন। কোয়ালপাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, ঐ সব গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা দিবার তাঁহার খুবই আগ্রহ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুষ্কর। যাহাদের পাওয়া যায়, তাহারা বড়ই বিলাসী; আর মানুষের স্বভাবই এই যে, ভাল জিনিসটা না শিখিয়া তাহারা প্রথমেই বাবুয়ানাটা শিখিয়া লয়। পল্লীগ্রামের পক্ষে ইহাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা।

তিনি বিলাসিতা পছন্দ করিতেন না। একটি মহিলার স্বামী বিশেষ অসুস্থ। তিনি মায়ের আশীর্বাদ লইবার জন্য সুন্দর বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। মা তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতে বলিলেন ও মিষ্ট-বাক্যে প্রবোধ দিয়া বিদায় দিলেন। মহিলা চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথা-মুড় খুঁড়ে মানসিক করে যাবে—তা নয়, কি সব গন্ধ-টন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখেছ? অমন করে কি ঠাকুর দেবতার স্থানে আসতে হয়? এখানকার সবই কেমন এক রকম!"

মাতাঠাকুরানীর সাধারণ আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় এই সংযমপূর্ণ ঈশ্বরপরায়ণতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—তাঁহার বাহ্য ব্যবহার দেশ প্রথানুযায়ী হইলেও সমস্তের ভিতরই একটা আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত থাকিত। গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া (১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৮) ঘাটের পাণ্ডা ব্রাহ্মণকে একটি

কলা, একটি আম ও একটি পয়সা দিয়া মা বলিলেন, "ফল আমি দিলুম বটে কিন্তু দানের ফল তোমার।"

তিনি স্বভাবতই অযথা ধ্বংসের বিরোধী ছিলেন। তথাপি তাত্ত্বিক দৃষ্টি অবলম্বনে অথবা ভক্তদের সহিত ব্যবহার কালে তাঁহার দেশাচার লংঘনের দৃষ্টান্তও বহু রহিয়াছে। শ্রীমাকে আহারের সময় দুধ, আম ও সন্দেশ দেওয়া হইলে তিনি উহা একত্রে মাখিয়া একটু খাইয়া বলিলেন, "ছেলের জন্য রইল" এবং আচমনের জন্য বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, জনৈক স্ত্রীভক্ত ঐ প্রসাদ খাইতেছেন আর আবদার করিয়া বলিতেছেন, "সবই ওঁর ছেলেরা খাবে আর আমরা শুকিয়ে মরব!" মা প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে ভাত, ডাল, চচ্চড়ি আনাইয়া উহার একটু মুখে দিয়া বাকিটা রাখিয়া বলিলেন, "ছেলের জন্য রইল।" পার্শ্ববর্তী অপর মহিলা তখন ভাবিতেছেন, "ইনি ব্রাহ্মণের বিধবা হয়ে দুবার খেলেন কি করে?" আপত্তিটা ভাষায় প্রকাশ না পাওয়ায় সেবারে মায়ের বক্তব্য অবিদিত রহিয়া গেল। কিন্তু অনুরূপ আর এক স্থলে উপস্থিত ভক্তমহিলা বলিয়াই ফেলিলেন "আচ্ছা, মা, আপনি বামুনের মেয়ে হয়ে দুবার ভাত খেলেন—মুখ এঁটো করলেন?" মা উত্তর দিলেন, "ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি। ওতে কোন দোষ হয় না। আর প্রসাদ হলে পাঁচবারও খেতে দোষ নেই। প্রসাদ কোন বস্তুর মধ্যে নয়। ঐসব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না ; ওতে ঠাকুরকে ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তাই করবে।"

তবু আমরা আবার বলি যে, এই প্রকার আচরণ বিরল না হইলেও লোক-ব্যবহার কালে তাঁহার প্রতিকার্য অনিন্দনীয় ছিল। তাঁহার কামারপুকুরে বাসকালে এক ভক্ত পদচিহ্ন চাহিলে তিনি বলিলেন, "এখন এখানে সুবিধা নয়। তোমরা আমাকে যেমন (যে চক্ষে) দেখ সকলে তো অমনি দেখে না। এই লাহাবাবুদের বাড়ির অনেকে এখানে আসে-টাসে। সেজন্য আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে—পায়ে আলতার চিহ্ন থাকবে কিনা।" তাঁহার উদ্বোধনে অবস্থান-কালে একজন স্ত্রীভক্ত একখানি লালপাড় শাড়ি আনিয়া দিলে শ্রীমা সহাস্যে উহা লইয়া পরিলেন ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে কাপড়খানি ছাড়িয়া বলিলেন, "কি করে পরব, মা? লোকে বলবে, 'পরমহংসের স্ত্রী লালপেড়ে কাপড় পরেছে।' থাক এনেছ, ঐ কাপড় পরে নাইতে যাব।" তাঁহার শেষ অসুখের সময় একজন সাধু উদ্বোধনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। মা শুইয়া ছিলেন। সাধু তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সে সময় মায়ের মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। সাধু চলিয়া গেলে মা পার্শ্বস্থ সেবিকাকে বলিলেন, "আমার

মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনা কেন? আমি কি মরে গেছি? এখনই এই করছ?"

শ্রীমা দেশাচারকে কত মান্য করিতেন তাহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গোলাপ-মা তাঁহাকে তেল মাখিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি তেল মাখব না। আমি মাখলে সকলেই মাখবে, তেল মেখে গঙ্গাস্নানে যেতে নেই।" বাবুর অসুখের জন্য মা তাহাকে মাদুলি পরাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছেন দেখিয়া জনৈক স্ত্রীভক্ত জানিতে চাহিলেন যে, শ্রীমায়ের ইচ্ছাতেই যখন সব হইতে পারে, তখন ঐরূপ করার তাৎপর্য কি? মা তাঁহাকে বুঝাইলেন, "অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়। আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।"

মা তখন (১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৮) বাগবাজারে রাজার ঘাটে স্নান করিতেন, কারণ দুর্গাচরণ মুখার্জীর ঘাট তখন ছিল না। স্নানের পর তিনি ছোট ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া রাস্তার ধারে প্রতি বটবৃক্ষের গোড়ায় জল দিয়া প্রণাম করিতেন। একবার এক ভক্ত তাঁহাকে রাঁচি লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "চৈত্র মাসে কোথাও যেতে নেই।" জনৈক কবিরাজ বাতের জন্য রসুনের কোয়া দুধে জ্বাল দিয়া খাইবার বিধান দিলে মা বলিয়াছিলেন "না, বাবা, আমি রসুন খেতে পারব না।" কবিরাজ বুঝাইলেন, "মা, দুধে জ্বাল দিলে রসুনের গন্ধ থাকবে না। এটি বাতের পক্ষে মহৌষধ।" তথাপি মা বলিলেন, "না, বাবা, আমি পারব না।" সুতরাং রসুন খাওয়া হইল না।

তারপর মায়ের সামাজিক দৃষ্টি ও দেশাত্মবোধ। কথাটা অনেকের কর্ণেই হয়তো অদ্ভুত ঠেকিবে। কিন্তু সমাজে যাহারা বাস করে, দেশের খাইয়া যাহারা মানুষ হয়; জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা তাহাদের মনোরাজ্যে আপনা হইতে স্থান করিয়া লয় এবং অনেক অপ্রত্যাশিত স্থলে চকিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। সিন্ধুবালা, স্বদেশী আন্দোলন ও পীড়িতের সেবাদির প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমায়ের চরিত্রের এই দিকটার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। বাকি দুই চারিটি কথার মাত্র এখানে অবতারণা করিব।

মায়ের এক দীক্ষিত ভক্তকে পুলিশ অনর্থক কষ্ট দিয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে নিরীহ ও ধার্মিক বলিয়া জানিত। তথাপি একদিন জপধ্যান ও পূজাদি শেষ করিয়া তিনি নিজের ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল, একটু প্রসাদ ও জল খাইতেও দিল না। মা এই সংবাদ পাইয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন, "দেখ দিকি, ইংরেজের কি অন্যায়! আমার ভাল ছেলে, তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদ দিতেও দিলে না! এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে?"

জার্মান যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) দেশে যখন খুব বস্ত্রাভাব, তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে চরকা ও তাঁতের কাজ চলিতেছে দেখিয়া মা বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'আমাকেও একখানা চরকা এনে দাও, আমিও সুতো কাটব।" স্বামী জ্ঞানানন্দ যখন অযথা পুলিশের নজরবন্দী হইয়া কাটিহারে ডাক্তার অঘোরবাবুর বাড়িতে ছিলেন, তখন কোয়ালপাড়ায় শ্রীমায়ের কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি তথায় উপস্থিত হন। ডাক্তারবাবু বিপদে পড়িতে পারেন ভাবিয়া সকলেই জ্ঞান মহারাজকে তখনই কাটিহারে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু মা নিজ সন্তানকে ছাড়িতে চাহেন না। অবশেষে সকলের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িলেন বটে, কিন্তু এই অত্যাচারী সরকারের উচ্ছেদ কামনা করিতে লাগিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের দামোদরের বন্যায় বহু লোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে শুনিয়া শ্রীমা করুণাবিগলিত স্বরে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন "বাবা জগতের হিত কর।" মায়ের আদেশে বিরাটরূপী ভগবানের সেবা করিতে বদ্ধপরিকর ঐ ভক্ত শ্রীমায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া শুনিলেন—মা বলিতেছেন "কেবল টাকা, টাকা, টাকা!" কথা শুনিয়া ভক্ত শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিলেন, 'মা বোধ হয় আমার ভেতর ঐ ভাবের আতিশয্য দেখিয়াই এমন কথা বললেন।" শ্রীমা ও সন্তানের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'না বাবা, টাকাও দরকার। এই দেখ না কালী মামা। কেবল টাকা টাকা করে।' মঠের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে শ্রীমা জনসেবায় উৎসাহ দিতেন। ১৩২০ সালে কলিকাতায় আসিবার পথে তিনি বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে বিশ্রাম করিতেছেন। ঐ দিন প্রায় একই সময়ে ব্রহ্মচারী বরদা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিষ্ণুপুরে চাউল কিনিয়া জয়রামবাটী প্রভৃতি অঞ্চল দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের মধ্যে বিতরণের জন্য লইয়া যাইবেন। মায়ের সঙ্গে যেসব গরুর গাড়ি আসিয়াছে, উহাতে চাউল যাইবে। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া রাধু ধরিয়া বসিল যে তাহাকেও একসঙ্গে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কিন্তু শ্রীমা বাধা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, "ও এখন এখান থেকে চাল নিয়ে গেলে তবে অতগুলি লোক খেতে পাবে; ওর হাতে অতগুলি প্রাণীর জীবন, তা খেয়াল আছে?" কাজেই রাধুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ব্রহ্মচারী দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে জয়রামবাটী ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীমা নিজে কাজ করিতে ভালবাসিতেন এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। এক অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী গোপেশ দেখিলেন, মা জয়রামবাটীর নূতন বাড়িতে নলিনীদিদির ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ধীরে ধীরে আটা মাখিতেছেন। তখন সেখানে ঝি-চাকর, সেবক-সেবিকা ইত্যাদির অভাব নাই; অথচ বৃদ্ধ বয়সে ও অসুস্থ শরীরে মায়ের এত পরিশ্রম করার সার্থকতা কি? ব্রহ্মচারী মনের কথা মাকে খুলিয়া বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "বাবা, কাজ করাই ভাল।"

তারপর একটু নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আশীর্বাদ কর, যতদিন আছি, যেন কাজ করেই যেতে পারি।"

মায়ের কাজের অন্ত ছিল না। জয়রামবাটীতে ভক্তদের তত্ত্বাবধান, সকাল বেলা ঘণ্টা দুই ধরিয়া তরকারি কোটা, ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, পূজার আয়োজন করা, স্বহস্তে পূজা করা, পূজার পর প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া, অন্ততঃ একশ খিলি পান সাজা, বৈকালে নিজ হাতে আটা-ময়দা মাখিয়া রুটি-লুচি তৈয়ার করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কাব করা ইত্যাদি কাজ তিনি প্রত্যহ প্রীতির সহিত ধারাবাহিকভাবে করিয়া যাইতেন। গৃহে অপর লোক থাকিলেও সবটাই যেন তাঁহার একার কাজ—কাহারও অপেক্ষায় তিনি বসিয়া থাকিতেন না। তিনি বলিতেন, "শরীর এদিকে পড়ে যাচ্ছে, আর কাজও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।" উদ্বোধনের বাড়িতে বর্ষার সময় সকলে কাপড় শুকাইতে দিয়া নিশ্চিন্তমনে নিজ নিজ ঘরে বসিয়া আছেন।। এদিকে হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া হয়তো কাপড়গুলি ভিজিয়া গেল। মায়ের পায়ে বাত থাকিলেও তিনি তখন ভিজা বারাণ্ডায় যাইয়া কাপড়গুলি তুলিয়া আনিয়া ও নিংড়াইয়া দক্ষিণের ঘরে সযত্নে শুকাইতে দিলেন। কেহ অনুযোগ করিলে বা বাতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে বলিলেন, "না, বাবা, এই যাচ্ছি, এই সামান্য একটু।"

মঠের কয়েক জন সাধু তপস্যায় যাইবেন শুনিয়া কিশোরী মহারাজ মাকে বলিলেন, "এই কর্মের মধ্যে থাকা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। আমিও তপস্যা করতে যাব, আপনি অনুমতি দিন।" মা বলিলেন, "সে কি গো! আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, এ কি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুণতে কোথায় যাবে?"

কাশীধামে স্বামী শান্তানন্দকে মা উপদেশ দিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে; কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।" অবশ্য উপযুক্ত অধিকারীকে মা তপস্যার অনুমতিও দিতেন; কিন্তু আমরা এখানে অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

ছোট ছোট বিষয়েও শ্রীমায়ের তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকিত এবং তিনি বিশৃঙ্খলা সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন জয়রামবাটীতে গৃহকার্যে নিযুক্ত একজন স্ত্রীলোক ঝাঁট দিয়া ঝাঁটাটি ছুঁড়িয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিলে তিনি বলিলেন যে, ঝাঁটাটিকেও সম্মান দিতে হয়; সামান্য কাজও শ্রদ্ধার সহিত করিতে হয়; ছোট জিনিস বলিয়া তুচ্ছ করিতে নাই।

অপচয় তিনি পছন্দ করিতেন না। একদিন বলরামবাবুর বাড়ীর চাকর চুপড়িতে করিয়া কিছু আতা আনিয়া উদ্বোধনে ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া গেল এবং

নীচে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপড়িটির কি হইবে? নীচে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "ও আর কি হবে, রাস্তায় ফেলে দে।" মা উহা উপর হইতে শুনিতে পাইয়া রাস্তার দিকে বারাণ্ডায় গিয়া দেখিলেন, চুপড়িটি সুন্দর এবং কাজে লাগিতে পারে; সুতরাং এইরূপ অপচয়ের নিন্দা করিয়া উহা আনিয়া ধুইয়া রাখিয়া দিলেন।

রামময় প্রতি শনিবার বদনগঞ্জ হইতে জয়রামবাটী যান। তাই কোন ভাল খাবার থাকিলে মা তাঁহার জন্য তুলিয়া রাখেন। এক শনিবারে কোন ভক্ত মহিলা ভুনিখিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। রামময় আসিলে মা তাঁহার সম্মুখে প্রচুর খিচুড়ি ধরিয়া দিলেন। তিনি পরিমাণমত খাইয়া বাকিটা ফেলিয়া দিতে উঠিলে মা বলিলেন, "বাবা, এমন ভাল জিনিস ফেলো না," এবং পাশের বাড়ির এক সদ্‌গোপের মেয়েকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সে আসিয়া আহ্লাদ সহকারে উহা লইয়া গেলে মা বলিলেন, "যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।" কোন জিনিস তিনি নষ্ট হইতে দিতেন না। ফল ও তরকারির খোসা ইত্যাদিও গরুর জন্য তুলিয়া রাখিতেন।

গতানুগতিক ধারায় চলিতে অভ্যস্ত মানুষের জীবন্ত সমাজে অকস্মাৎ এমন অনেক খাপছাড়া প্রশ্ন উপস্থিত হয়, যাহার সমাধান বহু স্থানে সমাজ শুধু অবজ্ঞা দিয়াই করিতে চায়। কিন্তু মহামানবের হৃদয়মুকুরে সেক্ষেত্রেও সত্যের এরূপ আলোক প্রতিফলিত হয়, যাহার সাহায্যে সমাজ নূতন পথের সন্ধান পায়। কলিকাতায় মায়ের বাড়ীর সম্মুখে একটি লোক থাকিত। তাহার উপপত্নীর কঠিন পীড়া হইলে সে প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছিল। গুণগ্রাহিণী শ্রীমা ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি সেবাটাই করেছে, মা, এমন দেখি নি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান!" মা যাঁহাকে বলিলেন, তিনি মায়ের সম্মুখে চুপ করিয়া থাকিলেও অন্তরে ঘৃণাই পোষণ করিলেন—উপপত্নীর আবার সেবা! মায়ের এই ঔদার্য বুঝিতে একটু সময় লাগিবারই কথা।

শ্রীমাকে আমরা এযাবৎ গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পাইয়াছি। ইহাতে যেন কেহ স্থির না করিয়া ফেলেন যে, তাঁহাতে বালিকা-সুলভ কোন সরলতা বা নারীজনোচিত রসিকতাদি ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার সরল ও সরস ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার গরিমাকে তখনকার মতো ঢাকিয়া তাঁহাকে সাধারণের সহিত মিশাইয়া দিয়া এক পরম আত্মীয়তা স্থাপন করিত। অপরে যেখানে অত্যধিক বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়া বা নিজের বুঝিবার ক্ষমতা ঢাকিয়া বাহবা লইতে চায়, মা সেখানে নিজের অপারগতাদি সরলভাবে স্বীকার করিতেন এবং অপরের

নিকট আপনাকে স্বেচ্ছায় হাস্যাস্পদ করিয়া নিজেও সে হাসিতে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন।

কলিকাতায় প্রথম আগমনের সময় মাতাঠাকুরানী একবার কলঘরে ঢুকিয়া কল খুলিবামাত্র যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতে থাকে। ইহাতে তিনি ভয় পাইয়া তখনই বাহির হইয়া আসেন এবং বলিতে থাকেন যে, কলে সাপ ঢুকিয়াছে। শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; কারণ কলিকাতার লোকের জানাই আছে যে, অনেকক্ষণ জল বন্ধ থাকিলে নলের ভিতর বায়ু জমে এবং আবার জল আসার সময় কল খুলিলেই সবেগে বায়ু বাহির হইতে থাকায় ঐরূপ আওয়াজ হয়। শ্রীমা অপরের সে হাসিতে অপ্রস্তুত না হইয়া বরং উহা উপভোগ করিয়াছিলেন এবং পরেও ভক্তদের নিকট এই গল্প বলিয়া সরলা বালিকার ন্যায় আমোদ করিতেন।

শ্রীমা জয়রামবাটীতে যে হারিকেন-লণ্ঠন রাখিতেন, তাহার চিমনির চারিদিকে তারের ঘের দেওয়া ছিল। লণ্ঠনটি শ্রীমা সযত্নে রাখিতেন বলিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চিমনি খুলিয়া পরিষ্কার করিতে পারিতেন না, বলিতেন, "ওতে অনেক কলকব্জা, আমি খুলতে পারিনে।" কলিকাতার একটি মেয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "অমুকের বউ ঘাড়িতে দম দিতে জানে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্কে ধাঁধা লাগিত; মায়ের লাগিত কলকব্জায়! যুগপ্রবর্তনে অবতীর্ণ এই যুগ্ম আত্মার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের দান সম্বন্ধে এই অপূর্ব মনোভাব প্রণিধানযোগ্য।

তারপর মায়ের দাম্পত্যজীবনের জ্ঞান। ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল, তাঁহার স্বামী মন্মথ তাহাকে চড় মারিয়াছে। মা কারণ জানিতে চাহিলে রাধু বলিল, সে মন্মথকে গামছা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। মা যেন রাগিয়া গিয়া রাধুর পক্ষ লইয়া কথাবার্তায় দেখাইতে লাগিলেন যে, মন্মথের দোষ হইয়াছে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত জনৈকা মহিলা যাই বলিলেন যে, রাধু গামছা ছুঁড়িয়া মারিয়া থাকিলে বরের চড় মারা অস্বাভাবিক নয়, মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি, বউমা? তোমাদের কি এরকম হয়? ঠাকুরের সঙ্গে তো আমার এরকম কখনও হয়নি—এসব জানি না।" আর রাধুকে বলিলেন, "শোন, তোরই তো দোষ তাহলে—ঐ যে বউমা বললে।"

অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক তিনি অপরের সহিত ছেলেমানুষী করিতেন। বহু সেবক থাকিতেও শ্রীমা একটি ছোট ছেলেকে বলিতেছেন "দে বাবা, চারটি ফুল তুলে—লক্ষ্মী ধন আমার!" ছেলে কিছুতেই তুলবে না, মাও ছাড়িবেন না। শেষ পর্যন্ত তাহাকে দিয়াই তিনি ফুল তোলাইলেন। বহু সেবিকা থাকিতেও মা গ্রামের এক বৃদ্ধাকে ধরিয়া বসিলেন, "দে মা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে, পাটা বড় কামড়াচ্ছে।" বুড়ী কিছুতেই হাত বুলাইবে না; বলে-

সারাদিন খাটিয়া সে ক্লান্ত; এই রাত্রে কোথায় বিশ্রাম করিবে, না আবার হাত বুলানো! মা তবু বলেন, "দে না, একটু হাত বুলিয়ে; কি আর করবি; বাছা বল!" শেষ পর্যন্ত মায়েরই জয় হইল।

রামময় তখন ছেলেমানুষ; বদনগঞ্জে পড়েন এবং শনিবারে স্কুলের পর মায়ের বাড়ীতে আসিয়া কাজকর্ম করিয়া সোমবারে ফিরিয়া যান। শ্রীমা তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছেন এবং খুব স্নেহ করেন। একদিন অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। রামময় ও মা রুটি বেলিতেছেন, আর নলিনীদিদি সেঁকিতেছেন। রামময় খুব দ্রুতহস্ত; একসঙ্গে তিনখানি রুটি বেলেন, আবার হাত না দিয়াই ঘুরাইতে পারেন। এইভাবে কাজ চলিতেছে; হঠাৎ নলিনীদিদি বলিয়া উঠিলেন, "পিসীমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।" মা ছোট বালিকাটির মতো অভিমান দেখাইয়া চাকি-বেলুন সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তবে আমি বেলব না, ওই বেলুক। আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ী হয়ে গেলুম, আর ও দুধের ছেলে, গলা টিপলে দুধ বেরোয়, ও আমার চেয়ে ভাল বেলেছে!" রামময়ও বেলুন চাকি সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, আপনি না বেললে আমিও বেলব না," আর নলিনীদিদিকে বলিলেন, "আপনি কি করে বুঝছেন কোন্‌টা আমার আর কোন্‌টা মার?" মা তখন আবার বেলিতে বসিলেন।

তাঁহার জীবনে রঙ্গরসেরও অভাব ছিল না। একদিন নিবেদিতা ও কৃষ্টিন আসিয়াছেন। নিবেদিতা দুই-চারিটি বাংলা শব্দ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে বলিলেন, "মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী।" কৃষ্টিনও ইংরেজীতে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। শুনিয়া মা সহাস্যে বলিলেন, "না, বাপু, আমি কালীটালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।" কথাগুলি ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিলে নিবেদিতা ও কৃষ্টিন বলিলেন, "মাকে অত কষ্ট করতে হবে না, আমরাই তাঁকে জননী রূপে দেখব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব।" শ্রীমাকে উহা বুঝাইয়া দিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা না হয় দেখা যাবে।"

জয়রামবাটীতে মাতাঠাকুরানীর জ্বর হইয়াছে, তাই সাগু খাইতে খাইতে ভক্তসন্তানদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "কি গো, আজ যে প্রসাদে ভক্তি নেই?" আর একদিন প্রসন্নমামার ঘরের ভিতর মা পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। প্রকাশ মহারাজ নিকটে গিয়া পদ্মফুল দিয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বলিতেছেন, "মা আমাকে আর ঘুরোবেন না।" শ্রীমা উত্তর দিতেছেন, "আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পারলে, আমি একটু ঘুরোব না?"

শ্রীমা নিজে রঙ্গরস করিলেও কাহারও আহাম্মকিতে যখন সকলে উপহাস করিত, তখন তিনি অযথা ঐ হাসির পাত্রকে ব্যথা না দিয়া বরং সহানুভূতি দেখাইতেন। তাঁহার শেষবার জয়রামবাটীতে থাকার সময় বড়দিনের ছুটিতে

রাঁচির ভক্তেরা অনেকগুলি ফল লইয়া আসিয়াছেন। ভাবিনী দেবী নাম্নী মায়ের এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা ভগিনী সেখানে আছেন, মায়ের বাড়ীতে তিনি ভাবিনী মাসী নামে পরিচিত। মাসীর বৃদ্ধা মাতা তখন অসুস্থ; তাই শ্রীমা বুড়ীর জন্যে দুইটি বেদানা পূর্বেই মাসীর হাতে দিয়াছেন। ইহার পরেই রাঁচির ফলগুলি আসিতে দেখিয়া মাসীর আরও পাইবার ইচ্ছা হইল; তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। বাবা তখন পাগল ভেবে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে এসব জিনিস আমারই ঘরে আসত।" কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মায়ের মুখেও একটু হাসি দেখা দিল; কিন্তু তাহা বিদ্রূপের নহে, পরন্তু সৌহার্দ্যের হাস্য। তিনি মাসীকে বলিলেন, "তা নে না, তোর আর কি কি চাই" এবং সেবককে আদেশ করিলেন, "ও হরি, ঠাকুরের জন্য তুলে রেখে পেঁপে, বেদানা আরও কিছু ফল ভাবিনীকে দাও তো।" পরে মাসীকে সহানুভূতির সহিত বলিলেন, "পেঁপে যেন তোর মাকে খাওয়াসনে, বড় ঠাণ্ডা।"

অর্থ অলঙ্কারাদির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় একটু ভিন্ন রকমের। উহা হাতে লইবামাত্র তিনি মাথায় ঠেকাইতেন। ঐ বিষয়ে ঠাকুরের অন্যরূপ আচরণের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি অকপট, অথচ অতি অর্থপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আর আমি! আমি যে, বাবা, মেয়েমানুষ! ঠাকুর যে আমায় সোনার গয়নাও পরিয়েছেন!" অর্থাদির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, যেহেতু উহা লক্ষ্মীর প্রতীক। কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে কোন আসক্তি ছিল না। একবার জয়রামবাটী যাইবার পূর্বে মা সেবকের হাতে একখানি দশটাকার নোট দিয়া দেশের এক দুঃস্থা মেয়ের জন্য একখানি গায়ের কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিলেন। সেবক আড়াই টাকায় উহা কিনিয়া বাকি টাকা মাকে ফেরত দিতে গেলে মা বলিলেন যে, তিনি পাঁচ টাকার নোট দিয়াছিলেন, সুতরাং অত টাকা ফেরত লইবেন না। সেবক তখন জানিতে চাহিলেন, "প্যাঁটরায় কখানা দশ টাকার নোট এবং কখানা পাঁচ টাকার নোট ছিল মনে আছে তো?" শ্রীমা বলিলেন, "না।" সেবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বসুদ্ধ কত টাকা ছিল তাও কি মনে আছে?" মা উত্তর দিলেন, "না।" তখন সেবক বলিলেন, "তবে বুঝে দেখুন। বেশী কেন দিতে যাব? আর বেশী পাবই বা কোথা?" এত করিয়া বলায় তবে মা টাকা ফেরত লইলেন।

মায়ের এই অনাসক্তি জন্মগত। তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। তাঁহার তিরোধানের পর মায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা কিছু বন্দোবস্ত থাকা উচিত ভাবিয়া তিনি একবার তাঁহার জন্য দুই শত টাকার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। মা ঐ টাকা লইয়া পুটুলি বাঁধিয়া মশলার হাঁড়িতে রাখিয়া দেন। ঠাকুর ইহা

জানিতে পারিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "টাকা অমন করে রাখতে আছে?" এই কথা জনৈক সেবককে বলিয়া মা মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন, "এখন দেখ, তাঁর ইচ্ছায় কত টাকা আসছে আর যাচ্ছে!" অর্থের এইরূপ আসা যাওয়াকে শ্রীমা সাক্ষিরূপেই দেখিতেন। প্রথম প্রথম তিনি ভক্তদের প্রদত্ত প্রণামীর টাকা স্পর্শও করিতেন না, গোলাপ-মা প্রভৃতি যাঁহারা যখন থাকিতেন, তাঁহারাই উহার ব্যবস্থা করিতেন। পরে বিধির বিধানে রাধুকে আশ্রয় করিয়া লোক-কল্যাণার্থে মায়ের মন যখন জাগতিক ভূমিতে নামিয়া আসিল এবং তাঁহার 'সংসার' বাড়িয়া চলিল, তখন তাঁহাকেই সব দিক সামলাইতে হইত। এই সময়েও ডাকে টাকা আসিলে প্রথম প্রথম মামারাই উহা রাখিতেন; প্রয়োজন-স্থলে মা টিপসহি দিতেন। পরে উপস্থিত কোন সেবক মায়ের নাম লিখিয়া দিতেন। মা টিপসহি দিয়া টাকাগুলি মুঠা করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। টাকা বেশী নাড়াচাড়া গণাগাঁথা বা বাজানো তিনি পছন্দ করিতেন না; বলিতেন, "টাকার আওয়াজ শুনলে গরীব লোকের মনে লোভ জন্মে।" টাকা একটা সাধারণ বাক্সে থাকিত এবং উহা হইতে খরচ হইত; কিন্তু কোন হিসাব রাখা হইত না। তিনি বাক্সের চাবি সেবককে দিয়া টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতে বলিতেন, অথবা নিজেই বাক্স খুলিয়া বলিতেন, "এই রয়েছে, নিয়ে যাও।" আবার বাজারের পর উদ্বৃত্ত টাকা হাতে দিলে তিনি না দেখিয়াই তুলিয়া রাখিতেন। অনেক সময় মা হয়তো নিজেই জিনিস কিনিতেন। জয়রামবাটীর সতীশ সাঁইয়ের মা প্রায়ই তরকারি বেচিতে আসিত। শ্রীমা উহা কিনিয়া এক মুঠা পয়সা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিতেন এবং উহা হইতে তাহার প্রাপ্য লইয়া যাইতে বলিতেন। কখনও কখনও সে বাড়ী গিয়া দেখিত যে ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা বেশী আনিয়াছে; তখন আবার ফিরাইয়া দিয়া যাইত।

ইহা হইতে কেউ ধরিয়া লইবেন না যে, শ্রীমা অপচয় করিতেন বা তাঁহার কোনরূপ সাংসারিক বুদ্ধিবিবেচনা ছিল না। নিজে সর্ব বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও অপরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে সকল দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতে হইত। বিশেষতঃ জয়রামবাটীতে নূতন বাড়ী হওয়ার পর ঐ গৃহের কর্ত্রীরূপে তাঁহাকে কাজে আরও বেশী মন দিতে হইত।

নূতন বাড়ীর উপর স্থানীয় পঞ্চায়েৎ বার্ষিক চারি টাকা ট্যাক্স ধার্য করিলেন। প্রথম বারের ট্যাক্স দেওয়া হইল; মা উহা জানিতেন না—তিনি তখন কলিকাতায়। দ্বিতীয় বারে তাঁহার উপস্থিতিকালে চৌকিদার ট্যাক্স লইতে আসিলে তিনি জনৈক সেবককে উহা দিতে নিষেধ করিলেন এবং হাঁটাহাঁটি করিয়া উহা মকুব করাইতে বলিলেন। সামান্য টাকার জন্য মায়ের এই দৃঢ়তা দেখিয়া সেবক আশ্চর্য হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

পরে মা নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, "আজ আমি এখানে আছি চৌকিদারী টাকা দিয়ে দিলুম। কিন্তু পরে সাধু ব্রহ্মচারী কেউ থাকবে ; হয়তো তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে—সে কোথায় টাকা পাবে?" যাহা হউক পঞ্চায়েৎ-প্রেসিডেন্টের কথামত ঐ বৎসর ট্যাক্স দেওয়া হইলেও এই চেষ্টার ফলে পরবৎসর হইতে উহা বন্ধ হইয়া গেল।

জ্ঞান মহারাজ জয়রামবাটীতে থাকিতে বেশী দাম দিয়াও খাঁটি দুধ কিনিতে চাহিতেন। তিনি গোয়ালাকে বলিতেন, "টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই।" মা উহা শুনিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, "ও কি, জ্ঞান? এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরীবে খেতে পায়। আর তুমি অমন করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা—সে তো জল দেবেই; দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশী পাবে বলে আরও জল মেশাতে চাইবে।" নবাসনের আশ্রমে থাকিতে জ্ঞান মহারাজ একবার মায়ের বাড়ীর জন্য বেশী দামী প্রচুর 'খাঁটি দুধ' যোগাড় করিয়া দিলে গোপেশ মহারাজ উহা লইয়া জয়রামবাটী চলিলেন। কিন্তু পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, উহাতে ছোট একটি মাছ রহিয়াছে। তাই তাঁহার মনে হইল, ঐ দুধ ঠাকুরসেবায় লাগিবে না; সুতরাং ফেলিয়া দেওয়াই বিধেয়। তথাপি নিজের বুদ্ধি না খাটাইয়া ঐ দুধ মায়ের নিকট লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। ফেলিয়া দিবার কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "ফেলব কেন? ঠাকুরের ভোগে না দিলেও বাড়ির ছেলেপিলে আছে, তারা তো খেতে পাবে।"

এই উদাহরণে কেহ হয়তো শ্রীমায়ের সাংসারিক বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাইবেন—কোন উচ্চ ভাবের আভাস পাইবেন না; তাই অনুরূপ আর একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। একদিন কম্বল বিক্রয়ের জন্য এক স্ত্রীলোক উদ্বোধনে আসিয়াছে এবং নলিনীদিদি দর করিতেছেন। কম্বলওয়ালী চায় পাঁচসিকা আর নলিনীদিদি দিতে চাহেন এক টাকা—এইরূপ দর কষাকষি চলিতেছে শুনিয়া শ্রীমা দূর হইতে নলিনীদিদিকে বলিলেন, "তুমি চার আনা পয়সার জন্য এতক্ষণ যাবৎ খ্যাচম্যাচ করছ, ছিঃ! সে দু পয়সা পাবার জন্যই বোঝা মাথায় করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় ; আর তুমি কিনা সামান্য পয়সার জন্য এতখানি সময় ওকে আটকে রেখেছ! বিশেষ তোমার কম্বলের দরকারই বা কি? সবই তো তোমার আছে, তবু কিনতে গেছ! বরং বউমাকে (পার্শ্বস্থিতা ক্ষীরোদবালা রায়কে) একখানা দিলে ভাল হত। ও কম্বল ছাড়া অন্য জিনিস ব্যবহার করে না, তাও একখানা মাত্র কম্বল। এত শীতে সে এই নিয়েই থাকে তবু কারও কাছে চায় না।" মা এত খবর রাখেন দেখিয়া ক্ষীরোদবালার চক্ষে জল আসিল।

জয়রামবাটীতে তরকারি পাওয়া যায় না বলিয়া সতীশ সামুইয়ের মা উহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া ভক্তদের জন্য বহুগুণ দামে মায়ের বাড়ীতে বেচিত

তাই একবার ঐ বিষয়ে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলিলেন, "দেখ, সে আমার জন্য ভাবে; সময়ে অসময়ে তার কাছে গেলেই জিনিস পাওয়া যায়, সে আমার ভাঁড়ারী।"

শ্রীমা সকলেরই মা; সুতরাং তাঁহার আচার ও উপদেশ সকলেরই জন্য! নিজে বৈরাগ্যমণ্ডিত এবং বহু ত্যাগী সন্তানের দ্বারা পূজিতা হইলেও তিনি গৃহস্থ ভক্তদিগকে সঞ্চয় করিতে বলিতেন। আমরা সুরেন্দ্রবাবুর কথা পূর্বেই (২৭২ পৃঃ) বলিয়া আসিয়াছি। একবার বদনগঞ্জের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু মায়ের জন্য বহু টাকার ফল, মিষ্টি ও তরকারি কিনিয়া আনিলে মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বানরের চুল হলে বাঁধতে জানে না। তুমি এতগুলি টাকা কেন খরচ করলে? তোমার ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করা উচিত। আমার কি ঠাকুর কিছুর অভাব রেখেছেন?" প্রবোধবাবুর ইহাতে দুঃখ হইল; তিনি ভাবিলেন, "আমি গরীব বলে কি আমার সেবা করবার অধিকার নেই?" তাঁহার দুঃখ হইয়াছে বুঝিয়া মা বলিলেন, "কি জান, বাবা? কিছু সঞ্চয় করলে নিজের সংসারে ও ভবিষ্যতের উপায় হবে। আর সাধুদেরও সেবা করতে পারবে। কিছু না থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদের কি দেবে, বাবা?" প্রবোধবাবু একবার একটি ঘোড়া কিনিতে চাহিলে মা বলিয়াছিলেন, "না, বাবা, তুমি ঘোড়া কিনো না। 'আঁটেপিটে দড় তবে ঘোড়ার পিঠে চড়়।' তুমি বরং একটা পা-গাড়ি (সাইকেল) কিনো।"

তারপর মাতাঠাকুরানীর সাধারণ লোকব্যবহার। জিবটার শম্ভু রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সজনীবাবু মায়ের বাড়ীর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণকালে দুইটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলে মা টাকা ফিরাইয়া দিলেন। অথচ ডাক্তার নিজেদের বাগানের শাক-সবজি আনিলে মা সাদরে গ্রহণ করিতেন। সেবকের মনে এই অসামঞ্জস্যের প্রশ্ন উঠিয়াছে বুঝিয়া মা ঐদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, "দেখ, সজনীর টাকা রাখলুম না; জিনিসপত্র নিজেদের বাগানের নিয়ে আসে, সেটা আলাদা কথা। ওর বাড়ীর লোকেরা টাকা নেওয়ার কথা শুনলে ভয় পাবে— আমি তাদের বিষয়সম্পত্তিতে না হাত দিই। ওরা ভারী বিষয়ী লোক— তালুকদার। ওদের মনে সন্দেহ হতে পারে।"

একবার গোপেশ মহারাজ জয়রামবাটীতে থাকিতে সংবাদ পাইলেন, ঢাকার ভক্তগণ শ্রীমাকে ঐ অঞ্চলে লইয়া যাইবার ব্যয়নির্বাহার্থে দেড় হাজার টাকা চাঁদার জন্য ছাপানো আবেদন বাহির করিয়াছেন। তিনি চাঁদার কথা না বলিয়া সুযোগমত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনার পূর্ববঙ্গে যাবার সম্ভাবনা আছে কি?" মা বলিলেন, "কি জানি, বাবা। ঠাকুরের যেখানে ইচ্ছা— তিনিই জানেন।" তখন গোপেশ মহারাজ সাধারণভাবে বলিলেন যে, ঢাকার

ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন "চাঁদা তুলবে তো?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "লোকগুলো হুজুক নিয়েই আছে! এই দেখ না, ঠাকুরকে নিয়ে আর এক হুজুক উঠেছে।"

একবার গড়বেতা হইতে দুইজন ব্রহ্মচারী জয়রামবাটীতে আসিলে শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা আশ্রমের জন্য ঐ অঞ্চলের বড় বড় গ্রামে অর্থসংগ্রহ করিতে চায়। অমনি তিনি নিষেধ করিলেন, "দেখ, ঠাকুরেব নাম করে আমাদেব এই অঞ্চলে সেবাশ্রম বা অন্য কিছুর জন্য চাঁদা আদায় কবো না. শহরে বা দূরে যা হয় করো।"

মায়ের নূতন বাড়ীর গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় ললিতবাবু জয়রামবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য উৎসাহী হইয়া শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মা, আপনার নামে ভক্তদেব কাছে আবেদন বেব করলে এই গরীব লোকদের মহা উপকার হয়।" এইভাবে টাকা তোলা মায়ের মনঃপূত না হইলেও তিনি চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্য (হেমেন্দ্র) সেখানে আসিয়া ও প্রস্তাব শুনিয়া ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। মা ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং পরে রাসবিহারী মহারাজকে বলিলেন, "এ দেখছি আমাব যোগীনের মতো আমায় রক্ষা করলে। ছিঃ, ছিঃ! টাকা চাওয়া" ললিত-বাবু পরে নিজেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের ব্যয় বহন করিতেন।

ইহার পর মায়ের সৌজন্য। বেলা আন্দাজ দুইটার সময় জিবটার রায়দের একটি ছেলে কোন কাজে জয়রামবাটী আসিয়াছিল। সে সমবয়সী পূর্বপরিচিত রামময় প্রভৃতিকে দেখিয়া মায়ের বাড়ীর বৈঠকখানায় গল্প জমাইয়া বসিল। এদিকে মা খবর পাইয়াই উনান ধরাইয়া একটু হালুয়া তৈয়ার করিতে বসিলেন। রামময় বলিলেন, "মা, ওতো আপনার কাছে আসেনি—আমাদের বয়সী, তাই একটু আড্ডা দিতে এসেছে। ওর জন্যে এত কষ্ট করার কি দরকার?" মা উত্তর দিলেন, "তা কি হয়, বাবা? ওরা আমাদের জমিদার—রাজা! ওদের জন্য একটু করতে হয়।"

শ্রীমায়ের ভাষা ও উপদেশ প্রণালীতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কলিকাতার লোকদের সহিত কলিকাতার ভাষায় কথা বলিতেন ; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেশের ভাষাই ব্যবহার করিতেন। তবে দেশের ভাষার সহিত প্রায়ই কলিকাতার ভাষা মিশিয়া যাইত ; আবার কলিকাতার ভাষাতেও দেশের দুই-চারিটি শব্দ বা উচ্চারণভঙ্গি আসিয়া পড়িত।

তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই ছিল মিষ্ট এবং কোমল। ভক্তকেও আদেশ না দিয়া বলিতেন, "বাবা, এটা করলে ভাল হয় না?" তবে সন্তানগণের মঙ্গলকামনায়

সময়ে সময়ে অল্পবয়স্কদিগকে তিনি আদেশও দিতেন, "আমি বলছি, তুই এটা কর।"

কখনও কখনও শব্দ বা বাক্যবিশেষের উপর জোর দিবার জন্য তিনি উহা টানিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিতেন। বিভূতিবাবু একদিন জয়রামবাটী হইতে কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় রাস্তায় জলঝড় আরম্ভ হইল; মধ্যে আবার দারকেশ্বর নদ পার হইতে হয়। সারাদিন মায়ের দুশ্চিন্তায় কাটিল। পরের সপ্তাহে বিভূতিবাবু পুনরায় জয়রামবাটী আসিলে মা বলিলেন, "তুমি তো চলে গেলে! জল হচ্ছিল; আমি ভাবছিলুম বিভূতি আমার এতক্ষণ বড় নদী—পেরুল!"

কথার মধ্যে তিনি সুন্দর ছড়া কাটিয়া উহা চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-প্রণেতা শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন একদিন মাতাঠাকুরানীর নিকট আসিয়া 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাবা!" তখন অক্ষয়বাবু বলিলেন, "মা, আমি বললুম, 'মা', আর তুমি বললে, 'হ্যাঁ'। আর কিসের ভয়?" শ্রীমা অমনি উত্তর দিলেন, "না বাবা, অমন কথা বলো না। 'যার আছে ভয়, তারই হয় জয়'।" জনৈক স্ত্রীভক্তকে শ্রীমা একদিন বুঝাইতেছিলেন যে, মানুষের দেওয়া জিনিস থাকে না; সুতরাং তাহাদের কাছে কিছু চাইতে নাই—এমন কি, বাপ বা স্বামীর কাছেও নহে। পরে বলিলেন, "ঠাকুর যখন দেবেন, তখন রাখবার জায়গা পাবে না। ঠাকুরের দেওয়া জিনিস ফুরোয় না। যে চায় সে পায় না, যে চায় না, সে পায়।" নিবেদিতার দেহত্যাগপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা)।"

এই সমস্ত ভাববহুল প্রবাদবাক্যাদি-প্রয়োগ ছাড়াও মায়ের এমন একটা সুন্দর শব্দবিন্যাসপদ্ধতি ছিল, যাহা সরল হইলেও অতীব চিত্তাকর্ষক অথচ মার্জিতরুচি এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সংবাদ শ্রীমাকে জানাইতে গিয়া যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা সন্ধিশর্ত বুঝাইতে লাগিলেন, তখন একটু শুনিয়াই মা বলিলেন, "ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ।" যতীন্দ্রবাবু কথাটার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।"

আর ছিল তাঁহার সুন্দর উপমা-প্রয়োগ। ঈশ্বরলাভ শুধু তাঁহার কৃপাতেই হয়; তবে সাধনাদিরও প্রয়োজন আছে, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—এই কথা বুঝাইতে গিয়া মা বলিলেন, "শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের

উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষণি হয়।" পত্রে দুই জনের মনোমালিন্যের সংবাদ পাইয়া উত্তরে মা জানাইয়াছিলেন, "সময়ে সবই সহ্য করতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।" অনেক ভক্তই শ্রীমায়ের নিকট দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার ন্যায় গুরুলাভ করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের জীবনে কিছুই হইতেছে না। এইরূপ স্থলে তিনি আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময় (দীক্ষাকালে) করে দিয়েছি। তবে যদি সদ্য শান্তি চাও, সাধন-ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে!" এই কৃপালাভ ও কৃপাবিষয়ে সচেতন হওয়ার পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানা সমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে যে, স্থানান্তর হয়েছে? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে, অন্যত্র এসেছ?"

কোমলতার প্রতিমূর্তি শ্রীমা কাহারও মনে কষ্ট দিতে পারিতেন না; আর তাঁহার স্বভাবই এই ছিল যে, অপরে যেখানে দোষটুকুই বাড়াইয়া তুলিত, তিনি সেখানে এতটুকু গুণ দেখিতে পাইলে উহারই প্রশংসায় শতমুখ হইতেন। তাই ভক্তের উপর সর্বদা তাঁহার আশীর্বাদই বর্ষিত হইত। জনৈক ভক্ত একদিন কতকগুলি আম কিনিয়া কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে আনিলেন। অগ্রভাগ খাইলে দেবতার ভোগে দেওয়া চলে না জানিয়া তিনি দোকানীর কথায় বিশ্বাস করিয়া চাখিয়া দেখেন নাই। মধ্যাহ্ন-ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে টক বলিয়া কেহ মুখে দিতে পারিলেন না। মা কিন্তু একটি আম খাইয়া বলিলেন, "না এ বেশ টক টক আম।" মা একটু টক পছন্দ করিলেও বর্তমান ক্ষেত্রে ঐরূপ বলার উহাই একমাত্র কারণ ছিল না; প্রকৃত কারণ ছিল ভক্তের মান রক্ষা করা। অন্য স্থলেও দেখা যাইত যে, ভক্তের আনীত মিষ্ট ইত্যাদি খারাপ হইলেও মা উহার দুই-একটি মুখে দিতেন।

ভক্তদিগকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহার জন্য যে জলখাবার প্রসাদ রাখা হইত, তাহা ভক্তদিগকে দিতে দিতে অনেক সময় নিজের জন্য কিছুই থাকিত না। আবার তিনি স্বয়ং প্রসাদ ভাগ করিতে বসিলে নিজে প্রত্যহ যে মিছরির পানাটুকু খাইতেন, তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইত বা অল্পই অবশিষ্ট থাকিত।

আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা না হইলেও শ্রীমায়ের ব্যবহার ও উপদেশাবলী এত সুন্দর, উদার, তথ্যবহুল ও মর্মস্পর্শী ছিল যে, নিবেদিতার ন্যায় সুশিক্ষিতা পাশ্চাত্য মহিলাও একসময়ে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা হয়তো অতি সরল স্ত্রীলোকের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তবু আমার দৃষ্টিতে, তাঁহার পবিত্রতা যেমন

চমকপ্রদ ছিল, তেমনি অপূর্ব ছিল তাঁহার সুমার্জিত সৌজন্য এবং অপরের ভাব বুঝিবার মতো পরম উদার মন। তাঁহার নিকট উত্থাপিত প্রশ্নগুলি যতই কঠিন বা অভিনব হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনও উত্তরদানকালে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। মায়ের অগোচরে সমাজে যেসব বিপ্লব ঘটিতেছে, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হইয়া যদি কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তবে তিনি অভ্রান্তদৃষ্টিতে সে সমস্যার মর্মোদ্ঘাটন করিয়া প্রশ্নকর্তার মনকে সেই বিপদ কাটাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন" ('দি মাস্টার এ্যাজ আই স হিম')।

সর্বশেষে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনধারার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাইব। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁহার শেষ রাত্রে উঠিবার যে অভ্যাস ছিল, তাহা সারা জীবন অব্যাহত ছিল। রাত্রি তিনটায় ঠাকুরদেবতার নাম করিতে করিতে তিনি শয্যাত্যাগ এবং প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দর্শন করিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরকে শয়ন হইতে তুলিতেন ও জপে বসিতেন। স্বাস্থ্য খারাপ হইলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না; বরং শরীরে না কুলাইলে মুখহাত ধুইবার পর আবার শুইতেন। যথাকালে ওঠা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" পূজার ফুল, বেলপাতা ও ফল নিজ হাতে সাজাইয়া তিনি আন্দাজ নয়টার সময় পূজায় বসিতেন। এক ঘণ্টায় পূজা শেষ হইয়া যাইত। পরে তিনি শালপাতা সাজাইয়া সকলকে প্রসাদ দিতেন। শেষের দিকে মা উদ্বোধনে থাকিতে স্ত্রীভক্তেরা এই সকল কাজে সাহায্য করিতেন এবং সাধুদের কেহ কেহ পূজা করিতেন। পূজা ও স্তব-পাঠাদিতে বিলম্ব হইলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, "আগে পুজো ও ভোগ সেরে নিয়ে যত পারে স্তবপাঠ করুক না। এ কি! লোকে সব জল খেতে পায় না, বেলা হয়ে যায়।" মা নিজে যেমন নিরলসভাবে প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে দ্রুত সম্পাদন করিতেন, অপরেও সেইরূপ করে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

দ্বিপ্রহরে আহার শেষ হইতে প্রায় দুইটা বাজিয়া যাইত। তখন শ্রীমা বিশ্রাম করিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে সুযোগ বুঝিয়া অনেক ভক্ত মহিলা প্রায়ই আসিতেন। মা শুইয়া শুইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন। পরে আন্দাজ সাড়ে তিনটায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ও কাপড় কাচিয়া ঠাকুরের শীতল দিতেন। ততক্ষণে আরও স্ত্রীভক্ত আসিয়া জুটিতেন। শীতল দিবার পর মা মালা লইয়া বসিতেন এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীভক্তদের সহিত কথা কহিতেন। পুরুষভক্তেরা তাঁহার নিকট আসিতেন প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময়। স্ত্রীভক্তেরা তখন অন্য ঘরে গিয়া বসিতেন। মা সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া তক্তপোশের উপর

পা ঝুলাইয়া বসিয়া পুরুষদের প্রণাম লইতেন। তখন গ্রীষ্মকাল হইলে কেহ তাঁহাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতেন। মা ভক্তদের 'কেমন আছেন?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ ঘাড় নাড়িয়া বা অনুচ্চ স্বরে দিতেন; উপস্থিত অপর কেহ মায়ের কথা স্পষ্ট করিয়া আবৃত্তি করিতেন। কাহারও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি সর্বশেষে আসিতেন। ঐ ব্যক্তি পরিচিত হইলে মা নিজেই কথা বলিতেন, নতুবা অপরের সাহায্য লইতেন। সন্ধ্যার আগে তিনি আবার জপে বসিতেন এবং সন্ধ্যার পর উহা শেষ করিয়া ভোগের পূর্ব পর্যন্ত মেজেতে শুইয়া থাকিতেন। ঐ সময়ে কোন স্ত্রীভক্ত তাঁহার পায়ে বাতের তেল বা আমবাতের জন্য গায়ে মরিচাদি তেল মালিশ করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের ভোগের পর আহারাদি করিয়া শুইতে এগারটা, সাড়ে এগারটা বাজিয়া যাইত।

মায়ের আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। শাকের মধ্যে ছোলা-শাক, মূলাশাক প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় ছিল। জ্বরের পর অরুচি হইলে তাঁহাকে অনেক সময় ছোলাশাক দেওয়া হইত। বেগুনি, ফুলুরি, ঝালবড়া, আলুর চপ প্রভৃতি তেলে-ভাজা জিনিস তিনি পছন্দ করিতেন। শীতকালে সকালের পূজায় মুড়ি ও ফুটকড়াই-এর সহিত ঐ সকল জিনিস মাঝে মাঝে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইত। মুগের নাড়ু, ঝুড়িভাজা ইত্যাদিও তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার আমাশয়ের ধাত ছিল বলিয়া কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন তাঁহার জন্য আমরুল শাকের ব্যবস্থা দেন। শেষাশেষি তিনি উহা প্রায়ই খাইতেন। মঠ হইতে কেহ উদ্বোধনে আসিলে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাহার হাতে উহা পাঠাইয়া দিতেন। রাতাবি সন্দেশ এবং (লাল আলুর) রসপুলি পিঠা তাঁহার প্রিয় ছিল। সকালে তিনি একটু মিছরির শরবত খাইতেন; মিষ্ট আম অপেক্ষা অম্লমধুর—"টক টক, মিষ্টি মিষ্টি"—আমই অধিক ভালবাসিতেন। পেয়ারা-ফুলি, ছোট ল্যাংড়া ও আলফনসো তিনি পছন্দ করিতেন। ডান হাঁটুতে বাত থাকায় তিনি দই নামমাত্রই খাইতেন। পেটের অসুখ ও বাতের জন্য তিনি ইদানীং একটু অফিম খাইতেন; তাই মধ্যাহ্নে ও রাত্রে আধসের করিয়া দুধের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে এক পোয়া মাত্র খাইয়া তিনি বাকি দুধে ভাত মাখিয়া ভক্তদের জন্য রাখিয়া দিতেন। উদ্বোধনে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সকালে এবং বৈকালে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই ঐ প্রসাদের কিছু কিছু পাইতেন। বৈকালে পান ও জল ছাড়া তিনি কিছুই খাইতেন না। রাত্রে দুই-তিনখানি লুচি, একটু তরকারি ও প্রায় দেড় পোয়া দুধ খাইতেন। তিনি প্রত্যহ চারিবার দাঁতে গুল দিতেন। নারিকেলের পাতা ও দোক্তা পোড়াইয়া উহা তৈয়ার হইত।

মা যখন জয়রামবাটীতে মামাদের বাড়ীতে ছিলেন, তখন সকাল সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত বারান্ডায় বসিয়া তরকারি কুটিতেন। ঐ সময় ভক্ত

সন্তানগণ কাছে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন ও শাকসবজির পাতা বাছিয়া দিতেন। স্নান সারিয়া তিনি প্রায় নয়টার সময় পূজায় বসিতেন এবং পূজার পরে ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। ভক্তেরা সাধারণতঃ মুড়ি, মিষ্ট এবং হালুয়া পাইতেন ; কখনও বা উহার সহিত তাঁহাদেরই আনীত ফলমূলও থাকিত। প্রসাদ বিতরণের পর রাঁধুনীকে জল খাইতে বসাইয়া তিনি রান্না করিতেন। তরকারিতে লবণ, ঝাল ও মশলা একটু কম দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল, যেহেতু শ্রীশ্রীঠাকুর ঐরূপ রান্নাই পছন্দ করিতেন।

ভক্তগণ বাড়ীর মধ্যে মাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি তাঁহাদিগকে মিষ্ট, জল এবং অন্ততঃ দুই খিলি পান দিতেন। মায়ের জন্য ভক্তগণ যাহা লইয়া আসিতেন, অথবা কলিকাতা হইতে যাহা পাঠাইতেন তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিতেন। পরে ভক্তদের মধ্যে উহা এমনভাবে বিলাইতেন, যেন উহা ভক্তসেবার জন্যই আসিয়াছে। গ্রামের অনেক বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষও সন্তানাদিসহ প্রায়ই 'দিদিঠাকুরুন'কে প্রণাম করিতে আসিত এবং হাত ভরিয়া ফল, মিষ্ট প্রভৃতি লইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিত। স্বামী সারদানন্দজী ও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ বলরাম বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর প্রেরিত বেদানা ও আম প্রভৃতি ভাগ করিয়া প্রথমে ৺সিংহবাহিনী, ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতার জন্য পাঠাইতেন ; পরে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদিগকে দিতেন। মিষ্টান্নাদিও এইরূপে বিতরিত হইত। আবার কোন ভক্ত অনুপস্থিত থাকিলে বা তাঁহার শীঘ্র আসিবার কথা থাকিলে, তাঁহার ভাগ তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। একবার কোন পর্বোপলক্ষে পুলিপিঠা হইয়াছিল। বিভূতিবাবু ছুটি পাইলেই জয়রামবাটী আসেন জানিয়া মা তাঁহার জন্য পিঠা তুলিয়া রাখিলেন ; কিন্তু বিভূতিবাবুর সেবার আসিতে বেজায় দেরি হইল। তথাপি মা তাঁহার আশায় প্রতিদিন পিঠাগুলি আবার ভাজিয়া তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন আর বলিতে থাকিলেন, "কাল হয়তো আসতে পারে ; যদি আসে, মনে হবে, আহা, খেতে পেলে না।" এইরূপে চারি দিন পরে বিভূতিবাবু মায়ের বাড়ীতে গিয়া নিজের ভাগ পাইলেন।

জয়রামবাটীর নূতন বাড়ীতেও তাঁহার জীবনধারা মোটামুটি একই রূপ ছিল। বিশেষ এই যে, শেষাশেষি শরীর দুর্বল হইয়া পড়ায় বেশী কাজ করিতে বা অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না ; পূর্বাপেক্ষা বেশী সময় তাঁহাকে শুইয়া কাটাইতে হইত এবং ঐ অবস্থাতেই আগের অভ্যাসমত জপ চলিত। সকালে একটু রৌদ্র উঠিলে তিনি বাহিরে বসিয়া ধনে, মৌরী ও পলতার জল খাইয়া তরকারি কুটিতে কুটিতে ভক্তদের সহিত আলাপ করিতেন। বেলা নয়টা আন্দাজ ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছিয়া ঠাকুর ও গোপালের পূজা করিতেন ; তারপর দীক্ষার্থী কেহ থাকিলে দীক্ষা দিতেন। এই সব কাজ শেষ হইলে সকলকে

প্রসাদ দিয়া ও নিজে একটু মিছরির পানা ও মুড়ি বা খই কোটা খাইয়া রান্নার তদারক করিতেন। পরে ঠাকুর তাঁহাকে যেভাবে পান সাজিতে শিখাইয়াছিলেন, সেইভাবে প্রায় দুই শত খিলি পান তৈয়ার করিতেন। কোন কোন দিন ঐ সময় চিঠি পড়া হইত। মা শুনিয়া উত্তর বলিয়া দিতেন। দুপুরে রান্না হইয়া গেলে মা হাত-পা ধুইয়া পঞ্চপাত্র লইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিতেন, "রান্না হয়েছে, খেতে চল"—যেন তাঁহাকে রান্না ঘরে লইয়া যাইতেছেন। ভোগ হইয়া গেলে মা সেবকদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিতেন। তাঁহার পিত্তের ধাত ছিল এবং শরীর জ্বালা করিত বলিয়া কলাইয়ের ডাল পছন্দ করিতেন। এখানেও উদ্বোধনের মতো দুধে ভাতে মাখিয়া সকলকে প্রসাদ দিতেন। বেলা তিনটা নাগাদ হাত-পা ধুইয়া আসিয়া রাত্রের কুটনা কুটিতেন। এই সুযোগে পাড়ার মেয়েরা তাঁহার সহিত কথা বলিতে আসিত। রান্নার ভার রাঁধুনী ব্রাহ্মণী ও সেবকদের উপর থাকিলেও মা মাঝে মাঝে দুই একটি তরকারি রাঁধিয়া নিজ হাতে পরিবেশন করিতেন। যে দিন কার্যবশতঃ সকালে চিঠি পড়া হইত না, সেদিন সন্ধ্যার পরে হইত। রাত্রি নয়টার সময় তিনি ঠাকুরের ভোগ দিতেন, অথবা নিজে অপারগ হইলে অপর কেহ দিতেন। সকল বিষয় ও ভক্ত-পরিজনের দেখাশোনা করিয়া রাত্রে শুইতে প্রায় এগারটা বাজিয়া যাইত।

লীলাসংবরণ

শ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন। ১৩২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর) ভক্তগণ তাঁহার জন্মোৎসব করিবেন। এই শুভ-দিনে মাতৃদর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন ভক্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ; অপর কেহ কেহ বস্ত্রাদি পাঠাইয়াছেন। শ্রীমা ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছিয়া অনেক-গুলি কাপড়ের মধ্য হইতে বাছিয়া স্বামী সারদানন্দেব প্রেরিত কাপড়খানি পরিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিলেন। পরে ভক্তেরা তাঁহাকে কপালে সিন্দূর ও চন্দন এবং গলায় ফুলের মালা দিলেন। মা এই ভাবে পা ঝুলাইয়া তক্তপোশে বসিলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গেলেন। শ্রীমা সন্তানদের আহারের পূর্বে খাইতে পারিতেন না : কিন্তু সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নভোগ হইয়া গেলে সকলের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে ভক্তগণ ও গ্রামবাসী অনেকে প্রসাদ পাইলেন।

ইদানীং শ্রীমায়ের শরীর ভাল ছিল না ; জন্মতিথির এই সকল পরিশ্রমে সেদিন বিকালেই জ্বর আসিল। প্রথমে অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, স্থানীয় চিকিৎসায় সারিয়া যাইবেন : সুতরাং ঐরূপ ব্যবস্থাই হইল। কিন্তু জ্বর সম্পূর্ণ সারিল না ; মাঝে মাঝে বিরাম হয়, আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপে পুনঃপুনঃ ভুগিয়া তিনি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন দেখা যাইত যে. সামান্য জ্বর হইলেই তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইহারই মধ্যে আবার দীক্ষা চলিতেছে ; এমন কি জ্বর ছাড়িয়া পথ্য পাইবার পূর্বেও তিনি দীক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। ভক্তেরা বহু আশা লইয়া দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন ; মা তাঁহাদিগকে ফিরাইতে বা অযথা বসাইয়া রাখিতে পারিতেন না।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে এবং স্থানীয় চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে সমস্তই জানানো হইল। কিন্তু তিনি তখন কাশীতে ; তিনি না থাকিলে শ্রীমা কলিকাতায় যাইতে চাহিতেন না। আবার কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াও শরৎ মহারাজকে কার্যব্যপদেশে ভুবনেশ্বরে যাইতে হইল। সেখান হইতে ১৭ই ফেব্রুআরি কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি যখন জানিলেন যে, মায়ের অবস্থা ক্রমেই উদ্বেগজনক হইয়া পড়িতেছে তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য স্বামী আত্ম প্রকাশানন্দ ও অপর দুইজনকে জয়রামবাটী পাঠাইলেন। ইঁহারা শ্রীমায়ের নিকট সারদানন্দজীর অভিপ্রায় জানাইলে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। ১২ই

ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুআরি), মঙ্গলবার সকাল দশটায় যাত্রার সময় নির্দিষ্ট হইল এবং শ্রীমায়ের সঙ্গে রাধু, রাধুর মা, মাকু, নলিনীদিদি, নবাসনের বউ ও ব্রহ্মচারী বরদার যাওয়া স্থির হইল।

মায়ের শরীর তখন এতই দুর্বল যে, যাত্রার দুই-একদিন পূর্বে ৺সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল।" যাত্রার দিনেও তিনি পুণ্যপুকুরের ঘাটে পড়িয়া গিয়াছিলেন। পূর্বেই ঠিক হইয়াছিল যে, শ্রীমা ও রাধু দুইখানি পালকিতে জয়রামবাটী হইতে বিষ্ণুপুর যাইবেন, অন্যান্য সকলে পায়ে হাঁটিয়া আমোদর নদ পর্যন্ত যাইবেন এবং অপর পারে গরুর গাড়িতে উঠিবেন। কিন্তু রাধু কিছুতেই পালকিতে চড়িতে চাহিল না , মাও বিন্দুমাত্র পীড়াপীড়ি না করিয়া মাকুকেই তাহার খোকার সহিত দ্বিতীয় পালকিতে যাইতে বলিলেন। যাত্রার দিন সকালে গরুর গাড়ির যাত্রীরা রওয়ানা হইয়া গেলেন। শ্রীমাও ঠাকুরের পূজা শেষ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ অনেকেই তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন. আর সজলনয়নে বলিতেছেন, "শরীর সেরে শিগ্‌গির চলে এসো ; আমাদের বেশী দিন ভুলে থেকো না।" "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা ; তোমাদের কি ভুলতে পারি ?"— বলিয়া শ্রীমা ঠাকুরের ফটোখানি কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সে তুলিয়া প্রণামান্তে গাত্রোত্থান করিলেন। সদর দরজা পার হইয়া তিনি ৺সিংহবাহিনী ও গ্রামের অন্যান্য দেবদেবীর উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে মামাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। তিনি গ্রামের বাহিরে যাইয়া আহেরের ধারে পালকিতে উঠিবেন; কারণ গ্রামে ৺সিংহবাহিনী বিরাজিতা আছেন বলিয়া মা কোথাও যাত্রা করিবার সময় গ্রামের মধ্যে পালকিতে উঠেন না। তিনি পালকিতে বসিলে তাঁহার চরণযুগল ধুইয়া দিবেন বলিয়া বড়মামী তাঁহাদের বাড়ীর দরজায় এক ঘটি জল ও একটি গামলা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার আর জল নিয়ে যাবার দরকার নেই . তুমি এগুলি হরির হাতে দাও, সেই ধুইয়ে দেবে।" মামী তাহাই করিলেন এবং এক গেলাস জল, সামান্য মিষ্ট ও একটু ছেঁচা পান লইয়া আহেরের দিকে চলিলেন। ঘোষপাড়ায় 'যাত্রাসিদ্ধি রায়কে প্রণাম করিয়া এবং গ্রামের দিকে মুখ ফিরাইয়া জননী জন্মভূমিকে প্রণাম করিয়া মা পালকিতে বসিলে হরি তাঁহার পদদ্বয় গামলাতে রাখিয়া ধুইয়া দিলেন ; বড়মামী জল ও মিষ্ট প্রভৃতি মাকে দিলেন। মা নিজের ব্যবহৃত একখানি চাদর হরিকে দিয়া বলিলেন, "হরি, এটি রেখে দিও।"

বরদা মহারাজ সাইকেলে চড়িয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ; তিনি ঐ ভাবেই বিষ্ণুপুর যাইবেন। তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন ; গ্রামবাসীরা

সকলে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে দেখিতে লাগিল। সে সময় আমোদর নদে বাঁধ দেওয়ায় ঘোরা পথে দুই-তিন মাইল বেশী চলিয়া শিহড়ে যাইতে হইবে। শিহড়ে শান্তিনাথের মন্দিরের নিকট পালকি থামাইয়া শ্রীমা পুকুরে হাত-পা ধুইয়া আসিয়া শিবকে প্রণাম করিলেন এবং দুই টাকার সন্দেশ, চিনি ও সরাগুড় কিনিয়া পূজা দেওয়াইলেন। গ্রামের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে সেখানে একত্র হইয়াছিল। মা তাহাদের সকলের হাতে প্রসাদ দিলেন, নিজে কিছু গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গের মাকু প্রভৃতিকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ রাধুর জন্য আঁচলে বাঁধিয়া লইলেন। কোয়ালপাড়া পৌঁছিতে এগারটা বাজিয়া গেল।

সেখানে আসিতেই বরদা মহারাজ শুনিলেন যে, পাথেয় টাকা ভুলবশতঃ কালীমামার বাড়ীতে ফেলিয়া আসা হইয়াছে, মাকে না জানাইয়া উহা চুপি চুপি লইয়া আসিতে হইবে। সুতরাং বরদা তাহা আনিতে গেলেন। এদিকে মা একটি কালো ডুরে মশারি না পাইয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বরদা মহারাজের অনুসন্ধান করিলেন। তখন তাঁহাকে না পাওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিবামাত্র মা তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জানিতে চাহিলেন। বরদা সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। মশারিটি কিন্তু পাওয়া গেল না। মা তখন বলিলেন, "সবই অমঙ্গলের লক্ষণ দেখছি।" পথে কিছু হারানো ভারী অশুভের সূচক—ইহাই ঐ অঞ্চলের প্রবাদ।

স্থির হইল, সেই দিন বিকালে পাঁচখানি গরুর গাড়ি বিষ্ণুপুর রওয়ানা হইবে; পালকি দুইখানি শ্রীমা ও মাকুকে লইয়া পরদিন সকালে যাত্রা করিবে এবং ঐ দিন বিকালে শেষ গাড়িখানি যাইবে। দ্বিতীয়দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে আশ্রমের ঠাকুরঘরে আসিয়া শ্রীমা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। সূর্যোদয়ের পরে সেবক শ্রীমায়ের বাসস্থান জগদম্বা আশ্রমে গেলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "এসেছ? এত দেরি করলে যে? রোদ হবে। এই যাত্রার ফুলটি নাও।" এই বলিয়া পূজার একটি ফুল নিজের মাথায় ঠেকাইয়া তাঁহার হাতে দিলেন। বলিলেন, "কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নাও।" সেবক তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার মাথায় ও বুকে সামান্য করজপ করিয়া দাড়ি ধরিয়া চুমা খাইলেন। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শিবিকায় উঠিলেন এবং গগন মহারাজকে হাতের লাঠি দিয়া উহা প্রসন্নমামাকে দিতে বলিলেন। উহা প্রসন্নমামারই লাঠি; দুর্বলতার জন্য মা উহাতে ভর দিয়া চলিতেছিলেন। প্রসন্নমামাকে দিবার জন্য তিনি একটি মশারিও গগন মহারাজের হাতে দিলেন। সর্বশেষে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, শরৎ রইল।" পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত ঐ কথার কোন সামঞ্জস্য ছিল না; তাই গগন মহারাজ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পালকি চলিতেছে। কোতলপুর পার হইয়া শ্রীমা বরদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সর্বদা আমাদের কাছে থেকো এবং সাবধানে চলো। রাধু ও মাকুর

গহনাগুলি সব মাকুর পালকিতে আছে।” কথাটা শুনিয়া বরদা স্বভাবতই সতর্ক হইলেন এবং মায়ের অনুগত বেহারাদের সর্দারকে একান্তে ডাকিয়া জানাইলেন, “মা ভয় পাচ্ছেন ; সাবধানে পথ চলতে হবে, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের কাছে জঙ্গলে।” সর্দার তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল, “আমরা বত্রিশ জন বেহারা আছি এবং প্রত্যেকের একখানি করে মজবুত লাঠি পালকির তলায় আছে।”

জয়পুরে আসিয়া মা পালকি নামাইতে বলিলেন। গতবারে জয়রাম-বাটীতে যাইবার সময় তাঁহারা যে চটিতে রান্না করিয়া খাইয়াছিলেন, উহা তখন ভগ্নপ্রায়। মা উহা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আহা, আমাদের সেই চটিখানি গো!” তিনি উহার নিকটে গিয়া এক গাছতলায় কম্বল পাতিয়া বসিলেন এবং বেহারাদের মুড়ি কিনিয়া দিবার জন্য দুইটি টাকা বাহির করিলেন। পরে মাকুর ছেলের দুধ গরম করিয়া দিয়া সামনের পুকুরে হাত-পা ধুইয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পয়সার মুড়ি এবং মাকু ও বরদার জন্য মুড়ির সহিত কিছু তেলেভাজা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। মুড়ি আসিলে মা অল্প দুইটি খাইয়া অপরদের দিয়া বলিলেন, “আর চিবুতে পারি না।” সকলের খাওয়া হইলে আবার যাত্রা শুরু হইল।

জয়পুর হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত আট মাইল পথ গভীর বনাকীর্ণ—সহজেই মনে একটু ভয় হয়। চারি মাইল জঙ্গলের পর তাঁতিপুকুরে দিনের বেলায় একটি ছোট দোকান বসে। সেখানে আসিয়া দেখা গেল যে, কতকগুলি মজুরশ্রেণীর লোক দোকানের পাশে বসিয়া জটলা করিতেছে। এ স্থানটা কোনরূপে পার হইয়া দুই মাইল যাইতে পারিলে মাঝে মাঝে লোকালয় পাওয়া যাইবে ; সুতরাং তেমন দুশ্চিন্তা থাকিবে না। কিন্তু মা পালকি হইতে দোকান দেখিয়াই বলিতেছেন, “একটু নামাতে বল দেখি, আমার পালকিতে বসে পা-টা ধরে গেছে। ঐ দোকান থেকে আধ পয়সার তেল একটা শালপাতায় করে এনে দাও পা-টায় মালিশ করি।” কথা শুনিয়া বরদা তো ভয়ে অস্থির। শেষে চুপিচুপি বলিলেন, “এইখানে কারা সব রয়েছে ; আপনার আর নেমে কাজ নেই। আপনি বসে থাকুন ; আমি তেল এনে দিচ্ছি।” এদিকে আবার মাকু বলিয়া উঠিল, “আমার মুড়ি খেয়ে খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।” মা কহিলেন, “খা না, ঐ পুকুরটায় খেয়ে আয়।” বরদা ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, “ও জল কি খাবে? খুব খারাপ।” কিন্তু শ্রীমা কহিলেন, “রাস্তায় ওই কত লোক খাচ্ছে। কিছু হবে না, যা। তুমি যাও ওকে খাইয়ে আন।” সুতরাং তেল কিনিয়া দিয়া, মাকুকে জল খাওয়াইয়া তবে তাঁতিপুকুর ছাড়িতে হইল।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সকলে বিষ্ণুপুরে গড়দরজায় সুরেশ্বরবাবু-দের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি গরুর গাড়িতে সকালে আটটায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত দেরি হল

কেন?" এবং মুড়ি খাওয়ার জন্য বিলম্ব হইয়াছে শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন ; কারণ বাঁকুড়ার লোকের অত্যধিক মুড়িপ্রীতি তাঁহাদের নিকট খুবই কৌতুক-প্রদ ছিল। সুরেশ্বরবাবু কয়েক মাস পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমা তাঁহার কথায় বলিতেছেন, "আহা, আমি এখানে এলে সুরেশ আমার সর্বদা জোড়হাত করে ঐখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকত ; কখনও বারান্ডাটিতে পর্যন্ত উঠত না। কি ভক্তিই ছিল!" তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমা মাঝে মাঝে বলিতেন, "সুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরিশবাবু!" সেই দিন এবং পরের দিন বিষ্ণুপুরে কাটাইয়া তৃতীয়দিন মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া সকলে এক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন এবং ২৭শে ফেব্রুআরি শুক্রবার রাত্রি প্রায় নয়টার সময় উদ্বোধনে পৌঁছিলেন।

মায়ের অস্থিচর্মসার শরীর দেখিয়া সচকিতা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা তাঁহার সঙ্গীদিগকে অনুযোগ সহকারে বলিলেন, "তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো? ভূতের মতন কালো! কেবল চামড়া ও হাড় কখানি এনে হাজির করলে গো? মায়ের শরীর যে এত খারাপ তা তো আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।" পরের দিন হইতেই স্বামী সারদানন্দজী মায়ের চিকিৎসার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন।

১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুআরি) হইতে ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং চারিদিন পরে জ্বরের বিরাম হয়। কিন্তু ২২শে ফাল্গুন বিকালে আবার ১০১ ডিগ্রী জ্বর হয়। উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় ২৯শে ফাল্গুন কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিকে ডাকিয়া আনা হয়। এই নূতন চিকিৎসার ফলে ৭ই চৈত্র হইতে পনর দিন জ্বর বন্ধ ছিল। ইহাতে সকলেরই আনন্দ হইল। এমন কি ভক্তেরাও একদিন উপরে আসিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন। কিন্তু পরে রোগ আবার দেখা দিল। এই সময় আর এক অসুবিধা ঘটিল। কবিরাজ প্রতিদিন সকালে এক তিক্ত পাচন খাইতে বলিয়াছিলেন। উহা খাইতে মায়ের কষ্ট হইত এবং মুখ এত তিক্ত হইয়া যাইত যে, মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আহারে রুচি হইত না; সুতরাং তেমন কিছু খাইতেও পারিতেন না। কবিরাজকে ইহা জানাইলে তিনি বলিলেন যে, এই রোগের জন্য তাঁহাদের শাস্ত্রে তিক্ত ছাড়া ঔষধ নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া ২৬শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) হইতে ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষকে ডাকিয়া আনা হইল। ইনি প্রায় এক মাস চিকিৎসা করিলেন। ইহাতেও ফল না হওয়ায় ১৮ই বৈশাখ (১লা মে) হইতে ডাক্তার প্রাণধন বসুর হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও এক এক দিন আনা হয়। ১৬ই মে প্রাণধনবাবু শ্রীমায়ের কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। তিনি খুব যত্নের সহিত

চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ফল হইল না। ১৮ই জ্যৈষ্ঠের (১লা জুন) পূর্বেই স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ডাক্তারেরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ঐ দিন হইতে কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ; ঐ সঙ্গে কবিরাজ কালীভূষণ সেনও মাকে দেখিতে আসিতেন। ইহার পরে কবিরাজ শ্যামাদাসকে পুনরায় আনা হয়। তাঁহার ছাত্র কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক নিত্য মাকে দেখিতে আসিতেন এবং স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। শেষ তিনদিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল আবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছিলেন।[১]

বস্তুতঃ শ্রীমায়ের উদ্বোধনে আসা অবধি স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার আরোগ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত তিন প্রকারের চিকিৎসা ছাড়া তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিরও ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অবস্থা যে ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যহ তিনচারিবার করিয়া জ্বর আসিত এবং জ্বর খুব বাড়িলে প্রায়ই হুঁশ থাকিত না। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে আবার পিত্তাধিক্যের জন্য শরীরে এত জ্বালা হইত যে, মা বলিতেন, "পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে থাকব।" সেবক ও সেবিকারা বরফে নিজেদের হাত ঠাণ্ডা করিয়া তাহা তাঁহার গায়ে বুলাইয়া দিতেন। বরফ না থাকিলে যাহাদের গা ঠাণ্ডা মা তাহাদের গায়ে হাত রাখিতেন; অবিরাম অসুখে ভুগিয়া তিনি শেষাশেষি বালিকার মতো হইয়া গিয়াছিলেন; অধিকন্তু দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছিল না। একদিন সকালে রাসবিহারী মহারাজকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমাকে কোলে করে বস।" সেবিকা সরলা দেবী কাছেই ছিলেন। রাসবিহারী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "মাকে একটু কোলে করে বস ; তোমরা মেয়েছেলে।" তিনি চুপ করিয়া থাকায় অবশেষে বালিশ উঁচু করিয়া তাহাতে ঠেসান দিয়া মাকে বসানো হইল এবং গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত করা হইল।

এইরূপ অসীম যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও দেখা যাইত যে, শ্রীমায়ের মাতৃহৃদয় সর্বদাই স্নেহে উদ্বেলিত হইতেছে! বরং এই সময়ে যেন উহার অধিকতর বিকাশ দেখা যাইত। সকালবেলা কবিরাজের বাড়ি যাইবার পূর্বে সেবক যখন অসুখের খবর লইতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি বলিতে ভুলিতেন না, "খেয়ে যাও, বেলা হবে।" কবিরাজেরা তাঁহাকে দেখিয়া নীচে নামিয়া গেলে বলিতেন, "বুড়োর (দুর্গাপ্রসাদ সেনের) নাতিকে (কবিরাজ কালীভূষণ সেনকে) জল খেতে দাও, সন্দেশ দাও, আম দাও। রাম কবিরাজকে দাও, বুড়ো কবিরাজকে (রাজেন্দ্রনাথ সেনকে) দাও।" ডাক্তার

১ স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি অবলম্বনে।

কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদবাবু বা শ্যামাপদবাবু যে কেহ আসিতেন, মা তাঁহাদের প্রতিও এইরূপ স্নেহমমতা দেখাইতেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন আরামবাগের প্রভাকরবাবু ও মণীন্দ্রবাবু আসিলে তিনি ক্ষীণস্বরে থামিয়া থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ, বাবা? বাঁচব কি? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল।" তারপর দেশের খবর লইলেন, "জল হয়েছে কি?" মায়ের পরিচিত রমণী নামক এক স্ত্রীলোকের হাত দিয়া মণীন্দ্রবাবু মায়ের জন্য কচি তাল পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমা উহা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই বলিলেন, "রমণী কখন এসেছিল জানি না ; জ্বরে হুঁশ ছিল না। তাকে বলো, সে যেন মনে দুঃখ না করে।" কাশীতে তখন স্বামী অদ্ভুতানন্দজী কঠিন অসুখে ভুগিতেছিলেন। মাতাঠাকুরানী এই পীড়ার সংবাদ জানিতেন। তাই যে কেহ কাশী হইতে আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "লাটু কেমন আছে?"

উদ্বোধনে শ্রীমায়ের সেবার জন্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা তাঁহার জন্য একটু কিছু করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। কিন্তু মা সেবাগ্রহণে এতই সংকুচিত হইতেন যে, সে সুযোগ অল্পই মিলিত। একদিন পথ্যগ্রহণের পর বেলা প্রায় এগারটার সময় মা তক্তপোশের উপর আড়-ভাবে শুইয়া আছেন দেখিয়া একজন সেবক ভাবিলেন, এই সময়ে পাখা লইয়া হাওয়া করিলে মা আরামে ঘুমাইতে পারিবেন। কিন্তু পাখা লইয়া চার পাঁচ মিনিট বাতাস করিতেই তিনি বলিলেন, "আর না, তোমার হাত ব্যথা করছে।" সেবক বুঝাইয়া দিলেন যে, হাতপাখাতে অত সহজে ব্যথা হয় না, ব্যথা হইলেই তিনি থামিবেন। কিন্তু মা একটু চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "না, বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ; থাক্, আমি অমনি ঘুমুচ্ছি।" ইহাতেও সেবক থামিতেছেন না দেখিয়া একটু পরেই বলিলেন, "বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।" অগত্যা পাখা বন্ধ করিতে হইল—বোধ হয় দশ মিনিটও সেবা করা হইল না।

ডাক্তার প্রাণধনবাবু প্রথম প্রথম যখন আসেন, তখন তাঁহাকে ষোল টাকা করিয়া ভিজিট এবং পাঁচ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হইত। একদিন মায়ের জন্য অনেক ফুল, ফল, মিষ্টি, দধি প্রভৃতি আসিয়াছিল। প্রাণধনবাবু যথা-নিয়মে সন্ধ্যার পরে মাকে দেখিয়া যখন নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সহিত কথা বলিতেছেন, তখন মায়ের আদেশে প্রচুর ফুল এবং ফলমিষ্টান্নাদি ডাক্তার-বাবুর গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়িতে উঠিবার কালে ডাক্তারবাবুর মুখ দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি জিনিসগুলি পাইয়া খুশীই হইয়াছেন। পরদিনও তিনি রোগী দেখিতে আসিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ঘর

আর একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন, সেখানে পরমহংসদেবের ছবি রহিয়াছে। ডাক্তারবাবু খ্রীষ্টান, কিন্তু তবু তাঁহার উদার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি নীচে গিয়া সারদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি?" শরৎ মহারাজ সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং প্রশ্নের উত্তরে ইহাও জানাইলেন যে, চিকিৎসার ব্যয় ভক্তেরাই বহন করিতেছেন। সহৃদয় ডাক্তারবাবু সেদিন হইতে ভিজিট লওয়া বন্ধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, কিছুদিন পরে যখন চিকিৎসার পরিবর্তন হইল তখনও তিনি নিজব্যয়ে ট্যাক্সি করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় আসিতেন এবং অনেকক্ষণ থাকিয়া মায়ের সংবাদ লইতেন।

রোগের প্রথমাবস্থায় শ্রীমায়ের স্নেহ ও সৌজন্যের ন্যায় আত্মীয়বর্গের প্রতি সপ্রেম ব্যবহারও বিশেষ চমকপ্রদ ছিল। চৈত্র মাসের প্রথম দিকে কলিকাতার ইটালির উৎসবে যাইবার পথে লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদা প্রভৃতি মাকে দেখিতে আসিলেন। কথায় কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে মা লক্ষ্মীদিদিকে বলিলেন যে, যোগীন-মা জ্বরে পড়িয়া আছেন। শুনিয়া লক্ষ্মীদিদি তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন এবং সেখান হইতে বিদায় লইয়া আর মায়ের নিকট না আসিয়া উৎসবে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও মা যখন দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদিদি আর ফিরিলেন না এবং অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তখন জনৈক সেবককে বলিলেন, "দেখ, তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ওকে কাপড় ও টাকা দিতে ভুলে গেছি। তুমি কেষ্টলালের (স্বামী ধীরানন্দের) সঙ্গে ইটালিতে গিয়ে উৎসব দেখে এস আর লক্ষ্মীকে টাকা-কাপড় দিয়ে এস। ইটালিতে ওরা ঠাকুরকে বেশ সাজায়।" এই বলিয়া দুইটি টাকা এবং একখানি নরুনপাড় কাপড় বাহির করিয়া দেওয়াইলেন।

ইহারই মধ্যে আবার তিনি ভক্তদিগকে ইষ্টলাভে সাহায্য তো করিতেনই বিশেষ কোন ভাগ্যবানকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন বলিয়াও প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে তিনি কাহারও নিষেধ শুনিতেন না।

রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায়ই তাঁহাকে তিনটি নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১১ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল) স্বামী অদ্ভুতানন্দ দেহরক্ষা করেন এবং ৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে) শ্রীমায়ের আশ্রিত পরম ভক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হন। শ্রীমায়ের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় উভয় সংবাদই তাঁহার নিকট গোপন করার কথা ছিল ; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ গোলাপ-মা উহা বলিয়া ফেলিলেন। সংবাদ শুনিয়া শ্রীমায়ের চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সেদিন জ্বরও বৃদ্ধি পাইল এবং রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। ইহারই কিছুদিন পরে ৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমায়ের সহোদর বরদাপ্রসাদ

জয়রামবাটীতে নিউমোনিয়া জ্বরে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীমায়ের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া এই খবর গোপন রাখা হইয়াছিল। শুধু অসুখের সংবাদই তিনি জানিতেন; তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেন, "বরদা কেমন আছে?" কিন্তু সেজোমামার দেহত্যাগের পর তিনি বলিলেন, "বরদা বুঝি নেই? দেখলুম (বারান্ডার) রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।" তখন সত্য কথা খুলিয়া বলিতে হইল। ইহা মায়ের পক্ষে খুবই শোকাবহ ছিল; স্নেহের ভ্রাতাকে হারাইয়া তিনি অশ্রুরোধ করিতে পারেন নাই।

শ্রীমায়ের এই শোক ও অশ্রু দর্শনের কালে তাঁহার বৈরাগ্যের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। ভ্রাতার জন্য তিনি কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারই অল্পদিন পরের ঘটনা, প্রত্যক্ষদ্রষ্টা গোপেশ মহারাজ লিখিতেছেন, "সে সময় একদিন মায়ের একটি কথায় অতীব বিস্মিত হইয়াছিলাম। দিন কয়েক পূর্বে সেজো-মামা মারা গিয়াছেন। মা সেই সংবাদে সাময়িক শোকার্ত হইলেও অতি সহজেই উহা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলেন। নিরুদ্বেগে সেই খবর আমাকে দিলেন, 'শুনেছ, বরদা মারা গেছে।' কাহার কথা বলিতেছেন, না বুঝিয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম; কারণ তিনি বিন্দুমাত্র শোকের ভাব প্রকাশ না করিয়া অচঞ্চলচিত্তে প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ দিবেন—ইহা ভাবিতেই পারি নাই। তখন মা খুলিয়াই বলিলেন, 'জয়রামবাটীর ফুদের (ক্ষুদের) বাপ।' খবর শুনিয়া আমি অতীব দুঃখিত হইলাম; কিন্তু ততোধিক আশ্চর্যান্বিত হইলাম মায়ের ব্যাকুলতার অভাব দেখিয়া।"

ভক্তদের সম্মুখে ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর আরও কয়েকটি ব্যাপার শীঘ্রই সংঘটিত হইয়া তাঁহাদিগকে অতি নিদারুণভাবে জানাইয়া দিল যে, শ্রীমা ক্রমেই মায়াতীত রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন; তাই স্বেচ্ছায় গৃহীত সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে জনৈক ভক্ত যখন বলিলেন, "মা, আপনার শরীর এবার বিশেষ খারাপ হয়ে গেছে। এত দুর্বল শরীর কখনও দেখি নাই।" তখন মা কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, দুর্বল খুব হয়েছে। মনে হয় এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্বদা তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। এই দেখ না, রাধুকে এত ভালবাসতুম, ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত করেছি। এখন ভাব ঠিক উল্‌টে গেছে। ও সামনে এলে ব্যাজার বোধ হয়, মনে হয়—ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নীচে নামাবার চেষ্টা করছে? ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য এতকাল এই সব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হত?"

মন সত্যই উঠিয়া যাইতেছিল। জ্বরের জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে তিনি আজকাল প্রায়ই বলিতেছেন, "আমাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে চল, গঙ্গার

ধারে আমি ঠাণ্ডা হব।" মা যেন পুরাতন আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইতে চাহিতেছেন। শরৎ মহারাজ গঙ্গাতীরে বাড়ী সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কাশীতে লইয়া যাইবারও কথা হইতেছে; কিন্তু ডাক্তাররা ঐ অবস্থায় নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ করিলেন।

শেষ পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন হইল না; কিন্তু তবু মায়া কাটাইতে তো কোন বাধা নেই। গৌরী-মা ও দুর্গা দেবী নিত্য সকালে গঙ্গাস্নানের পর আশ্রমে ফিরিবার পথে মায়ের নিকট আসিতেন এবং কিছু সময় থাকিয়া তাঁহাকে পাখা করিতেন। সেদিন তাঁহারা মায়ের নিকট আসিতেই তিনি বলিতেছেন, "আমাকে স্পর্শ করো না। রোজ কি করতে, কি দেখতে, বিরক্ত করতে আস?"

গৌরী-মা অকস্মাৎ এই ঔদাসীন্য দেখিয়া অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মা, আপনি অসুখে পড়ে আছেন, আমাদের মনে শান্তি নেই। সর্বদা আপনাকে দেখতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সময় পাই না। তাই রোজ একবার আপনার কাছে আসি।" মা কহিলেন, "আমার কাছে এসে কি হবে? আমি আর কারও ঝামেলা সহ্য করতে পারছি না।" পরে বলিলেন, "যদি আস তবে আমার ঘরে ঢুকো না, ঐ দরজার বার থেকে দেখে যেও, আর কোন কথায় বকিও না।" গৌরী-মা একেবারে স্তম্ভিত! তিনি কথা বলিতে না পারিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে থাকিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। পরদিন হইতে তাঁহারা নিয়মিত সময়ে আসিয়া মায়ের নির্দিষ্ট স্থানে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া নয়নজলে হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মা সব দেখিয়াও মোটেই টলিলেন না।

ইহার কয়েক দিন পরে রাধুর পালা। অবিশ্বাস্য হইলেও মা তাহাকেও বিদায় দিলেন। শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে শ্রীমা রাধুকে বলিতেছেন, "দেখ, তুই জয়রামবাটী চলে যা, আর এখানে থাকিস নে।" সেবিকা সরলা দেবীকে বলিতেছেন, "শরৎকে বল ওদের জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিতে।" সেবিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছেন? রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি?" মা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "খুব পারব, মন তুলে নিয়েছি।" সেবিকা ঐ কথা যোগীন-মা ও সারদানন্দজীকে জানাইলে যোগীন-মা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মা, ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "যোগেন, এর পর এদের সেখানেই থাকতে হবে যে, হরি (স্বামী হরিপ্রেমানন্দ) যাচ্ছে, ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। মন তুলে নিয়েছি, আর চাই না।" যোগীন-মা অনুনয় করিলেন, "ও কথা বলো না, মা। তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে থাকব?" মায়াতীত লোকে প্রসারিতদৃষ্টি শ্রীমা বলিলেন, "যোগেন, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়।" যোগীন-মা ইহার উপর আর কি বলিবেন?

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সারদানন্দজীর নিকট গিয়া সব জানাইলেন। তিনিও শুনিয়া হতাশচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন, তখন আর আশা নেই।" সেবিকা নিকটেই ছিলেন; তাহাকে তিনি বলিলেন, "তোমরা চেষ্টা করে দেখ, যদি মার মন রাধুর উপর একটু ফিরে আসে।" কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোনই ফল হইল না; তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া শ্রীমা একদিন স্পষ্টই বলিলেন, "যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না জেনো।"

শ্রীমায়ের এই দৃঢ় নিশ্চয় ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া সকলকে অতিমাত্র শঙ্কিত করিয়া তুলিল। ব্রহ্মচারী হরি জয়রামবাটী চলিয়া যাইবার পরই শ্রীমা একদিন সেবক বরদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধু, নলিনী—ওরা সেদিন হরির সঙ্গে দেশে চ'লে গেল না কেন? ওদের সবাইকে জয়রামবাটীতে রেখে এস।" এই কথা সারদানন্দজীকে জানানো হইলে তিনি অকস্মাৎ কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অপর ভক্তেরাও ভাবিতেছেন, "মা রাধুগতপ্রাণ; এত ভালবাসেন, তাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, এই অসুখে শুয়ে থেকেও রাধু ও তার খোকার অনুসন্ধান করেন। আর আজ এই অবস্থায় তাদের জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে বলছেন—একি ব্যাপার!" সকলে মায়ের মনোভাব সেদিন বুঝিতে না পারিলেও বা না চাহিলেও দিন কয়েকের মধ্যেই মায়ের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবহারে এই বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। মায়ের বিরক্তি দেখিয়া ক্রমশঃ নলিনীদিদি মায়ের কাছে যাইবার সাহস হারাইলেন এবং মাকু তাঁহার ঔদাসীন্যে মর্মাহত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া নলিনীদিদি বলিলেন, "আমরা থাকলে যদি পিসীমার কষ্ট হয়, তাহলে না হয় আমরা চলে যাই। কিন্তু লোকেই বা কি বলবে? তারা ভাববে, 'দেখেছ, তাঁর এই অসুখ, আর এরা এই সময় ফেলে চলে এল'!" সারদানন্দজী তাই মাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আপনার এই অসুখের সময় এদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওরা যাবে।" মা তবু বলিতেছেন, "তা পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তবে যেন আমার কাছে আর ওরা না আসে। আমার আর ওদের ছায়া দেখতেও ইচ্ছা নেই।" একেবারে মায়ানির্মুক্ত! শুধু কথায় নহে; কার্যে আরও অধিক বৈরাগ্যই প্রকটিত হইল। দেহরক্ষার দিন দশেক পূর্ব হইতে মাকে মেজের উপর বিছানায় শোয়ানো হইতেছে। একদিন দ্বিপ্রহরে সেবিকারা আহারে গিয়াছেন। জনৈক সেবক মায়ের কাছে বসিয়া নিত্যকার মতো পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। রাধু পার্শ্বের ঘরে শুইয়া আছে। তাহার খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া হামা দিতে দিতে আসিয়া অভ্যাসমত মায়ের বুকের উপর উঠিতেছে। মা তাহা দেখিয়া খোকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা যা, আর পারবিনি।" তারপর সেবককে

বলিলেন, "একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এস। এসব আর ভাল লাগে না।" সেবক খোকাকে কোলে করিয়া তাহার দিদিমার নিকট রাখিয়া আসিলেন।

মায়ের অসুখ ক্রমেই বাড়িতেছে; শরীর জীর্ণ হইয়া বিছানার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে। চিকিৎসকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। মাও ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেজন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। পূর্ববারের অসুখের পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আবার তো সেই রকম ভুগতে হবে।" এবারে স্নেহপাত্র সেবক একদিন অতি অনুনয়সহকারে বলিলেন, "মা, তুমি তো ইচ্ছা করলেই থাকতে পার।" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "মরতে কার সাধ?" তখন তাঁহার নিজের ইচ্ছা বলিয়াও কিছু নাই, ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া শেষ আহ্বানের জন্য তাঁহারই মুখ চাহিয়া আছেন, আর বলিতেছেন, "তিনি যখন নিয়ে যাবেন, যাব।" জীবকল্যাণার্থে তিনি শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং মায়াতীত মনকে কোন প্রকারে জগতের কার্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য রাধুর সহিত একটা মায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন সে সম্বন্ধ কাটিয়া গিয়াছে, তাই রাধুকে একদিন বলিলেন, "কুটা ছেঁড়া করে দিয়েছি। তুই আমাকে কি করবি, আমি কি মানুষ?" ইহাই রাধুর সহিত তাঁহার শেষ কথা। রাধু তাঁহাকে নিজের পিসীমা বলিয়াই জানিত, সুতরাং অকস্মাৎ উচ্চারিত সে কথার মর্ম সে তখন বুঝিতে পারে নাই, আর মাও তাহাকে বুঝিয়া লইবার সুযোগ দেন নাই।

শেষদিনের একমাস পূর্বে তিনি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ছবিখানি পূজা হইত, উহা অন্য ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক হইলে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, অতঃপর শৌচাদির জন্য তিনি বাহিরে যাইতে পারিবেন না। কাজেই ঠাকুরের ছবি অন্য ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

লীলাবসানের সাত দিন আগে সকাল আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় শ্রীমা শরৎ মহারাজকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া মায়ের পায়ের কাছে বাঁ দিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং নীচু হইয়া মায়ের হাতে হাত বুলাইতে উদ্যত হইলেন। মা অমনি মহারাজের ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতের নীচে রাখিয়া বলিলেন, "শরৎ, এরা রইল", বলিয়াই হাত সরাইয়া লইলেন। শরৎ মহারাজ কষ্টে অশ্রু রোধ করিয়া ভারাক্রান্তহৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আস্তে আস্তে পিছনে হাঁটিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেবকদের তখন কর্তব্য ছিল ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া, ঔষধ লইয়া আসা, দুধ আনা, পথ্য প্রস্তুত করা, হাওয়া করা ইত্যাদি; সেবিকাদের কাজ ছিল মায়ের ভাত রান্না করা, তাঁহাকে পথ্য খাওয়ানো, তাঁহার কাপড় কাচা, বিছানা পরিষ্কার করা ইত্যাদি; মায়ের তখন ক্ষুদ্র বালিকার স্বভাব—সরল, নানা বিষয়ে আবদার, অথচ সমস্ত মায়িক সম্বন্ধের অতীত। এক রাত্রে বারটার সময় সেবিকা

সরলা দেবী তাঁহাকে খাওয়াইতে গেলে মা বায়না ধরিলেন, "আমি খাব না। তোর একই কথা, 'মা খাও', আর 'বগলে কাঠি (থার্মোমিটার) লাগাও'।" সেবিকা জানিতেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে শরৎ মহারাজকে ডাকিবার কথা বলিলেই মা নির্বিবাদে আহার করেন; তাই বলিলেন, "তবে কি, মা, মহারাজকে ডাকব?" তবু মা রাজী না হইয়া বলিলেন, "ডাক শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।" খবর পাইয়াই সারদানন্দজী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলে মা তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, "একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, বাবা" এবং তাঁহার হাত দুখানি লইয়া বলিলেন, "দেখ না, বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে—খালি 'খাও, খাও' এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" সারদানন্দজী কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "না মা ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।" এইভাবে সান্ত্বনা দিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখন কি একটু খাবেন?" মা বলিলেন, "দাও।" মহারাজ সেবিকাকে খাবার আনিতে বলিলে শ্রীমা কহিলেন, "না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।" সারদানন্দজী 'ফিডিং কাপ' হাতে লইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া বলিলেন, "মা, একটু জিরিয়ে খান।" এই মিষ্ট কথায় শ্রীমা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ তো, কি সুন্দর কথা—'মা, একটু জিরিয়ে খান।' এ কথাটা, আর ওরা বলতে জানে না? দেখ তো বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও, বাবা, শোও গিয়ে"—বলিয়া প্রিয় সন্তানের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। সারদানন্দজী মশারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখন আসি, মা।" মা কহিলেন, "এস বাবা, বাছার কত কষ্ট হল!" এ পর্যন্ত সারদানন্দজীর মনে সেবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি মাত্র দূর হইতেই উহা করিতে পারিতেন। শেষ অসুখের সময় শ্রীমা তাঁহার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সে রাত্রির ঘটনা ঐখানে সমাপ্ত হইলেও শ্রীমায়ের রোগজনিত ছেলে-মানুষি বাড়িয়াই চলিল। তাই পরদিন সকালে তিনি তাঁহার বালক সেবক বরদাকে বলিলেন, "তুমি কোথাও যেও না, সর্বদা আমার কাছে থেকো। ওরা আমাকে বড় জ্বালাতন করছে—কেবল কাঠি দেওয়া, আর 'খাও, খাও'।" এই ভাব ক্রমেই স্ফুটতর হইতে লাগিল। ইহাতে শরৎ মহারাজও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মায়ের কাছে আসিয়া তাঁহার বিছানায় বসিয়া এবং একখানি হাত সযত্নে কোলের উপর তুলিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি নম্র ও কোমল স্বরে ছোট বালিকাটিকে বুঝাইবার মতো বলিলেন, "মা, ওদের মনে খুবই কষ্ট হবে। ওরা আর কাঠি দেবে না। এই খাওয়াবার সময় হলো, কে খাওয়াবে?" তারপর সেবককে[১] বলিলেন, "দুধটা

[১] তখন দুইজন সেবক—রাসবিহারী মহারাজ ও বরদা মহারাজ এবং দুইজন সেবিকা—সরলা দেবী ও নবাসনের বউ ছিলেন। সাময়িকভাবে অপরে ইঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

ফিডিং কাপে করে দাও তো, বরদা! এই সময় আমিই খাইয়ে দিই।” মা বলিলেন, “কেন, এই বরদা খাওয়াবে। দুধ নিয়ে এস, বরদা, আমি খাচ্ছি।” সেবক দুধ আনিয়া মায়ের মুখে দিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। উহা তাঁহার পক্ষে একটু বেশী গরম ছিল। কিন্তু পাছে শরৎ মহারাজ অথবা সেবক কিছু মনে করেন, সেজন্য অতি স্নেহভরে বলিলেন, “ও কিছু না; আর সামান্য একটু ঠাণ্ডা করে দাও। বরদা বেশ পারবে।”

ফলতঃ মায়ের সর্বপ্রকার অবস্থার সহিত তখনও মিশ্রিত ছিল এক অসীম করুণা। সেবকের ত্রুটিস্থলেও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। সেবিকার প্রতি পরবর্তী ব্যবহারও তেমনি স্নেহকোমল। এইরূপ রোগীর পক্ষে বার বার আহার করা ও থার্মোমিটার দেওয়া সম্বন্ধে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক জানিয়া সেবিকা সরলা দেবী পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে কাজ বদলাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন, অতঃপর দুইদিন বরদা ও নবাসনের বউ দুধ খাওয়ানো ও থার্মোমিটার দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতে থাকিলেন এবং সরলা দেবী অন্য কাজ লইয়া রহিলেন। শ্রীমা লক্ষ্য করিলেন যে, সরলা দেবী আর আগের মতো সব কাজ করিতেছেন না, তিনি তাঁহার খোঁজ লইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিন দুপুরে মা তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, “তুই আমার উপর রাগ করেছিস, মা? আমি যদি কিছু বলে থাকি, কিছু মনে করিসনি, মা!” সরলা দেবী কিছু বলিতে পারিলেন না: তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি আবার পূর্বের ন্যায় কাজ করিতে থাকিলেন।

রোগবৃদ্ধির ফলে মায়ের হাতে-পায়ে শোথ হইয়াছে, বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই—বিছানাতেই শৌচাদি করানো হয়। শ্রীমতী সুধীরা ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মেয়েরা পালাক্রমে সব সময়ে থাকিয়া সেবা করেন। দেহ যাইবার মাত্র পাঁচদিন বাকি আছে। ভক্ত অন্নপূর্ণার মা দেখিতে আসিয়াছেন: কিন্তু ভিতরে যাইতে নিষেধ বলিয়া ঠাকুরঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ পাশ ফিরিয়া মা তাঁহাকে দেখিয়াই ইশারা করিয়া নিকটে ডাকিলেন। তিনি কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “মা, আমাদের কি হবে?” করুণাবিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে অভয় দিয়া মা থামিয়া থামিয়া বলিলেন. “ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?” একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, “তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা. কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।” যাহাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া ‘অভয়া শরীর পরিগ্রহপূর্বক স্বয়ং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, সেই আর্ত-দিগের প্রতি ইহাই তাঁহার শেষ বাণী।

বিদায়ের তিন দিন পূর্ব হইতে তিনি বড় একটা কথা বলিতেন না—সর্বদাই আত্মস্থ হইয়া থাকিতেন। কেহ তাঁহার মনকে নিম্ন ভূমিতে টানিতে চেষ্টা করিলে বিরক্তি বোধ করিতেন। পরে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বাক্ রোধ হইল। রোরুদ্যমান সেবকের প্রতি তাঁহার শেষ সান্ত্বনা, "শরৎ রইল, ভয় কি।" অবশেষে ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় (২১শে জুলাই, ১৯২০) তিনি কয়েকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। রোগে ভুগিয়া তাঁহার দেহ মলিন ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মহাসমাধির পর রোগের সকল চিহ্ন অপসৃত হইয়া মুখখানি যেন একটা পূর্ণতা লাভ করিল এবং এক অপূর্ব শান্তি ও দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই স্বর্গীয় ভাব দেহ শীতল হইয়া যাওয়ার অনেক পরেও বিরাজিত ছিল। অনেকে ঐ উজ্জ্বল মুখকান্তি দর্শন করিয়া বুঝিতেই পারিলেন না যে, শ্রীমা আর স্থূলদেহে নাই।

পরদিন (২১শে জুলাই) আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় স্বামী সারদানন্দজীর নেতৃত্বে সাধুভক্তগণ গন্ধপুষ্পমাল্যাদিতে সুসজ্জিত শ্রীমায়ের পূত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া 'রামনাম' কীর্তন করিতে করিতে উদ্বোধন হইতে বরাহনগরের পথে বেলুড় মঠে যাত্রা করিলেন। অনেক প্রবীণ ভক্তও পদব্রজে ইঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। ক্রমে শত শত ভক্ত তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বরাহ-নগরে নৌকাযোগে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীমায়ের দেহ মঠভূমিতে গঙ্গাতীরে রক্ষিত হইল। পরে স্ত্রীভক্তগণ উহাকে স্নান করাইয়া নব বস্ত্রে সাজাইলে বেলা তিনটার সময় স্বামীজীর মন্দিরের উত্তরে চন্দনকাষ্ঠে সজ্জিত চিতায় উহাকে আহুতি দেওয়া হইল। চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই দেখা গেল, গঙ্গার অপর তীরে বারিপাত হইতেছে; ভক্তগণ তাই একটু শঙ্কিত রহিলেন। কিন্তু এ পারে কিছুই হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং স্বামী সারদানন্দজী অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রথম কলসীর জল ঢালিয়া দিয়াছেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিয়া মঠভূমি ভাসাইয়া দিল। হোমাগ্নি নিবিয়া গেল; মাথায় শান্তিবারি এবং হৃদয়ে গভীর বিষাদ লইয়া সন্ধ্যাকালে সকলে স্ব স্ব স্থানে ফিরিলেন।

* * *

ঐ পবিত্র স্থানের উপর মাতৃমন্দির নির্মিত এবং ১৩২৮ সালের ৬ই পৌষ (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর), বুধবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি দিবসে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজিও দেশবিদেশের সহস্র সহস্র নর-নারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

পরিশিষ্ট

ঘটনাপঞ্জিকা

ঘটনা	খৃীষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ
শ্রীমায়ের জন্ম	২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩	৮ই পৌষ, ১২৬০
বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে গমন	মে, ১৮৫৯	বৈশাখের শেষ, ১২৬৬
২য় বার শ্বশুরালয়ে	ডিসেম্বর, ১৮৬০	অগ্রহায়ণ, ১২৬৭
দেশে দুর্ভিক্ষ	১৮৬৪	১২৭১
৩য় বার শ্বশুরালয়ে	মে, ১৮৬৬	বৈশাখ, ১২৭৩
৪র্থ বার শ্বশুরালয়ে	ডিসেম্বর, ১৮৬৬—	
	জানুয়ারি, ১৮৬৭	পৌষ-মাঘ (?), ১২৭৩
৫ম বার শ্বশুরালয়ে		
(ঠাকুর কামারপুকুরে)	মে-নভেম্বর, ১৮৬৭	জ্যৈষ্ঠ-অগ্রহায়ণ, ১২৭৪
দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন	মার্চ, ১৮৭২	চৈত্র, ১২৭৮
ষোড়শীপূজা	৫ই জুন, ১৮৭২	২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৯
জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন	১৮৭৩-এর মধ্যভাগ	১২৮০-এর প্রথমভাগ
পিতার দেহত্যাগ	২৬শে মার্চ, ১৮৭৪	১৪ই চৈত্র, ১২৮০
২য় বার দক্ষিণেশ্বরে	১৮৭৪	বৈশাখ, ১২৮১
জয়রামবাটী প্রত্যাগমন	১৮৭৫	আশ্বিন, ১২৮২
সিংহবাহিনী-মন্দিরে হত্যা	১৮৭৫	১২৮২
জগদ্ধাত্রীপূজা	নভেম্বর, ১৮৭৫	কার্তিক, ১২৮২
প্লীহাচিকিৎসা	১৮৭৫	১২৮২
শাশুড়ীর গঙ্গাপ্রাপ্তি	২৭শে ফেব্রুআরি ১৮৭৬	১৬ই ফাল্গুন, ১২৮২
শম্ভুবাবুর গৃহদান	১১ই এপ্রিল, ১৮৭৬	চৈত্র, ১২৮২
তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে	১৭ই মার্চ, ১৮৭৬	৫ই চৈত্র, ১২৮২
চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে	জানুআরি, ১৮৭৭	মাঘ, ১২৮৩
শম্ভুবাবুর দেহত্যাগ	১৮৭৭	...
৫ম বার দক্ষিণেশ্বরে	ফেব্রুআরি, মার্চ, ১৮৮১	ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৮৭
হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বর-ত্যাগ	১৮৮১	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ (স্নানযাত্রা)

ঘটনা	খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ
৬ষ্ঠ বার দক্ষিণেশ্বরে	১৮৮২	মাঘ-ফাল্গুন, ১২৮৮
৭ম বার দক্ষিণেশ্বরে	১৮৮৪	মাঘ, ১২৯০
রামলালের বিবাহে কামারপুকুরে	১৮৮৫ (?)	১২৯১
৮ম বার দক্ষিণেশ্বরে	মার্চ, ১৮৮৫	ফাল্গুন, ১২৯১
ঠাকুর শ্যামপুকুরে	অক্টোবরের আরম্ভ, ১৮৮৫	আশ্বিনের শেষ—২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২
কাশীপুরে সেবা	১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ —১৬ই অগস্ট, ১৮৮৬	২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ —৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩
তারকেশ্বরে হত্যাদান	ঐ সময় মধ্যে	ঐ সময় মধ্যে
কাশীপুর ত্যাগ	২১শে অগস্ট, ১৮৮৬	৬ই ভাদ্র, ১২৯৩
বৃন্দাবনযাত্রা	৩০শে অগস্ট, ১৮৮৬	১৫ই ভাদ্র, ১২৯৩
কলিকাতায় আগমন	৩১শে অগস্ট, ১৮৮৭	১৫ই ভাদ্র, ১২৯৪
কামারপুকুর গমন	সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭	ভাদ্র, ১২৯৪
বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে	১৮৮৮-এর অক্টোবর পর্যন্ত	১২৯৫-এর কার্তিক পর্যন্ত
পুরীধামে	১৮৮৮-এর নভেম্বর হইতে	১২৯৫-এর কার্তিক হইতে
কলিকাতায় আগমন	১২ই জানুআরি, ১৮৮৯	২৯শে পৌষ, ১২৯৫
কামারপুকুর যাত্রা	৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৮৯	চৈত্র, ১২৯৫
মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে	৪ঠা মার্চ, ১৮৯০	২১শে ফাল্গুন, ১২৯৬
গয়া যাত্রা	২৫শে মার্চ, ১৮৯০	১৩ই চৈত্র, ১২৯৬
ঘুষুড়ীর বাড়িতে	মে—সেপ্টেম্বর, ১৮৯০	জ্যৈষ্ঠ—ভাদ্র, ১২৯৭
দেশে গমন	অক্টোবর, ১৮৯০	কার্তিক ১২৯৭
জয়রামবাটীতে গিরিশচন্দ্র	১৮৯১-এর প্রথমার্ধ	১২৯৮
'জগদ্ধাত্রীপূজায় সারদানন্দ	১০ই নভেম্বর, ১৮৯১	২৬শে কার্তিক, ১২৯৮
নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে (পঞ্চতপানুষ্ঠান)	১৮৯৩	আষাঢ় হইতে কয়েক মাস, ১৩০০
দেশে গমন	...	১৩০০-এর 'জগদ্ধাত্রীপূজা
কৈলোয়ারে দুই মাস	১৮৯৪	মাঘ—ফাল্গুন, ১৩০০

ঘটনা	খ্রীষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ
বেলুড়ে ও আঁটপুরে	১৮৯৫	দুর্গাপূজা পর্যন্ত
বৃন্দাবন গমন	১৮৯৫	ফাল্গুন—চৈত্র, ১৩০১
দেশে গমন	১৩ই মে, ১৮৯৫	...
জয়রামবাটীর পথে কামারপুকুরে	১৩ই মে, ১৮৯৫	৩১শে বৈশাখ, ১৩০২
জগদ্ধাত্রীপূজায় দেশে	১৮৯৫	কাঃ, ১৩০২—বৈঃ, ১৩০৩
শরৎ সরকারের বাড়িতে একমাস	এপ্রিল, ১৮৯৬	বৈশাখ, ১৩০৩
সরকারবাড়ি লেনে	১৮৯৬	১৩০৩-এর প্রথমার্ধ
দেশে	নভেম্বর, ১৮৯৬	কালীপূজার পরে, ১৩০৩
বোসপাড়া লেনে	১৮৯৮-৯৯	১৩০৫-এর বৈশাখ হইতে ১৩০৬-এর শ্রাবণ
বেলুড় মঠের জমিতে পূজা	১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮	শ্যামাপূজার পূর্বদিন
নিবেদিতা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮	২৭শে কার্তিক, ১৩০৫
যোগানন্দের মহাসমাধি	২৮শে মার্চ, ১৮৯৯	১৫ই চৈত্র, ১৩০৫
অভয়চরণের মৃত্যু	২রা অগস্ট, ১৮৯৯	১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৬
দেশে গমন	অগস্ট, ১৮৯৯	১৩০৬ ...
রাধারানীর জন্ম	২৬শে জানুআরি, ১৯০০	১৩ই মাঘ, ১৩০৬
কলিকাতায় আগমন	অক্টোবর, ১৯০০	আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৭
বোসপাড়া লেনে	১৯০১-০২	ফাল্গুন বা চৈত্র, ১৩০৭
বেলুড়ে দুর্গাপূজায়	১৮-২২শে অক্টোবর, ১৯০১	১-৫ই কার্তিক, ১৩০৮
দেশে গমন	.	১৩০৮-এর শেষে
বাগবাজার স্ট্রীটে	১৪ই ফেব্রুআরি, ১৯০৪ হইতে ১৯০৫-এর মধ্যভাগ	১৩১০ মাঘ হইতে প্রায় দেড় বৎসর
পুরীধামে	১৯০৪-০৫	১৩১১-এর প্রথমভাগ হইতে মাঘের প্রথমভাগ
নীলমাধবের মৃত্যু	১৯০৫	চৈত্র (?), ১৩১১
দেশে গমন (বড় মামীর দেহত্যাগ)	১৯০৫-এর মধ্যভাগ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২
শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ	জানুআরির শেষে, ১৯০৬	মাঘের প্রথম সপ্তাহ, ১৩১২
গোপালের-মার গঙ্গাপ্রাপ্তি	৮ই জুলাই, ১৯০৬	২৪শে আষাঢ়,১৩১৩

ঘটনা	খ্রীষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ
গিরিশের দুর্গাপূজায় কলিকাতায়	অক্টোবর হইতে ১০ই নভেম্বর, ১৯০৭	আশ্বিনের শেষভাগ ১৩১৪
মামাদের সম্পত্তিভাগের জন্য সারদানন্দজী জয়রামবাটীতে	২৪শে মার্চ—২২শে মে, ১৯০৯	১১ই চৈত্র, ১৩১৫ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬
কলিকাতায় নিজবাড়িতে	২৩শে মে, ১৯০৯	৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬
বসন্তে শয্যাগত	জুন, ১৯০৯	আষাঢ়, ১৩১৬
দেশে যাত্রা	১৬ই নভেম্বর, ১৯০৯	৩০শে কার্তিক, ১৩১৬
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন	জুন (?), ১৯১০	আষাঢ় (?), ১৩১৭
কোঠারে	৫ই ডিসেম্বর, ১৯১০ হইতে ফেব্রুআরি, ১৯১১	১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘের শেষ, ১৩১৭
দাক্ষিণাত্যে	ফেব্রুআরি—মার্চ, ১৯১১	মাঘের শেষ হইতে দুই মাস, ১৩১৭
পুরীতে	৩রা এপ্রিল, ১৯১১	২০শে চৈত্র, ১৩১৭
কলিকাতায়	১১ই এপ্রিল, ১৯১১	২৮শে চৈত্র, ১৩১৭
দেশে যাত্রা	১৭ই মে, ১৯১১	৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮
রাধারানীর বিবাহ	১০ই জুন, ১৯১১	২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮
রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি	২১শে অগস্ট, ১৯১১	৪ঠা ভাদ্র, ১৩১৮
কলিকাতায় আগমন	২৪শে নভেম্বর, ১৯১১	৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮
বেলুড়ে দুর্গাপূজায়	১৬—২১শে অক্টোবর, ১৯১২	৩০শে আশ্বিন—৫ই কার্তিক, ১৩১৯
কাশীধামে	৫ই নভেম্বর, ১৯১২ ১৫ই জানুআরি, ১৯১৩	২০শে কার্তিক—২রা মাঘ, ১৩১৯
কলিকাতায়	১৬ই জানুআরি—২৩শে ফেব্রুআরি, ১৯১৩	৩রা মাঘ—১১ই ফাল্গুন, ১৩১৯
জয়রামবাটীতে	২৫শে ফেব্রুআরি, ১৯১৩	১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৯
ভূদেবের বিবাহ	৭ই মে, ১৯১৩	২৪শে বৈশাখ, ১৩২০
কলিকাতায় আগমন	২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩	১৩ই আশ্বিন, ১৩২০
দেশে যাত্রা	১৯শে এপ্রিল, ১৯১৫	৬ই বৈশাখ, ১৩২২

ঘটনা	খ্রীষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ
কোয়ালপাড়ায়	অগস্ট—সেপ্টেম্বর, ১৯১৫	ভাদ্র, ১৩২২
জয়রামবাটীতে নূতন বাড়িব গৃহপ্রবেশ	১৫ই মে, ১৯১৬	২বা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩
কলিকাতা যাত্রা	৬ই জুলাই, ১৯১৬	২২শে আষাঢ়, ১৩২৩
‘জগদ্ধাত্রীব অর্পণনামা	৭ই জুলাই, ১৯১৬	২৩শে আষাঢ়, ১৩২৩
বেলুড়ে দুর্গোৎসবে	৩—৬ই অক্টোবর, ১৯১৬	১৭—২০শে আশ্বিন, ১৩২৩
জয়রামবাটী যাত্রা	৩১শে জানুআবি, ১৯১৭	১৮ই মাঘ, ১৩২৩
জন্মোৎসবে জ্বর	৪ঠা জানুআবি, ১৯১৮	২০শে পৌষ, ১৩২৪
কোয়ালপাড়ায (জ্বর)	মার্চেব প্রথমার্ধ—২৮শে এপ্রিল, ১৯১৮	ফাল্গুনের শেষ, ১৩২৪ ১৫ই বৈশাখ, ১৩২৫
জযবামবাটীতে	২৯শে এপ্রিল— ৫ই মে, ১৯১৮	১৬ই বৈশাখ—২২শে বৈশাখ, ১৩২৫
কলিকাতায় আগমন	৭ই মে, ১৯১৮	২৪শে বৈশাখ, ১৩২৫
প্রেমানন্দেব মহাসমাধি	৩০শে জুলাই, ১৯১৮	১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫
বাধু সহ নিবেদিতা বিদ্যালযে	৩১শে ডিসেম্বব, ১৯১৮	১৬ই পৌষ, ১৩২৫
দেশে যাত্রা	২৭শে জানুআবি, ১৯১৯	১৩ই মাঘ, ১৩২৫
বিষ্ণুপুবে	২৭শে—৩০শে জানুআরি, ১৯১৯	১৩—১৫ই মাঘ, ১৩২৫
রাধুসহ কোয়ালপাড়ায়	৩১শে জানুআবি—২৩শে জুলাই, ১৯১৯	১৭ই মাঘ, ১৩২৫— ৭ই শ্রাবণ, ১৩২৬
ন্যাড়াব মৃত্যু	২০শে এপ্রিল, ১৯১৯	৭ই বৈশাখ, ১৩২৬
জযরামবাটীতে জন্মোৎসব (জ্বব)	১৩ই ডিসেম্বব, ১৯১৯	২৭শে অগ্রহাযণ, ১৩২৬
কলিকাতা যাত্রা	২৪শে ফেব্রুআবি, ১৯২০	১২ই ফাল্গুন, ১৩২৬
উদ্বোধনে আগমন	২৭শে ফেব্রুআবি, ১৯২০	১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৬
স্বামী অদ্ভূতানন্দের মহাসমাধি	২৪শে এপ্রিল, ১৯২০	১১ই বৈশাখ, ১৩২৭
রামকৃষ্ণ বসুব দেহত্যাগ	১৪ই মে, ১৯২০	৩১শে বৈশাখ, ১৩২৭
বরদাপ্রসাদেব দেহত্যাগ	২০শে জুন, ১৯২০	৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭
লীলাসংবরণ	২১শে জুলাই, ১৯২০	৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭

পরিশিষ্ট (পরিচয়-পত্রিকা[১])

(১) ভানুপিসী

ভানুপিসীর পিত্রালয় জয়রামবাটীতে—শ্রীমায়ের বাড়ীর নিকটেই। তিনি সদ্গোপ-বংশীয় শ্রীক্ষেত্র বিশ্বাসের কন্যা। পিসীর পিতৃকুল মুখুজ্যেদের যজমান এবং গ্রামসম্পর্কে তিনি শ্রীমায়ের পিসী। তাঁহার আসল নাম মানগরবিনী; উহাই প্রথমে মানু, পরে ভানুতে পরিণত হইয়া থাকিবে। জয়রামবাটীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলুই-শ্যামবাজারে তাঁহার অল্পবয়সে বিবাহ হয়। তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়া ছোটবেলাতেই মারা যায়, এবং তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার বাকি জীবন জয়রামবাটীতেই কাটিয়াছিল, ক্কচিৎ কখনও শ্বশুরবাড়ীতে যাইতেন।

শ্যামবাজার বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। ভানুপিসী শ্বশুরগৃহে রাগমার্গের সাধনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি পিতৃগৃহেও উহারই অনুসরণ করিতেন। কিন্তু শোনা যায়, তাঁহার দাদা গৌর বিশ্বাস অতি দুর্দান্ত ও বৈষ্ণববিরোধী ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনেও ভানুপিসীর ধর্মানুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে আসিতেন। ঐ সূত্রে ভানুপিসীর সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। জয়রামবাটীর লোকেরা ঠাকুরকে তখন "মুখুজ্যেদের ক্ষেপা জামাই" বলিয়াই জানিত। কিন্তু সাধিকা ভানুপিসী এই অসাধারণ পুরুষের স্বরূপ খানিকটা চিনিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি আসিলেই আকর্ষণে ছুটিয়া বার বার মুখুজ্যে বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন। পাড়ার মেয়েরাও অনেকেই আসিত। তাহাদের দেখিয়া ঠাকুর এমনভাবে কথা কহিতেন যে, তাহারা হাসিয়া অস্থির হইত অথবা লজ্জায় পলাইত। ঠাকুর তখন বলিতেন, "দেখলে গা, আগড়াগুলো সব উড়ে গেল। এবার তোমরা বস, কথা হবে।" ভানুপিসী ঠাকুরের কাছে আসিলেও সর্বদা দাদার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। রসিক ঠাকুরও ইহা জানিতেন; তাই মাঝে মাঝে "ঐ গৌরদা এল" বলিয়া ভয় দেখাইতেন, আর ভানুপিসী জড়সড় হইয়া যাইতেন; তখন ঠাকুর

১ গ্রন্থোল্লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের পরিচয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অথবা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'য় পাওয়া যাইবে বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। বর্তমান গ্রন্থের জন্য শ্রীমায়ের শিষ্যদের সকলের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বা অনাবশ্যক বোধে সে চেষ্টাও করা হয় নাই।

আবার বলিতেন, "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।" কখনও বা পরামর্শ দিতেন, গৌরদা যখন শাসাতে আসবে, তখন দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে নাচবে আর বলবে, 'ভজ মন গৌর-নিতাই।' তাহলে তোমাকে পাগল মনে করে সে আর কিছু বলবে না।" সরলা পিসী এই পরামর্শমত কাজ করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন।

ঠাকুর মধ্যে মধ্যে পিসীর কুটীরে যাইতেন। পিসী চরকায় সুতা কাটিতেন, আর ঠাকুর চরকার শব্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া হাত ঘুরাইয়া রঙ্গ-রসের গান গাহিতেন। ভানুপিসী যখন শ্রীমায়ের সহিত কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন ভগিনী নিবেদিতা এই ঘটনা শুনিয়া একখানি চরকা লইয়া আসিয়াছিলেন এবং পিসীকে উহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঠাকুরের গান শুনাইতে বলিয়াছিলেন। গান শুনিয়া নিবেদিতা খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সময়ে পিসীর পিতৃকুলের অবস্থা ভাল ছিল; গোয়ালে অনেক গরু ছিল এবং ঘরে দুধ, দই, ঘোল তখন যথেষ্ট থাকিত। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে তাহা খাইতে দিতেন।

একবার ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী হইতে কামারপুকুরে ফিরিবার সময় পিসীকে বলিলেন, "তুমি খিলি তৈরী করে খাওয়াতে পার?" পিসী তখনই পান সাজিতে ছুটিলেন ; কিন্তু ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া গোঁভরে চলিতে থাকিলেন। খিলি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পিসী দেখিলেন, ঠাকুর বহু দূর চলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক, চেঁচাইয়া ডাকিতে পারেন না, আর পিছন হইতে ডাকাও অন্যায়; সুতরাং তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিতে লাগিলেন। ঠাকুর অনেক দূর যাইয়া হঠাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং সবিস্ময়ে বলিলেন, "পিসী, তুমি এতদূর এসেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি পান চেয়েছিলেন, তাই নিয়ে এসেছি।" ঠকুর মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার হবে, তোমার হবে, তোমার হবে।" পিসী সম্ভবতঃ ভাবিলেন যে, তাঁহার সাধনার সুফল ফলিবে। কিন্তু পান হাতে লইয়াই ঠাকুর বলিলেন, "মেয়েমানুষ হয়ে এতদূর এসেছ; এখন বাড়ী ফিরে গেলে তোমাকে যে ঠেঙ্গাবে। তুমি এক কাজ করো—কুমোরবাড়ী থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ী যেও, তাহলে তারা মনে করবে যে, তুমি কুমোরবাড়ী গিয়েছিলে।"

ভানুপিসী ইহাকে তাঁহার জীবনের এক প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন এবং জয়রামবাটীতে আগত কোনও কোনও ভক্তকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া পান, কড়াই ভাজা, তালের বড়া ইত্যাদি খাওয়াইতে খাওয়াইতে উহা সাগ্রহে শুনাইতেন। ভক্তগণ ছিলেন তাঁহার নাতি ; কেহ কেহ ছিলেন 'বড় নাতি'। গিরিশ-বাবুর ভাগ্যে এই দ্বিতীয় আখ্যা জুটিয়াছিল। দেশদেশান্তর হইতে ভক্তগণ আসিতেছেন, অথচ নিকটের গ্রামগুলিতে ঠাকুরের নামে তেমন সাড়া নাই

দেখিয়া ভানুপিসী আক্ষেপ করিতেন, "বিষ্টুপুর তমলুক থেকে লোক আসে, আর আমাদের পোড়া দেশের কিছু হল না! প্রদীপের নীচে আলো থাকে না।" ভক্তদের পাইলে তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া ঠাকুরের কথা শুনাইতেন, অথবা স্নানাহারের কথা ভুলিয়া গিয়া ছেলেবেলায় শেখা পদাবলী বা ঠাকুরের মুখে শোনা গান গাহিতে থাকিতেন।

ভক্তদের যখন জয়রামবাটীতে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে, তখন ভানুপিসী বৃদ্ধা।[১] তাঁহার চেহারা পাতলা এবং বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। তখনও তাঁহার মুখ সদাপ্রফুল্ল ও সরলতাময়; তাঁহার ব্যবহার নিঃসঙ্কোচ ও আত্মীয়তাপূর্ণ। তিনি ব্রজগোপী ভাবে ভাবিতা ছিলেন এবং হাত নাড়িয়া, নাচিয়া গাহিয়া কথা কহিতেন। ঐশ্বরিক প্রসঙ্গ এবং ঠাকুর ও শ্রীমায়ের কথাই তিনি অধিক ভালবাসিতেন। তিনি তখন নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতেন। কখনও কোথাও যাইতে হইলে নিত্য-পূজিত ঠাকুরটি ইন্দুমতী দেবীর নিকট দিয়া বলিতেন, "মা, দুটি তুলসীপাতা তুলে 'তুলসীপত্রং রামকৃষ্ণায় নমঃ' বলে ঠাকুরের পাদপদ্মে দেবে।"

ভানুপিসীর জীবনের কোন কোন ঘটনা খুবই আমোদজনক। জয়রামবাটীর নাপিতেরা তখন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ। একবার তাহাদের গৃহে অষ্টপ্রহর কীর্তনে অন্য গ্রাম হইতে কীর্তনের দল আসিয়াছিল। গ্রামে হুলস্থুল; সকলেই কীর্তনে যাইতেছে। সন্ধ্যার একটু পরে পথে লোক-চলাচল কমিলে শ্রীমাও একজন সঙ্গিনীর সহিত চলিলেন; ব্রহ্মচারী গোপেশও একটু দূরে তাঁহাদের অনুবর্তন করিলেন। ঘোর অন্ধকার; সঙ্গিনীর হাতে একটি মিটমিটে লণ্ঠন। হঠাৎ দেখা গেল সামনে একটু দূরে শূন্যমধ্যে একটি জোনাকির মতো আলা হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে তাঁহাদেরই দিকে আসিতেছে। একটু কাছে আসিলে দেখা গেল, মানুষের মাথায় আলো। মা সকলের আগে ছিলেন। তিনি চিনিতে পারিয়াই মৃদুস্বরে ডাকিলেন, 'পিসী'! পিসীর তখন চকম ভাঙ্গিল। তিনি কীর্তন হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, কিন্তু মন কীর্তনেই মগ্ন থাকায় ডান হাতে মাথার উপর প্রদীপ রাখিয়া বাম হাতে কোমর ধরিয়া গানের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিলেন। দুই পক্ষে খুব হাসাহাসি হইল। পিসীর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি। শ্রীমা কীর্তনের জায়গায় না গিয়া একটু আড়াল হইতে শুনিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিলেন।

শ্রীমায়ের উপর বৃদ্ধা ভানুপিসীর অশেষ ভক্তি ছিল। সন্ধ্যার পরে তিনি প্রদীপ-হাতে ধীরে ধীরে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ নিবাইয়া একপাশে রাখিতেন। পরে মায়ের চরণে প্রণামান্তে সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ সুখ-

১ ১৩১৭ সালে তাঁহার বয়স আন্দাজ ষাট বৎসর ছিল।

দুঃখের কথা ও ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। শেষে মায়ের দেওয়া প্রসাদ লইয়া ও প্রদীপ জ্বালাইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিতেন। মায়ের অসুখ হইলে তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত দেখা যাইত, যেন তাঁহার অতি আপনার জন রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন। পিসী বলিতেন যে, তিনি একদিন শ্রীমাকে চতুর্ভুজারূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন যে, মায়ের গান গাহিবার সময় তিনি অবিকল ঠাকুরের গলা শুনিতে পান। মা বলিলেন, "কি জানি, বাপু; তুমিই জান।" পিসী তবু বলিতেন, "ঠাকুর তোমার ভেতর আছেন।"

ভানুপিসী শ্রীমায়ের বাল্যসঙ্গিনী ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে কলিকাতা ও কাশী প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালে পৌষ মাসে মা যখন কাশীতে লক্ষ্মীনিবাসে ছিলেন, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া নীচের তলায় পিসীকে দেখিয়া ফষ্টি-নষ্টি আরম্ভ করিলেন। পিসী স্বভাবতই রসিকা; তিনি হাত নাড়িয়া বালগোপাল-বিষয়ক গান ধরিলেন—

> "কালো বেরাল কে পুষেছে পাড়াতে?
> তোরা ধরে দে গো ললিতে। ...
> দই খেয়েছে, ভাঁড় ভেঙেছে, মুখ পুছেছে কাঁথাতে॥"

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট ব্রহ্মানন্দজীর দুই চক্ষে এত অশ্রু ঝরিতে লাগিল যে, জামা ভিজিয়া গেল। মা তাহা দেখিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "পিসী, তুমি তো সামান্য নও—যে রাখাল মহাসাগর, তাকেও তুমি তোলপাড় করে দিলে!"

শ্রীমা ভানুপিসীকে খুব আদর করিতেন এবং তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিতেন। এই আবাল্যসঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক টান ছিল। পিসী একবার অসুখে মরণাপন্ন হইলে মা দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "পিসী, তুমিও চলে যাবে? আমি কার সঙ্গে কথা কইব?" পিসী উত্তর দিলেন যে, মা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে রাখিতে পারেন। মা কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় পিসী দেখিলেন, মা যেন ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া মুখে চরণামৃত দিয়া বলিতেছেন, "পিসী, খাও, খাও।" তখন হইতে ক্রমে তাঁহার অসুখ সারিয়া গেল। তাঁহার ধারণা হইল যে, মা-ই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন। মা কিন্তু তাঁহার মুখে সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "পিসী, ওসব ঠাকুরের ইচ্ছা।"

ভানুপিসীর অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু ভক্তিপ্রভাবে সংসারের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। শ্রীমায়ের কিঞ্চিৎ পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেন।

(২) মৃগেন্দ্রের মা

শ্রীমায়ের অনুরাগী গ্রামবাসীদের মধ্যে মৃগেন্দ্রের মার নাম উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, ইনি তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণও করিয়াছিলেন। ইনি মায়ের বাড়ীতে মুড়ি ভাজা ও সংসারের অন্যান্য কাজ করিতেন। তাঁহার উপর মায়ের খুব বিশ্বাস ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও ইনি খুব লজ্জাশীলা ছিলেন, ঘোমটা টানিয়া চলিতেন এবং মৃদুস্বরে কথা বলিতেন। মৃগেন্দ্রদের বাড়ীর পাশ দিয়া শ্রীমাকে প্রতিদিন যাতায়াত করিতে হইত; কাজেই মৃগেন্দ্রের মা নিত্যই তাঁহার দর্শন পাইতেন। একবার জ্বর হওয়ায় মা দুই-তিন দিন বাহির হইতে পারেন নাই। তাই বৃদ্ধা দুশ্চিন্তায় ঘোমটা ফেলিয়া একদিন সকালে দ্রুতপদে মায়ের বাড়ীতে আসিয়া আবেগভরে বলিলেন, "এই যে গো আমার রাজরাজেশ্বরী অসুখ করে বিছানায় পড়ে আছেন; তাই তো কদিন দর্শন পাইনি। ওদিকে যাওয়া হয় না; চারিদিক অন্ধকার হয়ে আছে!" মৃগেন্দ্রের মা একদিন একজনকে বলিয়াছিলেন, "মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী" এবং এই কথার প্রমাণস্বরূপে মায়ের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত শুনাইয়াছিলেন।

তিনি শিহড়ের মেয়ে। তাঁহার পিতৃকুল শ্রীমায়ের মাতুলবংশের এবং শ্বশুরকুল পিতৃবংশের যজমান ছিলেন। উহাই শ্রীমায়ের সহিত মৃগেন্দ্রের মার ঘনিষ্ঠতার অন্যতম কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল; কিন্তু বয়স কম বলিয়া কথা বলার সুযোগ হয় নাই। তিনি বলিতেন, "আমরা...ঘরের ভেতর থেকে দেখতুম, তিনি যখন আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে আহেরের দিকে শৌচে যেতেন। কান পেতে তাঁর কথাবার্তা শুনতুম। আমার শাশুড়ীর সঙ্গে অনেক আলাপ ও রঙ্গরস হত।"

জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

গ্রন্থের উপাদান

(ক) আকর গ্রন্থসমূহ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (পাঁচ খণ্ড)—লেখক শ্রীম
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (পাঁচ খণ্ড)—লেখক স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন
শ্রীরামকৃষ্ণদেব—ব্যাখ্যাকার শ্রীশশিভূষণ ঘোষ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই খণ্ড)—প্রকাশক, উদ্বোধন কার্যালয়
শ্রীশ্রীসারদা দেবী—লেখক ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
শ্রীমা—লেখক শ্রীআশুতোষ মিত্র
শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা—লেখক 'শ্রী', ১৩৪৬ সালের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত
স্বামী সারদানন্দ (জীবনকথা)—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সংকলিত
গৌরী-মা—সারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত
শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি—লেখক স্বামী নির্লেপানন্দ
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী—লেখক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত
Sri Sarada Devi—প্রকাশক, Sri Ramakrishna Math, Madras
Prabuddha Bharata—প্রকাশক, Advaita Ashrama, Mayavati
উদ্বোধন—প্রকাশক, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

(খ) যাঁহাদের স্মৃতিলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে—

স্বামী শান্তানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ, স্বামী গৌরীশানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী সারদেশ্বরানন্দ, স্বামী সৎ-সঙ্গানন্দ, স্বামী তন্ময়ানন্দ, স্বামী হরিপ্রেমানন্দ, শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়, শ্রীমতী সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রীমতী কুসুমকুমারী আইচ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী।

(গ) যাঁহারা মৌখিক বিবরণ দিয়াছেন—

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী ঋতানন্দ, শ্রীযুক্ত কর্ণাটকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার গুপ্ত আমাদিগকে মাস্টার মহাশয়ের দিনলিপি ও পত্রাদি দেখিতে ও অংশতঃ ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উহা হইতে উদ্ধৃত অংশগুলির সম্পূর্ণ স্বত্ব তাঁহার।

শ্রীমায়ের জন্মকুণ্ডলী

শুভমস্তু, জন্ম—শকাব্দাঃ ১৭৭৫।৮।৭।২৮।৩০
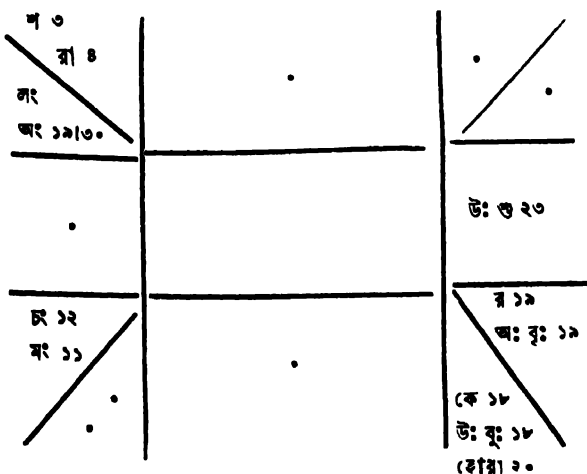
এতচ্ছকীয়-সৌরপৌষস্যাষ্টমদিবসে, গুরুবাসরে, কৃষ্ণপক্ষীয়-সপ্তম্যান্তিথৌ, উত্তর-ফাল্গুনী-নক্ষত্রস্য প্রথমচরণে, আয়ুষ্মদ্‌যোগে, ববকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গসংশুদ্ধৌ রাত্রি-নবমপলাধিক-দ্বিতীয়দণ্ডসময়ে অয়নাংশোদ্ভব-শুভমিথুনলগ্নে (লগ্নস্ফুটরাশ্যাদয়ঃ ২।১৯।৩০।০), বুধস্য ক্ষেত্রে, রবহোরায়াং, শুক্রস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য সপ্তাংশে, গুরোর্নবাংশে, শনৈশ্চরস্য দ্বাদশাংসে, গুরোস্ত্রিংশাংশে এবং সপ্তবর্গপরিশোধিতে বৃহস্পতের্বামার্ধে, রবের্দণ্ডে উত্তর-ফাল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিত-সিংহরাশিস্থিতে চন্দ্রে, অশেষ-গুণালঙ্কৃত-শ্রীযুত-রামচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়-মহোদয়স্য শুভা প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সারদামণি দেবী সমজনি।

শ্রীমায়ের পিতৃকুলের বংশতালিকা

নির্ঘণ্ট